বাংলাদেশ ও ইসলাম

সৈয়দ আমীরুল ইসলাম

বাংলাদেশ ও ইসলাম

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা

সৈয়দ আমীরুল ইসলাম

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

বাংলাদেশ ও ইসলাম : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা

সৈয়দ আমীরুল ইসলাম

প্রকাশক : কমলকান্তি দাস ও মোরশেদ আলম, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০। ফোন : ২৪০০৫১ গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রচ্ছদ : সুখেন দাস। বর্ণবিন্যাস : বর্ণনা কম্পিউটারস ১৩/১ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ১১০০। মুদ্রণে : চলন্তিকা প্রেস, ২৩ ডিস্টিলারি রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা ১২০৪। প্রকাশকাল : দ্বিতীয় সংস্করণ এবং জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৯।

মূল্য : ১৮০.০০ টাকা

BANGLADESH AND ISLAM (A Review from Historical Perspective) by Syed Amirul Islam, Second Edition and Jatiya Grantha Prakashan First Edition October 1999. Published by Kamalkanti Das & Morshed Alam, Jatiya Grantha Prakashan 67 Pyaridas Road Dhaka 1100, Phone : 240051. Copyright : Author. Cover Design : Sukhen Das. Computer Compose : Barnona Computers, 13/1 Northbrook Hall Road Dhaka 1100. Printer : S. R. Printing Press, 7 Shyamaprasad Roychowdhury Lane Dhaka 1100

Price : Tk. 180.00, US $ 10.00

ISBN 984-560-081-2

উৎসর্গ

প্রপিতামহ সৈয়দ আব্দুল করিম
পিতামহ সৈয়দ আব্বাসউদ্দিন আহমেদ
পিতৃব্য সৈয়দ গোলাম এরশাদ

স্মরণে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মানব সভ্যতার ইতিহাস : আদিম যুগ

গ্রীক সভ্যতা

ইতিহাস সন্ধান

বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস : নতুন দৃষ্টিকোণে একটি সমীক্ষা

বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি : ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট (যুগ্ম সম্পাদক)

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ও ইসলাম ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এ সংস্করণে বইটির উপস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন এনে অধ্যায় এবং ভাগ-বিভাজন আগের সংস্করণের চেয়ে অন্যতর করা হয়েছে। সামান্য কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে, কিছু সংযুক্ত হয়েছে। বড় পরিবর্তন এসেছে উপসংহারে। প্রথম সংস্করণের উপসংহার এবার মূল বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করে একটি নতুন উপসংহার দেওয়া হয়েছে।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচুর তথ্য উপাত্ত দিয়ে বইটি রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। অসংখ্য বই পত্রপত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অনেক বইয়ের উদ্ধৃতি সরাসরি ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বসুরি লেখকদের কাছে সেজন্য বর্তমান রচয়িতা গভীরভাবে ঋণী। সকল স্তরের মানুষের জন্য রচিত বলে টিকা-টিপ্পনি দেওয়া হয়নি। গ্রন্থপঞ্জিরও উল্লেখ বাহুল্য মনে হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বইয়ের ভেতরে প্রদত্ত উদ্ধৃতি থেকে সূত্র পেতে পারেন। কোথাও কোন ভুল দেখা গেলে, পাঠকের কাছে অনুরোধ, তা ধরিয়ে দিলে লেখক বাধিত হবেন।

ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল ও মানবিক দিকটি বস্তুনিষ্ঠভাবে এ বইয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে এ যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তার চেয়ে কম প্রভাব ফেলেনি তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সাম্যের বাণী শোনানো এবং নিরক্ষর অপরিশীলিত সমাজ পরিস্রুত করায় এর ভূমিকা বিশাল। সব ধর্মেরই মর্মবাণী মানুষের আত্মিক ও জাগতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। আজ যাই ভূমিকা হোক-না কেন, এক সময় বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের সঠিক গণনার ফলেই কৃষিভিত্তিক সমাজের চাষআবাদ সুচারু রূপে সম্পন্ন হত। ধর্মবাহকদের ইতিবাচক এ দিকটি অস্বীকার করা যেমন ভুল, তেমনই অনুচিত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে এর নেতিবাচক অমানবিক ব্যবহার। বক্তব্যটি মনে হয় বইটির পাঠকরা বুঝেছেন। আর সেজন্যই এটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সুধিবৃন্দের কাছ থেকে সাধুবাদ পাওয়া গিয়েছিল। তাঁদের কাছে লেখক এজন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথম সংস্করণেই বলা হয়েছিল যে, বইটির মূল পাণ্ডুলিপি খ্যাতনামা সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দিন দেখে দিয়েছিলেন। তিনি আজ লোকান্তরিত। তাঁর সপ্রশংস মন্তব্য আজো আমাকে প্রেরণা যোগায়। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। এটি রচনায় অগ্রজতুল্য অজয় রায়-এর উৎসাহ দানের কথা আগের সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। বইটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশক জনাব আবদুল আলীম ১৯৯১-এর ৩ ফেব্রুয়ারি আকস্মিকভাবে ইহলোক ত্যাগ করেন। এমন বিশালহৃদয় মানুষ পাওয়া ভার। তাঁর সান্নিধ্য হারানো আমার জীবনের এক পরম ট্র্যাজেডি। তাঁর অভাব সবসময় অনুভব করি। তাঁর স্মৃতির প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা।

বইয়ের নাম *বাংলাদেশ ও ইসলাম* রাখার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলেন বন্ধুবর অধ্যাপক যতীন সরকার। প্রথম সংস্করণে এজন্য তাঁকে আলাদাভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার সুযোগ না-হওয়ায় এখানে তা গ্রহণ করলাম। প্রখ্যাত মুদ্রাতত্ত্ববিদ সহকর্মী ড. মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন বাংলার একজন নতুন সুলতান আবিষ্কার করেছিলেন (সুলতান কুতুবউদ্দিন মাহমুদ) আর অন্য এক সহকর্মী বিশিষ্ট মুদ্রা-বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ রেজাউল করীম আবিষ্কার করেছেন তিনজন (সুলতান জালালুদ্দিন আজম, নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম ও গিয়াসউদ্দিন নুসরত)। এ সব তথ্য ব্যবহার করতে তাঁরা সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন। জনাব করীমের এছাড়াও নানা পরামর্শ গ্রহণ করেছি। এজন্য উভয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

বইটির যথেষ্ট পরিমানে চাহিদা আজও আছে দেখা যায়। কদিন আগেও এটি কোথায় পাওয়া যাবে তার হদিস চেয়ে পত্র পেয়েছি। অনেক গুণীজন এ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হরিপদ দত্ত এটি সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন আমেরিকা কানাডা। বিভিন্ন প্রকাশকও এগিয়ে এসেছেন এর পুন:প্রকাশে। বিশেষ করে বর্তমান প্রকাশকদ্বয়। এজন্য তাঁদের জানাই অজস্র ধন্যবাদ। তঁদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন জনাব মোতাহার হোসেন—আমার আর এক প্রকাশক। এজন্য তঁকেও আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রথম সংস্করণে বইটির সৌকর্য রক্ষা করা তেমন সম্ভব হয়নি। লেটার প্রেসে দীর্ঘ এক বছর ধরে তা ছাপা হয়েছিল। বর্তমান প্রকাশকদ্বয় এটি হাল-মানসম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম সংস্করণটির মত এ সংস্করণটিও আদৃত হলে নতুন করে দেওয়া আমার শ্রম সার্থক হবে।

অক্টোবর ১৯৯৯ | সৈয়দ আমীরুল ইসলাম

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

ভূমিকা

ই. এইচ. কা'র *হোয়াট ইজ হিস্ট্রি* রচনায় বলেছেন, 'ইতিহাসবিদের কর্তব্য অতীতকে ভালবাসা নয়, অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও নয়, বরং বর্তমানকে বোঝার জন্য প্রয়োজন তা জানা এবং বোঝা। মহৎ ইতিহাস তখনই লেখা সম্ভব যখন ইতিহাসকার-এর অতীত-দৃষ্টি বর্তমানের সমস্যাবলীর গভীরতায় আলোকোজ্জ্বল হয়।' যে পদ্ধতিতে এ দিব্যদৃষ্টি সম্ভব তা ডি. ডি. কোসাম্বি'র *দ্য কালচার এ্যাণ্ড সিভিলাইজেসন অব এ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া ইন হিস্টোরিক্যাল আউটলাইন* নামক গ্রন্থে প্রদত্ত 'ইতিহাস হল উৎপাদনের উপায় ও সম্পর্কের ক্রম-পরিবর্তন কালানুসারে উপস্থাপন' মন্তব্যটির মধ্যেই নিহিত। বাংলাদেশে ইসলামও বর্তমানে এ প্রেক্ষিতে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব, প্রচার ও প্রসার কোন ঐন্দ্রজালিক ঘটনা নয়, কতকগুলো স্বাভাবিক কার্যকারণ ও ঘটনা পরম্পরার-ই ক্রমপরিণতি। হ্যাভেল *এ্যারিয়্যান রুল ইন ইণ্ডিয়া*'য় বলেন, 'নবীন সমাজব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে দেয় সমান আত্মিক মর্যাদা, ইসলামকে করে রাজনীতি ও সমাজনীতির মিলনভূমি আর তাই দেয় তাকে জগৎশাসনের ভার। জগৎটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হওয়ার বিধান হিসেবে ইসলাম যথেষ্ট। বৌদ্ধদর্শন ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদের গোঁড়ামির সংঘর্ষ যখন উত্তর ভারতে একটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ সৃষ্টি করছিল, সেই সংকটকালেই ইসলাম সঞ্চয় করে চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি।' মানবেন্দ্র নাথ রায়-এর *দ্য হিস্টোরিক্যাল রোল অব ইসলাম*-এর ভাষায়, 'প্রমাণাভিলাষী মন নিয়ে ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে যে, যেমন পারস্য ও খ্রীস্টান দেশগুলোতে, তেমন এই ভারতবর্ষেও মুসলিম বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত করে দিয়েছিল দেশীয় কতকগুলো ঘটনা। বিজিত জাতির বিপুল জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না-হোক, অন্তত মৌখিক সহানুভূতি, কি মৌন সম্মতি না-পেলে কোন বিদেশী আক্রমণকারীই সুদীর্ঘ ইতিহাস ও প্রাচীন সভ্যতাসমৃদ্ধ কোন বড় জাতিকে অতি সহজে পদানত করতে পারে না।'

হ্যাভেল-এর আর একটি উক্তি 'ইসলামের দর্শন নয়, বরং এর সামাজিক বিধি-বিধান বা কর্মপদ্ধতি ভারতবর্ষে এত অধিক ধর্মান্তরিত গুণগ্রাহী খুঁজে পেয়েছে' এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সাধারণ মানুষের কাছে তত্ত্বকথা বা দর্শনের আবেদন সবসময়ই সামান্য। তারা চালিত হয় বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা, কেবল ভাবাবেগে নয়। জীবনের যে-অবস্থায় তারা দিন কাটায় তার চেয়ে উন্নত যে-কোন সমাজব্যবস্থাই তাদের আকৃষ্ট করতে পারে। কোসাম্বির ভাষায়, 'মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু আমরা আজো এমন কোন মনুষ্যপ্রাণী জন্ম দিতে পারিনি যে রুটি না-খেয়ে বাঁচতে পারে, অথবা (বাঁচে) কোন-না-

কোন প্রকার খাদ্য না-খেয়ে।' ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে সুমহানবাণী সম্বলিত একটি বইয়ের চেয়ে এক মুঠো খাবারই বেশি আদরের বস্তু। জৈনধর্মীরা কৌপীনাদি সহ সবকিছু ত্যাগ, এমনকি দেহটি পর্যন্ত ত্যাগের যে-মহিমা স্থাপনের চেষ্টা একদা করেছিলেন, সে-আদর্শ বিশ্বজুড়ে স্থাপিত হলে আজকের বিশ শতক পর্যন্ত না-হত এতসব বৈজ্ঞানিক উন্নতি, না টিকে থাকত একটি মানুষও। মৃত্যুতেই নির্বাণ বা মোক্ষলাভ হলে বংশ বাড়ার সুযোগও হয় নিঃশেষ। তবে আসলে এ-ও জীবনে বঞ্চনার, অপমানের এবং শোষণের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা জীবন-বিরোধী। ??

ইসলাম একান্তভাবেই জীবনবাদী ধর্ম। এখানে বাঁচতে হয়, ধর্মের অনুশাসনও পালন করতে হয়। সংসার ত্যাগ করে বনে যাওয়া নয়, আবার ঘোরতর সংসারী হয়ে সবকিছু স্বার্থপরভাবে গ্রহণ বা অধিকার করাও নয়, দু'য়ের ভেতর একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করার শিক্ষাই ইসলাম দেয়। হাদিসে আছে, আল ইসলামু বাইনাল ইফরাত ওয়াত তাফরিত অর্থাৎ মধ্যবর্তী পথই উত্তম। অন্যদিকে পবিত্র কোরানে বার বার বলা হয়েছে, 'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করে তাদের পুরস্কৃত করা হবে এবং আল্লাহ্‌র নেকনজর তাদের দিকেই থাকবে।' অর্থাৎ কেবল ঈমান আনা নয়, একই সাথে সৎকাজ করার কথা সবসময়েই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। মুখে ধর্মগ্রহণ বা তত্ত্বজ্ঞানলাভই সব নয়, বাস্তবে এর প্রয়োগ তথা সামাজিকভাবে এক মানুষের প্রতি অন্য মানুষের যে কর্তব্য ও দায়িত্ব, সে-সব পালন করার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সে-সব সৎকাজের বর্ণনাও নানা আয়াতে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণের জীবনাদর্শ এক্ষেত্রে বাস্তব উদাহরণ। বাংলাদেশের আলাউল হক-এর মত সাধকরা তাই সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজনে লঙ্গরখানা খোলেন, কেবল খানকাহ্ বা মাদ্রাসা নয়। ধর্মও প্রচারিত হয় এভাবেই, কেবল তরবারি বা তত্ত্বকথায় নয়। বস্তুগত লাভালাভের খতিয়ানে বাংলাদেশের মানুষও সেজন্যই ইসলামের ভেতর একদা পেয়েছে একই সাথে আত্মিক পরিতৃপ্তি এবং বাস্তব-জীবনে অগ্রগতি। নামাজান্তে মুসলমানরা খোদার কাছে মোনাজাত করে, রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাও অর্থাৎ হে প্রভু, ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল আমাদের দান কর। আরবেও ইসলাম এসেছিল এই বার্তা নিয়েই। এই বোধই ইসলাম সমগ্র পৃথিবীকে করেছে স্নাত, বিচ্ছিন্ন আরবকে সংহত এবং ভারত সহ বাংলাদেশের দ্বার অবারিত।

বাস্তব প্রেক্ষাপট তৈরি করে ধর্ম-দর্শনের পটভূমি। আবার ধর্মদর্শনও বদলায় বাস্তব প্রেক্ষাপটেই। বদল করে বাস্তব প্রেক্ষাপটকেও। বাস্তব প্রেক্ষাপটে অবস্থানকারী সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদান হল সৃষ্টিশীল মানুষ। ইসলাম ধর্ম কোন নৈর্ব্যক্তিক দর্শন নয়। মানুষের জীবন কেন্দ্র করেই তা আবর্তিত। আর মানুষের জীবন চলে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে। চলে সংঘাতে বর্জনে গ্রহণে। ইসলাম ধর্ম অনুসারী এসব মানুষের কাহিনীই প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে প্রতিপালিত ইসলামের কাহিনী। মূল ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের যে-অসঙ্গতি এবং যে-অসঙ্গতি জন্ম দেয় আরো ভিন্নতর

অবস্থা ও মতবাদের আর সেই পরিবর্তিত মতবাদ সৃষ্টি করে যে নবতর প্রেক্ষাপটের— এ সমস্তই মানুষের জীবনের ঘটনা। মানুষের এধরনের জীবন-ঘিরেই এগিয়ে চলেছে ইসলাম। এর অনুশাসন অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট থাকলেও তাই সে-সব থাকতে পারেনি আবদ্ধ কেবল কোন একটা নিচ্ছিদ্র কুঠুরির বিশেষ ডগ্‌মায়। কোন স্থানেই পারেনি। কোন দেশেই না। বাংলাদেশেও না।

উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করতে গিয়ে ১৯৭১-এ বিশ্ব-মানচিত্রে আবির্ভূত বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে কেন্দ্র করেই নানা কথার অবতারণা এ গ্রন্থে করা হয়েছে। তবে শত শত বছর আগের কাহিনীও যেহেতু অনিবার্যভাবেই এসেছে, সেই হেতু হাল আমলের বাংলাদেশের রাষ্ট্র-সীমায়ই কেবল তা সীমিত থাকেনি, বিস্তৃত হয়ে গেছে আরো বৃহত্তর ভূমণ্ডলে—এক সময়ের 'লখনৌতি' রাজ্যে, স্বাধীন সুলতানী আমলের 'বাঙ্গালা'য়, অথবা মোগলদের 'সুবাহ্-ই বাঙ্গালা'য় এবং ব্রিটিশ আমলের 'বেঙ্গল'-এ। নির্দিষ্ট একটা সময় ছাড়া রাষ্ট্রসীমা স্থির নয় কখনই। এমন কি একই স্থানের নামেরও বদল হয় হরহামেশাই। সেজন্যই একটিমাত্র স্থানের নাম কেন্দ্র করে কোন ইতিহাস আলোচনা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা প্রশ্নসাপেক্ষ। বাংলাদেশ বলতে তাই এখানে মোটামুটি সারা বাংলাকেই বোঝাবে অনেক সময়। আর আলোচনার সময়কালটা হবে বখতিয়ারের নওদিয়া বা নওদা কিংবা গৌড় বিজয় (১২০৫ খ্রীস্টাব্দ) থেকে আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব (১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ) ও পরবর্তী কিছুটা সময় ঘিরে।

আরবে ইসলামের আবির্ভাব

ইসলাম আবির্ভাবের অনেক আগেই সারা আরব উপদ্বীপে অনেকগুলো রাজ্য গড়ে উঠেছিল। রাজবংশ রাজত্ব করছিল। নানাধরনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রচলিত হয়েছিল। এগুলোর ভেতর দক্ষিণ আরবের সাবিয়ান, মিনাইয়ান, হিমাইয়ারি রাজ্য এবং উত্তর আরবের নাবিতিয়ান, পালমিরা, ঘাস্‌সানী, লাঘমিদ, কিন্‌দা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হলেও সাধারণভাবে সারা আরবে, বিশেষ করে ইসলাম আবির্ভাবের স্থান হেজাজ-নজদে গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার একটা বিশেষ প্রাধান্য বর্তমান ছিল। হজরত মুহম্মদের (সঃ) জন্মের সময়ও এ অবস্থার অন্যথা ঘটেনি।

অনুর্বর মরুভূমির গুটিকয় উর্বর স্থান, পশুপালনের চারণভূমি, তৃণক্ষেত্র, মরুদ্যান, নহর বা পানির ফোয়ারা এবং গবাদি পশু দখলের জন্য কলহ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। এজন্য বাইজেন্টাইন পারসিক এবং আবিসিনিয়দের সাথেও কখনো-বা তাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হত। ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার প্রাগ্-মুহূর্তে আবিসিনিয়-রাজ আবরাহার অভিযান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সমাজ ছিল শ্রেণী বিভক্ত। গোত্রদ্বন্দ্বে পরাজিতদের দাস হিসেবে খাটানো হত—গৃহে, খেতে বা অন্যান্য কাজে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের উপায়। সৎকাজের অভাবে দস্যুতাও ছিল এক ধরনের পেশা। দ্বন্দ্বসংঘর্ষে শারীরিকভাবে পুরুষগণ বেশি প্রয়োজনীয় ও নিরাপদ ছিল বলে নারীরা

সমাজে ছিল অবহেলিত। কন্যা-সন্তানকে তাই কখন-বা মেরেও ফেলা হত ভিন্নগোত্র দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার ভয়ে।

সমাজে সবচেয়ে ভদ্রপেশা ছিল ব্যবসাবাণিজ্য। দক্ষিণ আরবে বেশকিছু বণিক-ব্যবসায়ীর উদ্ভব ইসলাম-আগমনের আগেই ঘটেছিল। এমন একটি গোত্র কোরায়েশ ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত ধরনের জীবনযাপন করত বলে ছিল অত্যন্ত সম্মানিত। পঞ্চম শতকের প্রথমদিক থেকে তারা স্বায়ত্তশাসিত মক্কার শাসন ক্ষমতাও লাভ করেছিল। মক্কা ছিল আরবের সকল গোত্রের ধর্মকেন্দ্র, বিশেষ করে এর কাবাঘর। প্রতিটি গোত্রের টোটেম ও টাবু'র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ছিল এক একটি দেবতা বা দেবী মূর্তি। অনেক গোত্রই মাত্র কিছুদিন আগেও ছিল মাতৃতান্ত্রিক। বিভিন্ন গোত্রের ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি কাবাঘরে অধিষ্ঠিত ছিল। প্রতিটি গোত্রের ছিল আবার নানারকম বিশ্বাস-সংস্কার আচার-আচরণ। চিন্তাধারা তাই ছিল হাজারো। একেশ্বরবাদী ইহুদী ও খ্রীস্টানরাও আরবে বসবাস করত। তাদের একটা প্রভাবও সমাজে পড়ছিল। হয়ত-বা এজন্যই হজরতের (সঃ) আবির্ভাবের আগমুহূর্তে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকত একদল লোক। এঁরা হানীফ নামে পরিচিত ছিলে। আরবদের ভেতর অমানবিক প্রথা দূর করার প্রয়াস এঁরা চালাতেন।

সারা আরবে এ সময় একটি অত্যন্ত উন্নত ধরনের ভাষা কমবেশি প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। মেলাগুলো ছিল এই ভাষা চর্চার উর্বর ক্ষেত্র। মক্কার কাছেই ওকাজ নামক স্থানের মেলাটি ছিল বিখ্যাত। এসব মেলা এবং ধর্মীয় নানা উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মাধ্যমে দেশীবিদেশীর সমাগমে আরবিরা নানারকমের মানুষ ও চিন্তাচেতনার সাথে পরিচিত হত। শত ভেদবিভেদ সত্ত্বেও এ ভাষা গোত্র-ঐক্য চেতনার ক্ষেত্রে কিছুটা কাজ করছিল নিঃসন্দেহে। কাবাঘর কেন্দ্র করে এবং সেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিভূ মূর্তি রাখার সূত্র ধরে একটা ঐক্য-চেতনা গড়ে উঠছিল ঝগড়াঝাটি সত্ত্বেও। ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার্থে এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার্থে বছরের তিন-চার মাস গোত্র কলহই বন্ধ রাখা হত। বাণিজ্যের স্বার্থে আরব ব্যবসায়ীকুলও গোত্রকলহের বদলে চাচ্ছিল এক শান্তিময় পরিবেশ। এরকম খ্যাতনামা ধনিব্যবসায়ী আবু বকর বা ওসমানের মত ব্যক্তি তো পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেন।

মোটকথা, পরস্পরবিচ্ছিন্ন গোত্রব্যবস্থা, বিভিন্নগোত্রের ভেতরে একটা সামগ্রিক ঐক্যচেতনা, উন্নত একটি ভাষা, ব্যবসায়ীকুলের শান্তি কামনা, কোরায়েশ গোত্রের অপ্রতিহত প্রভাব এবং একেশ্বরবাদীদের চিন্তাধারা সম্মিলিতভাবে একটি নতুন সমাজগঠনের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার সহায়কশক্তি হিসেবে এ সময়টা বিরাজ করছিল। যেন ছয় শতকের আরব হজরত মুহম্মদের (সঃ) মত এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের জন্য অপেক্ষমানই ছিল। পি. কে. হিট্টি *হিস্ট্রি অব দ্য এরাব্‌স্* গ্রন্থে বলেন, 'মহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল এবং সময়টিও ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত'

হজরত মুহম্মদের (সঃ) চল্লিশ বছর বয়সে (৬১০-খ্রীস্টাব্দ) নবুয়ত প্রাপ্তি ঘটে এবং ৬৩২-এ ইন্তেকাল হয়। তাঁর মোটামুটি বাষট্টি বছর বয়সের মধ্যে শেষ বাইশ বছরই ইসলাম ধর্ম প্রচারের যুগ, বিশেষ করে ৬২২-এ মদীনায় হিজরতের পরের দশ বছর। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর নেতৃত্বে আরবগণ ঐক্যবদ্ধ হয়, বিভিন্ন গোত্রপ্রথার স্থলে সম্মিলিত চিন্তার উদ্ভব ঘটে এবং দেশ জয়ের মাধ্যমে ক্রমে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা করে।

হজরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদিন-এর আমল ৬৩২ থেকে ৬৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রায় ত্রিশ বছর এবং ৬৬১ থেকে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় নব্বই বছর উমাইয়া বংশের রাজত্বকাল। তারপর প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচশ বছরের ওপর রাজত্ব করেন আব্বাসিয় খলিফাগণ ৭৪৯ থেকে ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সারা সময়টাই ইসলামের ক্রম-প্রসরণ যুগ। কখনো বিজয়। কখনো অভ্যন্তরীণ সংগঠন। এরই মাঝে ৭১১-১২ খ্রীস্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদ-এর রাজত্বকালে ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের সিন্ধুদেশ আরবিয়গণ দখল করে মুহম্মদ-বিন-কাসিম-এর নেতৃত্বে। কিন্তু পরবর্তী উমাইয়া খলিফাদের সময়ের অভ্যন্তরীণ কলহ, দুর্বলতা ও অক্ষমতা এবং আব্বাসিয় খলিফাদের রাজ্যবিস্তারে অনীহা ও অনুৎসাহের কারণে সমগ্র ভারত অথবা বাংলাদেশ বিজয় আরবিয়দের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

সমসাময়িক বাংলাদেশ

হজরত মুহম্মদের (সঃ) জন্মের বহু আগেই বাংলাদেশে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন ঘটে গেছে। পূর্ব, পশ্চিমের একাংশ এবং দক্ষিণ বঙ্গে কোটালীপাড়া রাজধানী কেন্দ্র করে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব মোটামুটি ৫২৫ থেকে ৬০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সুসংগঠিত রাষ্ট্র স্থাপন করে ফেলেছেন। পৃথুবীর এবং শ্রীসুধন্যাদিত্যও হয়ত তাঁদের উত্তরসুরি হিসেবে এসেছেন। তবে হজরত মুহম্মদের (সঃ) জন্মের সময় এখানে খুব সম্ভবত সমাচারদেব-এর রাজত্বকাল ছিল। উত্তরবঙ্গ (সেকালের পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র) এবং পশ্চিমবঙ্গ (সেকালের সুহ্ম বা রাঢ়) ছিল মগধ-এর পরবর্তী গুপ্তরাজগণের অধীন। আবার হজরত মুহম্মদের (স:) নবুয়তপ্রাপ্তির আগে, সম্ভবত তাঁর মৃত্যুরও পর পর্যন্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ৬৩৭ পর্যন্ত, বাংলাদেশের একটা অংশসহ গৌড়-এর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন প্রখ্যাত মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক।

শশাঙ্কের পর মানব ও জয়নাগ নামক রাজাদ্বয়ের খবর পেলেও ৬৪২-এ ভাস্করবর্মা গৌড় দখল করেন। তাও শীঘ্রই, সম্ভবত ৬৪৭-এ তিব্বতরাজ স্রং-স্যান-গ্যাম্পোর আক্রমণে হস্তচ্যুত হয়। সেই থেকে ৭০২ পর্যন্ত গৌড় বার বার তিব্বতী অভিযানে বিব্রত হয়েছে। অতঃপর নেপালরাজ-দ্বিতীয় জয়দেব-এর শ্বশুর ভগদত্ত বংশীয় রাজা হর্য ৭১০ থেকে ৭২০ এর মধ্যে গৌড় দখল করেন।

অন্যদিকে, সমতটে এ সময়ের দিকে ভদ্র বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজগণ শাসন করছিলেন। বঙ্গের খড়্গ বংশ এদের উৎখাত করে। সাত শতকের শেষার্ধে রাত বংশের রাজাগণ সমতটে কর্তৃত্ব লাভ করেন। লামা তারানাথ বর্ণিত চন্দ্রগণও কখনো বঙ্গে আর কখনো গৌড়ে প্রায় আট শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৭২৫-এ শৈল বংশের রাজা জয়বর্ধনের প্রপিতামহের ভাই পুণ্ড্রবর্ধন দখল করেন। আবার ৭৩৫-এ কনৌজরাজ যশোবর্মা গৌড় ও বঙ্গ আক্রমণ করেন। ৭৩৭-এর দিকে তিনি কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের হাতে পরাজিত হলে গৌড়রাজ কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর ৭৫০-এর দিকে সুবিখ্যাত পাল বংশের গোপাল প্রথমে বরেন্দ্র অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে ক্রমে প্রায় সারা বাংলার অধিপতি হলে চারশ বছরের মত ১১৬৫ পর্যন্ত একটি বড় রাষ্ট্র স্থাপিত হয। ৯৬৬ থেকে ৯৯১ পর্যন্ত কম্বোজ-রাজগণ এবং ১০৭৫-এর দিকে কৈবর্তগণ অবশ্য তাদের সাময়িকভাবে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এছাড়াও সমতট ও হরিকেল-এ দেব বংশ নবম থেকে একাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, পূর্ব ও দক্ষিণ- বঙ্গে চন্দ্র বংশ ন' থেকে এগার শতকের মাঝ পর্যন্ত এবং বর্মণ বংশ পূর্ববঙ্গে পাল আমলেই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত।

এগার শতকে অপর-মন্দার তথা বর্তমান হুগলি অঞ্চলে শূর বংশ রাজত্ব করছিল। এদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বিজয় সেন পরাক্রমশালী হন এবং শেষ পালরাজ মদনপালদেব'কে ১১৫৫তে পরাজিত করে বরেন্দ্র অঞ্চলে সেন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সেন আমলেও সুন্দরবন অঞ্চলের পূর্বখটিকা বিষয়-এ এক পাল বংশ বারো শতকের শেষদিকে রাজত্ব করত। এছাড়া মেঘনা নদীর পূর্ব তীরের দেব বংশ ক্রমে ত্রিপুরা নোয়াখালি-চাটগাঁয় বারো শতকের শেষে ও তের শতকের প্রথমভাগে প্রভাব বিস্তার করে। কুমিল্লা অঞ্চলে পট্টিকেরা নামে তের শতকে আর একটি স্বাধীন রাজ্যও ছিল।

রাজনৈতিকভাবে নানা ভাগ-বিভাজন থাকলেও এ সময় পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, এর সাম্যের বাণী এবং সবকিছু আত্মস্থ ও একীভূত করে নেওয়ার প্রবণতা ছিল প্রবল। বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচণ্ড স্বার্থপর সমাজ-বিমুখ রূপটিও এর আগে তেমনটা দেখা যায়নি যা বল্লাল সেন-এর নানাবিধ কঠোর অনুশাসন, সামাজিক ছুতমার্গ, ভেদ-বিভেদ ও বৌদ্ধ-নিগ্রহ দ্বারা বাংলাদেশকে বারো শতক পরিব্যাপ্ত করেছিল। এর আগের শতকগুলোতে বৌদ্ধ, এমন কি ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও একটা সামাজিক সমন্বয়ধর্মী রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশেষ করে পাল আমলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও করণ-কায়স্থ রাজকর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে ধর্মীয় উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার যে পরিচয় মেলে তা সমাজকে সুস্থির রাখতে অনেকটাই সহায়ক হয়েছিল। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ ব্যবস্থা প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সুদৃঢ় আসন গেড়ে বসেছিল নতুন নতুন জায়গা আবাদযোগ্য করে। আর তারই বদৌলতে কৃষিমুখ্য অর্থনীতি আপন গতিতে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গ্রামগুলোর কৃষক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ফসল ফলানো, পরিবার প্রতিপালন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়

কাজে বেশি উৎসুক ছিল। রাজনৈতিক অঙ্গনের ভাঙাগড়ার কোলাহলে যোগদানে তাদের ভূমিকা ছিল গৌণ। সুদূর পল্লী অঞ্চলের সমাজে কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্যও ছিল সামান্য। মূলত প্রজাদের কর প্রদান ও রাজন্যবর্গের তা গ্রহণেই ছিল সীমাবদ্ধ। পাশাপাশি বসবাসকারী মানুষেরা স্বভাবতই পরমতসহিষ্ণু ও উদার হত তেমন অর্থনৈতিক কোন প্রতিযোগিতার অভাবেই। অনাবাদী উর্বর জমি ছিল এন্তার। চাষ করলেই ফসল। চাইলেই যেতো জমি রাজার কাছ থেকে পাওয়া। মানুষ ছিল সংখ্যায় কম। ফলে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হত সামান্যই। রাজনীতি ছিল উপরের তলার বিষয়। রাজা আর রাজবংশ আসত যেত সেখানকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই। সাধারণের জীবন ছিল ধর্মীয় বাতাবরণসহ নানা আচার-সংস্কারে বাঁধা। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন, দেখাসাক্ষাৎ এবং সীমিত-গণ্ডিতে চলাফেরা ও বাধানিষেধ জনগণকে সহিষ্ণু করে তুলত। দেশীয় আচারাদির সাথে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম তাদের মাঝে এক নতুন যোজনা সৃষ্টি করেছিল। জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর এগুলো দেবারও প্রয়াস পেত।

কিন্তু বারো শতকে সেনদের ব্রাহ্মণ্যবাদ সম্ভবত এদেশের সমাজে এক মারাত্মক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বল্লাল সেনের গোঁড়ামি এবং জাতি ও গোত্র নির্দেশের ব্যবস্থা এদেশের জনগণ সহজে নিতে পারেনি। সমাজে প্রচলিত বৌদ্ধ বা অন্যান্য মতবাদের প্রতি যখন অবহেলা প্রদর্শিত হতে থাকে এবং সেসব হয়ে যায় অপাঙ্ক্তেয় তখন তারা বরং এ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকে। এসময়ই তুর্কি মুসলমানরা দ্বার প্রান্তে এসে হয় উপস্থিত।

সময়ের বৈশিষ্ট্য

সেকালে ঐক্যবদ্ধ একদল জনগোষ্ঠী উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সুচতুর রণকৌশলের মাধ্যমে যে-কোন দেশ দখল করতে পারত। সাধারণত শাসনের কেন্দ্রস্থল দখল করলেই সারা রাজ্য দখল হয়ে যেত। তবে কখনোবা রাজ্যের অন্যান্য স্থানও দখল করতে হত, যদি সেসব স্থানে প্রতিরোধ হত। যুগটা ছিল এমনি করে আক্রমণ ও অধিকারের। আরবের মুসলমানরাও যে-পদ্ধতিতে সাম্রাজ্য প্রসারিত করেছিল তা এ রকমই। অর্থনৈতিক উন্নতির চাবিকাঠিও ছিল অমন করে রাজ্য-বিস্তৃতির মধ্যেই। কিন্তু রাজ্য বিস্তার একটা সীমিত পর্যায়েই সম্ভব, কারণ তা কেবল অধিকার করলেই হয় না, দখলেও রাখতে হয়। আর দখলে রাখতে গেলে বিজিত স্থান কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে এনে একটা সুষ্ঠু শাসন পদ্ধতির ভেতর ফেলতে হয়। কিন্তু অতিরিক্ত বড় অঞ্চল এভাবে শাসন করা কঠিন। সেযুগে তো আরো কঠিন ছিল অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। বুদ্ধিমান শাসকরা তাই অনেক অঞ্চলই সরাসরি অধীনে না-এনে করপ্রদায়ী রাষ্ট্ররূপে রেখে দিতেন। একজন ব্যতিক্রমধর্মী শাসকের পক্ষেই কেবল বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করা হত সম্ভব। সারা পৃথিবীতে সেকালে চেঙ্গিস খান-এর রাজ্যই সম্ভবত সবচেয়ে বড় ছিল। তার মৃত্যুর পর পরই তা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সমুদ্রগুপ্ত বা আলাউদ্দিন খলজি'র মত বিচক্ষণ শাসকরা দূরবর্তী অঞ্চলগুলো সেজন্যই সরাসরি কেন্দ্রীয়

শাসনাধীনে না-এনে করদাতা হিসেবে রেখেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। তাদের মত প্রচণ্ড শক্তিধর ব্যক্তিত্বশালী শাসকের দুর্বলতার সুযোগে অথবা মৃত্যুর পরেই রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙন দেখা দিয়েছে। অনুরূপ কারণেই বস্তুত উমাইয়া ও আব্বাসিয় আমলেও রাজ্যসীমা একটা পর্যায়ে এসে থেমে গেছে। এছাড়া যেটুকু স্থান অধীনে রেখে তার রাজস্ব ও সম্পদ আহরণের মাধ্যমে শাসকদের আর্থিক চাহিদা নিবৃত্ত হত, সেটুকুই সাধারণত তারা রাখতে চাইত। উমাইয়া আমলে রাজ্যের যে-বিস্তৃতি ঘটে তা সুষ্ঠুভাবে শাসন ও সঠিকভাবে রাজস্ব ইত্যাদি আদায় করেই পরবর্তী আব্বাসিয় খলিফাগণও স্বস্তিতেই জীবন কাটাতে সক্ষম হন বলেই রাজ্য বিস্তৃতির আর তেমন তাঁদের দরকারও হয়নি। দখলের হাজারো সুবিধা ভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে থাকলেও তা ঘটেনি।

অতএব যখন উমাইয়া-আব্বাসিয় রাজ্যসীমায় অবস্থিত অঞ্চলগুলোতে ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হল অর্থাৎ সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা ধর্মান্তরিত মুসলমান হল, তখনই কেবল সম্ভব হল এসব অঞ্চল থেকে মুসলিম বিজেতা এসে আশেপাশের স্থান দখল করার। ঘোর রাজ্যের আর্থিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনই ভারত বিজয়ে মুহম্মদ ঘোরি'কে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর বিজয় পথ করে দেয় ইখতিয়ারউদ্দিন (বা ইজ্জউদ্দিন) মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি'র নওদিয়া বা নওদা বিজয়।

সারা দেশের মানুষকে অসন্তুষ্ট রেখে সেযুগেও বোধকরি দেশশাসন ছিল কঠিন। তরবারির জোরে আপাত-শান্তি রক্ষা সম্ভব হলেও অসন্তুষ্টির সুযোগে তৃতীয় কোন ক্ষমতাধরের অনুপ্রবেশ মোটেই-যে অসম্ভব ছিল না বখতিয়ারের নদীয়া বিজয় তার প্রকৃষ্ট উদারহণ। সেনরাজদের প্রতি বাংলার সাধারণ মানুষের অনীহার খবর অন্তত বখতিয়ার খলজির মত করিতকর্মা ও সন্ধানী ব্যক্তির অজানা থাকার কথা নয় মোটেই। পশ্চাতে তাঁর যত বড় সেনাদলই আসুক না কেন, সেনরাজদের জনবিচ্ছিন্নতার খবর না-পেলে মাত্র সতেরজন অগ্রবর্তী অশ্বারোহী নিয়ে নদীয়া আক্রমণ করতে কতটুকু সাহসী তিনি হতেন তা সন্দেহজনক। কে জানে তাঁর সাথে রাজসভার অসন্তুষ্ট সভাসদ বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদেরই যোগাযোগ ছিল কিনা। সরাসরি তথ্যের অভাবে এসব অনুমানমাত্র হলেও এধরনের ঘটনা ঘটা-যে মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না, তা ভাবলে একেবারে ভুল হবে না নিশ্চয়ই।

বর্ণবাদী সেন আর ইসলাম ধর্মী তুর্কির মোটেই সেদিনের মানুষের কাছে তেমন কোন ফারাক ছিল না। মাত্র দু-তিন পুরুষ আগেই সেনরাও ছিল ভিনদেশী। যে বর্ণবাদী নীতি তারা প্রচার করছিল তাও দেশীয় প্রেক্ষাপটে ছিল ভিনদেশী। ভিনদেশী মুসলমান তুর্কিদের সাথে তাই তাদের তেমন তফাত করা যেতই বা কী, অন্তত সেই যুগে যখন হরহামেশাই রাজ্য হচ্ছে হাত বদল এর ওর কাছে! ধর্মের ভিন্নতাও কোন বিষয় ছিল না। সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল হাজারো মত ও পথ। ইসলাম ধর্ম বা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য চোখে হয়ত পড়ত (যেমন নামাজ পড়া, রোজা রাখা) কিন্তু তাতে এমন কোন উপাদান কেউ দেখতে পায়নি যার ফলে উভয়ের ভেতর থেকে সেনদেরই তারা আপন বলে ভাবতে পারে।

গণমুখী নীতি সেনদের জনপ্রিয় করতে পারত হয়ত-বা। কিন্তু তাদের অতিরিক্ত ধর্মান্ধতা সংঘাত বাধায় জনমতের সঙ্গে, বিশেষত সেই ধর্ম যা মানুষের মানবিক গুণাবলী স্ফূর্তিতে হয় প্রাচীর-স্বরূপ। গণমানুষ নির্বোধ নয় কখনই, ধর্মভীরু হতে পারে কিন্তু অমানবিক নয় মনে প্রাণে সদাসর্বদা, সময়ে সাম্প্রদায়িক চেতনাও আচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু সেটাই তার একমাত্র এবং সবসময়ের পরিচয় নয়। মনুষত্বই তার বোধকে চালনা করে মূলত। বর্ণবাদ-যে সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজের প্রতিবন্ধক, অন্তত সে-সময়ে প্রতিবন্ধক হয়ে গিয়েছিল, এটা অশিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে বোঝাও মোটেই অজানা ছিল না। অশিক্ষিত বা নিরক্ষর মানুষেরও বোধ-বুদ্ধি-চেতনার একটা নিম্নতম স্তর আছে, যেখানে সে ভাল মন্দ বুঝতে পারে ঠিকই। অতি স্বার্থান্ধ মানুষও-যে তা না বোঝে, তাও ঠিক নয়। স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই কেবল তা অস্বীকার করে। আর মানুষ অবুঝ হতে পারে বিশ্বাস ও সংস্কারের বশে। অন্ধবিশ্বাসের কাছে কোন যুক্তি খাটে না, আর যুক্তি খাটলে মানুষের অন্ধবিশ্বাস আসতে পারে না। এধরনের বিশ্বাস এবং স্বার্থের সম্মিলন ঘটে যখন, তখন তা হয় মারাত্মক। বিশ্বাস স্বার্থকে জোরদার করে আর স্বার্থ বিশ্বাসকে করে তোলে হিংস্র। হিংস্রতা বিনাশ ঘটায় মানবতার। মানুষ নামে পশুর ভারে।

সেনরা সম্ভবত স্বার্থের সাথে বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিল। তাদের বিশ্বাসের বর্ণবাদী নীতি গ্রহণের কারণ ছিল বোধকরি স্বীয় ক্ষমতা টেকাবার স্বার্থেই। চারশ বছরের পুরানো দেশী পাল বংশ ধ্বংস এবং অন্যান্য স্থানীয় রাজ-রাজড়াদের মাঝখানে বিদেশী তারা অবস্থান করায় সর্বদাই হয়ত বোধ করছিল অস্বস্তি। সেই প্রেক্ষিতে তারা একটা শক্ত শক্তিকাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিল বর্ণপ্রথার নিগড়ে মানুষকে আবদ্ধ করে, যাতে সমাজ থাকতে বাধ্য হয় সুস্থির। এজন্য স্বার্থ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে কোটারি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল একদল অঢেল সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে। একাজে এদেশের মানুষকে তেমন বিশ্বাস করতে না-পেরে উচ্চবর্ণের লোকদের আমদানিও করছিল বাইরে থেকে। দেশীয় বঞ্চিত পূর্ব-সুবিধাভোগীরাই-বা তা সহ্য করবে কেন। ফলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তার মধ্য দিয়ে যেমন ভেসে যায় সেন আধিপত্য, তেমন তারই ওপর দিয়ে তরি বেয়ে ভেসে আসে ইসলাম ধর্মানুসারিগণ।

বাংলাদেশে ইসলামের সূত্রপাত

ইসলাম ধর্মে সৎ ব্যবসা এবং সুস্থ বাণিজ্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরান-এ আছে, 'পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র সম্পদ অন্বেষণ কর।' রসুল (সঃ) বলেছেন, 'জীবিকার দশ ভাগের নয় ভাগই ব্যবসা-বাণিজ্যে নিহিত।' তিনি আরো বলেন, 'বিশ্বাসী ব্যবসায়ী বিচারের দিন নবী, শহীদ ও সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকবে।' এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলাম আবির্ভাবের পর আরবের মুসলমান ব্যবসায়ীরা পূর্বপুরুষের চিরাচরিত বাণিজ্য পেশা অবলম্বন করে ব্যবসায়ে তৎপর হয়ে ওঠে। খ্রীস্টিয় আট থেকে এগার

শতক পর্যন্ত একদিকে ভারতবর্ষ এবং চীন-এর সঙ্গে আর অন্যদিকে ইউরোপের স্পেন ও আফ্রিকার মরক্কো পর্যন্ত সকল রকম বাণিজ্যই করেছে আরবগণ। বস্তুত ৪৭৬-এ রোমান সাম্রাজ্য পতনের পর ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ আরবীয়দের মাধ্যমেই এশিয়ার পণ্যদ্রব্য কিনত। এই আরব মুসলমান বণিক-ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই বাংলাদেশের সাথেও ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক যোগাযোগ ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে, ক্ষাত্রশক্তিদ্বারা বখতিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের বহু পূর্বেই আরবিয়গণ ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে এদেশে আসত। হুগলি জেলার সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও এবং মেদিনীপুর-এর তাম্রলিপ্ত বা তমলুক ও পিপ্‌লি বন্দর হিসেবে খ্যাত ছিল। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বোধকরি আরবিয়দের কাছে ছিল আরো বেশি পরিচিত। এ বন্দর হয়ে উঠেছিল আরব ও বাংলাদেশের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল।

একেবারে প্রথমদিকের মুসলমান ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে তেমন কিছু আজো জানা যায়নি। ৮৫১ খ্রীস্টাব্দে রচিত সোলায়মান-এর *সিলসিলাত-উত-তওয়ারিখ* ও ইবনে খুরদাদবা (মৃত্যু ৮২২)-র *কিতাব-উল-মসালিক আল মসালিক* গ্রন্থদ্বয় এবং আল-মাসুদ (মৃত্যু ৯৫৬) ও আল-ইদ্রিসী (জন্ম একাদশ শতকের শেষ পাদ)-এর লেখা থেকে পরোক্ষভাবে কিছু কিছু তথ্য উদ্ধার করা যায়। সোলায়মান 'রুহ্মি' নামক যে-দেশের বিবরণ দিয়েছেন তাকে বাংলাদেশের সাথে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। তাঁর বর্ণিত রুহ্মিরাজ পাল বংশের খ্যাতনামা শাসক ধর্মপাল ছাড়া আর কেউ নন। ইবনে খুরদাদবা সমুদ্র উপকূলবর্তী নানা বাণিজ্য কেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন যার ভেতর একটি 'সমন্দর' নামে খ্যাত। ইতিহাসবিদ আবদুল করিম সমন্দরকে চট্টগ্রাম বলে চিহ্নিত করেছেন। সন্দ্বীপ-এও আরবিয়গণ আসত। এটি ছিল একটি বিখ্যাত বন্দর। এ তথ্য দিয়েছেন ইতিহাসবিদ আবদুর রহিম। বস্তুত আরব ব্যবসায়িগণ মেঘনার মুখ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত যাতায়াত করত বলে উপরোক্ত আরবি লেখকগণের লেখা থেকে বোঝা যায়।

প্রাক-বখতিয়ার যুগে আরব ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেন ও এদেশে আরবি ব্যবসায়ী-বণিকের আগমনের ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতানৈক্য না-থাকলেও, বাংলাদেশে মুসলমানদের বসতি স্থাপনের প্রশ্নে তাদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দশম শতাব্দীর দিকেই চট্টগ্রামে আরবিগণ বসতি স্থাপন করেছে বলে খ্যাতনামা গবেষক-পণ্ডিত মুহম্মদ এনামুল হক আরাকানি সূত্র থেকে জানিয়েছেন। বরং আরো এগিয়ে নবম শতাব্দীর দিকেই চট্টগ্রামে তাদের বসতির কথাও বলা হয়ে থাকে। মালাবার, শ্রীলঙ্কা, জাভা, সুমাত্রা, মালয়, বোর্নিও ও ভারত মহাসাগর-এর অন্যান্য দ্বীপে বসতি স্থাপন তারা করেছিল বলেও জানা যায়। বাংলাদেশেও ব্যবসায়ের জন্য সমুদ্র-উপকূলে বসতি স্থাপন করা অসম্ভব নয়। 'সুরতন' শব্দ 'সুলতান'-এরই ভিন্ন রূপ ভেবে হক-এর মত পণ্ডিতরা চট্টগ্রামে একটি মুসলিম রাজ্যই দশম শতাব্দীতে ছিল বলে চিন্তা করেছেন। তাঁর মতে, আরাকান উপকূলে 'বদর মোকাম' (বা বুদ্ধের মোকাম) নামে কথিত স্থাপত্য নিদর্শনগুলোও নবম-দশম শতকের আরবিয় মুসলমান প্রভাবের ফল। এছাড়া

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে পাহাড়পুর ও ময়নামতি অঞ্চল থেকে আরবি মুদ্রা পাওয়ার ফলে মনে করা হয় কোনরূপ লেনদেন-এর মাধ্যমেই তা এসেছিল। পাহাড়পুরের মুদ্রাটি খলিফা হারুন-অর-রশিদ কর্তৃক ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে উৎকীর্ণ।

বাংলাদেশে কয়েকজন সুফি সাধকও বখতিয়ারের বিজয়-পূর্বে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন। মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপাল নামক স্থানের বাবা আদম শহীদ, নেত্রকোনা জেলার মদনপুর নামক স্থানের শাহ সুলতান রুমী, বগুড়া জেলার মহাস্থান-এর শাহ সুলতান মহীসওয়ার এবং শাহজাদপুর-এর মখদুম শাহদৌলা শহীদ এগার-বারো শতকে এদেশে আসেন বলে কথিত।

যেসব তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি ভিত্তি করে মুহম্মদ এনামুল হক, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আবদুর রহিম প্রমুখ উপরোক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, তা অত্যন্ত জোড়ালো নয় বলে আবদুল করিম ও ইতিহাসবিদ আবদুল মমিন চৌধুরী দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, বখতিয়ারের পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশে মুসলমানদের বসতি ছিল বা মুসলমান রাজ্য ছিল এমন মনে করার কোন সরাসরি সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। তুর্কি আক্রমণের পূর্বে কোন মুসলমান সুফি বাংলাদেশে এসেছিলেন কিনা এ বিষয়েও অকাট্য প্রমাণের অভাব রয়েছে। প্রমাণপঞ্জির ভিত্তিতে তাঁরা বলেন যে, এ যুগে বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলমান আরবিদের সম্পর্কের প্রকৃতি ছিল মূলত বাণিজ্য ভিত্তিক। আরবি বণিক ব্যবসায়ীদের এরূপ বাণিজ্যিক তৎপরতার জন্যই ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর বলতে গেলে আরব হ্রদে পরিণত হয়ে যায়।

বস্তুত, সরাসরি পূর্ণ তথ্য-সমৃদ্ধ না-হলেও একথা অনুমান করা একেবারে অযৌক্তিক হবে না যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী এসব বণিক-ব্যবসায়ীরা কেবল বাণিজ্য-ব্যাপদেশে এলেও ইসলামের আবির্ভাব ও সূত্রপাত এদেশে এরাই ঘটায়। নতুন ধর্মীয় উদ্দীপনায় উজ্জীবিত আরব ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই নতুন ধর্মের বক্তব্য এদেশীয় লোকদের কাছে তুলে ধরছিল। ভিন্ন ধরনের আচার ও অনুষ্ঠান, যেমন নামাজ, রোজা, ঈদ ইত্যাদি পালনের জন্য তারা এদেশের লোকদের ঔৎসুক্য স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টিও করছিল। যতই দিন যেতে থাকে ততই তারা এদেশীয় সমাজের বৃহত্তর পরিসরে প্রবেশের পথ খুঁজে পায়। কখনো দেশীয়দের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং কখনো কোন বিশেষ কারণে হয়ত-বা এই সম্পর্ক জোরদারও হয়ে ওঠে। আর এভাবেই ছোট ছোট পকেট এলাকা গড়ে ওঠে যেখানে মুসলমান বসতি না-হলেও ইসলাম ধর্মের প্রভাব হাঁটিহাঁটি পা পা করে এগোচ্ছিল।

বাংলাদেশের ব্যাপারে জানা-না-গেলেও, দক্ষিণ ভারতের মালাবার শাসক চেরমন পেরুমল মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে ৬২৮ খ্রীস্টাব্দে আরব গিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিক ফিরিস্তা জানিয়েছেন। পেরুমল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাজউদ্দিন নাম ধারণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর বণিক-বন্ধু বসরার মালিক বিন দিনার ও তাঁর সহযোগী মালিক বিন হাবিব কুইলন ও অন্যান্য স্থানে দশটি মসজিদ স্থাপন করেন। বিষয়টি উল্লেখযোগ্য এজন্য যে, মহানবীর জীবিতকালেই তাঁর কথা ভারতবর্ষের দু'চারজন লোক

অন্তত জানত, এমন কি ধর্মান্তরিত হয়েছে, মসজিদও প্রতিষ্ঠিত করেছে। মালাবার বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে অবস্থিত হলেও এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, কয়েক শতাব্দী পরে এখানেও, অন্ততপক্ষে কোন কোন স্থানে ইসলামের কিছু কিছু প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য যখন পুরোদমে চলছিল।

সাধারণ বণিক-বেশে বখতিয়ারের নদীয়ায় প্রবেশে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, 'তুরক' বা 'তুরস্ক' তথা তুর্কিগণ বহু আগে থেকেই এ দেশের মানুষের কাছে পরিচিত ছিল। এজন্যই মাত্র ঊনিশজন তুর্কি বণিকবেশী অশ্বারোহী কোনক্রমেই নদীয়ার মানুষদের, বিশেষ করে রাজপুরুষদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেনি যে এরা আক্রমণকারী ছদ্মবেশী যোদ্ধা। ১৯ রমজান ৬০১ হিজরি অর্থাৎ ১০ মে ১২০৫ খ্রীস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি তৎকালীন সেন-রাজধানী গৌড় অধিকার করেন বলে 'গৌড় বিজয়' স্মারক মূদ্রা থেকে ইতিহাসবিদরা মনে করেন।

বাংলাদেশে ইসলামের প্রসারকাল

এক হাতে কোরান এবং অন্য হাতে তরবারি নিয়ে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে অনেক সময় বলা হয়। কথাটা এমনভাবে বলা হয় যাতে মনে হয় যেন শক্তিদ্বারা কোনকিছু প্রচার করানো। তাই অনেক মুসলমান উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং এসব ইসলাম-বিরোধী ব্যক্তিদের রটনা বলে মন্তব্য করেন। নানা কারণ খুঁজে তারা ইসলাম-যে শক্তি-দ্বারা প্রসারিত হয়নি তা প্রতিপন্নের প্রয়াস পান। যুক্তি-তর্ক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উদাহরণ মাধ্যমে তারা একথাই বলতে চান যে, ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল এর অভ্যন্তরীণ গুণে। ইসলামের আদর্শই মানুষকে এর গণ্ডির ভেতর টেনে এসেছে। কোন তরবারি নয়।

এ ধরনের কোন ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন আছে বলে বর্তমানে মনে হয় না। এতে মনে হয় যেন ইসলামকে যুক্তি-তর্কের ছায়া দিয়ে একটা ভালত্ব আরোপের ব্যর্থ প্রয়াস হচ্ছে। ফলে কেমন যেন হীনমন্যতা প্রকাশ পায়। আজকের দিনে যে-কোন সচেতন বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, একটা অধঃপতিত সমাজকে শক্তি-দ্বারা পরিবর্তন করে উন্নতির পথে নেওয়া অন্যায় তো নয়ই বরং কর্তব্য, যদি তাতে মানবিকগুণগুলো প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ এবং সম্ভাবনা থাকে। সেই সুযোগ কতটুকু ইসলাম দিয়েছিল কোরানের কয়েকটি সুরার উদ্ধৃতি থেকেই দেখা যেতে পারে।

সুরা বাকারাহ্'র ২২ রুকু'র ১৭৭ আয়াতে আছে, 'তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমদিকে মুখ ফেরাও (অর্থাৎ নামাজ পড়) তাতে পুণ্য নেই কিন্তু পুণ্যবান সে যে আল্লাহ্, কিয়ামত, কিতাব, এবং নবীদের প্রতি ঈমান এনেছে; এবং আল্লাহর ভালবাসায় আত্মীয়, অনাথ, দরিদ্র, পথের কাঙাল ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনে (অর্থাৎ গোলামের মুক্তি দানে) ধন দান করেছে এবং নামাজ কায়েম রেখেছে ও জাকাত আদায় করেছে এবং যারা ওয়াদা করার পর তার খেলাপ করে না এবং দুঃখ, কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করে।' ঐ একই সুরার ৩৪ রুকুর ২৫৬ আয়াতে আছে, 'ধর্মের জন্য কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে।' সূরা নেসা'র ৬ রুকুর ৩৬ আয়াতে আছে, 'মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, গরিব, আত্মীয় প্রতিবেশী ও অপর প্রতিবেশী, নিকট সঙ্গী, পথিক এবং যারা তোমাদের অধিকারে এসেছে তাদের সকলের প্রতি ভালব্যবহার কর, নিশ্চয় আল্লাহ অহঙ্কারী ও অবাধ্যকে ভালবাসেন না।' এই একই রুকুর ৩৭ ও ৩৮ আয়াতে আছে, 'যারা নিজেরাও বখিলি (কৃপণতা) করে এবং লোকদের কৃপণ হতে বলে, এবং আল্লাহ্ নিজ কৃপাগুণে তাদেরকে যা দান করেছেন তা

গোপন করে, আর আমি এইসব কাফেরদের জন্য গ্লানিকর শাস্তি তৈরি রেখেছি ; আর যারা লোককে দেখাবার জন্য নিজেদের ধন দান করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, বস্তুত তাদের সাথী শয়তান।' সূরা মায়েদার ৫ রুকুর ৩২ আয়াতে আছে, 'এজন্য আমি বনি-ইসরাইলের প্রতি আইন করলাম, যে ব্যক্তি কারও (খুনের) বদলে কিংবা দুনিয়াতে অত্যাচার দমন করার জন্য ছাড়া কাকেও খুন করে, সে যেন সমস্ত মনুষ্যজাতিকে হত্যা করল এবং যে-কেউ একটি জীবন রক্ষা করে, সে যেন সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাল।' সূরা বনি-ইসরাইল-এর ৪ রুকুর ৩৩ আয়াতে আছে, 'এবং তোমরা অন্যায়ভাবে প্রাণ বধ করো না, কেননা অন্যায়ভাবে প্রাণ নাশ করতে আল্লাহ অবশ্যই নিষেধ করেছেন।' বার বার নানা আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ অত্যাচারীকে ভালবাসেন না।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উদ্ধৃতিগুলো একান্তভাবেই মানবিক এবং প্রাত্যহিক চলমান জীবনের বাস্তব অবস্থায় করণীয় কর্তব্য সম্পর্কেই আদেশ-নিষেধ। এরকম উদ্ধৃতি আরো বহু দেওয়া যায়। হাদিস থেকেও এমন ধরনের বক্তব্য আহরণ সম্ভব। বোখারি ও মুসলিম বর্ণিত হাদিসে আছে, 'প্রকৃত মুসলমান সেই যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।' আর এক স্থানে তাঁদের বর্ণিত, 'যার ভরণপোষণ কর (প্রথমে) তাকে দিয়ে দান শুরু কর।' বোখারি শরিফে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসুলকে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ প্রকারের ইসলাম অর্থাৎ ইসলামি আচরণ উত্তম ? তিনি বললেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেবে আর চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দেবে। বোখারি বলেছেন, 'আত্মার প্রাচুর্যই প্রকৃত সম্পদ।' তিরমিজি বর্ণিত, 'যারা পৃথিবীতে আছে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর, তাহলে যারা আকাশে আছেন তাঁরা তোমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবেন।' মুসলিম বর্ণিত হাদিসে আছে, 'যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ থেকে নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' বোখারি বর্ণিত অপর এক হাদিস, 'তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, পীড়িতের সেবা কর এবং ঋণের দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত কর।' মুসলিম জানাচ্ছেন এক হাদিসে, 'পাপী ছাড়া অন্য কেউ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুদামজাত করে না।' মাসদানে দাইলামি থেকে জানা যায়, যার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটায় সে আমার ওপর খাঁটিভাবে ঈমান আনেনি।

ইসলামের এসব নীতিবাণী দুর্ভাগ্যের বিষয় বাস্তবের পরিবেশ পরিস্থিতি ও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে খুব কমই সাফল্যজনকভাবে রূপায়িত হতে পেরেছে। হজরত মুহম্মদের (স:) মৃত্যুর পর পরই মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে খলিফাপদ নিয়ে যে বিরোধ-নিষ্পত্তি হয় তা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। আনসারদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও ইসলামের দুর্দিনে যেভাবে তারা একে আতুরঘরে রক্ষা করেছিল সে-বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত ছিল না। কিন্তু তারা যখন সাদ বিন আবু ওবায়েদকে খলিফা নির্বাচিত করতে আগ্রহী হল, তখন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও অন্যান্য কোরাইশ নেতৃবর্গ অভিমত পেশ করেন যে, ঐতিহ্যগত আভিজাত্য ও শাসনকার্যের অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে

কোরায়েশ গোত্রের নেতৃত্ব ব্যতীত আরবিগণ অন্য কোন কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত হবে কিনা সন্দেহ। এ অবস্থায় আনসারদের মধ্য থেকে একজন এবং কোরাইশদের মধ্য থেকে একজন অর্থাৎ দুজন খলিফা মনোনীত করার প্রস্তাব আনসারগণ রাখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও বাতিল হয়ে যায় এবং কোরাইশ বংশীয় হজরত আবু বকর'কেই খলিফা বলে সকলকে স্বীকার করতে হয়। উল্লেখ্য যে, খোলাফায়ে রাশেদিনসহ পরবর্তীকালের উমাইয়া বা আব্বাসিয় খলিফাগণও ছিলেন কোরাইশ বংশীয়।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, আরব জাতির স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য খলিফা ওমর তাদেরকে বিজিত অঞ্চলে জমি কেনা ও বিজিত অধিবাসীদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক স্থাপনে নিরুৎসাহিত করতেন। একই অভিপ্রায়ে তিনি আরব উপদ্বীপ থেকে অনারবদিগকে বহিষ্কার করেন। আরবদের জন্য কৃষিকাজ নিরুৎসাহিত করে তাদের সামরিক প্রাধান্য ও সামাজিক আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রাখতেও তিনি উৎসাহী ছিলেন।

মুসলমান হলেও আরবদেশের মুসলমানরা সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের মুসলমান অধিবাসীদের 'আজমি' আখ্যা দিয়ে অবজ্ঞার চোখে দেখত। অনারব বা আজমি মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনীতে নেওয়া হত না। তারা যুদ্ধ করত পদাতিক বাহিনীর সৈন্য হিসেবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আজমিদের প্রাধান্য আরবরা কখনো স্বীকার করতে চায়নি। মাওয়ালি বা আরব মুসলমানের প্রতিও সমান ব্যবহার করা হত না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ সবই ইসলামী নীতি 'কুল্লু মুসলিমিন ইখওয়াতুন' অর্থাৎ মুসলমান মাত্রই ভাই ভাই পরিপন্থী।

ওমর বিন আবদুল আজিজ বা দ্বিতীয় ওমর বলে খ্যাত খলিফার সময় এ বৈষম্য দূর করে অমুসলমানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কর-ভার কমানোর সুযোগ প্রদান করলে বহু অমুসলমান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। মজার ব্যাপার, এতে তাঁর মিশরের শাসনকর্তা সোরাইয়া শঙ্কিত হয়ে বলেছিলেন যে, এভাবে লোকজন ধর্মান্তরিত হতে থাকলে খাজনা পাওয়াই হবে মুশকিল, রাজকোষ বরং দেউলে হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে, বাস্তব কার্য-কারণেই ইসলামের সৌন্দর্যময় ভ্রাতৃসুলভনীতি পালিত হতে পারেনি। ইসলাম ধর্মের প্রসারকাল আর সামন্ততান্ত্রিক যুগ একই সময়ে তথা একে অপরকে যুগপৎ ভর করে এসেছে। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম প্রসারের সময়কালে অর্থনৈতিক যে মূল ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত হয় তা একান্তভাবেই ভূমিভিত্তিক। যত ভূমি দখল, ততই আর্থিকভাবে লাভবান এই নতুন ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দ। আর তা কেবল দেশ-বিজয়ের মাধ্যমেই সম্ভব। দেশ বিজয়ের জন্য প্রয়োজন সামরিক শক্তি। সামরিক শক্তি গড়ে তোলে সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীতে যোগদানই ছিল সে-সময়ে জীবনে উন্নতির সবচেয়ে লোভনীয় পথ। এতে লাভ ছিল অন্ততপক্ষে তিন ধরনের : বেতন ও ভাতা, দেশ দখলের পর লুট এবং জায়গির বা জমিদারি। উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সুযোগ-পেলেই এ পথটা সবসময় আঁকড়ে ধরত। সেজন্য অতি সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেও চতুর বুদ্ধিমান করিতকর্মা ও নেতৃত্ব দেবার মত যোগ্য ব্যক্তি সেনাদল গঠন করে নানা

স্থান লুণ্ঠন ও অধিকার পূর্বক স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে বিরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারত। এরাই হত বীর। এরাই হত সুলতান রাজা বাদশা। সেজন্যই প্রতিটি সর্বোচ্চ শাসক বা দেশের কর্ণধারমাত্রই ছিল সামরিক যোদ্ধা। সরাসরি সেনাবাহিনী-থেকে কেউ না-এলেও, সমরবিদ্যায় অবশ্যই তাকে হতে হত চতুর। রাজ্য রক্ষা হত মূলত সামরিক-শক্তি দ্বারাই, জয়ও হত এরই মাধ্যমে। হারাতেও হত এরই দুর্বলতায়। সামরিক কৃৎকৌশল বা রণনীতি যার হত যত উচ্চস্তরের, সেই হত তত বিজয়ী।

বাস্তব এ অবস্থার সাথে ধর্মের সম্পর্ক ছিল সামান্যই। থাকলে আর গজনির সুলতান মাহমুদের সাথে অমুসলমান সৈন্য যোগ দিত না বা বখতিয়ারকে কামরূপ-রাজ তিব্বত অভিযানে সাহায্য করার কথা বলত না। গোষ্ঠীপ্রথা বরং কিছুটা কাজ করত, যেমন খলজিরা পৃষ্ঠপোষকতা করত খলজি গোত্রের লোকদের, ইলবেরি গোত্র করত ইলবেরিদের ইত্যাদি। মূলে এরা সবাই তুর্কি-জাতীয় থাকলেও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সময় সেটা ছিল না বলে ইসলাম ধর্ম ভাবগত একটা ঐক্য-সূত্র হিসেবে তাদের ভেতরে কিছুটা বিরাজ করে অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে পৃথক রাখত। ফলত একদিকে জীবনের বৈষয়িক লাভ ও উন্নত ধরনের সামরিক কৌশল এবং অন্যদিকে ধর্মীয় উদ্দীপনায় কিছুটা উজ্জীবিত—দেশ জয়ে গাজি, মৃত্যুতে শহীদ হওয়ার কামনা মিলে রাজ্যের পর রাজ্য জয় ইসলাম ধর্মানুসারীদের করে তোলে দিগ্বিজয়ী।

হজরত মুহম্মদ (সঃ), খলিফা ওমর অথবা ওমর বিন আবদুল আজিজ-এর মত দু'চারজন ছাড়া অন্য মুসলমান খলিফা বা সুলতান বাদশা কদাচিৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বিধর্মী রাজাদের আহ্বান জানিয়েছেন অথবা জানিয়ে ব্যর্থ হলে সেনাদল পাঠিয়েছেন ধর্ম-বিজয়ে। বরং দেখা যায়, রাজ্য জয়ের পর স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্মান্তরিত মুসলমান করার চেয়ে মুসলিম শাসকবৃন্দ হয়েছেন রাজনীতিকভাবে প্রজ্ঞাবান। যেমন, হজরত আবু বকর খিলাফতের প্রথম অভিযান সিরিয়া আক্রমণের সময় সেনাবাহিনীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'মুণ্ডিতমস্তক পুরোহিতরা বশ্যতা স্বীকার করলে তাদের নির্যাতন করো না।' খলিফা ওমর খ্রীস্টানদের পরাভূত করে জেরুজালেম প্রবেশপূর্বক প্রথমেই গীর্জার পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ দেন। স্ব-সেনাবাহিনীর সঙ্গে ওমরকে নামাজ আদায়ের জন্য খ্রীস্টান পাদ্রী গীর্জার একাংশ ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করলে ওমর এই বলে অসম্মতি জানান যে, তাহলে মুসলমানগণ অল্পদিনের মধ্যে গীর্জাটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করে ফেলবে।

যতই দিন যেতে থাকে এবং যতই আরবদেশ থেকে ইসলাম-ধর্মানুসারীদের রাজ্যসীমা প্রসারিত হতে থাকে ততই সেইস্থানে সমস্ত অধিবাসীদের মুসলমান করার চেয়ে স্থানীয় ধর্মানুসারীদের ধর্মপালনে বাধা-না-দেবার পরামর্শ দেওয়া হয়, যেমন ৭১১-১২ খ্রীস্টাব্দেই সিন্ধুদেশ জয়ের পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিজয়ী নেতা মুহম্মদ বিন কাসিমকে দিয়েছিলেন। নদীয়া জয়ের পরও মুসলমানরা ইসলাম প্রচারের জন্য এদেশীয় হিন্দু বা বৌদ্ধদের পাইকারিহারে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছিল বলে জানা যায় না। বস্তুত আরব-সীমা পেরিয়ে ইরান হয়ে ভারতবর্ষে অথবা ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে স্পেনে

প্রবেশ করে ইসলামপ্রচার সময় ও দূরত্বের সাথে সাথে যেন পাল্লা দিয়ে ধীর ও মন্থর হয়ে আসে। ধর্মান্তর-করণের স্থলে আসে ধর্মান্তরিত-হওন। অর্থাৎ ধর্ম-গ্রহণ স্থানীয় অধিবাসীদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর বর্তায়।

সমস্ত অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার চেয়ে এই যে স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্ম সংরক্ষণ—এই নীতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েকটি কারণ এই চিন্তায় মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের বাধ্য করেছে বলে মনে হয় :

এক। দূর-দেশের প্রচুর বিধর্মী লোকের ভেতর মুষ্টিমেয় সশস্ত্র মুসলমান যতই শক্তিশালী হোক, অপরাজেয় নয় কখনই। কাজেই অমুসলমানদের হৃদয় জয়-করা হয় তাদের উদ্দেশ্য। এতে রাজত্ব স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনাও ঘটে বেশি। উদাহরণ, বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানী আমল, দিল্লির মোগল সাম্রাজ্য। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মাধ্যমে রাজ্যে স্থিতিশীলতা এনে রাজত্ব-রক্ষায় শাসকবর্গ বেশি তৎপর সর্বদাই হয়েছেন। সমাজের সকল স্তরের লোকজনের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা হয়ে ওঠে তাঁদের প্রধান নীতি। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন-এর প্রতি বাবুর-এর উপদেশ প্রণিধানযোগ্য, 'তোমার উচিত সব ধরনের ধর্মান্ধতা থেকে মনকে পরিষ্কার রেখে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ও প্রথানুযায়ী তাদের বিচার করা। বিশেষত গো-জবাই থেকে বিরত হওয়া। তাতে প্রজারা তোমার অনুরক্ত হবে এবং তুমি তাদের হৃদয় জয় করতে পারবে। তোমার শাসনসীমার মধ্যে কোন জাতিরই ধর্ম-মন্দির বা উপাসনাগারের ওপর যেন হস্তক্ষেপ না-করা হয়।' বাংলাদেশের সুলতানি আমলে ইলিয়াস শাহি ও হোসেন শাহি বংশের এই নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এ কারণেই জিজিয়া কর আদৌ বাংলায় কখনো স্থাপিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শাসকদের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। আওরঙজেবের মত গোঁড়া মুসলমান শাসকও তাই বিধর্মী রাজকর্মচারী স্বচ্ছন্দে রেখেছেন, এমন কি বিয়েও করেছেন রাজপুতানি, বিধর্মী বলে তাঁকে পরিত্যাগ করছেন এমনটা জানা যায় না। কোন কোন শাসকের ঔদার্য, মহানুভবতা ও মানবিক বোধও অবশ্য ছিল প্রখর, যেজন্য প্রজানুরাগী নীতি গ্রহণ করেছেন তাঁরা, যেমন আজম শাহ, বারবাক শাহ, হোসেন শাহ প্রমুখ।

দুই। মুসলমান হলেই স্থানীয় লোকজনও প্রথম শ্রেণীর প্রজা হয়ে যাওয়া ছিল স্বাভাবিক। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ীই মুসলমান মুসলমানে ভাই। কোন ভেদ নেই। সমান। অধিকারও সমান। তা সে যে-দেশেরই হোক, যে স্তরেরই হোক। তাই সম্ভাবনা ছিল দীক্ষিত মুসলমানদের আমির ওমরাহে উন্নীত হওয়া এবং আশঙ্কা ছিল সিংহাসন দখলের। স্থানীয় ও অস্থানীয় মুসলমানদের এ নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটাও ছিল স্বাভাবিক। দিল্লির খলজি বংশের উত্থানের পেছনে এমনি কিছুটা সংঘাত ছিল বলে জানা যায়। অথচ অমুসলমান থাকলে রাজকীয় উচ্চপদগুলো, বিশেষ করে রাষ্ট্রের অস্তিত্বরক্ষাকারী সামরিকবাহিনীর উচ্চপদগুলো অধিকারের সম্ভাবনা থাকত খুবই কম। এত-যে মুক্ত-মনের অধিকারী বাদশা বলে কথিত আকবর, তাঁর আমলেও রাজ্যের সর্বোচ্চ রাজকীয় সাত হাজারি দশ হাজারি মনসবদারি পদে অমুসলমান ছিল হাতে গোনা মানসিংহের মত

গুটিকয় অতি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। বস্তুত রাজ্যে বিধর্মী বেশি থাকলে রাজ্য স্থিতিশীল হত বেশি। রক্ষা হত ক্ষমতার ভারসাম্য। প্রয়োজন হত কেবল সুদৃঢ় সুসংগঠিত এক সেনাদল এবং মোটামুটি সহনশীল রাজনীতির। গণমানুষদের রাজনৈতিক অধিকার ছিলনা বলে কেবল ষড়যন্ত্র ও স্বার্থ-কোন্দলের মাধ্যমেই রাজ-পরিবর্তন ঘটত।

তিন। অমুসলমানদের কাছ থেকে অধিক কর আদায়ও সম্ভব হত জিজিয়া, তীর্থকর ইত্যাদির মাধ্যমে। সুতরাং প্রজা বিধর্মী থাকলেই ছিল শাসকদের জন্য লাভজনক।

এসব একান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতাই মুসলমান শাসকদের করেছে রাজনীতিতে অনেক বেশি পারদর্শী ও কূটনীতিজ্ঞ। ধর্মীয় ব্যাপারটাই যদি শাসকদের বিচারের একমাত্র বিষয় হত তাহলে এক রাজ্যের সুলতান বা বাদশা অন্য কোন 'মুসলিম রাজ্য' কখনই আক্রমণ ও দখল করত না। কারণ উভয়ের ধর্মইতো এক-ইসলাম। কিন্তু আসলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়াবার প্রয়োজনই ছিল বিভিন্ন দেশ দখলের মূল উদ্দেশ্য।

বিজিত দেশে বাস্তব এবং স্বাভাবিক কারণেই রাজধর্ম হয়ে যায় প্রজাধর্ম। নানা সুযোগ সুবিধার জাগতিক প্রয়োজনে মানুষ রাজার ধর্ম গ্রহণ করে। তার দৈনন্দিন জীবন বয়ে চলে ইহলৌকিক তাড়নায়। ক্ষুধা-বাসস্থান-বস্ত্রলাভ থেকে স্নেহ, লোভ-লালসা, মায়া-মমতা, হিংসা-দ্বেষে। কট্টর আদর্শবাদী ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হয় পেছনে পড়ে যায়, নয় বিলুপ্ত হয়। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও যে না-বেরোয় তা নয়। তবে তা হয় ভিন্ন রূপে ভিন্ন ছায়ায়। কিন্তু জাগতিক বিষয়ে জড়িত বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বার্থের খাতিরেই সময়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। আবার সময়োপযোগী হলে নতুন দর্শন কখনো কখনো মানুষের কাছে হয়ে ওঠে গ্রহণযোগ্যও। এ ধরনের নানাবিধ কারণে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক অশোক-হর্ষবর্ধণের সময় বা বাংলাদেশে পাল যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং উত্তর ভারতে হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক সুঙ্গ-গুপ্ত বা বাংলায় সেন-আমলে ব্রাহ্মণ্য-শৈব-বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিপত্তি। বখতিয়ারের বিজয়ের পর বাংলাদেশে যারা মুক্তা বা ওয়ালি অর্থাৎ শাসনকর্তা, সুলতান সুবাদার নবাব হয়েছেন, একমাত্র গণেশ (এবং মহেন্দ্র?) ছাড়া সবাই ইসলামধর্মী। শাসকরা স্বাভাবিকভাবেই স্বীয় ধর্মকে করেছেন উৎসাহিত। প্রজাসাধারণও নানা কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তবে সেই কারণগুলোর ভেতর তরবারি দিয়ে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারটা যে খুবই সামান্য, তা নিঃসন্দেহ। সেটা বেশি থাকলে উত্তর ভারতের মুসলিম শাসকবর্গের একেবারে কেন্দ্রস্থল দিল্লি-আগ্রা-আজমির অঞ্চলের জনসংখ্যায় অমুসলমান পাওয়া যেত খুবই কম, বাংলাদেশও হত কেবল মুসলিম-অধ্যুষিত ভূমি।

তরবারি শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে রাজ্য বিস্তারে যে-নিয়েছিল উদ্যোগ সে-হল সামন্তচক্র। ওয়ালি-মুক্তা, সুলতান-আমির-ওমরাহ মালিক-এর মত অভিজাত থেকে তাদের সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সাধারণ রাজকর্মচারী-আধাকর্মচারী-আমিন-কারকুন-পোদ্দার-কানুনগো-চৌধুরি পর্যন্ত এই সামন্তব্যবস্থার সমৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এদের সংগঠিত শক্তিই দখল করেছে দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য। ইসলাম যে-ঐক্যবোধ এ সামন্তচক্রকে ভাবরাজ্যে দিয়েছিল তারই সূত্র ধরে তারা ইহলৌকিক

জাগতিক বিষয়োন্নতির এক অভূতপূর্ব যুগের সূচনা করে। চিন্তায় চেতনায় একীভূত হয়ে রাজ্যের পর রাজ্য জয় ও সংগঠন-সংরক্ষণে তারা হয় তৎপর।

এই আত্মোন্নতি ও আত্মসিদ্ধির যে-পথ উক্ত সামন্তচক্রের সদস্যবৃন্দসহ উপর-প্রভুরা মুসলমান হওয়ার পরও বেছে নেয় এবং হিংসা-দ্বেষ, হত্যা-লুণ্ঠন, ক্রূরতা-ষড়যন্ত্র-বিশ্বাসঘাতকতা যেভাবে তাদের জীবনের প্রতি পরতে জড়িয়ে যায় তাতে তাদের অনেকেই 'আশরাফুল মখলুকাত' বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব কিনা সন্দেহ জাগে। সেই সাথে প্রশ্ন জাগে কোরানের বাণী 'ইনিল হুকমু ইল্লালিল্লাহ' অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ কথাটির কতটুকুই-বা এঁরা মেনেছেন!

দণ্ডধরের কাণ্ড

সেকালের রীতি অনুযায়ী বখতিয়ার লুণ্ঠন ও জবরদখলের সূত্র ধরেই নানা স্থানসহ নদীয়া জয় করেন এবং অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি যে, পরিশেষে সেই সময়ের মূল্যবোধেরই শিকার তিনি হন তাঁরই গোষ্ঠীর মালিক আলি মর্দান খলজির হাতে, হয়ত নিহত হয়ে। আলি মর্দানের সম্ভবত ইচ্ছে ছিল লখনৌতির গদি দখলের। কিন্তু আর এক নেতা শিরন খলজি তাঁকে বখতিয়ারের হত্যাকাণ্ডের জন্য করেন বন্দী। চতুর আলি মর্দান কতোয়ালকে বশীভূত করে পালিয়ে যান দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন-এর কাছে। যদিও বখতিয়ার কুতুবউদ্দিনের অপ্রিয় ছিলেন বলে মনে হয় না এবং তাঁর কাছ থেকে সময়ে সময়ে পেয়েছিলেন নানা ভেট, তবু তিনি তাঁর হত্যাকারীকে শাস্তি না-দিয়ে বরং শিরন-এর বিরুদ্ধে অযোধ্যার শাসনকর্তাকে পাঠান। বেচারা শিরন পরাজিত হয়ে পালিয়েও রেহাই পান না। খলজি মালিকদের অন্তর্বিরোধের ফলে স্বীয় পক্ষের আমিরদের হাতেই হন নিহত। মাঝখানে আর এক খলজি নেতা ইওজ কিছুদিন দিল্লির অনুগত থেকে শাসন করেন লখনৌতি। কিন্তু কুতুবউদ্দিন তাঁর প্রিয় আলি মর্দানকে পাঠালে ইওজ গদি ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন।

কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর আলি মর্দান দিল্লির আনুগত্য অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু শীঘ্রই খলজি মালিকদের বিরাগভাজন হলে ইওজ সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করে স্বাধীনভাবে লখনৌতিতে রাজত্ব শুরু করেন। মনে হয় খলজি আমিরদের ভেতর মোটামুটি একটা সমঝোতা তিনি আনতে সক্ষম হন। তাই বছর পনের তাঁর রাজত্ব স্থায়ী হয়। কিন্তু এ সময় দিল্লিতেও রাজত্ব করছিলেন তাঁরই মত বুদ্ধিমান আর এক সুলতান ইলতুতমিশ। তারও সম্পদ-সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ছিল আরো এবং আরো রাজ্য। সমৃদ্ধ বাংলার অংশ লখনৌতি রাজ্য তাঁর পাশেরই রাষ্ট্র। ফলে তাঁর নজর। প্রথমে ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে ইওজের বিরুদ্ধে তিনি সৈন্য পাঠান। পরে ১২২৭ সালে তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন লখনৌতি দখল করেন। ইওজ তখন বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব বাংলা জয়ের জন্য এসেছিলেন। খবর পেয়ে দৌড়ে লখনৌতি যান পুনর্দখল করতে, কিন্তু যুদ্ধে হন বন্দী এবং পরে নিহত।

এইতো বাংলাদেশে লখনৌতি রাজ্যের খলজি মালিকদের প্রাথমিক যুগের (১২০৫-১২২৭ খ্রীস্টাব্দ) বাইশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস : তিনজন অন্তঃশত্রু এবং একজন বহিঃশত্রুর হাতে নিহত! নেতৃঘাতক মর্দানের পুণ্যফল হিসেবে সিংহাসন লাভ! কতোয়ালের কর্তব্য ত্রুটি (বিশ্বাসঘাতকতা, না উৎকোচ গ্রহণ?)-র জন্য শিরন-এর রাজ্যচুতি। শাণিত বুদ্ধিসম্পন্ন ইওজের রাজমুকুট লাভ এবং পরিশেষে তারও অস্বাভাবিক মৃত্যু।

সামন্ত কোন্দলের ফলে ১২২৭ থেকে ১২৮৭ পর্যন্ত লখনৌতি মোটামুটি দিল্লির অধীনে ছিল। এই অধীনতাও যেমন কারো কারো পছন্দ ছিল না, তেমন নিয়মনীতির প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক প্রদেশের শাসনকর্তা কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়াই অন্য প্রদেশ দখল করে হয়েছে বীরবর। ইলতুতমিশ-পুত্র নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর দওলত শাহ এবং ইখতিয়ারউদ্দিন বলখা খলজির ভেতর সংঘাত এবং পরে বলখা খলজির বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ইলতুতমিশের আগমন ও তা দমন মিলে সময়টা উত্তপ্ত। পরবর্তী শাসক আলাউদ্দিন জানি-র অপসারণ এবং সাইফউদ্দিন-এর দিল্লির প্রতি অনুগত থাকা ও রহস্যময় মৃত্যুর বছরগুলোই কেমন যেন গোলমেলে। আওর খান, তুগরল তুগান খান ও তমর খান তো দিল্লির অনুমতি ছাড়াই লখনৌতি শাসন করেন। তুগান যাই হোক ভদ্রতা করে দিল্লির সুলতান রাজিয়ার কাছ থেকে পরে অনুমতি আনিয়েছিলেন। কিন্তু মুগিসউদ্দিন ইউজবক এক ডিগ্রি এগিয়ে স্বাধীন হয়ে কামরূপ দখল করতে গিয়ে হন নিহত। ইজ্জউদ্দিনও দিল্লির অনুমতি ছাড়াই পূর্বসূরিদের অনুসরণে লখনৌতির শাসক হন। তিনি বঙ্গ আক্রমণ করতে গেলে কারা প্রদেশের সুযোগ-সন্ধানী শাসনকর্তা তাজউদ্দিন আরসলান খান লখনৌতি দখল করেন। ইজ্জউদ্দিন ফিরে এসে স্বরাজ্য পুনর্দখল করতে গিয়ে মারা যান। আরসলান স্বাধীনভাবেই বোধ হয় রাজত্ব করেন। তাতার খান দিল্লির সুলতান বলবনের অনুগত হয়ে পড়েন। কিন্তু আমিন খানের সহকারী শাসনকর্তা তুগরল খান স্বাধীনতা ঘোষণা করলে দিল্লির বিক্রমশালী বলবন দু'বার সৈন্য পাঠিয়ে ব্যর্থ হলে রেগেমেগে নিজেই এসে তাকে দৃষ্টান্তমূলকভাবে দমন করেন।

অতএব এই ষাট বছরের ইতিহাস হল দিল্লি ও লখনৌতির সুলতান-আমির-ওমরাহ-মালিক তথা সামন্তনেতাদের টানাপোড়েনের কাহিনী। এই টানাপোড়েনের চোটে লখনৌতি অঞ্চল পরিচিত হয়ে যায় 'বলগমপুর' বা বিদ্রোহী এলাকা বলে! দিল্লিওয়ালারা এ সময় এ দেশকে এভাবেই আখ্যায়িত করেছিল। বরং আর একটু এগিয়ে জিয়াউদ্দিন বরনি বলেন যে, বাংলাদেশের আবহাওয়াটাই বিদ্রোহীদের পক্ষে সহায়ক। এখানকার লোক স্বভাবতই বিদ্রোহী! নতুন শাসক এলে অমাত্য অনুচর সকলে মিলে তাকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিত। যদি কোন শাসক বিদ্রোহ করতে অস্বীকার করত, তাহলে অমাত্য অনুচর সকলে মিলে তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের চেষ্টা করত। সুতরাং শাসককে বাধ্য হয়ে দিল্লির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হত।

বরনি যে ব্যাখা দিয়েছেন তা নিতান্তই অগভীর ও হাস্যকর। মূলে সামন্তচক্রের স্বার্থ-দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা তাঁর দৃষ্টির বাইরেই থেকে গেছে। দিল্লি থেকে বহু দূরে প্রচণ্ড সম্পদশালী এই বাংলা অবস্থিত বলে এবং সেযুগে যাতায়াত ব্যবস্থাও যথেষ্ট পরিমাণ অসুবিধাজনক ছিল বলে এখানকার শাসনকর্তা বিদ্রোহ করতে উৎসাহ বোধ করত। বিদ্রোহ মানেই পরের স্তরে স্বাধীনতা অর্থাৎ সম্পদ ভোগদখলের একক অধিকার। আর অধীনতা মানেই স্বাধীনতাহীনতা। অন্য কথায়, সম্পদ-সম্পত্তি ভোগদখলের একচেটিয়া আধিপত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া।

তাই দেখা যায়, পিতার জীবিতকালে গভর্নর হিসেবে লখনৌতি শাসন করলেও বলবনের মৃত্যুর পর বোগরা খান স্বাধীন হয়ে যান। দিল্লির তখ্‌তও কম জৌলুসময় মনে হয় লখনৌতির কাছে অথবা দিল্লির ইলবরি তুর্কি ও দেশী খলজিদের ক্ষমতা-কোন্দল তার পক্ষে সামাল দেওয়া কঠিন ভেবেই ওদিক মারান না তিনি। কিন্তু তাঁর পুত্র দিল্লির সুলতান কায়কোবাদ সেই দ্বন্দ্বের মধ্যেই হারান প্রাণ। মর্মাহত ভালমানুষ পিতা নাসিরউদ্দিন পুত্র কাইকাউসকে লখনৌতির সিংহাসনে বসিয়ে রাজমুকুট ত্যাগ করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কারো ভালত্ব দিয়ে তো সমাজ চলে না। দিল্লির সামন্ত-কোন্দল-মুক্ত হলেও বাংলাদেশের লখনৌতিতে তাদের শ্রেণী-প্রতিভূ ছিল। তারই শিকার হন কাইকাউস। সিংহাসন দখল করেন শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ। অত্যন্ত চালাক এই ফিরোজ লোভী অর্থগৃধ্নু পরস্বাপহরণকারী আমির-ওমরাহ-সৈনিক-যোদ্ধাদের সারা বাংলার নানা অঞ্চল বিজয়ে পাঠিয়ে তাদের লালসা নিবৃত্তের প্রয়াস পান। কিছুটা হয়ত তা মেটে বলেই তিনি বাইশ বছর রাজত্ব করতে সক্ষম হন।

স্বার্থপরতার কারণে সামন্তপ্রভুদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আবার। ফিরোজ-পুত্র বাহাদুর শাহ রাজ্য ভোগে নিষ্কন্টক হওয়ার জন্য সামন্তবাদের রাজ্য ও সম্পদ ভোগের সহজ পদ্ধতিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পৃথিবী থেকে সড়িয়ে দেন। কিন্তু কনিষ্ঠ ভাই নাসিরউদ্দিন ইবরাহিম কোনক্রমে বেঁচে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই-এ দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সুবর্ণ সুযোগে দিল্লির হস্তক্ষেপ, বাহাদুর শাহর রাজ্যচ্যুতি, গিয়াসউদ্দিনের লখনৌতি অধিকার। নিশ্চয়ই বাহাদুরকে যখন গলায় দড়ি বেঁধে তুগলক সুলতানের দরবারে উপস্থিত করা হয়েছিল তখন ইবরাহিম খুশি হয়েছিলেন ভাই-এর স্পর্ধিত ক্ষমতা ভুলুণ্ঠিত করতে পেরে। কিন্তু এ-যে স্বীয় স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া, স্বীয় আত্মীয়ের অপমান মানে নিজেরই অপমান অথবা শত্রুর হাতে নিজেকেই তুলে দেওয়া—এ সমস্ত আদৌ তাঁর মনে এসেছিল কিনা জানা না-গেলেও হয়ত সান্ত্বনা দেওয়ার মত মনে ছিল বাহাদুরের অযথা বাহাদুরি, অন্যায় ও অত্যাচার। বাহাদুরেরও কি মনে হয় নি তার কৃতকর্ম! ভাইদের রক্তের ওপর গড়ে ওঠা সিংহাসনের চকচকে গদি!

হয়ত ইবরাহিম ভেবেছিলেন বড় ভাই-এর পর তিনিই হবেন লখনৌতির সুলতান। কিন্তু দিল্লির শাসক অধিকতর বুদ্ধিমান! বাংলার সামন্তদের বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্য সারা লখনৌতি রাজ্যকে তিনটি বিভাগে ভাগ করে কেবলমাত্র লখনৌতির শাসক করেন

ইবরাহিমকে। বাকি দুটি অংশ সাতগাঁও ও সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা করেন বাহ্‌রাম খানকে। কিন্তু পিতা গিয়াসউদ্দিন তুগলককে সরিয়ে দিল্লির তখ্‌তে পুত্র মুহম্মদ বিন তুগলক বসে বানচাল করে দেন এই নিয়োগ ব্যবস্থাও। তিনি নাসিরউদ্দিন ইবরাহিমকে নিয়ে যান দিল্লি তাঁর সাথে, লখনৌতিতে বসান কদর খানকে, মালিক ইজ্জউদ্দিনকে বসান সাতগাঁও-এ, এবং মজার ব্যাপার, বন্দী বাহাদুরকে মুক্তি দিয়ে বাহ্‌রামের সঙ্গে যুগ্ম শাসনকর্তা হিসেবে বসান সোনারগাঁও-এ। এক সময়ের স্বাধীন সুলতান বর্তমানে দিল্লি সুলতানের অধীনে চাকরিরত বাহাদুরের অতীত-বাহাদুরির কথা মনে হয়ে গেল হয়ত। কথা দিয়ে এসেছিলেন মুহম্মদকে তাঁর পুত্রকে জামিন হিসেবে পাঠাবেন দিল্লি। কথা রাখলেন না। বরং ঘোষণা করলেন স্বাধীনতা! বাহাদুরের বিরুদ্ধে বাহ্‌রাম দিল্লির সুলতানের পক্ষে লড়াই-এ বাহবা পেলেন তাকে নিঃশেষ করে। ইবরাহিম এর আগেই কোথায় যে হারিয়ে গেছেন মুহম্মদের সাথে মুলতান গিয়ে!

বাহ্‌রাম একাকী বেশ কিছুদিন শাসন করার পর মৃত্যুবরণ করলে তাঁর সিলাহ্‌দার বা বর্মরক্ষক ফখরউদ্দিন সোনারগাঁওয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁকে দমন করার জন্য ইজ্জউদ্দিন আর কদর খান এগিয়ে আসেন। মিলিত বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে না-পেরে ফখরউদ্দিন পালান। সোনারগাঁও-এর প্রভূত ধনসম্পদ কদরের হাতে পড়ে। অন্যান্য সামন্তকর্তা চলে গেলেও তিনি থেকে যান। কদর সম্পদের কদর ঠিকই বুঝতেন, বরং একটু বেশিই বুঝতেন। তাই এসব সম্পদ না-পাঠান দিল্লির সুলতানের কাছে, না-দেন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের ন্যায্য প্রাপ্যটুকু। গরিব লোকের সন্তানরা সৈনিক হতই যুদ্ধের মাধ্যমে আহৃত অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে জীবনটা একটু শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে কাটাতে। তাই মালেগনিমাহ্ থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে বিক্ষুব্ধ হল। ফখরউদ্দিনও সুযোগ বুঝে তাদের সপক্ষে টেনে নেন। কদর খান যুদ্ধে হন পরাজিত ও সম্ভবত স্বসৈন্যদের হাতেই নিহত।

কদর খানের মৃত্যুতে লখনৌতির আরিজ বা সেনাধ্যক্ষ দিল্লির কাছে নাকি লেখেন একজন শাসনকর্তা পাঠাতে। দিল্লি একজনকে পাঠালেও পথিমধ্যে তাঁর হয়ে গেল মৃত্যু। কি আর করেন সেনাধ্যক্ষ! স্বয়ংই লখনৌতির সিংহাসনে বসে পড়েন স্বাধীনভাবে আলাউদ্দিন আলি শাহ্ নাম নিয়ে। অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই সোনারগাঁও-এর সুলতান এবং লখনৌতির সুলতানের ভেতর বেঁধে যায় দ্বন্দ্ব সারা বাংলার প্রভুত্ব নিয়ে। ফখরউদ্দিন চট্টগ্রাম দখল করে তাঁর রাজ্যের সামন্ত, আমিরদের লুণ্ঠনের ভাগ দিয়ে মোটামুটি শান্ত রাখেন। বণিক-ব্যবসায়ীরাও এই বন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য করে হয় লাভবান। ঠাট্টা করে ফখরউদ্দিনকে 'ফকরা' বলে ডাকলেও তাঁকে মুলে অপছন্দ তেমন কেউ করত না, কারণ সবার স্বার্থ তিনি সংরক্ষণের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দিনের হচ্ছিল অসুবিধা! যুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর অধিকৃত অঞ্চলের যেমন হচ্ছিল ক্ষয়ক্ষতি, তেমন তাঁকে রাজধানীও নানা কারণে লখনৌতি থেকে ফিরোজবাদ (মালদহ'র পাণ্ডুয়া নামক স্থানে) সরিয়ে নিতে হয়। এসব ঝামেলার সুযোগে ক্ষমতাশালী আমির হাজী ইলিয়াস লখনৌতি দখল করেন আলি শাহ্‌কে সরিয়ে।

সুচতুর ইলিয়াস স্বীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য শীঘ্রই সাতগাঁও অঞ্চল দখল ও নেপাল লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করেন। পরে সোনারগাঁও রাজ্যও জয় করেন। ফলে যেমন একটা বিশাল অঞ্চলের তিনি অধীশ্বর হন তেমন আরো সমৃদ্ধির জন্য হন উদ্যোগী। জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করে চিল্কা হ্রদের সীমা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ৪৪টি হাতিসহ অনেক সম্পদ তিনি আহরণ করেন। অতঃপর বিহার ছাড়িয়ে চম্পারন, গোরখপুর ও কাশী জয় করেন। কামরূপের অংশবিশেষও হয়ত দখল করেন। ত্রিপুরা'র ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। এভাবে রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সামন্ত-অন্তর্দ্বন্দ্ব কিছুটা কমে আসে। তাদের অর্থ-সম্পদ লোভ প্রশমিত হওয়ার সুযোগ পায়। লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে সৈনিকবৃন্দও বৈষয়িকভাবে উপকৃত হয়।

বস্তুত সেন বংশের পতনের পর থেকে সারা বাংলায় প্রায় দেড়শ বছর ধরে (মোটামুটি ১২০৫ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ) যে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল সামন্তচক্রের অন্তর্কলহে, ইলিয়াস শাহ্‌র সময় থেকে তা অনেকটা যেন বিদূরিত হল। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সমস্ত সামন্ত-অভিজাত বণিক-ব্যবসায়ী কৃষক-গৃহস্থ এসব কলহে হচ্ছিল সাময়িকভাবে লাভবান, কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত। যুদ্ধের ফলে সামন্ত-সৈনিকের যত লাভ ততটুকু কখনোই নয় বণিকের বা কৃষকের। দুঃসময়ে বেশি দামে জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারলেও তার স্থিরতা কম। আবার উদ্বৃত্ত সম্পদ সঞ্চিত করলে তা রক্ষার জন্য চাই শান্তি। সমাজের এই স্তরগুলো শান্তির জন্য ছিল তাই আগ্রহী। মানুষ বাঁচার জন্য চায় খাদ্য। তা আহরণের প্রয়োজনে হয়ত যুদ্ধ। কিন্তু খাদ্য আহৃত হলেই চায় শান্তি। আর শান্তির অভীপ্সাতেই এ অঞ্চলের মানুষ এ সময়টায় বারবার জোট বাঁধছিল। সুলতান মুগিসউদ্দিন তুগরলের সময় থেকেই দেখা যায় একটি স্থায়ী ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার অপেক্ষায় এ অঞ্চল কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে। বরনিই জানান যে, সেনাবাহিনীসহ লখনৌতির সকল অধিবাসী তুগরলের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। তাঁর অধীন হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজা ছিল তাঁর পক্ষে, ইচ্ছে করে কেউ তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। সাধারণ ব্যবসায়ীরাও স্বেচ্ছায় তাঁর পলাতক অবস্থানের কথা কখনো বলবনের লোকদের কাছে ফাঁস করেনি। এজন্যই ইতিহাসবিদ কানুনগো বলেন যে, বলবন শুধু একজন বিদ্রোহী তুগরলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেন নি, সারা বাংলার বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

বোগরা খানের সময় সেই রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার জন্য যেন আরো একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। তাই ইতোপূর্বের বছরগুলোতে বলতে গেলে যা কখনো হয় নি, তিনি পুত্রকে উত্তরাধিকারী করে যেতে পেরেছিলেন। ফিরোজও সুদীর্ঘ বাইশ বছর রাজত্ব করতে পেরেছিলেন এবং স্বীয় সন্তানকেই সিংহাসন দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সামন্ত-স্বার্থও যেন একত্রিত হয়ে চাচ্ছিল স্বস্তিকর এক পরিবেশ। বাহাদুর-ইবরাহিমের পারিবারিক দ্বন্দ্ব ছিল একান্তভাবেই তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার। কেউ কেউ বড়জোর তাতে ফায়দা লুটছিল।

বস্তুত এতদিনের শোষণের ক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তৃতই হয়ে গিয়েছিল প্রায় সারা বাংলা জুড়ে সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ায়। সমস্ত অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হলেই রাজস্ব আদায়ের

মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লুণ্ঠনের একটা স্থায়ী মৃগয়াক্ষেত্র পাওয়া সম্ভব। পররাজ্য লুণ্ঠন ও গ্রাসের মধ্য দিয়ে সম্পদ সমৃদ্ধির জন্যও দরকার রাজ্যের অভ্যন্তরে স্থিতিশীলতা। বাণিজ্য-ব্যবসা, কৃষি-পণ্য, চাষ-আবাদের জন্যও প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। চট্টগ্রাম বন্দরসহ অন্যান্য বন্দরের মাধ্যমে সারা বাংলায় যে ধন ও সম্পদ সঞ্চারিত হচ্ছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও যে সারা দেশটার একত্রীকরণ প্রয়োজন ছিল, তা ক্রমেই অনুভূত হচ্ছিল। ইবনে বতুতা সোনারগাঁও রাজ্য ভ্রমণের সময় বাংলাদেশে সমস্ত জিনিস সারা পৃথিবীর তুলনায় ভীষণ সস্তা দেখেছিলেন। এর একটা সম্ভাব্য কারণ, এ সব জিনিস ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় গণ্ডির বাইরে যেতে পারছিল না। অথচ ব্যবসার মাধ্যমে যাবার প্রয়োজন অনুভূত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সেটা সম্ভব ছিল একটা বৃহত্তর রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে অথবা অন্য রাষ্ট্রের সাথে বহির্বাণিজ্যে। পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে এর সম্ভাবনা ছিল সামান্যই। সামন্ত বণিক-ধনিকের স্বার্থের সাথে সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত উপৎপাদনের জন্য কৃষক-চাষী-গৃহস্থের স্বার্থও এক হয়ে গিয়েছিল বৃহত্তর রাষ্ট্র গঠনের সপক্ষে। ইলিয়াস শাহ্ও স্বীয় নীতি এবং কৌশলের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করে তোলেন সকল শ্রেণীর স্বার্থ একত্রে মিলিয়ে। অর্থনৈতিক স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি ধর্মীয় গণ্ডিকে সম্প্রসারিত করে ফেলেন স্থানীয়-অস্থানীয় ও হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন উর্ধ্বে তোলে। এজন্যই দিল্লির সুলতান ফিরোজ তুগলক বাংলাদেশ জয়ের প্রাক্কালে তার 'নিশান' বা ঘোষণাপত্রে শত ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়েও এদেশীয় লোকদের ইলিয়াসের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারেন নি। বরং দেশীয় পাইকরা ইলিয়াসের জন্য জান-কোরবান করেছিল। হয়ত ইলিয়াসের প্রতি এদেশীয় অধিবাসীদের এরূপ অচলা ও একনিষ্ঠ আনুগত্য দেখেই দিল্লির ইতিহাসবিদরা তাকে হেয় করার জন্য ব্যঙ্গ করে 'ভাঙখোর' ও 'কুষ্ঠরোগী' বলেছেন।

তবে একথাও ঠিক যে, ইলিয়াস শাহ্র সম্পদ ও লোকবল দিল্লির তুলনায় ছিল যথেষ্ট দুর্বল। স্বদেশে স্বগৃহে থেকে ইলিয়াস একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে যে-রণকৌশলে ফিরোজ শাহ্কে ব্যতিব্যস্ত রাখেন তাতে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় মিললেও বোঝা যায় সেনাবাহিনী তাঁর খুব সুবিধেজনক ছিল না। নানা রকমের ভূপ্রকৃতি-বিশিষ্ট অঞ্চল বিজয় ও দখলের জন্য সব ধরনের বাহিনীই রাখা দরকার। উত্তরবঙ্গ রাঢ় বিহার ইত্যাদি শুকনো অঞ্চলের জন্য বেশি প্রয়োজন অশ্বারোহী-হস্তীবাহিনীসহ পদাতিক, এবং কামরূপ-আসাম-ত্রিপুরা-বঙ্গ ইত্যাদির জন্য বেশি দরকার ছিল বোধকরি নৌসেনা। ইলিয়াস উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের এসব অঞ্চল বিজয়ের জন্য বেরও হয়েছিলেন হয়ত এ ধরনের বাহিনী নিয়ে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যে, এ সব অঞ্চলে তাঁর অভিযান ছিল মূলত লুণ্ঠনমূলক। স্থায়ী দখলে এ সব স্থান তিনি খুব বেশি একটা রাখতে পারেন নি। সেটা ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং দূরত্বের জন্য যেমন হতে পারে, তেমন হতে পারে তাঁর সেনাদলের প্রাচুর্যের অভাবেও। ফিরোজের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ-ব্যবস্থাও ছিল আত্মরক্ষামূলক। তাঁর মত একজন পরাক্রমশালী সুলতানের (এবং পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ্র মত একজন শাসকেরও) দেশের অভ্যন্তরে শত্রুসেনাকে আসতে

দিয়ে যুদ্ধ করাটা কেমন যেন বিসদৃশ ও দুর্বলতার লক্ষণ ঠেকে। ফিরোজ একডালা শহর পর্যন্ত দখল করে ফেলেন। খুবই স্বাভাবিক ছিল সীমান্তেই তাঁকে বাধা দেওয়া। এসব কারণে মনে হয় অশ্বারোহী, হস্তীবাহিনী, নৌবাহিনী, পদাতিক বাহিনীর নানা বিভাগসহ বিরাট কোন সেনাবাহিনী রাখার মত স্থানীয় সম্পদ বাংলাদেশের সুলতানের ছিল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের রাজা বা সুলতানরা কখনই উত্তর ভারতসহ বিশাল কোন সম্রাজ্য বিস্তৃত সময়ব্যাপী প্রতিষ্ঠাও করতে পারেন নি। পাল যুগের পরাক্রমশালী ধর্মপাল-এর প্রচেষ্টাও সার্থক হয় নি। এর মূল কারণ বোধহয় সম্পদের স্বল্পতা। সম্পদ প্রথমে স্ব-অধিকৃত অঞ্চল থেকেই আহৃত হয়। সেকালে এর বেশিটাই রাজস্ব আদায় ও পররাজ্য লুণ্ঠনের মাধ্যমেই হত। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেও কিছু আয় হত। প্রাকৃতিক সম্পদ তখন খুব একটা আবিষ্কৃত হয় নি। সেজন্য সে-যুগে যত বেশি অঞ্চল দখল করা যেত ততই সমৃদ্ধ হত একটা রাজ্য। কিন্তু প্রাথমিক শর্ত ছিল সরাসরি অধিকারে যতটুকু রাজ্যসীমা বিস্তৃত তারই মধ্য থেকে কৃষক-বণিক ইত্যাকার উৎপাদনশীল ও মধ্যস্বত্বভোগী ব্যক্তিবর্গকে শোষণ করে সম্পদ আহরণ করা।

জমি হিসেবে সারা বাংলা মোটের ওপর খুবই উর্বরা। ফসলও ফলে প্রচুর। ব্যবসা-বাণিজ্যও হয় সেসব ফসল ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে। কিন্তু আনুপাতিক হারে উত্তর-ভারতের তুলনায় এলাকাটা বিরাট নয়। পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশের নানা পাহাড়ী অঞ্চল, পূর্বে আসাম-মায়ানমার-এর পর্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ছুঁয়ে যে এলাকাটুকু তা আশি হাজার বর্গমাইলও নয়। খাস ব্রিটিশ বাংলার আয়তন ছিল ৭৭,৫৯২ বর্গমাইল। চার্লস স্টুয়ার্ট *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* গ্রন্থে লিখেছেন 'বাংলা ২১ ডিগ্রী ও ২৭ ডিগ্রী অক্ষাংশ এবং ৮৬ ডিগ্রী ও ৯২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। এটি প্রস্থে ৩০০ এবং দৈর্ঘ্যে ৪০০ মাইল।' অথচ পাঞ্জাবের পশ্চিম এলাকা, পূর্বে বাংলাদেশের সীমানা এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চল দৈর্ঘ্যে কোথাও কোথাও দেড় হাজার মাইলেরও ওপর এবং প্রস্থে কোথাও কোথাও প্রায় দু'শ মাইল। সিন্ধু-গঙ্গা বিধৌত এ এলাকা গড়ে আড়াই লক্ষ বর্গমাইলেরও ওপর। এর সবটুকুই মোটামুটি শুকনো এবং দখল করা সহজ। স্থানে স্থানে পার্বত্যময় হলেও এটি অত্যন্ত উর্বরা, বিশেষত গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল। অতএব আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হলে, এ স্থানের সামন্তগণ রাজস্বের মাধ্যমে প্রচুর অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চয় করে বিরাট সেনাবাহিনী নানা বিভাগসহ গঠন করতে পারত। আর এরই মাধ্যমে হতে পারত বিরাট সাম্রাজ্যেরও অধীশ্বর। বাংলার সামন্তগণ এ সুবিধা থেকে অনেকটাই ছিল বঞ্চিত। একারণেই বাংলাদেশের শাসক কেউ এ অঞ্চলের সীমার বাইরে রাজ্য তেমন বিস্তৃত ও স্থায়ীভাবে বাড়াতে পারেন নি। বাংলার অভ্যন্তরে অথবা পাশের রাজ্য লুণ্ঠন করেও তেমন সম্পদ আহৃত হত বলে মনে হয় না, অন্তত দিল্লির তুলনায়। উপরন্তু লোকজন বোধকরি সমগ্র উত্তর-ভারতের চেয়ে বাংলায় ছিল কম। জলাঞ্চল বলে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় বসতি

গড়াই ছিল কিছুটা অসুবিধেজনক। দক্ষিণাঞ্চলের শ্বাপদসঙ্কুল গভীর সুন্দরবনে তো যাওয়াই ছিল অসম্ভব। পারতপক্ষে এসব অঞ্চলে কেউ বসতি করতে চাইত বলে মনে হয় না।

চোদ্দ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলার সীমানা ঘিরে একটা মোটামুটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র নানা কার্যকারণে গড়ে উঠল। কিন্তু তা বলে সামন্তদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেমে রইল না। রাজ্যটি কখনো বৃদ্ধি পেল, কখনো সংকুচিত হল। এরই সাথে স্বার্থজনিত সংঘাত, সিংহাসনের জন্য মৃত্যু, ক্ষমতার লড়াই, সম্পদ-লিপ্সা, শক্তির মত্ততা—এক কথায় একান্তভাবেই বস্তুগত বিষয়াদির জন্য কত-কিছুই-না ঘটল! হয়ত-বা বিমাতার অন্যায় আচরণেই সিকান্দার-পুত্র আজম হলেন বিদ্রোহী, যুদ্ধে পিতাকে করলেন নিহত, সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য ভাইদের হত্যা বা অন্ধ, কিন্তু নিজেও রেহাই পেলেন না সামন্ত-চক্রান্ত থেকে। রূপকথার রাজপুত্রের মত যে-আজমের সম্বন্ধে ছড়িয়ে আছে এদেশে নানা গল্প আর কাহিনী, তাঁরও আগমন তাই দেখা যায় মেঘের ডানায় ভর করে নয়, হিংসা দ্বেষ আর রক্তের সমুদ্র পেরিয়ে। মৃত্যুও ঘাতকের স্বার্থান্ধ খঞ্জরে। তাঁর আত্মীয়জনও রেহাই পেলনা। তাঁরই নুন খেয়ে বড়-হওয়া ভৃত্য(?) বায়েজিদ করলো পুত্র হামজাকে নিহত। বড় সাধই হয়েছিল ভৃত্যের রাজা হওয়ার। সে-সাধ মিটল প্রাণের বিনিময়ে। কিন্তু বিচিত্র সামন্তচক্র হয়ত স্বার্থজনিত কারণে তাঁর পুত্রকেই বসাল আবার গদিতে। একটি বছরও গেল না, সামনে এগিয়ে এল এসব কাণ্ডকীর্তির নেপথ্য-নায়ক বলে কথিত-ব্যক্তিটি ফিরোজকে সরিয়ে—গণেশ! আজম থেকে ফিরোজ মাত্র পাঁচটি বছরের ভেতর চারটি মানুষের অমূল্য জীবন অকালে গেল ঝরে, যে জীবন কখনোই ফেরত পাওয়া যায় না।

গণেশ তো এলেন। কিন্তু বড় অসময়ে এলেন। বাংলার সিংহাসনে বসার সামাজিক প্রেক্ষাপট-যে বদলে গেছে বুদ্ধিমান হয়েও তিনি তা বুঝলেন না। ভাতুরিয়ার চার শ বছরের পুরানো বংশের(?) লোক হয়ে তিনি ভেবেছিলেন আশেপাশের সব অঞ্চলই বুঝি রয়ে গেছে সেই মান্ধাতা আমলের চারশ বছরেরই পুরাতন! কিন্তু হায়! সময় চলে যায়। সাথে অনেক কিছুই নিয়ে যায়। বদলে দেয় জীবন। দর্শনও। এই বদলটুকু আগে চোখে পড়ে নি বলেই তিনি রাজা হয়ে যখন দেখলেন দুনিয়াটা আগের মত আর নেই তখন বুদ্ধিমানের মত সরে দাঁড়ালেন সিংহাসন থেকে। সন্তানকে করলেন ধর্মান্তরিত। বসালেন সিংহাসনে। কি চমৎকার সামন্তদের ধর্মানুরাগ! এমনতর উদাহরণ আছে বিদেশেও। সমসাময়িককালে ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরি (১৫০৯-৪৭) ক্যাথলিক চার্চ ত্যাগ করে এংলিকান চার্চের প্রবক্তা হন, আর ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরি (১৫৯৪-১৬১০) প্রোটেস্টান্ট থেকে হন ক্যাথলিক, সিংহাসনে সুস্থির থাকার জন্য। সেই পঞ্চদশ শতকেই বাংলার সামন্তরা পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে যে, বাংলা আজ যা ভাবে—কেবল ভারত নয়, সারা দুনিয়া ভাবে তার পরদিন!

ক্ষমতার লোভ বড় লোভ। বাঘ একবার রক্তমাংসের স্বাদ পেলে নাকি জ্যান্ত মানুষকেই খেয়ে ফেলে। জালালউদ্দিন-হওয়া যদু স্বপুত্র হলে কি হবে, সিংহাসনের

টান- যে পুত্রের চেয়েও বেশি। অতএব আবার গনেশাবির্ভাব। আবার জালালউদ্দিন নাকি রূপান্তরিত হন যদুতে। বলিহারি গণেশের বুদ্ধি! কিন্তু কতদিন রাজত্ব করলেন? খুবই সামান্য সময়। কিভাবে মৃত্যু হল জানা যায় না। তারপর হয়ত-বা অন্যপুত্র মহেন্দ্র এল। কিন্তু যদুও ততদিন বিচক্ষণ বনে গেছেন। তিনি দেশের অবস্থা বুঝে আবার জালালউদ্দিন হয়ে বাংলার গদিতে বসলেন। ভাই(?) মহেন্দ্র কোথায়-যে হারিয়ে গেল আজো অজানা।

জালাল কি কখনো ভেবেছিলেন যে চিরন্তন হবে তাঁর বংশ! ভাবলে হা হতোস্মি। আবার ভৃত্য এল দৃশ্যপটে। সাদি খান ও নাসির খান জালাল-পুত্র আহমদকে করল হত্যা। ক্ষমতা করতে চাইল কুক্ষিগত। অতএব দুজনার অন্তর্দ্বন্দ্বে সাদি হল নিহত। নাসিরও রেহাই পেল না আধা-দিন (অথবা সাত দিন নাকি দু-মাস?)-এর বেশি। অমাত্যরাই তাকে সরাল আর কোথা থেকে ধরে নিয়ে এল একদা-জনপ্রিয় ইলিয়াসের বংশধর বলে কথিত এক গ্রাম্য-কৃষক নাসিরউদ্দিনকে! কিন্তু সন্দেহ জাগে তিনি আদৌ চাষা ছিলেন, না ছিলেন আর একজন অমাত্যই! নাকি পূর্বোক্ত তথাকথিত ভৃত্য নাসিরই তিনি? নাকি তাঁর নাম গিয়াসউদ্দিন নুসরত—হালজমানার সূত্রমতে! প্রশ্নগুলোর সদুত্তর মেলে না।

আগের জীবন যাই থাকুকনা কেন, সৌভাগ্য নাসিরউদ্দিন এবং তাঁর পুত্র বারবাক শাহ্‌র যে, তাঁদের সাধারণ মৃত্যু হয়েছিল অর্থাৎ খুন বা লাপাত্তা হননি। পর পর পিতা ও পুত্রের স্বাভাবিক মৃত্যু বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের ভেতর এই প্রথম। বারবাক-পুত্র ইউসুফ শাহ্‌র মৃত্যুর খবর সঠিক জানা যায় না। তাঁরও মৃত্যু স্বাভাবিক হলে এই ত্রয়ীই হন একমাত্র উদাহরণ যাঁরা একই বংশের হয়ে পরপর সুস্থির মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু ইউসুফ-পুত্র সিকান্দরকে মাথাপাগল আখ্যা দিয়ে সিংহাসনচ্যুত করেন তাঁর চাচা ফতেহ্ শাহ্ নিজে তখতে বসার জন্য। তবুও নাসিরউদ্দিন মাহমুদ থেকে সিকান্দর পর্যন্ত চার পুরুষ-এর উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে বসাও বাংলার স্বাধীন সুলতানদের ভেতর অনন্য।

ফতেহ্ ভ্রাতুষ্পুত্রের যে-রক্তের ধারা বেয়ে সিংহাসনে বসলেন তারও মুল্য দিতে হল খতম হয়ে একইভাবে। শুধু তিনিই নন পর পর আরো চার জন সুলতান হলেন নিহত মাত্র ছ'বছরে। আবিসিনিয়া'র অধিবাসী হাবশি ছিলেন বলে এঁদের হাবশি সুলতান বলা হয়। এঁদের দ্বিতীয়জন ফিরোজ শাহ্ বাদে বাকি তিনজনই বদ ছিলেন বলেও জানানো হয়। বস্তুত এঁদের রাজত্বের গোটা সময়টাকেই হাবশি (কদাকার কালো!) আমল হিসেবে চিহ্নিত করে অত্যন্ত নৈরাজ্যের কাল বলে নাকসিট্‌কে উল্লেখ করা হয়। হাবশিরা নিচু জাত(?) বলেই যেন! সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মত দু'একজন ইতিহাসবিদ এ মত পরিবর্তনে আগ্রহী। আর মনেও হয় যতটা খারাপ বলা হয়, সমসাময়িক অন্যান্য সুলতান শাসকের তুলনায় মোটেই বেশি খারাপ এঁরা ছিলেন না। যে-কাণ্ডকীর্তি তারা ঘটিয়েছেন তা পূর্বসূরিদের ধারা অনুসরণ করেই। পূর্বের দৃষ্টান্তেই আছে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ থেকে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্‌র পাঁচ বছরের সময়ের মধ্যে চার জন

সুলতানই চক্রান্ত ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। বরং হাবশি ফিরোজের তিন বছর শাসনকাল এবং মুজফ্‌ফরের দু'বছরের ওপর শাসনকাল প্রমাণ করে তাঁদের যোগ্যতা, ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা। হাবশি মুজফ্‌ফরকে নিহত করে হোসেন শাহ্‌র সিংহাসনে বসতে যে বেগ পেতে হয়েছিল, তাতেও বোঝা যায় হাবশি-রাজ্যের সামর্থ ও প্রতিপত্তি।

প্রায় কিংবদন্তির নায়ক এবং খুবই জনপ্রিয় 'হোসেন শাহি আমল'-এর প্রতিষ্ঠাতা মহাশক্তিধর আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্'র সিংহাসনারোহনের ধারা বাস্তবিকপক্ষেই মোটেও সুখশ্রাব্য ও ভদ্রজনোচিত নয়। কেবল মুজফ্‌ফরকে হত্যা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে সৈনিক ও অমাত্যদের মাঝে অপপ্রচার চালানো যে, মুজফ্‌ফর কৃপণ-নিষ্ঠুর-অর্থগৃধ্নু, অধীন-মন্ত্রী হয়েও মুজফ্‌ফরের বিরুদ্ধে চার মাস ধরে যুদ্ধ চালানো ও বহু মৃত্যু ঘটানো, তবুও না-পেরে-ওঠে পাইকদের ঘুষ দিয়ে মুজফ্‌ফরকে হত্যা করানো, অমাত্যদের লোভ দেখানো যে হোসেনকে সুলতান করলে গৌড় নগরীর মাটির ওপর যা আছে তার সবই তাদের হবে এবং অতঃপর অমাত্যদের গৌড় নগরী লুণ্ঠন করার সুযোগ প্রদান আর ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে তেরশ' সোনার থালাসহ বহু গুপ্তধন স্বয়ং হোসেনের লুট—এ সবই এক নিচমনা কূট-প্রকৃতির ব্যক্তি বলে তাঁকে প্রতিভাত করে। অবশ্য সুলতান হিসেবে তিনি সফল ছিলেন বলে সকল ইতিহাসকারই একমত।

হোসেন শাহ্ থেকে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ পর্যন্ত চার জনের ভেতর দুজন নিহত—নসরত হয়ত অসন্তুষ্ট ঘাতকের হাতে এবং তাঁর পুত্র ফিরোজ স্বীয় চাচা মাহ্‌মুদের হাতে। লজ্জার কথা, যে-দুই চাচা (ফতেহ্ শাহ্ ও মাহ্‌মুদ শাহ্) সফলভাবে ভাইপো হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তাঁরা উভয়েই সুলতান হিসেবে একেবারেই অসফল। মাহমুদের হয়ত স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়, কিন্তু তাঁর সময় থেকেই বাংলার দু'শ বছরের স্বাধীনতাও লোপ পেতে থাকে। দিল্লির সামন্তপ্রভু হুমায়ুন ও শের খানের শক্তি পরীক্ষার রণক্ষেত্র হয় বাংলার মাটি। সাময়িক বিজয়ী শেরশাহ গিয়াসউদ্দিন তুগলকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই হয়ত বাংলার সামন্তশক্তি খর্ব করার জন্য এদেশের শাসনভার একজন প্রতিনিধির হাতে না-রেখে সমগ্র দেশটি কয়েকটি প্রশাসনিক ভাগে ভাগ করে সমমর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজন প্রশাসকের হাতে ন্যস্ত করেন। কেবল ঐক্যসূত্র হিসেবে কাজ করার জন্য একজন আমিন নিযুক্ত হয় সবার উপরে। তবে শেরশাহ-পুত্র ও উত্তরাধিকালী ইসলাম শাহ শূর এ ব্যবস্থা বাতিল করে পুরাতন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পুনরায় সেই একজন শাসনকর্তার ওপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করলে তাঁর মৃত্যুর পর পরই সুযোগ বুঝে মুহম্মদ শূর বাংলায় স্বাধীন হয়ে যান। অবশ্য এর আগেও, দিল্লির শূরাধীন বাংলা থাকা কালেও বারবাক শাহ্ নামে জনৈক সুলতান স্বাধীনভাবে সিলেট-ময়মনসিংহ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন বলে জানা যায়। অর্থাৎ সমগ্র বাংলা দিল্লিশ্বরের অধীনে তখনো যায় নি এবং এখানকার সামন্তগণ নিজেদের একচ্ছত্র ভোগের অধিকার সংরক্ষণে ছিলেন আগ্রহী।

মুহম্মদ শাহ্ শূর থেকে দাউদ খান কররানি পর্যন্ত সময়টুকু তাই সামন্ত শাসকদের কল-কেলাহলের কাল। কিছুদিনের জন্য দিল্লির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে ভারতের

বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন নতুন শাসক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ চাকরিজীবী-বণিক-সৈনিক ইত্যাদি এসে এখানে বসবাস শুরু করায় বাংলার পুরাতন স্বার্থে সংঘাত শুরু হয়। ঐক্যে ধরে ফাটল। ভারতের অন্য অংশ থেকে আগতদের স্বার্থের সাথে বাংলাসহ উত্তর ভারত বা অন্যান্য স্থানের স্বার্থবোধ হয়ে ওঠে এক। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যও দেশীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে পূর্বের সীমানার বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় বণিক-ব্যবসায়ীর স্বার্থও সংশ্লিষ্ট হতে থাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের সাথে। দিল্লির সামন্ত নেতৃত্বও শক্তিশালী হয়ে বাংলার সামন্তদের অধীনে নিয়ে যেতে হয় সক্ষম। রাজনীতিতে মূক বধির বাংলার কৃষক-জনতা-শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা সেখানে কিই-বা!

আর এমন এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যখন সারাবাংলা দিল্লির অধীন হয়ে যাচ্ছিল, তখন দিল্লিঅলাদের অন্তর্দ্বন্দ্বই বরং তা কিছুটা বিলম্বিত করল মোগল-আফগান সংঘাতে। আফগান শূর ও কররানিগণ উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় খোঁজে বাংলায় এবং বছর বিশেকের ওপর (১৫৫৩-৭৫) স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করে। কিন্তু স্বার্থ-সম্পর্কিত শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাই বলে লুপ্ত হয় না, বরং পথ করে পরিশেষে স্বখাত সলিলে সমাধিস্থ হওয়ার।

মুহম্মদ শাহ্ দিল্লির সুলতান আদিল শাহ্র হাতে পরাজিত ও নিহত হলে তাঁর দুই পুত্র পর পর রাজত্ব করেন। কিন্তু অতঃপর জালাল শাহ্র পুত্রকে অপসারিত করে জনৈক গিয়াসউদ্দিন সিংহাসন দখল করেন। গিয়াসউদ্দিনকে সরিয়ে তাজ খান ও পরে তাঁর ভাই সোলায়মান গদিনসিন হন। দিল্লিতে পরাক্রমশালী মোগল বাদশা আকবর-এর আক্রমণের ভয়েই হয়ত সোলায়মান সুলতান উপধি না-নিয়ে আফগান নেতাদের সাধারণ উপাধি 'হজরত আলা'তেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন মাঝে মাঝে উপঢৌকন পাঠিয়ে। তাজ এবং সোলায়মানের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হয় কিন্তু সোলায়মান-পুত্র বায়েজিদ নিহত হন তাঁর ভগ্নিপতি হাঁসু (বা হানসু)-র হাতে। দাউদ ভগ্নিপতিকে পাল্টা হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন।

দাউদ যে-বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হন তাতে স্বাভাবিকভাবেই মোগল বাদশার হৃদকম্প উপস্থিত হয়। তিনি দাউদের ক্ষমতা খর্ব করতে হন উদ্যত। অথবা বলা যায় উত্তর ভারতীয় এলাকার দুই মহাপরাক্রম শাসকের লুণ্ঠন কাজের একক সুবিধার জন্য শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি শুরু হয়। দুর্ভাগ্য দাউদের যে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। তবু৩ স্থানীয় ঈশা খা-মুসা খাঁ, ওসমান খাঁ, মাসুম কাবুলি প্রমুখ সামন্তনেতাদের দমন করে সারাবাংলা মহাবীর্যবান বাদশা আকবরও দখল করতে পারেন নি। সেই কৃতিত্বের দাবিদার তাঁর পুত্র জাহাঙ্গির। অবশ্য বাস্তবে দাউদের মৃত্যুর পর থেকেই বাংলাদেশের ইতিহাস আসলে দিল্লির মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেতে থাকে।

১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ইসলাম খাঁ থেকে ১৭১৭-তে মুর্শিদকুলি খাঁর প্রায়-স্বাধীন সুবাদারির আমল পর্যন্ত অর্থাৎ এই একশ বছরের ওপর বাংলাদেশ দিল্লির গাঁটে বাঁধা থাকে একটি সুবা বা প্রদেশ হিসেবে। দিল্লির তখতে শাসকের উত্থান পতনের সাথে

বাংলার সুবাদারের ভাগ্যও হয়ে যায় জড়িত। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি, সত্বর ডাক ব্যবস্থার চালু করণ এবং দিল্লির শাসকদের লুণ্ঠনের ফলে আর্থিক প্রাচুর্যের মাধ্যমে বিরাট সেনাবাহিনী পালন এবং এর দ্বারা বিজিত অঞ্চল শাসনাধীনে রাখা হয়ে ওঠে সম্ভব। বাংলার সুবাদারগণেরও অতীতের মত একেবারে স্বাধীন হওয়ার প্রয়াস আর সম্ভব হয় না। এদেশীয় বণিক-ব্যবসায়ী-সামন্তপ্রভুগণও দিল্লিঅলাদের সাথে স্বার্থ মিশিয়ে দেয় বা দিতে হয় বাধ্য দিল্লির প্রচণ্ড ক্ষমতার দাপটে। দিয়ে লাভবানও হয় বিরাট সীমানাযুক্ত সাম্রাজ্যের অভাবিত অভ্যন্তরীণ ও বর্হিসম্পদ লুণ্ঠনে। বাংলার সুবাদারগণ প্রভূত অর্থ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্য প্রায়-স্বাধীন নবাব হিসেবে স্বীকৃতি পেতে থাকেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ দিল্লির সামন্তনেতাদের অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগে বাংলাদেশে ইচ্ছেমত শাসন করতে থাকেন। তবে দিল্লির প্রতি সৌজন্য-আনুগত্য ঠিকই রাখেন বছর বছর খাজনা পাঠিয়ে। দিল্লির সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত সহায়-সম্পদ হয়ত তাঁর ছিল না। তবে এতটুকু পর্যন্ত তিনি সুযোগ গ্রহণ করেন যে, তাঁর পরবর্তী সুবাদারকে উত্তরাধিকারী-নির্বাচনের-মতই স্বয়ং মনোনীত করেন। অবশ্য তাঁর মনোনীত মেয়ের দিকের নাতি সরফরাজকে মসনদে আসীন হতে না-দিয়ে সরফরাজ-পিতা সুজাউদ্দিন স্বয়ংই তা দখল করেন দিল্লি-বাদশার ফরমান আনিয়ে। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ সুবাদার হন। কিন্তু শীঘ্রই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেঁধে যায় স্থানীয় সামন্তনেতৃবৃন্দের ভেতর। কৃতকার্য হন আলিবর্দি খাঁ। সরফরাজকে নিহত করে তিনি বাংলার মসনদ দখল করেন। দিল্লির বাদশা তা মেনেও নেন বৈধ-অবৈধের প্রশ্ন না তোলে! এই সেই আলিবর্দি যিনি সুজাউদ্দিনেরই অন্নে হয়েছিলেন লালিত। হায়রে বিষয় সম্পত্তির লোভ! হায়রে অর্থগৃধ্নু মোগল বাদশা, যিনি আলিবর্দির এক কোটি টাকাসহ নানা উপঢৌকনই দেখেন আসল—ন্যায় অন্যায় নয়!

আলিবর্দির মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত কন্যাপুত্র সিরাজদ্দৌলা মসনদে বসেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সত্বর নিহত হন। ষড়যন্ত্রের নেতা মির জাফর মসনদে আসেন। ষড়যন্ত্রে সাহায্যকারী ইংরেজ বেনিয়াগণ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ এমনভাবে দখল করতে এবং চাইতে থাকে যে, মির জাফর তাদের সন্তুষ্ট করতে হন অক্ষম। অতএব যিনি এই লালসা মেটাতে সক্ষম হবেন বলে স্বীকার করেন সেই মির কাসিমকে বাংলার মসনদে আসীন করে ইংরেজরা। মির কাসিম তাতে আপাত-সক্ষম হলেও দেখেন ইংরেজ লুণ্ঠনে তাঁর নিজের আর্থিক দুর্গতি। ফলে, উভয়ের মতান্তর, মনান্তর এবং সংঘর্ষ। মির জাফরের পুনঃপ্রবেশ, মির কাসিমের অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে চিরবিদায়। এরপর থেকে বাস্তবে বাংলার নবাব সুবাদারের কোন ক্ষমতাই থাকে না। ক্ষমতার উৎস হয় ইংরেজগণ। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রবেশ করে ভিন্নতর পর্যায়ে।

মোটামুটি এই হল বখতিয়ারের নদীয়া দখল থেকে বক্সারের পর মির জাফর পর্যন্ত বাংলাদেশের পাঁচশ ষাট বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল কাহিনী। আর এ কাহিনী হল একদল স্বেচ্ছাচারী-স্বৈরতন্ত্রী সামন্তের রাজ্য দখল, ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা,

প্রতিপত্তি ও সম্পদ-সম্পত্তির জন্য নিদারুণ লালসার-ক্লেদাক্ত কর্মকাণ্ডে ভরপুর। বাংলাদেশের সামান্তপ্রভুদের দলাদলি ও রক্তক্ষয় দেখে বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, 'বাংলার একটি বিস্ময়কর প্রথা এই যে, এখানে উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ খুব কমই ঘটে। রাজার পদ স্থায়ী এবং আমির, উজীর ও মনসবদারের পদও স্থায়ী। পদকেই বাঙালিরা শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেক পদের অধীনে একদল বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারী আছে। রাজার মন যদি চায় যে কোন একজন লোক বরখাস্ত হয়ে তার জায়গায় আর একজন লোক নিযুক্ত হোক, তাহলে ঐ পদের সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মচারী নবনিযুক্ত ব্যক্তির কর্মচারী হয়। খাস রাজার পদের মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্য আছে। যে-কোন লোক রাজাকে নিহত করে নিজে সিংহাসনে বসলে সেই রাজা হয়। আমির, উজির, সৈন্য ও কৃষকরা তক্ষুনি বশ্যতা স্বীকার করে, তাকে ভক্তি করে এবং তার পূর্ববর্তী রাজার জায়গায় তাকেই আইনসঙ্গত রাজা বলে স্বীকার করে নেয়। বাঙালিরা বলে, আমরা সিংহাসনের প্রতি বিশ্বস্ত ; যে সিংহাসন অধিকার করে, তাঁকেই আমরা অনুগতভাবে ভক্তি করি।'

বাবুরের এই শ্লেষাত্মক মন্তব্য অবশ্য তাঁর নিজের বেলায়ও প্রযোজ্য। তাঁর জন্মভূমি এবং অধিকৃত অঞ্চলেও একই ঘটনা ঘটেছে। তবে দূরের ভিন্ন স্থান বলে বাংলাদেশেরটা অত্যন্ত নগ্নভাবে তাঁর চোখে পড়েছে মাত্র, নিজেরটা পড়েনি।

দুনিয়াদারির খতিয়ান

বাংলাদেশের উল্লিখিত শাসকবর্গের নাম, শাসনকাল, মৃত্যুর ধরন ও প্রাসঙ্গিক তথ্য এবারে দেখা যাক :

নাম	শাসনকাল	প্রাসঙ্গিক তথ্য
ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি	১২০৫-০৬	পূর্বে তিস্তা-করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোটসহ রংপুর শহর, পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য ; রাজধানী লখনৌতি (সাবেক লক্ষ্মণাবতী) ; মৃত্যুর আগে দেবকোট-এ অসুস্থ, ফলে এটিই কার্যত রাজধানী ; দিল্লি-সুলতান কুতুবউদ্দিন-এর অনুগত ; সম্ভবত আলি মর্দান কর্তৃক নিহত
মুহম্মদ শিরান খলজি	১২০৭-০৮	দিল্লির অনুগত ; স্বীয় আমিরদের হাতে নিহত
হুসামউদ্দিন ইওজ খলজি	১২০৮-১০	পদত্যাগ, দিল্লির অনুগত
আলি মর্দান খলজি	১২১০	দিল্লির অনুগত
সুলতান রুকনউদ্দিন আলি মর্দান খলজি	১২১০-১২	পূর্বোক্ত আলি মর্দান, সুলতান উপাধি নিয়ে কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর স্বাধীন ; সোন নদীর পূর্ব পর্যন্ত বিহার লখনৌতির অন্তর্ভুক্ত, রাঢ়-এর কিছু অংশ দখল ; হুসামউদ্দিন কর্তৃক নিহত
সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি	১২১২-২৭	পূর্বোক্ত হুসামউদ্দিন, কামরূপ, উড়িষ্যা, বঙ্গ ও ত্রিহুত রাজগণ এঁকে কর দিতেন বলে কথিত ; রাজধানী লখনৌতি; নাসিরউদ্দিন কর্তৃক নিহত

নাসিরউদ্দিন মাহমুদ	১২২৭-২৯	দিল্লি-সুলতান ইলতুতমিশ-পুত্র;স্বাভাবিক মৃত্যু
দওলত শাহ্ বিন মওদুদ	১২২৯-৩০	ইলতুতমিশের অনুগত ; বলকা-কর্তৃক নিহত (?)
মালিক ইখতিয়ারউদ্দিন বলকা খলজি	১২২৯-৩০	বিদ্রোহী হলে ইলতুতমিশ দমন করেন; মৃত্যুর ধরন অজ্ঞাত
মালিক আলাউদ্দিন জানি	১২৩০-৩২	দিল্লি কর্তৃক অপসারিত
মালিক সইফউদ্দিন আইবক	১২৩২-৩৬	ইলতুতমিশের ক্রীতদাস, দিল্লির অনুগত, নিহত
আওর খান	১৩৩৬	দিল্লির অনুমতি ছাড়াই ক্ষমতা দখল ; তুগরল কর্তৃক নিহত
তুগরল তুগান খান	১২৩৬-৪৫	ইলতুতমিশের ক্রীতদাস ; বিহারের শাসক ; দিল্লির অনুমতি ছাড়া লখনৌতি দখল, পরে সুলতান রাজিয়ার অনুমতি লাভ ; পদত্যাগ ; মৃত্যুর ধরন অজ্ঞাত
মালিক তমর খান কিরান	১২৪৫-৪৭	দিল্লির অনুমতি ছাড়াই শাসক ; স্বাভাবিক মৃত্যু
মালিক জালালউদ্দিন মাসুদ জানি	১২৪৭-৫১	আলাউদ্দিন জানির পুত্র ; স্বাভবিক মৃত্যু
মালিক ইখতিয়ারউদ্দিন ইউজবক	১২৫১-৫৫	
সুলতান মুগিসউদ্দিন ইউজবক	১২৫৫-৫৭	পূর্বোক্ত মালিক ইখতিয়ারউদ্দিন ইউজবক ; উড়িষ্যা পুনরুদ্ধার, হুগলি জেলার মন্দারণ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃতি ; কামরূপ জয়কালে নিহত
ইজ্জউদ্দিন বলবন-ই-ইউজবকি	১২৫৭-৫৯	ইলতুতমিশের ক্রীতদাস ; প্রথমে দিল্লির অনুমতি না-নিয়ে শাসক, পরে নেন; আরসলান কর্তৃক নিহত
তাজউদ্দিন আরসলান খান	১২৫৯	ইলতুতমিশের ক্রীতদাস ; কারা প্রদেশের শাসনকর্তা ; বিহার ও লখনৌতির শাসক
সুলতান তাজউদ্দিন আরসলান খান	১২৫৯-৬৫	ঐ ; সম্ভবত স্বাভাবিক মৃত্যু
তাতার খান	১২৬৫-৬৭	বিহার-লখনৌতির শাসক ; দিল্লি-সুলতান বলবনের অনুগত
শের খান	১২৬৮-৭২	এরপর অজানা
আমিন খান	১২৭২-৭৫	সহকারী শাসনকর্তা তুগরল কর্তৃক বিতাড়িত
সুলতান মুইজউদ্দিন তুগরল	১২৭৫-৮১	পূর্বোক্ত তুগরল ; বলবন কর্তৃক নিহত
বোগরা খান	১২৮১-৮৭	বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র
সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ	১২৮৭-৯১	ঐ, স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ
সুলতান রুকনউদ্দিন কাইকাউস	১২৯১-১৩০০	নাসিরউদ্দিন-পুত্র, ফিরোজের হাতে নিহত ?
সুলতান শামসৃউদ্দিন ফিরোজ	১৩০০-২২	সাতগাঁও ও বঙ্গ বিজয়, সোনারগাঁওসহ ময়মনসিংহ-সিলেট জয় ; স্বাভাবিক মৃত্যু
জালাল উদ্দিন কুরবান?	১৩১৯ ?	
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর	১৩২২-২৪	ফিরোজ-পুত্র ; দিল্লি-সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক কর্তৃক অপসারিত
নাসিরউদ্দিন ইবরাহিম	১৩২৪-২৬	ফিরোজ-পুত্র ; লখনৌতির শাসক হিসেবে গিয়াসউদ্দিন তুগলক নিয়োজিত ; মুহম্মদ তুগলক কর্তৃক অপসারিত

বাহরাম খান	১৩২৪-৩৮	গিয়াসউদ্দিন তুগলক কর্তৃক সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা; স্বাভাবিক মৃত্যু ; যুগ্মশাসক শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর	১৩২৭-২৮	পূর্বোক্ত বাহাদুর; বাহরাম কর্তৃক নিহত
মালিক কদর খান	১৩২৬-৩৯	লখনৌতির শাসনকর্তা, ইবরাহিমের স্থলে মুহম্মদ তুগলক কর্তৃক নিয়োজিত; স্ব-সেনাদল কর্তৃক নিহত
ইজ্জউদ্দিন ইয়াহিয়া	১৩২৬-৩৮	মুহম্মদ তুগলক নিযুক্ত সাতগাঁও-এর শাসক
সুলতান ফখরউদ্দিন মোবারক	১৩৩৮-৪৯	রাজধানী সোনারগাঁও ; চট্টগ্রাম অধিকার; স্বাভাবিক মৃত্যু
সুলতান ইখতিয়ার উদ্দিন গাজি	১৩৪৯-৫২	ফখরুদ্দিন-পুত্র ; ইলিয়াস শাহ্'র সোনারগাঁও দখল ; মৃত্যুর ধরন অজ্ঞাত
সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ্	১৩৪১-৪২	লখনৌতি থেকে রাজধানী মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া (হজরত পাণ্ডুয়া বলেও পরিচিত) স্থানান্তর; ইলিয়াস কর্তৃক নিহত
সুলতান শামস্উদ্দিন ইলিয়াস	১৩৪২-৫৮	সাতগাঁও-লখনৌতি-সোনারগাঁও-এর শাহ্-ই বঙ্গাল ; ত্রিহুত ও বিহার পুনর্দখল ; ত্রিপুরায় প্রভাব বিস্তার; ত্রিহুত হাতছাড়া; স্বাভাবিক মৃত্যু
সুলতান সিকান্দার শাহ্	১৩৫৮-৯৩	ইলিয়াস-পুত্র ; কামরূপ দখল, তা পিতার আমলে হওয়াও সম্ভব ; আজম কর্তৃক নিহত
সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম	১৩৯৩-১৪১০	সিকান্দার-পুত্র ; কামরূপ পুনর্দখল ; বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন ; আরবে সাহায্য দান ; নিহত
সুলতান সাইফউদ্দিন হামজা	১৪১০-১২	আজম-পুত্র ; চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক ; শিহাবউদ্দিন কর্তৃক নিহত
সুলতান শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ	১৪১২-১৪	হামজার ক্রীতদাস, নিহত
সুলতান কুতুবউদ্দিন আজম	১৪১৩-১৪ ?	সম্পর্ক অজানা
সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ	১৪১৪-১৫	বায়েজিদ-পুত্র ; নিহত
রাজা গণেশ	১৪১৫-১৬	ভাতুড়িয়ার জমিদার
সুলতান জালালউদ্দিন মুহম্মদ	১৪১৬-১৭	গণেশ-পুত্র
রাজা গণেশ	১৪১৭-১৮	পূর্বোক্ত গণেশ ; মৃত্যুর ধরন অজ্ঞাত
রাজা মহেন্দ্রদেব	১৪১৮	গণেশ-পুত্র ; মৃত্যুর ধরন অজ্ঞাত
সুলতান জালালউদ্দিন মুহম্মদ	১৪১৮-৩২	পূর্বোক্ত জালালউদ্দিন ; পাণ্ডুয়া থেকে রাজধানী গৌড়-এ স্থানান্তর ; ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ জয় ; চীন-মিশর-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক ; আরাকান-রাজকে সাহায্য ; স্বাভাবিক মৃত্যু
সুলতান শামসউদ্দিন আহমদ	১৪৩৩-৩৬	জালালউদ্দিন-পুত্র ; নিহত
নাসির খান	১৪৩৬	আহমদ শাহ্‌র ভৃত্য
সুলতান গিয়াসউদ্দিন নুসরত	১৪৩৬	পূর্বোক্ত নাসির ? নিহত
সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ	১৪৩৬-৬০	ইলিয়াসের বংশধর (?) ; খুলনা অধিকার ; স্বাভাবিক মৃত্যু

সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক	১৪৬০-৭৪	মাহ্মুদ-পুত্র ; ত্রিহুত জয় ; হাবশি দাসদের উচ্চ পদ দান
সুলতান শামস্উদ্দিন ইউসুফ	১৪৭৪-৮১	বারবক-পুত্র ; মৃত্যুর ধরন অজ্ঞাত
সুলতান নূরউদ্দিন সিকান্দার	১৪৮১	মাহমুদ-পুত্র ; ফতেহ্ শাহ্ কর্তৃক অপসারিত, মৃত্যুর ধরন অজ্ঞাত
সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ্ শাহ	১৪৮১-৮৭	মাহমুদ শাহর-পুত্র ; নিহত
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বারবাক	১৪৮৭	হাবশি দাস, শাহজাদা বারবাক নামে পরিচিত, নিহত
সুলতান সৈফউদ্দিন ফিরোজ	১৪৮৭-৯০	মালিক আন্দিল নামে পরিচিত ; সম্ভবত নিহত
সুলতান কুতুবউদ্দিন মাহমুদ্	১৪৯০	আন্দিল-পুত্র ; নিহত
সুলতান শামস্উদ্দিন মুজফফর্	১৪৯১-৯৩	হাবশি দাস, সিদিবদর নামে পরিচিত ; নিহত
সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্	১৪৯৩-১৫১৯	উত্তর বিহার, উড়িষ্যার সীমান্ত, কামরূপ-কামতার শেষ সীমা ব্রহ্মপুত্র নদ, ত্রিপুরার অংশবিশেষ, দক্ষিণ-পূর্বে কর্ণফুলী নদী, দক্ষিণে খুলনা-বাগেরহাট-বরিশাল রাজ্য সীমা ; রাজধানী একডালা ; স্বাভাবিক মৃত্যু
সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ	১৫১৯-৩১	হোসেন-পুত্র ; ত্রিহুতে আধিপত্য বিস্তার, ত্রিপুরা রাজের সঙ্গে সংঘর্ষ, বাবুর-এর সঙ্গে সমঝোতা ; অসম্পূর্ণ আসাম যুদ্ধ ; রাজধানী সম্ভবত গৌড় ; নিহত
সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ্	১৫৩১-৩২	নুসরত-পুত্র ; আসাম যুদ্ধ ব্যর্থ, নিহত
সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ্	১৫৩৩-৩৮	হোসেন-পুত্র ; স্বাভাবিক মৃত্যু?
শের খান (শূর)	১৫৩৮	বিহার-এর অধিকর্তা
হুমায়ুন	১৫৩৮	দিল্লির বাদশা
জাহাঙ্গির কুলি বেগ	১৫৩৯	হুমায়ুন মনোনীত শাসক ; শের খান কর্তৃক নিহত
সুলতান শের শাহ্ শূর	১৫৩৯	পূর্বের শের খান, দিল্লির সুলতান
খিজির খান সুরক	১৫৪০-৪১	শের শাহ নিয়োজিত ; অপসারিত
কাজী ফজিহত	১৫৪১-৪৫	শের শাহ নিয়োজিত আমির
সুলতান বারবাকউদ্দিন বারবক	১৫৪২-৪৩	ময়মনসিংহ-সিলেট অঞ্চলে ; দিল্লির অনুগত ; মৃত্যুর ধরন অজ্ঞাত
শামস্উদ্দিন মুহম্মদ শূর	১৫৪৫-৫৩	
সুলতান শামস্উদ্দিন মুহম্মদ	১৫৫৩-৫৫	পূর্বোক্ত শামস্উদ্দিন ; দিল্লির মুহম্মদ শাহ আদিল-এর সাথে যুদ্ধে নিহত
শাহবাজ খান	১৫৫৫	আদিল নিয়োজিত শাসক
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর	১৫৫৫-৬০	শামস্উদ্দিন-পুত্র ; গৌড় পুনরাধিকার; যুদ্ধে আদিলকে নিহত করণ ; বিহার অধিকৃত ; স্বাভাবিক মৃত্যু
সুলতান গিয়াসউদ্দিন জালাল	১৫৬১-৬৩	শামস্উদ্দিন-পুত্র ; স্বাভাবিক মৃত্যু
জালাল শাহর অজ্ঞাতনামা-পুত্র	১৫৬৩	গিয়াসউদ্দিন কর্তৃক অপসারিত ; মৃত্যুর খবর অজ্ঞাত

সুলতান গিয়াসউদ্দিন	১৫৬৩-৬৪	তাজ খান কর্তৃক নিহত
তাজ খান কররানি	১৫৬৫-৭২	বিহারের শাসক ; স্বাভবিক মৃত্যু
সোলয়মান খান কররানি	১৫৬৪-৬৫	তাজ খানের ভাই ; উড়িষ্যা দখল ; কোচবিহারের সঙ্গে মৈত্রী ; 'হজরত আলা' উপাধি ; গৌড় থেকে চার মাইল পশ্চিমে তাণ্ডা রাজধানী ; স্বাভাবিক মৃত্যু
বায়েজিদ কররানি	১৫৭২	সোলায়মান-এর জ্যেষ্ঠ-পুত্র; হাঁসু কর্তৃক নিহত
হাঁসু	১৫৭২	সোলায়মান-এর জামাতা ; উজির লোদী খান কর্তৃক নিহত
দাউদ খান কররানি	১৫৭২	সোলায়মান-এর কনিষ্ঠ পুত্র ; বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার-অধিপতি
বাদশা দাউদ খান কররানি	১৫৭২-৭৫	বাদশা উপাধি গ্রহণ
দাউদ খান কররানি	১৫৭৫	পরাজয়ের পর দিল্লির বাদশা আকবরের অধীন উড়িষ্যার সামন্ত
সুবাদার মুনিম খান	১৫৭৫	তাণ্ডা থেকে রাজধানী গৌড়ে ; প্লেগ মহামারীর জন্য পুনরায় তাণ্ডায় রাজধানী ; বাংলা-বিহার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত ; মহামারীতে মৃত্যু
বাদশা দাউদ খান কররানি	১৫৭৫-৭৬	দাউদের বাংলা পুনর্দখল ; নিহত
সুবাদার হোসেন কুলি খান	১৫৭৫-৭৮	দিল্লি-বাদশা আকবর নিযুক্ত সুবাদার ; দাউদকে পরাজিত করেন ; স্বাভাবিক মৃত্যু
সুবাদার ইসমাইল কুলি	১৫৭৮-৭৯	অস্থায়ী
সুবাদার মুজফ্ফর খান তুরবাতি	১৫৭৯-৮০	বিদ্রোহী মোগল সেনাদের হাতে নিহত
বাবা খান কাকশাল	১৫৮০-৯১	বিদ্রোহিগণ নিয়োজিত, যারা আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা হাকিমকে বাদশা বলে ঘোষণা করে ; আকবর দমন করেন ; রোগে মৃত্যু
মাসুম খান কাবুলি	১৫৮১	স্বাধীন সুলতান, চাটমোহর পাবনা
সুবাদার মির্জা আজিজ কোকা	১৫৮২-৮৩	আকবরের দুধ-ভাই ; বদলি
সুবাদার ওজির খান	১৫৮৩	অস্থায়ী
সুবাদার শাহবাজ খান	১৬৮৩-৮৫	বাংলার বারভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান; বদলি
সুবাদার সাদিক খান	১৫৮৫	বারভূঁইয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
সুবাদার ওজির খান	১৫৮৫-৮৭	ঐ, স্বাভাবিক মৃত্যু
সুবাদার সায়েদ খান	১৫৮৭-৯৩	ঐ
সুবাদার মানসিংহ	১৫৯৪-১৬০৬	রাজধানী তাণ্ডা থেকে অল্প দূরে রাজমহল-এ স্থানান্তর ; বারভুঁইয়াদের সাথে যুদ্ধ ; প্রতিনিধি রেখে দুবার (১৫৯৭-১৬০১ এবং ১৬০৫-০৬;) দিল্লিতে অবস্থান ; বদলি
সুবাদার কুতুবউদ্দিন কোকা	১৬০৬-০৭	নিহত
সুবাদার জাহাঙ্গির কুলি খান	১৬০৭-০৮	স্বাভাবিক মৃত্যু
সুবাদার ইসলাম খান	১৬০৮-১৩	বারভূঁইয়া দমন ; জাহাঙ্গির নগর (বর্তমান ঢাকা)-এ রাজধানী স্থানান্তর ; স্বাভাবিক মৃত্যু
সুবাদার কাসিম খান চিশতি	১৬১৩-১৬	কাছার হস্তচ্যুত ; চট্টগ্রাম জয়ে ব্যর্থ ; প্রত্যাহার

সুবাদার ইবরাহিম খান	১৬১৭-২৪	ত্রিপুরা জয় ; দিল্লির বাদশা জাহাঙ্গির-পুত্র খুররম (শাহ্‌জাহান)-এর বাংলা অধিকার ; খুররম কর্তৃক নিহত
শাহ্‌জাদা খুররম	১৬২৪	মাত্র কিছুদিন শাসক
সুবাদার দারাব খান	১৬২৪	খুররম নিয়োজিত ; মহব্বত খান কর্তৃক নিহত
সুবাদার মহব্বত খান	১৬২৫	জাহাঙ্গির-সেনাপতি ; প্রতিনিধি রেখে দিল্লি প্রত্যাবর্তন
সুবাদার মোকাররম খান	১৬২৬-২৭	স্বাভাবিক মৃত্যু
সুবাদার ফিদাই খান	১৬২৭-২৮	খুররম কর্তৃক প্রত্যাহার
সুবাদার কাশিম খান	১৬২৮-৩২	পর্তুগিজ দলন হুগলিতে ; স্বাভাবিক মৃত্যু
সুবাদার আজম খান	১৬৩২-৩৫	প্রত্যাহার?
সুবাদার ইসলাম খান	১৬৩৫-৩৯	কামরূপ-এ মোগল কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা; মগ-দলন ; প্রত্যাহার?
সুবাদার মুহম্মদ সুজা	১৬৩৯-৫৭	শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয়-পুত্র ; রাজধানী ঢাকা হলেও রাজমহল-এ বাস
বাদশা মুহম্মদ সুজা	১৬৫৭-৬০	স্বীয় ভ্রাতা আওরঙ্গজেব-এর বিরুদ্ধে দিল্লির তখ্‌ত্‌ নিয়ে বিরোধ, পরাজয় ও পলায়ন আরাকানে ; নিহত
সুবাদার মিরজুমলা	১৬৬০-৬৩	কুচবিহার জয়, কামরূপ পুনরুদ্ধার, অহোমদের সঙ্গে সন্ধি ; রোগে মৃত্যু
সুবাদার দিলির খান	১৬৬৩	অস্থায়ী
সুবাদার দাউদ খান	১৬৬৩-৬৪?	ঐ
সুবাদার শায়েস্তা খান	১৬৬৪-৭৮	চট্টগ্রাম দখল ; বদলি
সুবাদার ফিদাই খান	১৬৭৮	বদলি ; আজম খান কোকা নামেও পরিচিত
সুবাদার মুহম্মদ আজম	১৬৭৮-৭৯	আওরঙ্গজেব-পুত্র
সুবাদার শায়েস্তা খান	১৬৭৯-৮৮	পূর্বোক্ত শায়েস্তা খান ; ইংরেজ দলন ; বদলি
সুবাদার খান জাহান	১৬৮৮	বরখাস্ত
সুবাদার ইবরাহিম খান	১৬৮৯-৯৭	বরখাস্ত
সুবাদার আজিমউস্‌সান	১৬৯৭-১৭১২	শাহ্‌জাদা আজিমউদ্দিন, আওরঙ্গজেব-পুত্র; ১৭০৩-এ পাটনা চলে যান ; বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার; অনুপস্থিতিতে তাঁর পুত্র ফররুখশিয়ার বাংলার নায়েব-সুবাদার
সুবাদার খান জাহান	১৭১২-১৩	
সুবাদার ফররুখশিয়ার	১৭১৪	
সুবাদার ওবায়দুল্লাহ	১৭১৪-১৬	
সুবাদার মুর্শিদকুলি খান	১৭১৭-২৭	বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার ; রাজধানী মুর্শিদাবাদ-এ স্থানান্তর ; স্বাভাবিক মৃত্যু
সুবাদার সুজাউদ্দিন খান	১৭২৭-৩৯	মুর্শিদকুলি-জামাতা ; বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার ; স্বাভাবিক মৃত্যু
সুবাদার সরফরাজ খান	১৭৩৯-৪০	সুজাউদ্দিন-পুত্র ; আলিবর্দি কর্তৃক নিহত
সুবাদার আলিবর্দি খান	১৭৪০-৫৬	স্বাভাবিক মৃত্যু
সুবাদার সিরাজদ্দৌলা	১৭৫৬-৫৭	আলিবর্দির কন্যা-পুত্র ; মির জাফর কর্তৃক নিহত

সুবাদার মির জাফর আলি খান	১৭৫৭-৬০	আলিবর্দির বৈমাত্রেয় বোনের স্বামী ; ইংরেজ কর্তৃক অপসারিত
সুবাদার মির কাশিম আলি খান	১৭৬০-৬৪	রাজধানী মুঙ্গের-এ স্থানান্তর ; ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ; পলাতক অজ্ঞাতবাসে
সুবাদার মির জাফর আলি খান	১৭৬৩-৬৫	ইংরেজগণ কর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, রোগে মৃত্যু

বর্তমান সময় পর্যন্ত জানা উপরের তালিকায় ১৩৭ টি নাম পাওয়া যাচ্ছে। এর ভেতরে ওয়ালি বা মুকতা বা আল-সুলতানি বা সুবাদার অর্থাৎ গভর্নর বা শাসনকর্তা হিসেবে ৭৮টি এবং বাকি ৫৭টি স্বাধীন সুলতান বা রাজা বা বাদশা হিসেবে ১২০৫ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত পাঁচশত ষাট বছর বাংলাদেশের অংশবিশেষ, প্রায় পুরো-বাংলাদেশ এবং কখনোবা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা একত্রে শাসন করেছেন। এই ১৩৭টি নামের ভেতর ১৪টি নাম দুবার আসছে। একটি আসছে ৪বার (দাউদ খান কররানি)। এদের এই ১৪ জনের মধ্যে ৯জন প্রথমে শাসনকর্তা হিসেবে শাসন শুরু করে পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ৪ জন দুবার করে সুলতান বা বাদশা হন—ফিরোজপুত্র গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর, গণেশ-পুত্র জালালউদ্দিন মুহম্মদ, শের শাহ্ এবং দাউদ খান কররানি। ২ জন দুবার করে সুবাদার—মানসিংহ ও শায়েস্তা খান। গণেশ সম্ভবত দুবারই রাজা হিসেবে সিংহাসন দখল করেছিলেন। দাউদ দিল্লির আনুগত্য স্বীকার করেও দুবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

অতএব মূলত ব্যক্তি হিসেবে হচ্ছে ১২৩ জন। এর ভেতরে অমুসলমান হিসেবে গণেশ এবং মহেন্দ্রকে বাদ দিলে ১২১ জন ইসলামধর্মী শাসক এ অঞ্চলে শাসনকর্তা হিসেবে এসেছেন। নাসির খান, শেরশাহ্, হুমায়ুন, খুররম প্রমুখকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কারণ আধাদিন বা সাতদিনই হোক (নাসির খান) অথবা দিল্লির সুলতান বা বাদশাহ হোন (শেরশাহ্ বা হুমায়ুন) অথবা বিদ্রোহী শাহজাদাই (খুররম) হোন—এঁদের সবারই মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে স্ব-অধিকারে আনা এবং এর সম্পদ আহরণ করা।

১২১ জন মুসলমান শাসকের মধ্য ৪১ জন সরাসরি নিহত বলে জানা যায়—কেউ যুদ্ধ করতে গিয়ে, কেউ প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে, কেউ আততায়ীর খঞ্জরে। মোগল শাসনকাল-পূর্বের ৭০ জন শাসক ও সুলতানের ভেতর ৩৪ জন নিহত, ৮ জনের মৃত্যুর ধরন অজ্ঞাত, ১৮ জনের সম্ভবত স্বাভাবিক মৃত্যু এবং অন্যেরা ক্ষমতাচ্যুত বা পদত্যাগী। অস্বাভাবিক মৃত্যুর এ সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে যদি কেবল স্বাধীন সুলতান ও কার্যত-স্বাধীন শাসকদের গণনা করা যায়। ৫২ জন স্বাধীন সুলতানের ভেতর (শেরশাহ্, হুমায়ুন বাদে কিন্তু শূর ও কররানি বংশ ধরে) ২৫ জনই নিহত। আর কেবল স্বাধীন সূলতানি আমল (১৩৩৮-১৫৩৮) ধরলে ২৫ জন (গণেশ ও মহেন্দ্র ধরলে ২৭) সুলতানের ভেতর ১৫ জন নিহত, ৭ জনের সম্ভবত স্বাভাবিক মৃত্যু এবং ৩ জনের মৃত্যুর ধরন অজ্ঞাত। শাসনকর্তা ও স্বাধীনতা ঘোষণাকারী হিসেবে কাজ করেছেন প্রাক-

সুলতানি যুগে ২৭ জন। এদের মধ্যে স্বাধীনতা-ঘোষণাকারী ৯ জন। এই ৯ জনের মধ্যে ৬ জন নিহত, ২ জনের মৃত্যুর ধরন অজানা, ১ জনের স্বাভাবিক মৃত্যু। বাকি ১৮ জন শাসনকর্তার ভেতর ৭ জন নিহত, ২ জনের মৃত্যুর ধরন অজ্ঞাত, ৫ জনের স্বাভাবিক মৃত্যু। অন্যেরা ক্ষমতাচ্যুত। ৪২ জন মোগল সুবাদারের ভেতরও ৬ জন নিহত। আর একজন সুবাদার (শুজা) বাদশা হতে গিয়ে নিহত।

গভর্নর ও সুলতানদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ নয় মোটেই। খুব কম শাসক-সুলতানই পঞ্চাশোর্ধ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয়। বেশির ভাগ শাসক-সুলতানই চল্লিশের কোঠা পার হওয়ার আগেই জীবনলীলা সংবরণ করেছেন। ত্রিশোর্ধ্বও হতে পেরেছেন খুবই কম সংখ্যক। সত্তর-আশি বছর বয়সের শাসক-সুলতান পাওয়া তো নিতান্ত দুর্লভ।

তাদের শাসনকার্যকালও বৈশিষ্ট্যময়। মোগল আমলের আগের শাসনকর্তা ও সুলতানদের ভেতর ১৫ জনই এক বছরের কম সময় শাসন করে অস্বাভাবিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। নাসির খানের মত আধাদিন (মতান্তরে সাত দিন বা দু মাস)ও কেউ ক্ষমতায় থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। দু'বছরের মত শাসনকাল হল ৯ জনের। দু' বছরের কম-বেশি রাজত্ব করে এঁরাও যুদ্ধে বা অন্যভাবে হন নিহত। পনের থেকে বিশ বছর পর্যন্ত শাসন করেছেন ৩ জন, যাঁরা নিহত না-হলে হয়ত আরো অনেকদিন রাজত্ব করতেন। এই তিনজনই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত সুলতানদের পর্যায়ভুক্ত—গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ এবং নাসিরউদ্দির নুসরত শাহ্। স্বাধীন সুলতানদের ভেতর সবচেয়ে বেশিদিন রাজত্ব করেছেন সিকান্দার শাহ্—মোটামুটি ৩৫ বছর। কিন্তু তিনিও হন নিহত।

স্থায়ী এবং অস্থায়ী মোগল সুবাদারদের ভেতর ১৭ জন মাত্র বছর খানেকের কম-বেশি শাসন করেছেন। এদের কেউ হন নিহত (মুজফ্ফর খান তুরবাতির মত), নয় বদলি করে দেওয়া হয় নানা কারণে, অথবা করা হয় বরখাস্ত। অবশ্য সুবাদারদের ভেতর বাইশ বছরকাল শাসনের দৃষ্টান্তও আছে, যেমন শায়েস্তা খান। তাঁর দু'বার শাসনকাল যোগ করলে তাই হয়।

মোটকথা, কেন্দ্রে মোগল শাসন সর্বক্ষণ থাকার পরও সুবাদারি প্রথায় যেমন কোন সুষ্ঠু নিয়ম গড়ে উঠতে পারে নি শাসনকার্যকাল ব্যাপারে, তেমন এর পূর্ব-যুগের স্বাধীন সুলতানদের সময়েও গড়ে ওঠে নি কোন সুশৃঙ্খল উত্তরাধিকারপ্রথা অথবা ওয়ালি-মুকতাদের বেলায় কোন সঠিক বিধি-আচার। ৫৬০ বছর সময়ের ভেতর গড়ে পাঁচ-বছর করেও রাজত্ব করতে পারেন নি ১২৩ জন শাসক-সুলতান। ৩২ জনই অর্থাৎ শতকরা পঁচিশ ভাগের মত এক বছরের কম সময় রাজত্ব করেছেন, আবার ১২৩ জনের ভেতর ৪১ জনই নিহত হওয়ায় শতকরা হিসেবে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পঁয়ত্রিশ ভাগের মত।

১২০৫ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত সময়টুকুর ৫৬০ বছরের ভেতর বিভিন্ন সামন্তপ্রভুর অর্থাৎ শাসক-সুলতানের স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীন থাকার সময় যোগ করলে ২৮০ বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল তাঁরা স্বাধীন রাখতে সক্ষম হন। সুলতান আলি মর্দানের মোটামুটি বছর তিনেকের স্বাধীনতা ভোগ (১২১০-১২), গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির পনর বছর (১২১২-২৭), মুগিস উদ্দিন ইউজবুকের তিন বছর (১২৫৫-৫৭), তাজউদ্দিন আরসালনের মোটামুটি ছয় বছর (১২৫৯-৬৫), মুগিসউদ্দিন তুগরলের ছয় বছর (১২৭৫-৮১), নাসিরউদ্দিন মাহমুদ থেকে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর পর্যন্ত সাঁইত্রিশ বছর (১২৮৭-১৩২৪), ফকরউদ্দিন মোবারক থেকে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ পর্যন্ত দু'শ বছর (১৩৩৮-১৫৩৮) এবং শূর সুলতানদের এগার বছর (১৫৫৩-৬৪) যোগ করে হয় ২৮০ বছর। মোগল আমলের শেষদিকে বাংলার নবাবদের মোটামুটি পঞ্চাশ বছর যোগ করলে (মুর্শিদকুলি খাঁর ১৭১৭ থেকে মির জাফর ১৭৬৫ পর্যন্ত) এ সময় বেড়ে ৩৩০ বছর হয়। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের শেষদিকের কিছুটা সময় এবং কররানিদের স্বাধীন থাকার সময়টুকু যোগ করলে এই সময়কাল আরো অন্তত বছর দশেক বাড়বে। যা হোক, মোটামুটি ৫৬০ থেকে ৩৪০ বাদ দিলে বাকি ২২০ বছর বাংলা ছিল দিল্লির মুসলিম শাসকদের অধীন একটি প্রদেশ।

১২০৫-এ বখতিয়ারের নদীয়া বিজয়ের পর থেকে ১৭৬৫তে মির জাফরের মৃত্যু পর্যন্ত সময়টুকু চারভাগে ভাগ করা যায় : ১. প্রাক-স্বাধীন সুলতানী আমল—দিল্লির সাথে সম্মিলন ও সংঘর্ষের যুগ (১২০৫-১৩৩৮), ২. স্বাধীন সুলতানী আমল—স্বাধীন বাংলা (১৩৩৮-১৫৩৮), ৩. উত্তর-স্বাধীন-সুলতানী আমল—ফের দিল্লির সাথে সম্মিলন ও সংঘাতের যুগ (১৫৩৮-১৬০৮) ; এবং ৪. প্রাদেশিক যুগ—সুবাদারি আমল (১৬০৮-১৭৬৫)।

এখানে আবার একথাও উল্লেখ্য যে, বখতিয়ার থেকে মির কাশিম পর্যন্ত রাজ্যের যে সীমা এই বাংলাদেশের দেখা যায় তা কিন্তু স্থির বা সুনির্দিষ্ট নয় কখনই। বখতিয়ার যে-অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন তা সারা বাংলার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র— উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের অংশবিশেষ। এটি আবার বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজধানী লক্ষণাবতী (উচ্চারণের ক্রম-পরিণতিতে লখনৌতি)-র নামে 'লখনৌতি রাজ্য' হিসেবে পরিচিত ছিল। এর সীমার বাইরে মূল বাংলা অঞ্চলে আরো বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্তরাষ্ট্র তখনো ছিল। এমনকি সেনগণ তখনো বঙ্গে (পূর্ব বাংলায়) রাজত্ব করছিল। শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ্‌র সাতগাঁও এবং বঙ্গ বিজয়ের আগে বাংলাদেশের বৃহত্তর অংশই লখনৌতি রাজ্যের বাইরে ছিল। এমনকি ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ'র পূর্বে চট্টগ্রামও দখল হয় নি। ইলিয়াস শাহ্ প্রায় সমগ্র বাংলার সুলতান ছিলেন। সেজন্য তাঁকে 'শাহ্-ই-বাঙ্গাল' বলে ডেকেছেন দিল্লির ঐতিহাসিক শামস্-ই-সিরাজ আফিফ। তবুও তাঁর অধীনে ছিল না খুলনা-যশোর অঞ্চল বা ফরিদপুর-বরিশাল এলাকা। সুলতান জালালউদ্দিনের সময় ফরিদপুর অঞ্চল এবং সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ্‌র সময় খুলনা অঞ্চল বিজিত হয়। আবার ত্রিহুত-বিহার-উড়িষ্যা-কামরূপ নিয়ে কত-যে যুদ্ধ হয়েছে এবং কতবার-যে

এ সব অঞ্চলের নানা অংশ বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এমনকি সারা-বাংলাই তো ক্রমে ক্রমে মোগলরা অধিকার করে নেয়। এই মোগল আমলেও কেন্দ্রের শক্তি দুর্বল হলে বাংলাদেশ তথা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব-সুবাদারগণও কার্যত স্বাধীনভাবেই শাসন করে গেছেন।

রাজ্যের এই সীমা বৃদ্ধি এবং সঙ্কুচিত হওয়া, কখনো পরাধীন কখনো স্বাধীন এবং একই স্থান দখল-পুনর্দখলে স্পষ্টতই বোঝা যায় সম্পূর্ণ সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করত কোন রাজ্যের সীমানা ও স্বাধীনতা। আধুনিককালের মত একটা অঞ্চলের অধিবাসীদের বৃহত্তর অংশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর এর অস্তিত্ব স্থায়িত্ব অথবা সীমা স্থির হত না। সামরিক ক্ষমতা বেশি হলে অন্যের রাজ্য গ্রাস করত, দুর্বল হলে নিজেই অন্যের শিকার হত। কোন সামন্তনেতা যতই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হোক-না কেন কেবল তা দিয়ে যেমন রাজ্য রক্ষা হত না তেমন সামরিকশক্তির সাথেও বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হত। আর এসমস্তকিছুর সাথে বেসামরিক আপামর জনসাধারণের যোগ থাকত সামান্যই। সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে যারা সৈনিকবৃত্তিতে যোগদান করত তারাই বরং কিছুটা সামন্তচক্রের আবর্তে পড়ে তাদের স্বার্থের সাথে স্বীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টপূর্বক সামন্ততন্ত্রকে করত শক্তিশালী। এই সামরিক চক্র জিতলে রাজ্য হত রক্ষা এবং বৃদ্ধি, হারলে হত সংকুচিত অথবা পরাধীন। আবার এজন্যই একই স্থান বারে বারেই করতে হত জয়।

এ ধরনের এক ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে যোগ্যতম ব্যক্তিটির সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ওঠার সম্ভাবনা ছিল বলে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়। উদাহরণ হিসেবে বহু ক্রীতদাসের (?) সুলতান বা উজির-নাজির হওয়ার দৃষ্টান্ত তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া সম্ভবও। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, যাঁরাই সুলতান বা শাসক হয়েছেন তাঁরাই হয় অমাত্য নয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নয় তাঁদের বা রাজার আত্মীয়স্বজন। যাঁদের তথাকথিত দাস-সুলতান বলা হয়ে থাকে (যেমন দিল্লির কুতুবউদ্দিন, ইলতুতমিশ বা বাংলাদেশের হাবশি শাহজাদা বারবক, সৈফুদ্দিন ফিরোজ প্রমুখ), তাঁরা প্রথম জীবনে এক সময়ে দাস বা ক্রীতদাস থাকলেও পরবর্তীতে কোন শাসক-সুলতান বা রাজকর্মচারীর অনুগ্রহে আমির-ওমরাহ্ বা শাসনকর্তার পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন এবং সিংহাসনের খুব কাছাকাছি পদে বা ক্ষমতায় থেকেই তা দখল করেন। অন্য কথায়, তাঁরাও সামন্তপ্রভু হওয়ার পরেই তখ্ত দখল করতে পেরেছেন। সেটা অধিকারে রাখতে অন্যান্য সামন্তনেতাদেরও সন্তুষ্ট করতে হয়েছে নানা পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে বা সম্পদ-সম্পত্তি বিলিয়ে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই বোঝা যায়, এক সময়ের ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন অথবা হাবশি ফিরোজ এত দানখয়রাত করে দানবীর আখ্যায়িত হয়েছেন কেন ও কিভাবে! শব্দার্থেই যে প্রকৃত দাস বা ভৃত্য এবং যে কখনই ঐ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি তার পক্ষে সিংহাসন দখল কোনদিনই সম্ভব হয় নি। শাসক বা সুলতান হতে তাই প্রয়োজন ছিল প্রভূত ক্ষমতা এবং সম্পদের। সে-সম্পদ আহৃত হত লুণ্ঠন অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে। লুণ্ঠন অথবা পররাজ্যগ্রাস তাই সমাজে তখন ঘৃণিত ছিল না,

বরং সেটাই ছিল নীতি। 'জোড় যার মুল্লুক তার' বা কাব্যিক ভাষায় 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'র রীতি ধরে যেন-তেনভাবে ক্ষমতা আর সম্পদ আহরণই ছিল সমাজের সকল ব্যক্তির আদর্শ। ধর্ম ও নীতিবাক্য সেখানে কাজ করত সামান্যই। বৈধ উত্তরাধিকারীকেও সেজন্যই অনেক সময় ঘাতকের হাতে হারাতে হয়েছে প্রাণ। সেই ঘাতকই হয়ত আবার সুলতান হিসেবে হত খ্যাতিমান। পুত্র পিতাকে করত হত্যা; পুত্রকেও পিতা ছাড়ত না ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে! ভাই-বেরাদর, চাচা-ভাতিজার সম্পর্কতো কোন ছাড়! কেউ হয়ত ত্যক্ত-বিরক্ত হয়েও সিংহাসন করত ত্যাগ!

এ সবই হল সমাজের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রচণ্ড অস্থিরতার এবং নীতিবিগর্হিত কাজকর্মের স্বাক্ষর। কোন সুষ্ঠু নীতিই এই প্রচণ্ড অস্থিরতায় গড়ে উঠতে পারে না। কখনো এই অস্থিরতা একটু কম বা সীমিত, কখনো তা তীব্র। কখনো অভ্যন্তরীণ, কখনো তা বহিঃশত্রুর ভয়ে কম্পমান। কখনো স্বশ্রেণীভুক্তদের মধ্যেই, কখনো তা বহিঃশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। দুর্ভাগ্য যে, বহিঃশ্রেণীদ্বন্দ্বের সঠিক খবর এ সময়ের তেমন পাওয়া যায় না। ইতিহাসকারগণ সামন্তপুষ্ট হওয়ায় খুব কমই সেসব সংবাদ পরিবেশন করতে পেরেছেন। তবে সামন্তদের অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেই বোঝা যায় কেমন অস্বাভাবিক ও অনিশ্চিত ছিল তাদের শ্রেণীর ভেতরের অবস্থা। বলাই বাহুল্য, এসব কাণ্ডকীর্তি করতে গিয়ে সামন্তদের নিজেদেরও কম মূল্য দিতে হয় নি। 'সোহ্রাব রুস্তমে'র কাহিনী এরকমই এক সামন্ত সেনাপতির মর্মন্তুদ ঘটনার বর্ণনা। কাহিনীটি ইরানের হলেও এই বাংলাদেশ বা এমন আরো অন্যান্য সামন্তবাদী দেশে এরকম হাজারো কত-যে কাহিনী ছড়িয়ে আছে তার খোঁজও রাখা সম্ভব নয়! সম্পদ-লালসা আর খ্যাতি-ক্ষমতা অর্জনের কথা বাদ দিলেও, এসব গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে সে-সমাজের হৃদয়বিদারক বিভিন্ন বৈপরীত্য এবং সামাজিক অসঙ্গতি; আর এ অবস্থার মূল কারণ সামান্তস্বার্থ তথা জাগতিক বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের আকর্ষণ। ধর্মীয় কোন বাধা-নিষেধ অথবা উদ্দীপনা এ ব্যাপারে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছে বলে মনে হয় না, কারণ এ সব কলহের পাত্র অনেক সময়ই ছিল স্বধর্মভুক্ত।

সামন্তদের মনের উদ্দেশ্য ধরা পড়ে তাদের কৃত-কাজগুলো বিচার করলেই। তাদের প্রধান কাজই হল স্বীয় অধিকৃত অঞ্চল অন্য সামন্তপ্রভুর হাত থেকে রক্ষা এবং নিজে অন্য রাজ্য আক্রমণ করে তা দখল বা গ্রাস। জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় এবং নানা ধরনের শোষণের জন্য নিজেদের শাসন যতদূর সম্ভব বিস্তৃত ও গভীর করার প্রয়াস তারা পেত। সামন্তরাষ্ট্রে এক এক অঞ্চলের জনগণের জীবনে যে তথাকথিত ঐক্যসূত্র স্থাপন করত সে-ঐক্য জনগণের স্বার্থে হত না, হত শাসক-শোষকের স্বার্থেই। এ স্বার্থ রক্ষার জন্যই এক দেশের শাসক অন্য দেশের শাসকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হত, তাদের সাথে সন্ধি করত এবং সুবিধেমত আবার যুদ্ধে লিপ্ত হত। এ সব যুদ্ধ ও সন্ধি, আক্রমণ ও প্রত্যাঘাতের বেলায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কোন ভূমিকাই থাকত না। আধুনিক রাষ্ট্রের মত রাস্তায় নেমে পছন্দ-অপছন্দের সন্ধিচুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার কোন

প্রশ্নই তখন উঠত না। সেনাবাহিনী বরং কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারত। কারণ এরাই ছিল তখনকার দিনে সবচেয়ে সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী। তাদের পছন্দ হলে কোন সুলতান বা রাজাকে রক্ষা করতে বা সিংহাসনে বসাতে পারত, অপছন্দ হলে করতে পারত হত্যাও। সেনাবাহিনী হাতে রাখতে পারলে সামান্তরাজ কারো কাছে দায়ী যেমন থাকতে বাধ্য হত না, তেমন রাষ্ট্রটাও হত ঠিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতই। এরকম ছিল বলেই স্বসাম্রাজ্যের অংশবিশেষে, যেমন বাংলায় ইংরেজদের বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার মোগল বাদশাগণ অবলীলাক্রমে দিতে পেরেছিলেন। কারো কাছেই তাদের জবাবদিহি করতে হয় নি, হওয়ার প্রশ্নও ওঠে নি। রাজ-ইচ্ছার বিষয়ে জনগণের কোন প্রকার বিরুদ্ধ বক্তব্য রাখা ছিল অচিন্তনীয়। প্রজাসাধারণের সুবিধা, রাষ্ট্রের উন্নতি, গণমানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাদের কর্তব্যের ভেতর ছিল না, ছিল প্রয়োজনের অথবা হয়ত শখের ব্যাপার। দু'চারজন গুণী ও মেধাবী শাসক জনগণের সুবিধার জন্য কিছু করলেও, তা একান্তই ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার।

এজন্যই সে-যুগে কোন দেশের স্বাধীনতার মানে আসলে হল এসব বীর্যবান সামন্তপ্রভুরই স্বাধীনতা। বলা যায়, এসব সামন্তপ্রভু এবং তাদের সহযোগী-দোসরদের জমি ও সম্পদ একচ্ছত্র ভোগ-দখলের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ও পরাধীনতা যে-অর্থে আধুনিককালে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ একটি ভূখণ্ডের সমগ্র জনগণের পরাধীনতা বা স্বাধীনতা, সেই অর্থে স্বাধীনতা তখনকার দিনের বেলায় প্রযোজ্য ছিল না। আধুনিক একটি রাষ্ট্রে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ভিন্নমতাবলম্বী থাকলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আন্দোলন ও ইচ্ছায়ই সেটি টিকে থাকে, কেবল গুটিকয় ব্যক্তির ইচ্ছায় নয়। কিন্তু সামন্তযুগে ঘটনাটা ছিল ঠিক উল্টো। মাত্র গুটিকয় ব্যক্তির কর্মোদ্যম ও বিশেষ ভূমিকার ওপরই নির্ভরশীল ছিল একটি রাষ্ট্রের স্থিতি ও লয়। সাধারণ মানুষ তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সাথে যোগ দিত মাত্র, আলাদা সক্রিয় তেমন কোন ভুমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পেত না।

সামন্তসমাজ ব্যবস্থায় জনগণের আর্থিক জীবন ভূমিনির্ভর হওয়ার ফলে তাদের চলাচলের বিশেষ প্রয়োজন হত না। যানবাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও চলাচলের অসুবিধার জন্য দেশের অভ্যন্তরে মানুষের যাতায়াত হত খুবই কম পরিমানে। অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-ব্যবস্থার জন্য তার প্রয়োজনও হত না। চলাচলের অভাবে একই দেশের বিভিন্ন অংশের জনগণ পরস্পরের বিশেষ খবরও রাখত না। ফলে পরস্পরের সাথে পরিচিত হওয়ারও বিশেষ সুযোগ পেত না। বড় বড় রাষ্ট্রে তো এক অংশের মানুষের সাথে অন্য অংশের মানুষের কোনদিনই দেখা সাক্ষাৎ হত না, এমনকি অস্তিত্ব সম্পর্কেও হয়ত থাকত অজ্ঞ। এই অপরিচয় এবং অজ্ঞতা স্বভাবতই তাদের মধ্যে এমন কোন বোধ অথবা চেতনা সৃষ্টি করতে পারত না যার ফলে তারা নিজেদের এক ও অবিভাজ্য মনে করে সকলের স্বার্থ-রক্ষার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে হয় সক্ষম। অর্থাৎ কোন দেশে সামন্ত অর্থনীতির কাটামোর মধ্যে জনসাধারণের পারস্পরিক পরিচয় এবং আর্থিক যোগসূত্রের অভাব যতদিন বর্তমান থাকে, ততদিন সেই দেশে জাতীয়

ঐক্যবোধের ও সমচেতনার বিস্তৃতি ঘটে না তথা জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয় না। আধুনিক রাষ্ট্রে এসব শর্ত পূরণ হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর রাষ্ট্র হয় নির্ভরশীল। অতীতে যেমন এ ধরনের জাতীয়তাবোধ ছিল না, তেমন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতি নির্ভর করত সামন্তশাসকেরই সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত মোটামুটি এ ধারায়ই এদেশের ইতিহাস প্রবাহিত।

স্বাধীনতা ও পরাধীনতার সংজ্ঞা

প্রচলিত মত হল ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সূর্য ইংরেজদের হাতে অস্তমিত হয়। এ ধারণা অতিসরলীকরণের ক্রটিতে পূর্ণ। ইংরেজ শাসনই তো ১৭৫৭তে শুরু হয় নি, স্বাধীনতা হারানো দূরের কথা! ১৭৬৫তে নিজামত ও দেওয়ানি লাভের পরেও বাস্তবে শুরু হয়েছিল, একথাও বলা যায় না, আইনগতভাবে হলেও। এ সনদ সারা ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল না। কেবল ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলগুলোর জন্যই তা কার্যকরী ছিল। ১৭৭২-এ ইংরেজ কোম্পানি স্বহস্তে দেওয়ানি নেওয়ার আগে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় নি। ১৭৫৭ থেকে '৭২ পর্যন্ত সময়টুকু ছিল ক্রান্তিকাল। এর পর্যায়ও দু'টি : ১৯৫৭ থেকে '৬৫ পর্যন্ত ইংরেজরা ছিল 'কিং মেকার'—নবাব তারা গদিতে বসিয়েছে এবং নামিয়েছে ; আর ১৭৬৫ থেকে '৭১ পর্যন্ত ছিল তারা পরোক্ষ শাসক, প্রত্যক্ষভাবে তারা দেশীয় ব্যক্তিদের দিয়েই দেশ শাসন করেছে। দেওয়ান ছিল দেশীয় ব্যক্তিবর্গই। এর পরে রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে দেশীয়রা থাকলেও, ততদিনে ইংরেজরা শাসনভার সরাসরি হাতে নিয়েছে, বিশেষ করে ১৭৭২এর রেগুলেটিং এ্যাক্ট-এর পর।

এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, ১৭৫৭তে পলাশীর মাঠে বাংলার স্বাধীনতা যেমন মোটেই অস্তমিত হয় নি, তেমন নবাব সিরাজদ্দৌলাও এদেশের স্বাধীনতা রক্ষা তথা আপামর জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কিছু করেছেন বলা যায় না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তখনকার দিনে 'জনগণের স্বাধীনতা' কথাটার কোন অর্থ আদৌ ছিল না। রাজনৈতিক শক্তি বলতে ছিল শ্রেণী-আনুগত্য এবং ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি বিশ্বস্ততা। আর ষড়যন্ত্র ও রাজা-বাদশা-নবাব পরিবর্তন ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। সেজন্যই সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মধ্যে অভিনবত্ব যেমন কিছু ছিল না, তেমন এতে এ দেশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার কথাও কারো মনে জাগে নি। সামন্তবাদের 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির ভেতর এমন ধারণা আসা ছিল অসম্ভব। জন্মস্থানের প্রতি একটা দুর্বলতা বা ভালবাসা-ভাললাগার ব্যাপার ছাড়াও দেখা যায় সে-সময়ও একটি বিশেষ স্থানের লোকেরা ভিনদেশের বিজয়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য জীবন পর্যন্ত দান করেছে। সে-আত্মরক্ষা করার স্পৃহা ঠিক আজকের স্বাধীনতা রক্ষা করার স্পৃহার মত নয়। তখন আশঙ্কা ছিল আসলে জমি অন্যের করায়ত্ত হলে জীবন যাপনে অসুবিধা অথবা পরাজিত হলে ক্রীতদাস হওয়া। আজকের দিনের মত জন্মস্থানের স্বাধীনতার কথা তখন ভাবা হত না। এর প্রতি আকর্ষণ বা এর জলহাওয়া প্রকৃতি নিসর্গের প্রতি

টানটাই স্বাধীনতা নয়। এই 'টানটা' হয়ত তখনো ছিল। এখনো আছে। পরিচিত মানুষ বা পরিবেশের প্রতি এমনটা থাকেও। কিন্তু স্বাধীনতা এর সমার্থক নয়।

ইংরেজ কোম্পানির শক্তিমত্তায় চক্রান্তকারীদের বিশ্বাস ছিল বলে সিরাজের বিরুদ্ধে প্রাসাদ-চক্রান্তে তাদের টেনে আনা হয়। কোম্পানিও বহু আগে থেকেই সাম্রাজ্যলিপ্সার পরিচয় দিচ্ছিল তার বাজারের স্বার্থে। ১৬৮৭তেই এর পরিচালকরা মাদ্রাজকুঠির অধ্যক্ষকে লিখেছিলেন প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে এমন এক সামরিক ও বেসামরিক সংগঠন গড়তে যা ভবিষ্যতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি হতে পারে। দখল করার এই ভাবটা ছিল সামন্তনীতি অনুসরণেই, যদিও কোম্পানি ছিল একটি বেনিয়া বা বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান।

সিরাজ যা করেছিলেন তার সবটাই স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। ইংরেজ বেনিয়াদের সীমাহীন লুণ্ঠনের ফল দাঁড়াচ্ছিল তাঁর রাজস্ব আদায়ে বিঘ্ন তথা কার্ল মার্কসের ভাষায় 'অভ্যন্তরীণ লুণ্ঠনে' নবাবের হচ্ছিল অসুবিধা। অন্যদিকে নবাবও পুরো স্বাধীন মোটেই ছিলেন না। দিল্লির আনুগত্য তাঁকে ঠিকই মেনে চলতে হত নবাবি সনদ আনিয়ে এবং বছর বছর খাজনা পাঠিয়ে। বিশ্বাসঘাতকতা করে মির জাফরও নতুন কিছু করেন নি। গদির জন্য অমন করাটাই ছিল সে-যুগের রীতি, না-করাটা ব্যতিক্রম। তাঁর নিজের জামাতা মির কাশিমও লজ্জাসরম ও নীতিজ্ঞানের মাথা খেয়ে ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়ে বাংলার মসনদ দখল করতে মোটেই কুণ্ঠিত হন নি।

সিরাজের রাজ্যচ্যুতিতে এদেশের মানুষ হাল আমলে যে হাহুতাশ করে অথবা তাঁকে নায়ক করে যেসব চমৎকার স্বাদেশিকতাপূর্ণ বক্তব্য হাজির করা হয় তা আসলে জাতীয়তাবোধ-জাগ্রত-হওয়ার-সময়ের এক ইচ্ছাপূরণের কাহিনী মাত্র। জাতিগতভাবে সিরাজ বাঙালি ছিলেন না; বাঙালিত্ববোধও তখন ছিল না। এ বোধ আসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বড়জোর উনিশ শতকের শেষ দিকে, অথবা আরো সঠিকভাবে বললে বিশ শতকে এবং তাও কিছু ইতিহাসকার ও লেখকের মধ্যে, যা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।

তবে একটা কথা। কল্পিত কোন বিষয় যদি সমাজ প্রগতির পক্ষে কাজ করে তাহলে সে-আধারটিকে একেবারে অস্বীকার করা ঠিক নয়। ইতিহাসের রুক্ষ মাঠিতেও নয়, যদিও ইতিহাস সত্যেরই সাধক। ইতিহাস সুন্দরেরও সাধক নিশ্চয়ই। কেবল মানুষের পশুত্ব বর্ণনা দেওয়া এর কাজ নয়, মানবতার উদ্বোধনে যা সাহায্য করে তার কথা বলাও এর কর্তব্য। সিরাজকে কেন্দ্র করে বাংলা তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে উদ্বোধন হয়েছিল এদেশে এবং মুসলমান সিরাজকে কেবল মুসলমান হিসেবে না-দেখে জাতীয়তাবাদের প্রেরণাকারী হিসেবে যেখানে দেখা হয়েছিল এক অসাম্প্রদায়িক চেতনায়, সেখানে সিরাজের একদা-বাস্তব-ভূমিকা যাই-থাক-না-কেন তাঁর পরবর্তী কাল্পনিক ভূমিকার জন্য অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাতে হয়, বিশেষ করে এমন-সিরাজ-সৃষ্টি-কারীদের! মিথ্যা থেকেও সত্য ও সুন্দরের সৃষ্টি হলে ইতিহাসবিদও সে-সুন্দরের বাইরে যেতে পারেন কি না সন্দেহ। সিরাজকে জাতীয় বীররূপে প্রচার করে তার মধ্য দিয়ে যে

অসাম্প্রদায়িক চেতনার সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসার্হ। সত্যিকার সিরাজ তত বড় না হলেও মিথ্যা সিরাজ এখানে অনেক বড়। তারো চেয়ে বড় তাঁর সৃষ্টিকারিগণ যাঁরা সিরাজের ভূমিকা এমন ধরনের সর্বমানবের এক সম্মিলনের ভূমিকাতে স্থাপন করে তাঁদের ঈপ্সিত লক্ষ্য পূরণে হয়েছেন অভিযাত্রী। তাঁদের অভিযাত্রায় আদর্শের এই ভূমিকা চরম সত্য থেকে আহৃত না-হলেও তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ এ ঘটনাটিও ইতিহাসেরই একটা পর্যায়ের এবং একটা সময়েরই অন্তর্গত। সে-জন্য তা সত্যও বটে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার জন্য সিরাজ বা মির কাশিমের মত স্ব-স্বার্থ সংরক্ষণকারী সামন্তনেতৃবর্গের কর্মকাণ্ড কিছুটা বিশ্লেষণেরও দাবি রাখে। এ ধরনের ভূমিকায় প্রগতিমুখী উপাদান থাকা অস্বাভাবিক নয়। স্ব-দেশকে বাহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করা যদি কর্তব্যের ভেতর ধরা হয় এবং ধরা হয় তা প্রগতিশীল চিন্তাধারা, তাহলে কোন সামন্ত সেই যুগে সেই প্রয়াস পেলে তার ভূমিকা প্রগতিশীল বলা যাবে কিনা এই প্রশ্নটির উত্তরের ভেতরই রয়েছে বিষয়টির সমাধান। সামন্তদের স্বার্থ অবশ্যই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তবে 'গণে'র অবস্থান কখনো-বা তাকে যথেষ্ট গণমুখিও করে তুলতে পারে শাসককুলের নানা হিতকর কার্যকলাপের মাধ্যমে জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। এর ফলে শাসকরা হয়ত জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে, যেমন বাংলায় হয়েছিল ইলিয়াসশাহি বা হোসেনশাহী বংশ। আবার দেশীয় সামন্তগণ শোষণ করলেও দেশের সম্পদ দেশের অভ্যন্তরেই বর্তমান থাকে বলে তা সমান্তরাল এবং উলম্ব ভাবে জনগণের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে কমবেশি তাদের উপকারে আসে। এ হিসেবেই বিদেশী শোষণের চেয়ে দেশী শোষণ ভিন্নতর। কলোনির সম্পদ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ স্ব-কেন্দ্রভূমিতে নিয়ে কেবল আত্মস্বার্থে প্রয়োগ করে স্বীয় উদর পূর্তিতে উৎসাহী হয়। আর শোষিত দেশ স্বীয় সকল সম্পদ নিঃশেষ করে দিতে দিতে রসকসহীন নারকেলের ছোবড়ার মতই পড়ে ধুকতে থাকে, যেমনটি ইংরেজ আমলে সারা ভারতের অবস্থা হয়েছিল এবং ইংলন্ডে হয়েছিল শিল্পবিপ্লব।

এ প্রসঙ্গে সঙ্গত কারণেই আরো প্রশ্ন জাগে, তাহলে দিল্লির সুলতানি বা মোগল আমলে বাংলাদেশকে কী বলা যাবে—স্বাধীন কি পরাধীন? প্রশ্নের উত্তরটি জটিল। পরাধীন শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণেই এর উত্তর পাওয়া সম্ভব। পরাধীন শব্দটি দ্যোতনা করে যেমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন সৃষ্টি করে একটি চেতনাবোধেরও। এ চেতনাবোধের উৎপত্তি অর্থনৈতিক অবস্থা থেকেই হয়, হয় বঞ্চনা ও প্রতারণা থেকেই। তবে যতদিন পর্যন্ত তা একটি জনসমষ্টির ভাবজগতে প্রবেশ না-করে ততদিন পর্যন্ত পরাধীন শব্দটি সেই জনসমষ্টির ওপর প্রযোজ্য হয় কি না, তাতে সন্দেহ জাগে। উপরন্তু অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকেই সে-চেতনাবোধ মূলত জাগ্রত হলেও ভাষা, ধর্ম, সামাজিক অবস্থা, রাজনীতি ইত্যাদি দ্বারাও তা হয় প্রভাবিত। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের কোন একটি অঞ্চলের জনসমষ্টি যদি মনে-না-করে যে তারা বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত থেকে পরাধীন হয়ে রয়েছে তাহলে সে-অঞ্চল বা জনসমষ্টিকে পরাধীন বলা ঠিক হবে কিনা

সন্দেহ। মানসিংহ যদি আকবরের অধীন থেকে মনে-না-করেন যে তিনি পরাধীন, তাহলে তাকে পরাধীন বলা সম্ভবত সঙ্গত নয়, অথচ রানা প্রতাপ তা-ই মনে করতেন বলেই তাঁর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি আত্মবিসর্জন পর্যন্ত দিয়েছেন। বাস্তব বিষয়টি কিন্তু দু'জনার ওপর একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত—তাদের ওপর আকবরের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। দু'জনই আবার দু'দিক থেকে উচ্চ-প্রশংসিত: মানসিংহ তার আনুগত্য, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদির জন্য এবং প্রতাপ তাঁর দেশপ্রেমিকতা, সাহসিকতা ইত্যাদির জন্য। এজন্যই দিল্লির সুলতানি বা বাদশাহি মোগল আমলে বাংলার সম্পদ সেখানে চলে গেলেও তখনকার এদেশের সামন্তদের ভেতর পরাধীনতার বোধটুকু (অন্তত বাংলার তথাকথিত বার-ভূঁইয়াদের সংগ্রামের পর) উদিত হয় নি বলে সেই সময়ের বাংলাকে পরাধীন-বাংলা বলা যাবে কিনা সন্দেহ। আর এভাবে যদি পরাধীনতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় তাহলে প্রতিটি স্থানইত কারো-না-কারো অথবা কোন-না-কোন দেশের অধীন—একটি পাড়া একটি গ্রামের, একটি গ্রাম একটি ইউনিয়নের, একটি ইউনিয়ন একটি থানার, একটি থানা একটি জেলার এবং একটি জেলা একটি দেশের। অনুরূপভাবে সেই স্থানে বসবাসরত মানুষও, এমনকি প্রতিটি মানুষও হয় একে অন্যের অধীন—পরিবারের অধীন ব্যক্তি-মানুষ, পরিবার সমাজের অধীন ইত্যাদি। পরাধীন শব্দটি তাই স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিশ্লেষণযোগ্য।

কথাগুলো আপাত-সরলীকরণের আওতাভুক্ত। এর দুর্বলতার দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। কারণ উল্লিখিত বক্তব্যের আলোকে যে-কোন প্রভু তার ভৃত্যের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য দাবি করতে পারে যদি-না এবং যতক্ষণ-না সেই ভৃত্য চেতনা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে যে, সে পরাধীন। বাস্তবে বিষয়টি ঠিক তাই ঘটে। প্রভুরা কখনো চায় না ভৃত্যরা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সচেতন মানুষ হয়ে উঠুক। আর তাই দেখা যায় ভৃত্যদের দাবিয়ে রাখার নানা কৌশল—কখনো আদর-স্নেহ, কখনো কঠোর শাসন। সত্যিকার স্বাধীনতা তাকেই বলা সম্ভব যখন সমান চেতনাবোধসম্পন্ন সমঅধিকারের ভিত্তিতে একদল মানুষ স্বেচ্ছায় একত্র বসবাসরত। এই চেতনা সামন্তযুগে সমাজের অভ্যন্তরের প্রতিটি মানুষের এসেছিল বলে মনে হয় না, হয়ত কখনো কখনো প্রচণ্ড নির্যাতনে কোন কোন অঞ্চলে বা কোন কোন মানুষের ভেতর এলেও আসতে পারে—এবং হয়ত এরাই করেছে সময়ে বিদ্রোহ বা বিপ্লব। বৃহত্তর গণমানুষের ভেতর এই সমঅধিকারের চেতনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যুগে। আর এ ব্যবস্থার সূত্রপাত এদেশে ঘটে এদেশী সামন্তযুগের অবসানে ইংরেজ শাসনের শুরুতে। মির জাফরের দ্বিতীয়বার নবাবির সময় থেকে বলা যায় বাংলায় দেশীয় সামন্তবর্গের যুগ শেষ হয়ে এদেশের ইতিহাস এক নতুনতর সামন্ত-বুর্জোয়া পদ্ধতির পথে মোড় নেয়। এ হিসেবে মির মুহম্মদ জাফর আলি খান ওরফে মির জাফরই বাংলাদেশে বখতিয়ারের শেষ উত্তরসুরি।

অপরিস্রুত সামন্তনেতা

বখতিয়ার থেকে মির জাফর পর্যন্ত সময়টুকু রাজনীতির দিক দিয়ে একান্তভাবেই সামন্ত-সেনানায়কদের কাহিনী। এ সময়ের ভেতর আগত শাসকবর্গের ক্ষমতায় অধিরোহণ ও

বিচ্যুতির জীবনালেখ্যসহ তাদের জীবনযাপন প্রণালীই তুলে ধরে কি প্রচণ্ড ইহলৌকিক বা ইহজাগতিক তাড়নায় তারা তাদের জীবনকে করেছে পরিচালিত।

আত্মঅহমিকা, আত্মম্ভরিতা, আত্মপ্রচারসর্বস্বতা, প্রদর্শনবাতিকতা, মিথ্যেবড়াই এসব সামন্তকে অনেক সময় ডন কীহোতি বা কুইকসোট-এর পর্যায়ে নিয়ে যেত। ক্ষুদ্র লখনৌতি রাজ্যের সুলতান আলি মর্দান খলজি নিজেকে সারা বিশ্বের অধীশ্বর কল্পনা করতেন। তিনি নাকি দরবারে বসে ইস্পাহান, খোরাসান, গজনি, ঘোর এলাকার জায়গির দান করতেন নানা জনকে। ইলতুতমিশ-পুত্র নাসিরউদ্দিন যখন লখনৌতি রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন তখন তাঁর উপাধি ছিল 'মালিক-উশ-শরফ' বা পূর্বাঞ্চলাধিপতি। জালালউদ্দিন মাসুদ জানিও এ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। অথচ পূর্ব অঞ্চলের কতটুকু স্থানের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন এঁরা! সুলতান কাইকাউস আরো কয়েক ডিগ্রি এগিয়ে গিয়েছিলেন। এক শিলালিপিতে তাঁর উপাধি এরূপ : 'আল-সুলতান আল-মুয়াজ্জম মালিক রিকাব-আল-উসম মওলা মুলুক আল-তুরক ওয়াল-আজম সাহিব আল-তাজ ওয়াল খাতিম রুকন্ আল-দুনিয়া ওয়াল-দীন কাইকাউস শাহ্ সুলতান বিন সুলতান ইয়মীন খলীফত আল্লাহ্ নাসির আমির আল-মামেনীন।' অর্থাৎ তিনি নিজেকে সুলতান-উস-সলাতিন বা রাজাধিরাজ বলেই ক্ষান্ত হননি, দাবি করেছেন 'মালিক রিকাব আল উসম মওলা মুলুক আল-তূরক ওয়াল আজম' অর্থাৎ জাতিসমূহের অধীশ্বর এবং তুর্কি ও পারস্যের রাজাধিরাজ বলে! কোথায় স্বাধীন তুরস্ক আর পারস্য আর কোথায় একফোঁটা লখনৌতি বা গৌড়! তাঁর গভর্নররাও কম যান না। বিহারের শাসক ইখতিয়ারউদ্দিন ফিরোজ ইতিগিন উপাধি নেন 'আল-খান আল-আজম খাকান খাকান আল-মুয়াজ্জম ইখতিয়ার আল-হক ওয়াল-দীন খান খান-আল-শয়ক ওয়াল-চিন সিকান্দর আল-সানী ফিরোজ ইতিগিন আল সুলতানি'। অর্থাৎ তিনি হলেন মহাখান, প্রাচ্যদেশ ও চীন দেশের খান এবং দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দর আর কাকে বলে! প্রফেসর আবদুল করিম এ প্রসঙ্গে *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল)-এ বলেছেন, 'এই সকল উচ্চ উপাধির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা নিরর্থক, কারণ লখনৌতির সুলতান কাইকাউসকে তুর্কী ও পারস্যের রাজাদের রাজা বা ফিরূজ ইতিগীন বা জাফর খান বাহরাম ইতিগীনকে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে তুলনা করার চিন্তা করাও বাতুলতা বই আর কিছুই নয়।'

জ্ঞানী বলে দাবিদার রুকনউদ্দিন বারবক শাহ্'র গর্বও কম ছিল না। তাঁর একটি প্রশস্তির অনুবাদ সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল* (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) বইয়ের ভাষায় এরূপ :

'শাহ্ সুলতান রুকনউদ-দুনিয়া ওয়াদ দীন

আমাদের সুলতান বারবক শাহ, জ্ঞানী এবং মহীয়ান

তাঁর পুত্র—যাঁর খ্যাতি দেশে দেশে বিস্তৃত হয়েছে—

সুলতান মাহমুদ শাহ, ন্যায়পরায়ণ এবং ভদ্র।

দুই ইরাকে কি এমন মহানহৃদয় সুলতান আছেন

বারবক শাহের মত? সিরিয়া এবং আল-ইয়েমেনেও কি আছেন?

না। বিধাতার সমগ্র রাজ্যে আর কেউই নেই

যিনি মহত্ত্বে তাঁর সমান। তাঁর সময়ে তিনি অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়।'

সমস্ত যুগেই জ্ঞানীরা বিনয়ী বলে সর্বজনশ্রদ্ধা লাভ করেন। বারবক জ্ঞানী হয়েও বোধহয় সামন্ত-ক্ষমতার দর্প ভুলতে পারেন নি! তাই আত্মপ্রচারণার কি ভয়াবহ প্রকাশ! আপনারে বড় বলে বড় সেই হয় কি? প্রশস্তি তো তাঁর তাবেদার লেখকদের দিয়েই রচিত তাঁরই জন্য।

উক্ত প্রশস্তির অন্য অংশের বক্তব্যেই প্রমাণিত হয় মূলত আত্মসুখ সন্ধানই ছিল তাঁর মত অন্য সকল সামন্তদেরও জীবন-দর্শন :

'তাঁর (বারবক শাহর) আবাস বাগানের মত শান্ত এবং আনন্দদায়ক,

তা আনন্দ সঞ্চার করে এবং দুঃখ বিদূরিত করে।

এর নীচ দিয়ে একটি জলধারা বয়ে যায়,

বেহশতের নির্ঝরের কথা মনে করিয়ে দিয়ে,

এর বুদ্বুদগুলি মুক্তোর মত, তারা ভুলিয়ে দেয় দারিদ্র্য ও বেদনা।

তার তোরণ আশ্রয় দান করে, আত্মাকে সুগন্ধ ঔষধির মত (অর্থাৎ

আত্মা সুগন্ধ ঔষধির সুবাস দান করার মত)

বন্ধুদের। শত্রুদের কাছে এ (প্রাসাদ) নিষিদ্ধ এবং সুদূর।

একটি অনির্বচনীয় তোরণ, তৃপ্তিদায়ক ও স্ফূর্তিজনক। যাকে বলা হয়

মধ্য তোরণ বিশেষ প্রবেশ পথ হিসেবে এটি নির্মিত।

আটশো একাত্তর সালে (হিজরিতে)।

জীবন, আশা এবং বিশ্রামের আবাস।'

পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট আরামদায়ক জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় থাকাই ছিল এসব সামন্তনেতৃবৃন্দের মুখ্য উদ্দেশ্য। বারবক শাহর আগে সুলতান জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহের সময় একদল চীনা দূত এসেছিলেন সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে। এঁদের ভেতর ফেই-শিন নামে একজন *শিং-ছা-শ্যং-লান* নামক গ্রন্থে তখনকার রাজপ্রাসাদ ও অভ্যর্থনার বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে :

'সুলতানের প্রাসাদ ইট ও সুরকির গাঁথুনিতে তৈরি। যে সিঁড়ি বেয়ে প্রাসাদে উঠতে হয় তা উঁচু আর চওড়া। হলঘরের ছাদ চারকোণা। এর ভেতরের দিক চুনকাম করা। প্রাসাদটিতে ন'টি মহল এবং তিনটি দরজা আছে। থামগুলো পিতল রঙের। পালিশ করা। গায়ে নানারকম ফুল এবং জীবজন্তুর ছবি খোদাই। ডানে এবং বায়ে টানা লম্বা অনেকগুলো বারান্দা। সেখানে হাজারেরও বেশি লোক জড়ো। তাদের পরনে চকচকে বর্ম। বাইরের আঙ্গিনায় সারি সারি সৈন্য দাঁড়িয়ে। তাদের মাথায় উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ। হাতে বর্শা তরবারি তীরধনুক ইত্যাদি শোভিত। তারা দৃপ্তবীরত্বের প্রতীক। সুলতানের ডানে এবং বাঁয়ে শত শত লোক। তাদের মাথায় ময়ূরের পালকে তৈরি ছাতা (সম্ভবত ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি বা পাখা)। হলঘরের সামনে কয়েকশ হস্তিরূঢ় সৈন্য। প্রধান দরবার

কক্ষে দামি পাথর-খচিত উঁচু এক সিংহাসনে পায়ের উপর পা রেখে সুলতান বসে। তাঁর কোলের ওপর দুমুখো একটি তলোয়ার।

ভেতরে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য দুটি লোক এল। তাদের হাতে রূপোর লাঠি। মাথায় পাগড়ি। আমরা পাঁচ কদম এগোলে তারা সেলাম করল। হলের মাঝখানে পৌছে তারা থামল। অন্য দুজন লোক এল। তাদের হাতে সোনার লাঠি। তারা আগের মতই সেলাম করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেল। সুলতান আমাদের প্রত্যাভিবাদন করে (আমাদের) সম্রাটের ফরমানাটি নিলেন এবং নিজের মাথায় সেটি ঠেকিয়ে খুলে পড়লেন। সম্রাটের উপহারগুলো গালিচার ওপর ছড়িয়ে রাখা হল।

সুলতান সম্রাট-প্রতিনিধিদের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন। আমাদের সৈনিকদের অনেক জিনিস উপহার দিলেন। ভোজে মেষ (খাসির?) মাংস ও গোমাংসের কাবাব দেওয়া হয়। মদ পান নিষিদ্ধ। এতে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হওয়ার ও শিষ্টাচার-বিধি লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা। এর বদলে তারা (অর্থাৎ চিন সম্রাটের প্রতিনিধিরা) গোলাপজল দেওয়া সরবত পান করেন। ভোজসভা শেষ হলে সুলতান (চিনা) সম্রাট-প্রতিনিধিদের সোনার বাটি, সোনার কটিবন্ধ, সোনার কুঁজো আর সোনার পেয়ালা উপহার দিলেন। প্রতিনিধিদের যারা সহকারী তারা সবাই ওরকম জিনিসই পেলেন। তবে সেগুলো রূপোর তৈরি। নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা প্রত্যেকে পেল একটি সোনার ঘণ্টা এবং এক ধরনের লম্বা সাদা রেশমি পোশাক। সৈন্যরা সবাই রূপোর টাকা পেল। সত্যি কথা বলতে কি, এদেশের লোকেরা যেমন ধনি তেমন সৌজন্য-পরায়ণ। এরপর সুলতান সোনার তৈরি একটি আধারে রক্ষিত এক স্মারকলিপি (চিন) সম্রাটকে দেওয়ার জন্য অর্পণ করলেন। স্মারকলিপিটি সোনার পাতের উপর লেখা। (চিনা) সম্রাট-প্রতিনিধিরা যথোচিত সম্মানের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে সম্রাটের উদ্দেশ্যে প্রেরিত আরো অনেক উপহার-সামগ্রী সমেত এই স্মারকলিপিটি গ্রহণ করলেন।'

উপরে ফেই-শিনের বর্ণনাতে সৌজন্য ভদ্রতা ধনসম্পদের প্রাচুর্যের কথা জানা যায়। বোঝা যায় কী ধরনের জীবন এ সামন্তপ্রভুরা যাপন করতেন।

এমন নানা বর্ণনার মধ্য দিয়ে শাসকদের সম্পর্কে যেসব খবর পাওয়া যায় তার সাথে ইসলামের সরল জীবনযাত্রার বিন্দুমাত্র মিল নেই। উপরন্তু ব্যভিচারিতা অশ্লীলতা নারীসঙ্গলিপ্সা খতিয়ান করলে যে চিত্র ফুটে ওঠে তাতে রীতিমত শিউরে উঠতে হয়। কত শত নারীর সাধারণ সুখী দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নসাধ এবং শান্ত নির্বিঘ্ন জীবন-যে নষ্ট করেছে এ সামন্তদের হারেম আর প্রাসাদ তার পূর্ণ তালিকা পরিসংখ্যানের অভাবে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে এক-আধটা উদাহরণ থেকেই তা অনুমান করা সম্ভব। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ্‌র উপপত্নীর সংখ্যা নাকি ছিল পনের শ। মুর্শিদকুলি বা আলিবর্দির মত এক পত্নীতে তুষ্ট সামন্ত পরিবার ছিল সে-যুগে একেবারেই ব্যতিক্রম।

অন্যদিকে রাজধর্মই-বা কতটুকু পালিত হত—সেই রাজধর্ম যার কথা ইনিয়ে বিনিয়ে চমৎকারভাবে নানা ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন সামন্তপুষ্ট লেখকগণ! প্রজাশাসন রাজার একটি কর্তব্য বলে সামন্ত যুগে এত করে বলা হয়েছে! প্রজাকে অন্যায় জুলুম

থেকে রক্ষা করাও নাকি রাজারই কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে! কিন্তু সেখানেও দেখা গেছে অনেক সময়ই চরম ব্যর্থতা। সামন্ত তোষণে পুষ্ট লেখকদের পক্ষে এসব লেখাও ছিল চরম অসুবিধাজনক। তাছাড়া সময়ের তোড়ে তা হারিয়েও গেছে হয়ত। তবু কিছু কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে বৈকি! সামসুদ্দিন তালিশ লিখেছেন, 'আকবরের সময় থেকে শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়কাল পর্যন্ত আরাকানের মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুরা বাংলা লুণ্ঠন করত। তারা হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ ছোট-বড় সকলকেই বন্দী ও হাতের পাতা ছিদ্র করে তার মধ্যে সরু বেত ঢুকিয়ে বাঁধত এবং একজনের ওপর আর একজনকে চাপিয়ে জাহাজের পাটাতনের নিচে ফেলে দিত। লোকে যেমন পাখিকে আহার দেয়, সেইরূপ তারা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় উপর থেকে বন্দীদের আহারের জন্য চাল ছড়িয়ে দিত। ...ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে এই দস্যু দলের যাতায়াতের নদীগুলোর উভয় পাশে একজন গেরস্তও নেই। তাদের যাতায়াতের পথে বাকলা অঞ্চল এবং বাংলার অন্যান্য অংশ পূর্বে শস্যশালী এবং গৃহস্থ-পল্লী দিয়ে পূর্ণ ছিল। প্রতি বছর এ প্রদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ সুপারির কর আদায় হয়ে রাজকোষ পূর্ণ হত। কিন্তু দস্যুর দল লুণ্ঠন ও নরনারী হরণ করে এ প্রদেশের অবস্থা এমন করে ফেলে যে সেখানে বসতবাটী বা একটি প্রদীপ জ্বালাবার লোকও নেই।'

সারা ভারতের বহুলাংশে যখন দোর্দণ্ড প্রতাপে মোগলরা রাজত্ব করছে তখনকারই চিত্র এই। অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র সামন্তরা তো ছিলই। তারাও ছিল এসব অন্যায় দমনে একান্তভাবে অক্ষম অথবা নিজেরাই করত শোষণ। খাজনা-কর ইত্যাদির মাধ্যমে শোষণতো ছিলই, আরো ছিল বিদেশীদের লুণ্ঠনেরও অবাধ অধিকার ও অন্যায় অত্যাচার। এসবের বিরুদ্ধেও সামন্তনেতৃবর্গ অনেক সময় একেবারেই ছিল অসহায় অথবা স্বীয় প্রজা-স্বার্থে যথেষ্ট উদাসীন। হলওয়েল মারাঠা বর্গিদের সম্বন্ধে বলেছেন, 'তারা ভীষণতম ধ্বংসলীলা ও ক্রূরতম হিংসাত্মক কাজে আনন্দ লাভ করত। তারা তুতগাছের বাগানে ঘোড়া চড়িয়ে রেশম উৎপাদন একেবারে বন্ধ করে দেয়। দেশের সর্বত্র বিভীষিকার ছায়া। গৃহস্থ, কৃষক ও তাঁতীরা সকলেই গৃহ ত্যাগ করে পালিয়েছে। আড়ঙগুলো পরিত্যক্ত, চাষের জমি অকর্ষিত........খাদ্যশস্য একেবারে অন্তর্হিত, ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে উৎপীড়নের চাপে।' গঙ্গারাম নামে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বর্গিদের ব্যাপারে যে বিবরণ দেন তাও উল্লেখ করা যায়, 'বর্গিরা হঠাৎএস গ্রাম ঘিরে ফেলে। তখন সকল শ্রেণীর মানুষ যে যা পারে অস্থাবর মালপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। বর্গিরা সবকিছু ফেলে দিয়ে কেবল সোনা রূপা কেড়ে নেয়। কারো হাত কেটে ফেলে, কারো কাটে কান, নাক, কাউকে করে একেবারে হত্যা। সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলেই টেনে নিয়ে যায়...তারপর বর্গিরা তার ওপর অকথ্য-পাপাচর করে পরিত্যাগ করে। লুণ্ঠন শেষে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। প্রদেশের সর্বত্র এরূপ বীভৎস লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালায়...তারা কেবল চিৎকার করে, টাকা দাও, টাকা দাও, টাকা দাও। টাকা না-পেলে তারা হতভাগ্য মানুষের নাকে পানি ঢুকিয়ে বা পুকুরে ডুবিয়ে হত্যা করে।' বর্ধমান-রাজের সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের অভিমতও অনুরূপ, 'শাহুরাজার

সৈন্যরা দয়ামায়াহীন। তারা গর্ভবতী নারী শিশু, ব্রাহ্মণ, দরিদ্র নির্বিশেষে হত্যা করে। ভয়াল তাদের মূর্তি, সব ধরনের লুণ্ঠন কাজে পটু এবং সব রকম পাপাচারে দক্ষ।'

কোন কোন শাসক (যেমন আলিবর্দি) স্বীয় রাজ্য রক্ষার জন্যই এদের দমন করতে চেষ্টা করেছেন, হয় যুদ্ধ করে, নয় চৌথ বা রাজস্বের একাংশ দিয়ে। কিন্তু বেশির ভাগ শাসক নিজেরাই এমন কত ধরনের অন্যায়-অত্যাচার-যে করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। বস্তুত সম্পদ-সম্পত্তি ভোগলিপ্সার চরম অভিব্যক্তি, নারী-লাঞ্ছনার করুণতম উদাহরণ, পিতৃঘাতক পুত্রের অথবা পুত্রকে সড়িয়ে পিতার বা পিতৃব্যের সম্পদ দখল, প্রভুহত্যাকারী ভৃত্যের অথবা বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়-বন্ধুর শূন্যস্থান পূরণ, পররাজ্য গ্রাসের মাধ্যমে অন্যের স্বাধীনতা হরণ বা নিজের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া, স্বসম্পদ রক্ষার্থে লড়াই, স্বস্বার্থ-স্বজন বা নেতার জন্য আত্মদান—এসব মূল্যবোধের এক জগখিচুড়িতে সামন্তবাদের স্তরবিন্যাস বিসর্পিল। ইসলাম ধর্মের সুমহান বাণীগুলো এ অবস্থায় পালিত হওয়ার সুযোগ কোথায়! আমির হচ্ছে কখনো ফকির, একদা-দাস হচ্ছে কখনো সুলতান, কখনো সুলতানের শির লুটাচ্ছে ধূলোয়, ধনী-শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সর্বস্বান্ত, শান্তিময় জীবনসংসার হচ্ছে একেবারেই বিপর্যস্ত, সদ্যোজাত শিশুটি শিকার হচ্ছে নৃশংসতার, কখনো কেউ মুখে যা বলছে কাজ করছে উল্টো, বিশ্বাসহন্তা হচ্ছে পুরস্কৃত আর সত্যবাদী তিরস্কৃত—এমন নানা বিপরীত ঘটনাপঞ্জি দেখে মানুষ হয়ে ওঠে ভাগ্যবাদী ও দৈববিশ্বাসী। এসমস্তকিছুর পেছনেই-যে থাকে একান্তই বস্তুতগত কার্যকারণ তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতেও হয়-না অনেক সময় সক্ষম। বরং ধর্মের প্রদত্ত নানা ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করে তারা খুঁজে ফিরে কিছুটা স্বস্তি আর তৃপ্তি।

বেহেশতি মেওয়ার আশায়

বখতিয়ারের বিজয়ের পর থেকে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী ভাবধারা এদেশে ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হতে থাকে। হিজরি সন প্রবর্তন করে, আরবি ভাষা চর্চার মাধ্যমে এবং আরবি-ফারসি-তুর্কি ধরনের পদবি প্রবর্তিত করে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ঐতিহ্য এদেশে হয় প্রোথিত। মুদ্রা জারি করা এবং খুতবা পাঠ ছিল সেকালের সুলতানদের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রধান নিদর্শন। স্বাধীন সুলতানগণসহ অন্যান্য শাসনকর্তাও মুদ্রায় যেসব উপাধি গ্রহণ করেছেন তাতে দেখা যায় ইসলামের খেদমতগার হিসেবে তাঁরা নিজেদের চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। সুলতান ইওজ খলজি মুদ্রায় নিজেকে 'সুলতান-উল-মুয়াজ্জম, সুলতান-উল-আজম, সুলতান-উস-সালাতিন' ছাড়াও নিজেকে 'নাসির আমির-উল-মোমেনিন বা কসিম আমির-উল-মোমেনিন' অর্থাৎ আমির উল-মোমেনিনের সাহায্যকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আমির-উল-মোমেনিন বলতে এখানে আব্বাসিয় খলিফাকে বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ সুলতান ইওজ তাঁর প্রতি অনুগত ছিলেন এবং ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী হিসেবে রাজত্ব করছেন। তুগরল তুগানের মত প্রাদেশিক শাসনকর্তা উপাধি নিয়ছেন 'গিয়াস-উল-ইসলাম ওয়াল মুসলেমিন' বা ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী।

মজার ব্যাপার, কোন কোন সুলতান আব্বাসিয় খলিফার মৃত্যুর পরও তাঁর নাম মুদ্রায় উৎকীর্ণ রাখেন, যেমন কাউকাউসের অনেক মুদ্রায় আব্বাসিয় খলিফার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পরেও খলিফা আল-মুস্তাসিম বিল্লাহর নাম উল্লেখ আছে। এর দ্বারা খলিফার মৃত্যু-ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা অস্বীকার করা যেমন বোঝাতে পারে, তেমন সশ্রদ্ধ পূর্ব-আনুগত্য প্রদর্শন করার রেওয়াজও বোঝাতে পারে। আরো লক্ষণীয় যে, ধর্মীয় ব্যাপারে সহনশীল ও উদারনীতির সমর্থক, হিন্দু-মুসলমানের সমান প্রিয় সুলতান সিকান্দার শাহ্ও মুদ্রায় নিজেকে 'আল মুজাহিদ-ফি-সাবিল উর-রহমান' বা আল্লার যোদ্ধা এবং 'ইমাম-উল-আজম' বা ইমাম-শ্রেষ্ঠ উপাধি গ্রহণ করে সকল মুসলমানের উপর নেতৃত্ব দাবি করেছেন।

সুলতানদের ইসলামের প্রতি এ ভক্তি ও এর নেতৃত্ব গ্রহণের ব্যাপারটা আরো এগিয়ে যায় জালালউদ্দিনের সময়। তিনি নিজেকে খলিফা হিসেবে দাবি করে 'খলিফতউল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ 'খলি-ফতউল্লাহ-বিন হুজ্জত ওয়াল বুরহান' অর্থাৎ দলিল ও সাক্ষ্য মতে আল্লাহর খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। ইউসুফ শাহ্র শিলালিপিতে 'জিল্লু আল্লাহ ফিল আলমিন' বা পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া এবং 'খলিফত আল্লাহ ফিল আরদিন' বা পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি উপাধি দুটি পাওয়া যায়। এসব দৃষ্টান্তে মনে হয় যেন স্বীকার করা হচ্ছে, বাংলাদেশেই খলিফার রাজত্ব কায়েম হয়েছে। বাগদাদে ১২৫৮ সালে খলিফার মৃত্যুর ঘটনাটা আর বোধকরি স্বীকার না করে পারা যাচ্ছিল না। এর দ্বারা এ দেশীয় সামন্তপ্রভুদের মহান একটা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীর দাবিদার বলেও জানান যাচ্ছিল। পরাক্রমশীল মহাবীর্যবান ধর্মীয় খলিফা বলেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছিল।

বাস্তবিকপক্ষেই, ওয়ালি-মুক্তা সুলতান-সুবাদারগণ এ ধরনের নৈর্ব্যক্তিক কার্যাদি ছাড়াও, মসজিদ তৈরি, মাদ্রাসা স্থাপন, খানকা-দরগা-লঙ্গরখানায় সাহায্য সুফি-পির-দরবেশদেরকে দান-পোষণ, কোন কোন শাসক স্বয়ং অথবা তার কর্মচারিবৃন্দ ইসলামী জ্ঞানচর্চা, ইসলামী ভাবধারা প্রচার এবং জনকল্যাণমূলক সেবাধর্মী কাজকর্ম করে সারা বাংলায় ইসলাম প্রচারে প্রভূত সাহায্য করেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালা-পার্বণে সুলতান-সামন্তরা সবসময়েই প্রাধান্য নেবার চেষ্টা করতেন। ঈমানসহ পাঁচটি ফরজ আদায়েও তৎপর থাকতেন।

জানা যায় যে, বখতিয়ার তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ স্থাপন করেছিলেন। ইওজ খলজিও মাদ্রাসা, মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারক আলেম সৈয়দ-সুফি-শেখদের ভরণ-পোষণের জন্য বৃত্তি ও জায়গিরের ব্যবস্থা করেন। ইসলাম প্রচারে শামসউদ্দিন ফিরোজ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন সাতগাঁও বিজয়ে শাহ সফিউদ্দিন এবং সিলেট বিজয়ে শাহ জালালকে সাহায্য করে। মুগিসউদ্দিন তুগরল শেখদের প্রতি এত অনুগত ছিলেন যে, কাদেরিয়া সিলসিলাদের তিন মণ স্বর্ণ দিয়েছিলেন বলে কথিত। ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ ফকির ও উলেমাদের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা বিনা পয়সায় নদী

পারাপার হতে পারতেন। খাওয়াপরার সংস্থান রাষ্ট্র থেকে হত। কোন শহরে গেলে আধা দিনার দিয়ে অভ্যর্থিত হতেন। ইলিয়াস শাহও সুফি ও দরবেশদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। শেখ আলাউল হকের সম্মানে তিনি একটি মসজিদ তৈরি করেন। সৈয়দ রিজা বিয়াবনীর প্রতি তিনি এত অনুরক্ত ছিলেন যে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তিনি জীবনের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও তাঁর দাফনে শরিক হন। সিকন্দার শাহ'র তৈরি আদিনা মসজিদ তো বিখ্যাত। আজম শাহ নূর কুতুবকে প্রায়ই উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন। এছাড়া তিনি মক্কা মদীনায় পর্যন্ত মাদ্রাসা, সরাইখানা ও আরাফাতে খাল খননের জন্য অর্থ পাঠান। ঐ দু শহরের অধিবাসীদের মধ্যে বিলি করার জন্যও বহু অর্থ তিনি প্রেরণ করেন। জালালউদ্দিনও মক্কায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং সেখানকার জনগণের জন্য উপহার পাঠান। বারবক শাহ নিজেই ছিলেন ইসলামী শাস্ত্রে পণ্ডিত। তাঁর 'আল-কামিল আল-ফাজিল' উপাধিই সেই প্রমাণ। ইউসুফ শাহ বেশ কয়েকটি মসজিদ তৈরি করেন। গৌড়ের কদমরসুল মূলে তাঁরই তৈরি। এছাড়া দরাসবাড়ি মসজিদ ও তাঁতীপাড়া মসজিদ তাঁর স্থাপিত। লোটন মসজিদ অনেকে তাঁর তৈরি বলে মনে করেন। হোসেন শাহ মালদহে এক বিরাট মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। নূর-কুতুব-ই-আলম-এর দরগায় তিনি বহু অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন এবং একটি মসজিদ তৈরি করান। নুসরত শাহ্র সময়ে তৈরি বড় সোনা মসজিদ বিখ্যাত। সোলায়মান কররানি শেখ ও উলেমাদের সঙ্গ পছন্দ করতেন। তাঁদের সাথে ধর্ম ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহ পেতেন। সুবাদার শাহজাদা আজম ঢাকায় লালবাগের শাহি মসজিদ নির্মাণ করান। সুবাদার মুর্শিদকুলি কোরান শরীফ পাঠ ও অন্যান্য এবাদতের জন্য দু'হাজার ক্বারী নিযুক্ত করেছিলেন। আলিবর্দি জ্ঞানী-গুণীদের দরবারে আমন্ত্রণ করে আলাপআলোচনা করতেন। মোটা অঙ্কের ভাতা দিতেন।

সর্বোচ্চস্তরের শাসকবর্গ ছাড়াও রাজকর্মচারী, জমিদার ও সমাজের সচ্ছল বিত্তবান ব্যক্তিবর্গও মক্তব মাদ্রাসা খানকাহ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাইকাউসের সময় কাজী আল নাসির মুহম্মদ ত্রিবেণীতে ১২৯৬তেই একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। শামস্উদ্দিন ফিরোজ-এর সময় জাফর খান ১৩১৩তে দার-উল-খয়রাত নামে আর একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। লোকস্মৃতিতে কালে তিনি স্বয়ংই দরবেশে পরিণত হয়ে যান। হোসেন শাহর সময় ওয়ালি মুহম্মদ বিখ্যাত ছোট সোনা মসজিদ তৈরি করেন। বীরভূমের নবাব আসাদউল্লাহ খান তাঁর জমিদারি-আয়ের অর্ধেকটাই জ্ঞানী-গুণীদের ভাতা ও অন্যান্য দাতব্য কাজে ব্যয় করতেন।

সামন্তচক্রের এভাবে একদিকে ধর্মের ললিতবাণীর অনুসরণে নানা কাজকর্ম সাধন এবং অন্যদিকে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ অস্বীকার করে ইহজাগতিক ক্ষমতা-বিত্ত-বৈভব ও প্রতিপত্তির জন্য নৃশংসতম কাজে প্রবৃত্ত হওয়াটা যেন আপাতদৃষ্টিতে কেমন একটা বৈপরীত্য বলে মনে হয়। ব্যতিক্রম বাদ দিলে, যে কাণ্ড-কীর্তি এসব ধন-সম্পদ সঞ্চয় এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনে করতে হয় তা কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েই নীতিবান সচেতন মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। জঘন্যভাবে আহৃত সম্পদের সবটুকুই মসজিদ-

মাদ্রাসা-খানকা স্থাপনে ব্যয় করে দিলেই-যে সব পাপ স্খলন হয়ে সোয়াব হাসিল হয় তাও মনে হয় না। তবুও সমাজে সৎ ও ধর্মীয় কাজ বলে কথিত নানা কর্মের মাধ্যমেই সেই অসঙ্গতিটুকু ঢেকে মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করা হত। আজও হয়।

আবার, জীবনের নানা পতন-উত্থান-বন্ধুর-অভ্যুদয়ের অমসৃণ পথ মানুষের মনে যে অস্থিতিশীলতা এবং ঘটনার ওপর প্রভাব বিস্তারের অক্ষমতায় যে-মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই তাকে করে তোলে অদৃশ্যশক্তিতে বিশ্বাসী। সামন্তচক্রের আবর্তে পড়ে সকল মানুষই সামাজিক এক অনির্ধারিত প্রেক্ষাপটে অবস্থান করে। সামনে উপরে নিচে সবখানেই এই চক্রাবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে জনসাধারণও সামন্তমূল্যবোধেই আক্রান্ত হয়ে তাদেরই অনুরূপ কর্মকাণ্ডে হয় লিপ্ত। যখন তারা দেখে দুরাচার-দুর্বৃত্তের হাজার গুনাহ করে কিছুই হচ্ছে না, তখন কেমন এক অন্ধ নিয়তি ও ভাগ্যের ওপর সে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। আবার প্রচণ্ড শক্তিশালী শাসকের দেহটিও যখন ঘাতকের খঞ্জরে ভূলুণ্ঠিত হয়ে গড়াগড়ি যায় ধুলোতে-মাটিতে তখন অমোঘ সেই নিয়তির প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে অনেক মানুষ। কার্যকারণ খোঁজার চেষ্টা করে ধর্মীয় চিন্তাধারায়। ধর্ম হয়ে ওঠে বঞ্চিত, ব্যথিত ও দুঃখীর আশ্রয়স্থল।

ধর্মনেতাদের কর্ম

সময়ের এ প্রেক্ষাপটে ইসলাম ধর্মের বাণী সেকালে বেশকিছুটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। এ সাড়া জাগিয়ে তোলেন বাগদাদ, খোরাসান, মক্কা, ইয়ামেন, দিল্লি, মুলতান-এর মত দূর-দূরান্ত থেকে বহু সাধক বাংলায় এসে বসতি স্থাপন ও ধর্ম প্রচার করে। উপরে শাসকগণ ইসলামধর্মী হওয়ায় এ প্রচার সুবিধেজনক হয়ে যায়। দেশীয় আলেম-উলেমারাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। দেশী-বিদেশী এ সুফি-পির-দরবেশগণও মুসলিম ক্ষমতা বিস্তারে সাহায্য, শাসকশ্রেণীকে নানাভাবে প্রভাবিত, ধর্মীয় শিক্ষায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ এবং সমাজে স্বীয় উজ্জ্বল চরিত্র প্রদর্শন ও প্রচারমূলক কাজকর্ম করে ইসলাম প্রচারে হন খুবই সহায়ক।

পাণ্ডুয়াতে সমাধিস্থ শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজি ১২১৩ খ্রীস্টাব্দেই লখনৌতি পৌঁছেন এবং ১২২৫ (মতান্তরে ১২৪৪)-এর তিরোভাবের পূর্ব পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম ও সুফিতত্ত্ব প্রচার করেন। মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় ইসলাম প্রচারের পেছনে শেখ জালালউদ্দিন ও তাঁর মুরিদগণের অবদান অপরিসীম। তাঁর নামানুযায়ীই দেওতলা'র নাম হয়ে যায় তাবরিজাবাদ। শেখ শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামা সম্ভবত ১২৭৮-এর মধ্যেই ঢাকা'র সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হন এবং ১৩০০তে এখানেই সমাধিস্থ হন। তাঁর শিষ্য শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরি ১২৯৩-তে জন্মভূমি বিহার-এর মানের-এ ফিরে গিয়ে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁর সমসাময়িক পির বদরউদ্দিন বদর-ই-আলম চট্টগ্রামে বহুদিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি ১৪৪০-এ বিহার শরীফ-এ ইন্তেকাল করেন। চট্টগ্রামের বিখ্যাত 'পির বদর' অবশ্য বদরউদ্দিন থেকে ভিন্ন ব্যক্তি বলে

অনেকে অনুমান করেন। ৩১৩ জন অনুচরসহ আগত ও সিলেটে সমাধিস্থ শাহ জালাল ১৩০৩-এ সিলেট বিজয়ের পর উক্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ১৩৪৭-এ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হুগলির ছোট পাণ্ডুয়ায় সমাধিস্থ শাহ সফিউদ্দিন, লখনৌতির শেখ আখি সিরাজউদ্দিন (মৃত্যু ১৩৫৭-তে), পাণ্ডুয়ায় সমাধিস্থ শেখ আলাউল হক (মৃত্যু ১৩৯৮-তে) এবং তাঁর পুত্র নূর কুতুব-উল-আলম (আনুমানিক মৃত্যু ১৪৪৭-এ) ইসলাম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য শেখ আখি সিরাজ ছিলেন বাংলা-জাত। লখনৌতিতে তিনি একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। বাংলায় চিশ্‌তিয়া সিলসিলার প্রবর্তক তিনি। আলাউল হক পাণ্ডুয়া এবং সোনারগাঁয় খানকা এবং লঙ্গরখানা খুলেছিলেন। তাঁর নাম অনুযায়ী আলাই তরিকা'র সৃষ্টি। এ তরিকা খালিদিয়া নামেও পরিচিত। তিনি বিখ্যাত সেনাপতি খালিদ-বিন ওয়ালিদ-এর বংশধর বলে কথিত। নূর কুতব-এর নামানুযায়ী নূরী তরিকা'র আবির্ভাব। শেখ হোসেন জুখরপোস (অর্থ ধূলিধুসরিত) ছিলেন আলাউলের মুরিদ। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন হোসাইনী তরিকা।

বায়েজিদ বিস্তাম (মৃত্যু ৮৭৪ খ্রীস্টাব্দ) সাত্তারিয়া সিলসিলা'র প্রতিষ্ঠাতা। শেখ আবদুল্লাহ তা ভারতে প্রচার করেন। বায়েজিদ বোস্তামি বাংলাদেশে এসেছিলেন বলে কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁর নামে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ নামক স্থানে একটি মাজার আছে। শেখ ফরিদ বা শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জ-ই-শকর (মৃত্যু ১২৬৯)-ও বাংলায় এসেছিলেন বলে কথিত। তাঁর নামেও চট্টগ্রামে একটি নহর আছে। নাম চশম শেখ ফরিদ। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা তাঁরই নামে নামকরণ হয়েছে বলে কথিত। ফকরউদ্দিন মোবারক শাহ'র সময়ের কত্তল খান গাজি'র নামও চট্টগ্রাম বিজয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সাধক হিসেবেও তিনি বিখ্যাত।

খুলনার বাগেরহাটে সমাধিস্থ খান জাহান আলি ছিলেন সাধক ও যোদ্ধা। যশোর-খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাঁর তিরোধানের পর তাঁরই হাতে ব্রাহ্মণ থেকে ধর্মান্তরিত ভক্ত শিষ্য মুহম্মদ তাহির বা পির আলি ১৪৫৮-৫৯তে তাঁর সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। এমন আর একজন সাধক-যোদ্ধা ছিলেন শাহ ইসমাইল গাজি। ১৪৪৭-এ বারবক শাহর আদেশে তাঁকে হত্যা করা হয়। শাহ মোয়াজ্জম দানিশমন্দ বা শাহদৌলা পির নুসরত শাহ'র রাজত্বকালে রাজশাহি'র বাঘা নামক স্থানে আস্তানা গেড়েছিলেন। তাঁর এখানকার খানকা ও মাদ্রাসা উনিশ শতকের শেষ ভাগ অবধি উন্নত ফারসি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাহ আলি বোগদাদি ১৫৭৭-এ ঢাকার মিরপুর বসতি স্থাপন করেন। এখানে তাঁর মাজার রয়েছে।

বাংলাদেশে আগত অথবা জাত খ্যাতনামা ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল।

প্রচারকদের নাম	খ্রীস্টাব্দ	জন্মস্থান	মাজার/প্রচারস্থান
বায়েজিদ বিস্তামি	মৃত্যু ৮৭৪	ইরান	চট্টগ্রাম এসেছিলেন?

শাহ মুহম্মদ সুলতান রুমি	এগার?	রুম, তুরস্ক	মদনপুর, নেত্রকোণা
শাহ সুলতান বলখি মাহিসওয়ার	এগার-বার?	বল্খ	মহাস্থানগড়, বগুড়া
বাবা আদম শহীদ	বার?	অজানা	রামপাল, মুন্সিগঞ্জ
মখদুম শাহদৌলা শহীদ	তের	ইয়ামেন	শাহাজাদপুর, পাবনা
জালালুদ্দিন তাবরিজি	মত্যু ১২২৫?	তাবরিজ, ইরান	দেওতলা, পাণ্ডুয়া, মালদহ
শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকন	তের?	অজানা	পুরানা পল্টন, ঢাকা
মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবি	তের	"	মঙ্গলকোট, বর্ধমান
শাহ মখদুম রূপোশ	তের?	"	দরগাপাড়া, রাজশাহি
শেখ ফরিদউদ্দিন শক্করগঞ্জ	"	"	চট্টগ্রামে এসেছিলেন?
শাহ তুর্কান শহীদ	অজানা	"	শেরপুর, বগুড়া
মওলানা তকিউদ্দিন আরাবি	তের?	আরব	মাহিসন্তোষ, রাজশাহি
শেখ শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামা	মৃত্যু ১৩৩০	বোখারা	সোনারগাঁও, ঢাকা
শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরি	জন্ম ১২৬৩	মানের, বিহার	সোনারগাঁও ও বিহার
শেখ আবদুল্লাহ কিরমানি	তের?	কিরমান, ইরান	খুস্তিগিরি, বীরভূম
আমির খান লোহানি	"	আফগানিস্তান	ইন্দাস, গড়গপুর, মেদিনীপুর
শাহ সুফি শহীদ	তের	অজানা	পাণ্ডুয়া, হুগলি
জাফর খাঁ গাজি	মৃত্যু ১৩১৩	"	ত্রিবেনী, হুগলি
পির-বদরউদ্দিন	তের-চোদ্দ?	"	হেমতাবাদ, দিনাজপুর
সৈয়দ আব্বাস আলি মক্কি	১২৬৫-১৩২৫	মক্কা	বসিরহাট, চব্বিশ পরগনা
রওশন আরা (ঐ বোন)	জন্ম ১২৭৯	"	তারাগুনিয়া, চব্বিশ পরগনা
শাহ বদরউদ্দিন আল্লামা	তের-চোদ্দ	অজানা	বকশি বাজার, চট্টগ্রাম
কত্তল পির	অজানা	"	কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম
শাহ জালাল মুজাররাদ	মৃত্যু ১৩৪৭?	কুনিয়া, তুরস্ক	সিলেট শহর
শাহ কামাল	চোদ্দ?	অজানা	গাড়ো অঞ্চল, ময়মনসিংহ
শাহ কামাল	"	"	সুনামগঞ্জ
সৈয়দ আহমদ কল্লা শহীদ	"	"	খড়মপুর, আখাউড়া
শরিফ শাহ	চোদ্দ	"	ঘুটিয়ার শরিফ, কলকাতা
বড়খান গাজি	চোদ্দ?	"	ত্রিবেনী, হুগলি
সৈয়দ নাসিরুদ্দিন শাহ নেকমরদান	চোদ্দ	"	দিনাজপুর
সৈয়দ রিজা বিয়াবনী	"	"	গৌড়
মওলানা আতা	"	"	দেবীকোট, দিনাজপুর
শেখ আখি সিরাজউদ্দিন	মৃত্যু ১৩৫৭	পাণ্ডুয়া	গৌড়-পাণ্ডুয়া
শাহ মালেক ইয়ামনি	চোদ্দ	ইয়ামেন	ওসমানি উদ্যান, ঢাকা
শাহ বলখি	"	বলখ	ঐ

সৈয়দ হাফেজ মওলানা আহমদ তন্নুরি (সৈয়দ মিরান শাহ)	”	অজানা	কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী
শেখ বখতিয়ার মাইসুর	”	অজানা	রোহিনী, সন্দ্বীপ
মখদুম শাহ জালাউদ্দিন জাহা গাশতবুখারি	১৩০৭-৮৩	বুখারা	মাহিগঞ্জ, রংপুর
রাস্তি শাহ	চোদ্দ	অজানা	শ্রীপুর, কুমিল্লা
শাহ মুহম্মদ বাগদাদি	”	বাগদাদ	শাহতলি, কুমিল্লা
শাহ সৈয়দুল আরেফিন	”	অজানা	কালিশুড়ি, বাউফল পটুয়াখালী
শাহ লঙ্গর	”	বাগদাদ?	মোয়াজ্জেমপুর, রূপগঞ্জ, ঢাকা
শাহ মুহসিন আউলিয়া	মৃত্যু ১৩৯৭	অজানা	বটতলি, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম
শেখ আলাউদ্দিন আলাউল হক	১৩০১ ?	”	পাণ্ডুয়া
শাহ নূর কুতবুল আলম	মৃত্যু ১৪৪৭	”	”
শেখ আনোয়ার শহীদ	মৃত্যু ১৪১৮	”	”
শেখ জাহিদ	মৃত্যু ১৪৪৫	”	”
শেখ জয়নুদ্দিন বাগদাদি	”	বাগদাদ	দিনাজপুর
মির সৈয়দ আশরাফ জাহাগির সিমনানি	চোদ্দ-পনের	মধ্য এশিয়া	পাণ্ডুয়া ও জৌনপুর
শেখ হোসেন জুখরপোস	”	অজানা	পূর্ণিয়া
শেখ বদরুল ইসলাম শহীদ	”	”	গৌড়
বদরউদ্দিন বদরে আলম জাহিদি	মৃত্যু ১৪৪০	মিরাঠাবাদ ভারত	চট্টগ্রাম ও বর্ধমান
খান জাহান আলি	মৃত্যু ১৪৫৮	অজানা	বাগেরহাট
খালাস খান	পনের	”	বেদকাশী, সুন্দরবন
মওলানা বরখুরদার	”	”	গৌড়
শাহ শরিফ জিন্দানি	”	”	নওগাঁ, তড়াশ, পাবনা
শাহ মজলিস	”	”	কালনা, বর্ধমান
বাবা আদম	”	”	আদমদিঘি, বগুড়া
শাহ মান্নাহ		”	মগরাপাড়া, সোনারগাঁও
শাহ ইসমাইল গাজি	মৃত্যু ১৪৭৪	মক্কা	কাটাদুয়ার, পিরগঞ্জ, রংপুর
শাহ জালাল দক্ষিণী	মৃত্যু ১৪৭৬	গুজরাট	ঢাকা, বঙ্গভবন
শেখ হুসামউদ্দিন মানিকপুরী	মৃত্যু ১৪৭৭	মানিকপুর, পূর্ণিয়া	উত্তরবঙ্গ ও বিহার
শাহ সুলতান আনসারি	পনের-ষোল	মদিনা	মঙ্গলকোট, বর্ধমান
শাহ আবদুল্লাহ গুজরাটি	পনের-ষোল	গুজরাট	ঐ
গাজি শেখ মুহম্মদ বাবাদুর	পনের	কাবুল	সিরাজগঞ্জ
শাহ আলি বাগদাদি	মৃত্যু ১৪৮০?	বাগদাদ	মিরপুর, ঢাকা

শাহ চাঁদ আউলিয়া	পনের	অজানা	পটিয়া, চট্টগ্রাম
হাজি বাহরাম সাকা	পনের-ষোল	তুর্কিস্থান	বর্ধমানশহর
হাজি বাবা সালেহ	মৃত্যু ১৫০৬	অজানা	ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ
মখদুম শাহ জহিরউদ্দিন	ষোল	"	মখদুম নগর, বীরভূম
মুবারক গাজি	"	"	বাশড়া, চব্বিশ পরগনা
একদিল শাহ	"	"	বারাসত, চব্বিশ পরগনা
শাহ আফজাল মাহমুদ	"	"	সিরাজগঞ্জ
শাহ মুয়াজ্জম দানিশমন্দ	"	বাগদাদ	বাঘা, রাজশাহি
শেখ জালাল হালবি	১৪৬২-১৫৩৭	আলেপ্পো	হাটহাজারি, চট্টগ্রাম
শাহ আদম কাশ্মিরি	ষোল	কাশ্মীর	আটিয়া, টাঙ্গাইল
শাহ জামাল	"	"	কাগমারি, টাঙ্গাইল
শাহ জামাল	"	ইয়ামেন	জামালপুর
খাজা চিশতি বেহেশতি (খাজা শরফুদ্দিন)	মৃত্যু ১৫৮৯	অজানা	সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা
শাহ পির	মৃত্যু ১৬৩২	"	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
শাহ নিয়ামতউল্লাহ	মৃত্যু ১৬৬৪	কনাউল, দিল্লি	গৌড়
কাজী মুয়াক্কিল	সতের-আঠার	অজানা	মিরেশ্বরাই, চট্টগ্রাম
খাজা আনোয়ার শাহ শহীদ	মৃত্যু ১৭১৫	"	বর্ধমান
সৈয়দ আবদুল খালেক বুখারি	সতের-আঠার	"	ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
শাহ আবদুর রহিম শহীদ	১৬৬৩-১৭৪৫	কাশ্মীর .	লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

উপরে প্রদত্ত পঁচাশি জন সাধক প্রচারক ছাড়া আরো অনেকের নাম স্থানাভাবে এবং অজ্ঞাত থাকার দরুণ দেওয়া সম্ভব হল না। এঁদের কেউ কেউ উপরোক্ত কোন কোন প্রচারকের সাথে এসেছিলেন (যেমন সিলেটের শাহজালালের সাথে ৩৬০ জন সঙ্গী ছিলেন বলে কথিত), তবে হয়ত আলাদাভাবেও কেউ কেউ এসেছিলেন। সকলের নাম ও জন্মস্থান বা প্রচার স্থান অথবা মাজার সঠিকভাবে জানা সম্ভব না হলেও, দরগাহ ও মাজার-এর অবস্থান থেকে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, পূর্বে সিলেট-চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমে বর্ধমানের মঙ্গলকোট এবং দক্ষিণে বাগেরহাট ও ছোট পাণ্ডুয়া থেকে উত্তরে দিনাজপুর জেলার কাঁটাদুয়ার পর্যন্ত সুবিশাল এলাকা ছিল তাঁদের কর্মক্ষেত্র। তাঁদের অনেকেই ছিলেন অধ্যাত্মবাদী কবি-গবেষক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। আবু তাওয়ামা'র সুফি মরমিবাদের ওপর রচিত *মকামত* মনশীলতায় ও জ্ঞানরসে পরিপূর্ণ। ফিকাহ শাস্ত্রের খ্যাতনামা গ্রন্থ *নাম-ই-হক*ও সম্ভবত তাঁরই রচিত। সুবিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান শরফুদ্দিন মানেরি *ফাওয়ায়িদ-ই-রুকনি, তাজীব* ইত্যাদি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। নূর কুতব রচিত *মকতুবাত, আলিম আল খুরবা*'র ভেতর পাওয়া যায় তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতি। এ আলেম-ওলেমাদের সুনাম ও জ্ঞান-দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে কতজনকে-যে ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাঁরা ছিলেন বহির্বিশ্বের সাথে সংযোগরক্ষাকারী। ধর্মীয় শিক্ষার নতুন নতুন কেন্দ্র খুলেছিলেন তাঁরা আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য। আবু তাওয়ামা প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁও-এর মাদ্রাসা ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানের পাদপীঠ। নূর-কুতব-এর মাদ্রাসার খ্যাতির জন্য হোসেন শাহ পর্যন্ত সাহায্য করতেন। হজরত হামিদ

দানিশমন্দ বা হাওয়া মিয়ার বাঘাস্থ খানকাও ছিল দেশজুড়ে বিখ্যাত। মাহীসন্তোষে তকিউদ্দিন আরবি প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

বিহার শরীফ, সাতগাঁও, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও, সিলেট-এর মত প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলো ছিল এসব সুফি-পির-দরবেশের আস্তানা। কিন্তু তাঁদের কর্মকাণ্ড কেবল খানকাহ বা মাজারের চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ না-থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করত। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত লঙ্গরখানা, যেমন পাণ্ডুয়ার জালাউদ্দিন তাবরিজির, সোনারগাঁও এবং পাণ্ডুয়ায় আলাউল হক-এর এবং লখনৌতির শেখ আখি সিরাজ-এর লঙ্গরখানা ছিল গৃহহীন ও বুভুক্ষুর আশ্রয়স্থল। জনকল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন এ সাধু-দরবেশরাই করেন। খানকাগুলোতে যেমন অধ্যাত্মতত্ত্বান্বেষীরা আত্মিক শান্তি লাভ করতেন, তেমন সেগুলো আর্ত-পীড়িতজনের সেবা-সদনরূপেও ব্যবহৃত হত। এগুলো ছিল দুঃস্থদের হাসপাতাল, বৃদ্ধ-অক্ষম ও রোগীর আশ্রয়স্থল এবং গৃহহীন গরিবের সান্ত্বনা। সাধারণ মানুষের সাথে এসবের মাধ্যমে হত নাড়ীর যোগ। জরা, দুঃখ ও বিপদের দিনে পির-দরবেশগণ আসতেন এগিয়ে। তাঁরাই হতেন ডাক্তার-বৈদ্য-জ্যোতিষী-ভবিষ্যদ্বক্তা ও রক্ষক। জনগণের ভাষায় তাঁরা উপদেশ দিতেন। আলোচনা করতেন। ধর্মতত্ত্বের কথা বলতেন।

এসব সুফি-পির দরবেশের সৎ ও সহজ জীবনযাত্রা, মধুর মিষ্টি ব্যবহার, সত্যবাদিতা, বদান্যতা, প্রচারভঙ্গি ও উন্নতস্তরের আলোচনায় আকৃষ্ট হয়ে এ-দেশের বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। অতি সাধারণ কাজে যেমন তাঁরা অনাগ্রহী ছিলেন না, তেমন ছিলেন তাঁদের অনেকেই উদার ও সহিষ্ণু। শরীয়ত নির্দেশমত আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে অধ্যাত্মিকতার মূল্য ছিল তাঁদের কাছে বেশি। খোদা-প্রেমই ছিল মুখ্য। তাই তাঁরা স্থানীয় পুরাতন আচার-আচরণ সম্বন্ধে গোঁড়া ওলেমাদের তুলনায় সহনশীল মনোভাব পোষণ করতেন। কোন কোন সুফি-সাধকের মাজার, যেমন শাহ সুলতান মাহিসওয়ারের মাজার, পুরাতন তীর্থক্ষেত্রের পাশেই তৈরি হয়েছিল। এতে যেমন বোঝা যায় দেশীয় জনসাধারণের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, তেমন সুফিদেরও উদারতা। ধর্মাচরণের এ ঔদার্য এবং নবদীক্ষিত হিন্দু-বৌদ্ধদের প্রতি স্নেহজাত মনোভঙ্গি ইসলাম ধর্মের উদার দিকটি প্রস্ফুটিত করে স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলামের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে ধর্মান্তরিত হতে প্রচুর সাহায্য করে।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন স্থাপন, এদেশের আবহাওয়া, নৈসর্গিক দৃশ্য, সহজলভ্য জীবনযাত্রা, সাধারণ মানুষের সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন প্রণালী এবং পরমতসহিষ্ণুতা বহু সুফি-পির দরবেশকে আকৃষ্ট করেছিল। খ্যাতনামা সুফি মির সৈয়দ আশরাফ জাহাগির সিমনানি জৌনপুর-এর সুলতান ইবরাহিম শরকিকে লিখেছিলেন, 'শোকর আল্লাহ! কি সুন্দর এই বাংলাদেশ যেখানে অসংখ্য পির-দরবেশ নানা স্থান থেকে এসে আবাস স্থাপন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেবগাঁওতে শেখশ্রেষ্ঠ হজরত শেখ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দির সত্তরজন নেতৃস্থানীয় মুরিদ চিরনিদ্রায় শায়িত। মাহিসুম

(মাহিসন্তোষ)-এ রয়েছেন সোহরাওয়ার্দি তরিকার বহু দরবেশ। একইভাবে দেওতলায় আছেন জালালিয়া তরিকার দরবেশগণ। নারকোটি'তে পাওয়া যায় শেখ আহমদ দামেস্কির সহচরদের। কাদেরিয়া তরিকার বারোজনের একজন হজরত শেখ শরফউদ্দিন তাওয়ামা, যাঁর প্রধান মুরিদ হলেন হজরত শেখ শরফউদ্দিন মানেরি, আছেন সোনারগাঁয়। আরো আছেন হজরত বড় আদম ও বদর আলম জাহিদ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাংলাদেশে বড় শহরের তো কথাই নেই, এমন ছোট শহর বা গ্রামও পাওয়া যাবে না যেখানে দরবেশরা এসে বসতি স্থাপন করেন নি।'

লক্ষণীয় যে, যেখানে সারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে এসব সাধু-সন্তদের শত শত কবর-দরগা-মাজার হাজারো মানুষের হৃদয়-উজার-করা শ্রদ্ধার্ঘ্যে আপ্লুত জিয়ারত-ওরস-মহফিলের মাঝে, সেখানে বলতে গেলে বিন্দুবৎও দেখা যায় না শাসককুলের অস্তিত্বের এ ধরনের সম্মানিত কোন স্মারক বা চিহ্ন। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রে মাত্র একজন সুলতানের কবর আছে বলে জানা যায়—সোনারগাঁ'য় সুলতান আজম শাহ-র (নাকি সিকান্দর শাহ'র?)। আরো কত কত শাসক-সামন্তনেতা কোথায় যে হারিয়ে গেছে তা আজ আর জানার উপায় নেই, কেবল ইতিহাসে লিখিত বিশেষ কোন ব্যক্তি ছাড়া। সকল বিত্ত-বৈভব ক্ষমতা-প্রতিপত্তি নিয়েও শাসকরা কোন স্থায়ী আসন জনগণের হৃদয়ে তেমনভাবে গড়তে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। মাত্র গুটিকয় জনপ্রিয় শাসকের অবস্থান গণমানুষের হৃদয়ে হয়ত হয়েছিল। আজম শাহকে নিয়ে নানা কিংবদন্তি, বাকর খানকে নিয় বাকরখানি'র উদ্ভব ইত্যাদি হল এ ধরনের স্মারক। এছাড়া রয়েছে হয়তবা কারো কারো কোন স্থাপত্য কীর্তি। কিন্তু এত এত সামন্ত বা শাসকের ভেতর এ ধরনের নাম বা কীর্তি কয়টিই-বা স্থায়ী হয়েছে। গেঁথে আছে গণমানুষের অন্তরে!

এখানেই প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ইসলামধর্মী মানুষকে যেটুকু মুক্তি, স্বস্তি ও শান্তি দেবে বলে মনে করা হয়েছিল, তা দিতে পারে নি বলেই কি সাধারণের হৃদয়ের কাছাকাছি মুসলিম সামন্তরা আসতে পারে নি? কেবল কি সামন্তগণের ইহজাগতিকতার ন্যাক্কারজনক কার্যকলাপ জনতা থেকে তাদের বিচ্যুতই করে রেখেছিল অথবা শোষণটুকুই গণমানুষের চোখে পড়েছে বেশি তাদের অবদানের চেয়ে! তাদের ঠাট-ঠমকে হয়ত চোখ ঝলসেছে, হয়ত তাদের করেছে ভয়, কিন্তু দিতে পারে নি শ্রদ্ধা ও ভক্তি। সামনে তোয়াজ করলেও মনে পায় নি ঠাঁই। অথচ এর বিপরীতে পির-ফকির-দরবেশগণের আবেদন হয়েছে অনেক মানবিক। হৃদয়ের কাছাকাছি। শরীয়তানুসারে মাজার ইত্যাদি স্থাপন ঠিক-না-হলেও প্রাণপ্রিয় সাধকদের বেলায় সে-বাধা মানা সম্ভব হয় নি। বোঝা যায় বাংলায় রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে ধর্মীয় নেতাগণ অনেক বেশি আদৃত হয়েছেন। রাজনীতির কর্মকাণ্ডে জনগণ এতই হয়ত বীতশ্রদ্ধ ছিল যে, যেসব রাজনীতিক নেতা স্বীয় কর্মকাণ্ডে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ ধর্মীয় নেতায়ই রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন, যেমন জাফর খা, ইসমাইল গাজী বা খান জাহান আলি। 'শাহ' উপাধিটি মূলে রাজকীয় হলেও পির-

ফকির সুফিদের বেলায় এর প্রয়োগ করায় বোঝা যায় তাঁরা ছিলেন মুকুটহীন রাজা। অন্য কথায়, ব্যতিক্রম দু'একজন ছাড়া রাজনৈতিক-সামন্তনেতৃবৃন্দের কাছে জনগণ তেমন কিছু পায় নি যাতে তাদের আলাদাভাবে সম্মান দিয়ে বরণীয় করে রাখতে পারে। অর্থাৎ বাস্তব-অর্থনৈতিক জীবনের নেতৃবৃন্দ গণমানুষকে কিছুই দিতে পারেন নি বলে আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দের কাছে জনগণ করেছে আত্মসমর্পণ। সামাজিক লৌকিক অসাম্য ভুলতে চেয়েছে অলৌকিক সাম্যে।

ধর্মধর বনাম দণ্ডধর

প্রাসঙ্গিকভাবেই সুফি-ফকির দরবেশ-আওলিয়ার সঙ্গে শাসককুলের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও সমন্বয়ের বিষয়টিও লক্ষণীয়। সুফি-পিরদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেশি প্রতিপন্ন হলে অথবা শাসককুলকে তাঁরা অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে রাজদণ্ড অত্যন্ত নির্মমভাবে তাঁদের মাথার ওপর পড়ে নির্মূল করতে দ্বিধা করত না। ইবনে বতুতা জানান, 'ফকিরদের প্রতি সুলতান ফকরউদ্দিনের শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে, তিনি শায়দা নামে একজন ফকিরকে সোদকাওয়াঙে (অর্থাৎ চট্টগ্রামে) তাঁর নায়েব (বা প্রতিনিধি) নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর সুলতান ফকরউদ্দিন তাঁর এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু শায়দা নিজে স্বাধীন হওয়ার মতলব করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেন। তিনি সুলতান ফকরউদ্দিনের পুত্রকে হত্যা করেন। সে ছাড়া সুলতানের আর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। খবর শোনে সুলতান তাঁর রাজধানীতে ফিরে আসেন। শায়দা এবং তাঁর সমর্থকরা দুর্ভেদ্য ঘাঁটি সুনারকাওয়াঙ (অর্থাৎ সোনারগাঁও) নগরে পালিয়ে যান। সুলতান ঐ স্থান অবরোধ করার জন্য এক সেনাবাহিনী পাঠান। সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের জীবনের ভয়ে শায়দাকে ধরে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সুলতানের কাছে এ খবর গেলে তিনি বিদ্রোহীর মাথা পাঠিয়ে দিতে আদেশ করেন।' এই বর্ণনায় ফকির শায়েদার ক্ষমতা-প্রতিপত্তির প্রতি লোভ যেমন দেখা যায়, তেমন প্রয়োজনে একদা-সমর্থককে প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য করে হত্যা করতেও শাসক কুণ্ঠিত হন নি।

শেখ আলউল হকের প্রতি সুলতান সিকান্দর শাহ্'র প্রথমে অতীব ভক্তি থাকলেও পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। কথিত যে, আলাউল তাঁর খানকাহ ও লঙ্গরখানায় এত বেশি ছাত্র-শিক্ষক-গুণীজনসহ আর্তপীড়িতকে আপ্যায়ন করতেন যে, তাতে সুলতানের সন্দেহ জাগে কীভাবে তিনি এত টাকা ব্যয় করেন! এ থেকেই নাকি মতান্তর ও মনান্তর এবং পরিশেষে আলাউল হকের সোনারগাঁয়ে নির্বাসন। সোনারগাঁয় এসেও আলাউল একইভাবে দেদার খরচ করতেন তাঁর খানকাহ ও লঙ্গরখানার জন্য। উল্লেখ্য যে, তাঁর এক পুত্র আজম খান ছিলেন সিকান্দরের উজির-সেনাপতি। সেজন্যই হয়ত রাজরোষ কঠিন হতে পারে নি। হয়ত এটাও আলাউলের খরচের ছিল একটি উৎস।

তবে সুলতান বারবক শাহ'র শেখ ইসমাইল গাজীকে প্রাণদণ্ড দেওয়াই ছিল এ ধরনের ক্ষমতা ও প্রভাবের অন্তর্দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত নিদর্শন। বারবক খবর পান যে, ইসমাইল

গাজি কামরূপ-রাজের সঙ্গে জোট বেঁধে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় রত। ঘোড়াঘাটের সেনাধ্যক্ষ ভাসন্দী রাও তাঁকে এ তথ্য জানান বলে শোনা যায়। ফলে সুলতান ইসমাইলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সুলতানের রোষ এতই নির্মম ছিল যে, সাবেক রংপুর জেলার পিরগঞ্জের কাঁটাদুয়ারে তাঁর মাথা এবং মান্দারনে তাঁর দেহ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে লোকস্মৃতিতে ইসমাইল গাজি একজন সাধক রূপে স্বীকৃতি পেয়ে খ্যাতনামা হয়ে যান। আসলে নাকি শাহ ইসমাইল ছিলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর প্রকৌশলী ও সেনাধ্যক্ষ। গৌড়ের নিকট ছুটীয়া-পুটীয়া নামে খরস্রোতা নদীতে বাঁধ দিয়ে তিনি বিখ্যাত হন।

ধর্মীয় নেতাদের সাথে রাষ্ট্রীয় নেতাদের সংঘাতের অবশ্য এ ধরনের উদাহরণ মিললেও মূলে তাঁরা ছিলেন একে অপরের পরিপূরক। শাসক-সুলতানের ক্ষমতা বিস্তারে ও রাজ্য জয়ে এ সব সুফি-পির-দরবেশগণ অনেক সময় সরাসরি সাহায্য ও সহায়তা করেন। আগেই বলা হয়েছে, শামসউদ্দিন ফিরোজ-এর সময়ে সাতগাঁও বিজয়ে শাহ সফিউদ্দিন এবং সিলেট বিজয়ে শাহ জালাল অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। যশোর-খুলনা অঞ্চল বিজয় ও ইসলাম প্রচারের সঙ্গে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ'র সময়ের খান জাহান আলি এবং মন্দারন ও কামরূপ অভিযানের সময় শাহ ইসমাইল গাজিও সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনা করেছেন। শাহ মাহমুদ গজনভি বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে রাজা বিক্রম কেশরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুসলিম শাসন সেখানে প্রতিষ্ঠা করন বলে কথিত। এমনিভাবে বহু মুসলিম সাধক একই সাথে সামরিক ও অধ্যাত্ম যোদ্ধা হিসেবে বাংলায় কাজে করেছেন শাসককুলের সাথে মিলে মিশে।

দেশের জনসাধারণের সাথে সার্বিক যোগ এবং শাসকদের বিজয়ে অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে শাসককুলের ওপর এসব সুফি-দরবেশ-পিরদের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। খানকয় ব্যতিক্রম ছাড়া উভয়ই উভয়ের সাথে একটা সদ্ভাব সবসময়ই বজায় রাখতেন। শাসককুল ভাল করেই জানতেন যে, কেবল অস্ত্র দ্বারা রাজ্য জয়ই যথেষ্ট নয়, রাজ্যে স্থিতিশীলতা নির্ভর করে বসবাসকারী মানুষের সমর্থনেরও ওপর। এজন্যই সুফি-পির সাধকগণের ইসলাম ধর্ম প্রচারের ভূমিকায় তাঁরা দান-খয়রাত করে, মাদ্রাসা, খানকাহ তৈরি করে এবং এগুলোর জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি দানের মাধ্যমে প্রচুর সুবিধা প্রদান করতেন। আর খানকাহ-মাদ্রাসা-লঙ্গরখানা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে দান-খয়রাত অর্থ বা সম্পত্তির মাধ্যমে হত, পারলৌকিক ধ্যানের ভেতর দিয়েও তা স্বাভাবিকভাবেই জাগতিক কাজে ব্যয় হত—এসব সাধুসন্তদের জীবনধারণ বাবত। জীবনধারণের জন্য যেহেতু এগুলো ছিল একান্তই প্রয়োজনীয় বস্তু, তাই এ ধরনের সাহায্য পেয়ে সামন্তস্বার্থের সাথে তাদের স্বার্থও হয়ে যেত জড়িত। তাই প্রয়োজনে এঁরা একে অপরকে সাহায্য করেছেন—একজন অসির জোরে রাজ্য জয় এবং রক্ষা করেছেন, আর অপরজন সেই জয়কে স্থিতিশীল করেছেন মস্তিষ্কে শাসককুলের ধর্মীয় ভাবধারা সম্প্রসারিত করে। অবশ্য এ সমস্তরই পেছনে-যে পারলৌকিক প্রাপ্তি-যোগ ছিল সৎ-কর্ম তথা ধর্মীয় কর্ম করে পুণ্য লাভ, নিঃসন্দেহে মনের নিভৃতে তাও কাজ করেছে।

শাসকদের স্বার্থের সাথে সাধকদের স্বার্থ যে কতটুকু জড়িত হয়ে গিয়েছিল তা বোঝা যায় খ্যাতনামা নূর কুতুব-এর উক্তিতে। তিনি একদা তাঁর মুরিদ শেখ হুসামউদ্দিন মানিকপুরীকে রসুলের বাণী 'যে তার নেতাকে শ্রদ্ধা করে সে তাকেই শ্রদ্ধা করে' কথাটি শুনিয়ে বলেন যে, 'আমরা সুলতান এবং রাজপুরুষদের শ্রদ্ধা করি যাতে আমাদের সন্তানেরা আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করে।'

নূর কুতুব ছিলেন আজম শাহর একসময়ের সহপাঠী। অনেক সময় উভয়ের মধ্যে নানা বিষয় আলাপ হত। একদিন আজম কুতুবকে জিজ্ঞেস করেন যে, আচারনিষ্ঠাপালনকারী এবং আচারনিষ্ঠাবর্জনকারী এ দু ধরনের লোকই আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত হতে পারে—এর ব্যাখ্যা কী? নূর কুতুব বলেন যে, 'প্রথমটি সুলতান অমাত্যদের জন্য অর্থাৎ তারা কর্তব্যে অবহেলা করে কেবল আচারনিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকলে অভিশপ্ত হবে, আর দ্বিতীয়টি পিরদরবেশদের জন্য প্রযোজ্য। প্রজাসাধারণের প্রতি ভাল ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করা শাসক অমাত্যদের কর্তব্য। সেই কর্তব্যে বাধা পড়ে এমন কাজ করা অনুচিত।' এ ধরনের নানা উপদেশ দিয়েও শাসককুলকে সাধকরা সচেতন করতে প্রয়াস পেতেন।

যদিও শাসককুলের সাথে একটা স্বার্থজনিত আঁতাত সাধকদের গড়ে উঠেছিল সারা সামন্তযুগ ধরেই, তবু শাসকবৃন্দের জীবনের কর্মকাণ্ড দেখেই হয়ত এ ত্যাগী পুরুষগণের সাথে ভোগী শাসকের দ্বন্দ্ব এসে যেত ধর্মীয় সূত্র ধরেই। ধর্মের মূল সুর সব-সময়ই শোষণ ও বঞ্চনার বিপক্ষে এবং শোষিত ও নির্যাতিতের পক্ষে। তাই শাসকদের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনায় উপদেশ যেমন এঁরা দিতেন, তেমন সমতা ও সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠারও স্বপ্ন হয়ত দেখতেন। কে জানে ইসমাইল গাজী এই স্বপ্ন দেখেই এক নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা! আর তাতে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে লোকস্মৃতিতে হয়ে আছেন এক মহাসাধকরূপে!

সাধকদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নানা কারণে বিধর্মীর প্রতি ছিলেন কিছুটা অসহিষ্ণু এবং ধর্মের ব্যাপারে আপসহীন। নূর কুতুব-এর মত সুফিগণ এ মতাবলম্বী ছিলেন বলে মনে হয়। তিনি জৌনপুরের সুলতান ইবরাহিম শরকি'কে গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান করতে আহবান জানিয়েছিলেন। অনুরূপ আর একজন ছিলেন বিহারের অধিবাসী মুজফ্ফর শামস্ বলখি। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর সাথেও আজম শাহ'র অন্তরঙ্গতা ছিল। পত্রালাপও হত। বলখি মাঝে মাঝেই আজমকে উপদেশাত্মক পত্র দিতেন। একটিতে তিনি লেখেন, 'বন্ধু, ধর্মের বিধানগুলো দৃঢ়ভাবে ধরে থাক। আল্লাহর কাছে আত্মসমপর্ণ কর এবং তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ কর।' আর একটি চিঠিতে তিনি উপদেশ দেন, 'সুলতানের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা উত্তরোত্তর বেশি করা উচিত যে, আল্লাহ আমার হৃদয় ও জিহ্বাকে ঠিক রাখার শক্তি দাও। আমাকে দিয়ে মুসলমানদের কাজ ঠিকভাবে করাও। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী কর।' তিনি আজমকে হজরতের

বাণী স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, এক মুহূর্তের ন্যায়বিচার ষাট বছরের নামাজ ও ভক্তি প্রকাশের চেয়েও উত্তম। বাংলার সঠিক অবস্থা বোঝার ক্ষমতা বিহারের বলখির ছিল কি-না কিছুটা অবশ্য প্রশ্ন তোলে এজন্য যে, বাংলার সুলতানদের সংখ্যাগুরু অ-মুসলমানদের ওপরই নির্ভর করে দেশ শাসন করতে হত। তাছাড়া ন্যায়বিচারের বিষয়টি অমুসলমানদের বেলায়ও সমভাবেই প্রযোজ্য হওয়ার কথা!

বলখির দৃষ্টিভঙ্গি আরো স্পষ্ট বোঝা যায় আর একটি চিঠি থেকে, 'মহান আল্লাহ বলেছেন মোমিনগণ, তোমাদের দলের বাইরে কারো সঙ্গে মিত্রতা করো না। তফসির ও অভিধানে বলা হয়েছে যে, মোমিনরা অবিশ্বাসী এবং অপরিচিত লোকদের বিশ্বস্ত কর্মচারী বা উজির নিযুক্ত করবে না। যদি তারা (অর্থাৎ মোমিনরা) বলে যে, তারা অবিশ্বাসীদিগকে বন্ধু বা প্রিয়জন বানাচ্ছে না, বরং সুবিধার খাতিরে এসব করছে, তা হলে উত্তর এই যে, এতে সুবিধা হয় না, বরং বিদ্রোহ এবং গোলযোগ হয়। আল্লাহ বলেছেন যে, তারা (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা) তোমাকে বিপথে চালিত করতে ব্যর্থ হবে না এবং তারা তোমার কাজে গোলযোগ সৃষ্টি করতে ইতস্তত করবে না।...বিধর্মীদের সামান্য কাজে নিয়োগ করা যায়, কিন্তু তাদের ওয়ালি (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করা উচিত নয়, কারণ তা হলে তারা মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করবে।...পরাজিত বিধর্মী নতমস্তকে তাদের নিজ এলাকায় কর্তৃত্ব এবং শাসন করে। কিন্তু তারা ইসলামের আয়ত্তাধীন দেশগুলোতেও উচ্চপদে নিযুক্ত হোক এবং মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব করুক, এমন হওয়া উচিত নয়।'

এই যে অমুসলমানদের সরাসরি অবিশ্বাস করার উপদেশ তা পালন করা বাংলাদেশের শাসকদের পক্ষে কখনোই খুব একটা সম্ভব হয় নি। এ কথা সত্য যে, বাংলার স্বাধীনতা 'অমুসলমান' 'হিন্দু'দের কাছে হারাতে হয় নি, যদিও বলখির উপদেশের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল তাই। অর্থাৎ হিন্দুদের উচ্চ পদে আসীন না-করা। কিন্তু একথাও সত্য যে, কোন হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই সর্বোচ্চ শাসকপদে বসার যোগ্যতা সাথে সাথেই অর্জন করে ফেলত এবং সুফি-সন্তরাও তা সহজেই স্বীকার করে নিতেন। আর এমন উদারতার পথ ধরেই এবং একই সাথে রক্ষণশীলতার মাধ্যমেও (কারণ কোন বিধর্মী বিধর্মী থেকে নয়, মুসলমান হয়েই) বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রসারের পথ সুগম হয়েছে।

আকবরের বাংলাদেশ বিজয়ের পর মোগল সুবাদারদের আনুকুল্যে বাংলায় মুসলমান আগমনের জোয়ার আসে। মোগল শাহজাদা কেউ কেউ সুবাদার-পদ নিয়ে এদেশে আসেন। তাদের প্রচ্ছায়ায় আসে ইরানী আদবকায়দা কৃষ্টি-আচার এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য। আবার এ সমস্ত বহিরাগতদের মধ্যে অনেকের সাথেই স্ত্রী-পুত্র-পরিজন না-থাকায় দেশীয় রমণী বিয়ের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি জন্মে। যারা পরিবার নিয়েও এসেছিল, তাদের সন্তানরা এদেশে থাকতে থাকতে ক্রমে এদেশবাসীর মতই হয়ে যায়। ফলে এই মিশ্র বংশধরগণ এদেশীয় লোকজন ও আচার অনুষ্ঠানের সাথে পরিচিত হয়। দেশী ভাষা, ভাব ও ভঙ্গি গ্রহণ করে তারা এক নতুন অবস্থা ও

পরিবেশের সৃষ্টি করে। এদের সাথে মিল-মিশের ফলে এদেশী বহু লোক হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান ও খাওয়া খাদ্য, যেমন নিষিদ্ধ গো-মাংস ভক্ষণ, অস্পৃশ্যের সাথে মেশা, সমাজের বাইরে বিয়ে ইত্যাদি কারণে সমাজচ্যুত হয় অথবা একত্রে পানাহার ও তামাক-সেবন থেকে হয় বঞ্চিত। খুলনার পিরালি ব্রাহ্মণ অথবা শেরখানি-শ্রীমন্তখানি এমনি উদাহরণ। এদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ থাকে না।

অন্যদিকে, রাজশক্তি মুসলমান থাকায় রাজানুগ্রহ লাভ, চাকরি-বাকরি সহ সামাজিক নানা সুবিধা ভোগের আশায়, নানা ধরনের কর প্রদান থেকে মুক্তি (যেমন তীর্থকর), অধীন প্রজা বা জিম্মি থেকে শাসকভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং কিছুটা ন্যায়-নীতি ও আদর্শে আকৃষ্ট হয়েও কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হয়। উচ্চ-নিচ সমাজের নানা স্তর থেকেই এধরনের ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বিশেষ করে নিচু শ্রেণীর লোকেরা সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েও মুসলমান হয়। বাংলার পূর্ব এবং বদ্বীপ অঞ্চলের জেলে, শিল্পী, দস্যু-তস্কর ও নিম্নশ্রেণীর চাষী সম্প্রদায়, যারা ছিল ব্রাহ্মণ সমাজে অস্পৃশ্য ও নগণ্য, ইসলাম ধর্মে খুঁজে পায় কিছুটা পরিত্রাণ। আর্থিক অসমতা দূর করতে না-পারলেও দিনে পাঁচবার একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার যে অধিকার তারা পায় তাই এসব ব্রাহ্মণ-ঘৃণ্য বর্ণভেদ প্রথায় জর্জরিত মানুষকে দেয় খানিকটা অধিকারবোধ ও ব্যক্তিত্বের আংশিক মুক্তি। সুরজিৎ দাশগুপ্ত রচিত *ভারতবর্ষ ও ইসলাম* গ্রন্থের ভাষায়, 'সামগ্রিক বিচারে মানতে হবে যে, ইসলাম স্বাতন্ত্র্যে গৌরবান্বিত বাংলার জনসাধারণকে অজ্ঞাত-পূর্ব মুক্তির স্বাদ দিল। বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর তথা শ্রমজীবী জনসাধারণকে দিল ব্রাহ্মণ্য নির্যাতন ও কঠোর অনুশাসনাদির থেকে মুক্তি, প্রতি পদে সামাজিক অপমানের থেকে মুক্তি, পূর্ব-দক্ষিণ-বঙ্গের সমুদ্রস্পৃহ জনসাধারণকে দিল ভৌগোলিক বিধি-নিষেধের বন্দী দশা থেকে মুক্তি, বহু আয়াসসাধ্য সংস্কৃত ভাষার বন্ধন থেকে জনসাধারণকে দিল মাতৃভাষাতে আত্মপ্রকাশের অধিকার, সাহিত্যের বাহনের মতোই প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও দিল ধর্মীয় বন্ধন থেকে মানবিক প্রসঙ্গে মুক্তি।'

অপরপক্ষে, সামন্তচক্রের প্রচণ্ড শোষণ ও শাসনের চক্রাবর্তে পড়ে খাবি খেতে খেতে মানুষের মানসিক স্ফূর্তি ফুটে বের হওয়ার পথ খুঁজে পেল ভক্তিমার্গে। চোদ্দ-পনের শতকের অনাড়ম্বর জীবনবাদী সুফিতত্ত্বে ক্রমে উপস্থিত হয় ভক্তি-প্রবণতা ও যোগ-দর্শন। সুলতানি আমলে যতই নিগূঢ়-নিগড়ে আবদ্ধ হতে থাকে বাংলার মানুষ, ততই ভক্তিরসের প্রাবল্য দিতে থাকে দেখা। আবির্ভাব ঘটে হোসেন শাহের সময় শ্রীচৈতন্যের। প্রাত্যহিক জীবনে সামন্ততান্ত্রিক নিষ্পেষণের পটভূমিতে মানুষের আর্তি প্রকাশিত হয় ভিন্নতর ভক্তির প্রেক্ষাপটে। শাসকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ও তার ন্যায়দণ্ড বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় সর্বোচ্চে অবস্থিত একক এক অপ্রতিহত সত্তার অবস্থান, যাঁকে কেবল আনুগত্য দিয়েই তুষ্ট করা সম্ভব, অস্ত্র দিয়ে বা লড়াই করে নয়। তাই ষোড়শ শতক থেকে ভক্তিযোগের প্রাবল্য এসে বাংলার মানুষকে ডুবিয়ে দেয়।

হয়তবা এ-ই হয় স্বেচ্ছাচারী স্বৈরতান্ত্রিক সামন্তবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও ভাষা। সম্মুখে সোজা ও সরলভাবে সেই প্রতিবাদ প্রকাশিত হওয়ার পথ না-পেয়ে, ঘোর-পথে জীবনবিবাগী দৃষ্টিতে তা হয় উপস্থিত। সামন্তসমাজের প্রেক্ষিতে ভক্তির এ প্রচণ্ড প্রবৃদ্ধি একান্তভাবেই সাযুজ্যপূর্ণ। ভক্তি-রসে আপ্লুত হয়ে আত্মসমর্পণ এবং নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার যে আত্যন্তিক প্রয়াস, তাতে সমাজ সংসার সহ অহংবোধ বিলুপ্ত হওয়ার মাঝেই কেবল অলৌকিক তৃপ্তি। এতে সামন্তেরও সম্ভব নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন যাপন। তবে এর ফলে তৃপ্তি আসে হয়ত-বা কিন্তু ইসলামের মর্মবাণী হয় ব্যাহত। ইসলাম কর্মের ধর্ম, কেবল ভক্তির নয়।

বাংলাদেশে ইসলামের স্থিতিকাল

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে মীরজাফর-পুত্র নবাব নজমউদ্দৌলা কর্তৃক বাংলার নিজামত এবং মোগল বাদশা শাহ্ আলম কর্তৃক দেওয়ানি ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদানের পর থেকে ইসলাম বাংলাদেশে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর ১৭৭২-এ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শাসনকালে কোম্পানির প্রশাসকগণ এদেশের শাসনভার সরাসরি গ্রহণের পর তা সত্যিকার অর্থেই নিঃশেষ হয়ে যায়। ইংরেজ শাসকদের কেউ কেউ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা বা ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে উৎসাহ দেখালেও তা প্রকৃতপক্ষে ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। সমাজের উপরের স্তরে পূর্বের মত আর ইসলাম নীতি-নির্ধারক হিসেবে থাকে না। এখন থেকে ইসলাম কেবল ঐতিহ্য রূপে সামাজিক স্তরে ধর্মীয় প্রেরণা ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণে হয়ে যায় সীমাবদ্ধ। অবশ্য এ সময় থেকে রাজনীতিও আর কিছু স্বেচ্ছাচারী সামন্তের কাহিনী-মাত্র থাকে না। এদেশের সামন্তচক্র ইংরেজদের কাছে নতিস্বীকার করে আত্মবিক্রিত হয়ে স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে জীবন ধারণোপযোগী ব্যবস্থা করে নিয়ে দেশীয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের মাধ্যমে কোনমতে জীবন-যাপনে হয় রত। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর মতই বাংলার নবাব দিন কাটাতে থাকেন নখদন্তহীন অবস্থায়। না থাকে তার প্রতিবাদ করার ভাষা, না প্রতিরোধের সঙ্কল্প।

উৎপাদনের উপায় উপকরণের মালিক অনেক সামন্ত প্রভু বাংলাদেশে ইংরেজ-আধিপত্য স্বীকার করে নিলেও, উৎপাদনের সঙ্গে যারা জড়িত, সেই উৎপাদক কৃষক-নিম্নসাধারণ নিপীড়িত মানুষ উৎপাদন উপায়-উপকরণের নতুন মালিক বিদেশী ইংরেজ বণিকদের কিন্তু এত সহজে স্বীকার করে নেয় না। বাংলাদেশের অগণিত মানুষ রুখে দাঁড়ায় ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে, প্রতিরোধে এবং সংগ্রামে এ সময় থেকে প্রকৃতই বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্নতর রূপ ধারণ করে অতীতের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। এখন থেকে আর সামন্তচক্রের মত একান্তভাবেই আত্মসর্বস্ব নীতি নয়, নয় উপরিতলের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, বরং সর্বমানবের এক সচেতন জনকল্যাণপ্রয়াসী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাস্বর হতে থাকে বাংলাদেশ, এমনকি সারা ভারতের দশ দিগন্ত। ক্রমেই গণমানুষ এগিয়ে আসতে থাকে এর প্রেক্ষাপটে।

একথা সত্য যে, সুপ্রকাশ রায়-এর *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* গ্রন্থের ভাষায়, 'সমগ্র ভারতবর্ষ পূর্বে কখনোই একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ ও জাতি রূপে গড়িয়া উঠে নাই। সেই কার্য মোগল শাসনকালে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই ঐক্য ছিল কেবলমাত্র সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিগত প্রশ্ন বাদ

দিলেও তখন ভারতবর্ষ ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে শতখণ্ডে বিচ্ছিন্ন একটা বিশাল ভূখণ্ড মাত্র। এই বিশাল ভুখণ্ড ছিল বহু গোষ্ঠী, বহু ভাষা, বহু ধর্ম এবং বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতি ও চেতনায় বিভক্ত।...কিন্তু ভারতীয় সমাজের মূল শক্তি নিহিত ছিল অন্যত্র। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ ছিল সেই শক্তির উৎস।' কার্ল মার্কস এই ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তার *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে বলেছেন, 'জমির ওপর সাধারণ অধিকার, কৃষি ও হস্তশিল্পের সংমিশ্রণ এবং এমন একটা অপরিবর্তনীয় শ্রম-বিভাগ যা কোন নতুন গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ামাত্র একটা ছককাটা নিয়ম হিসেবে ব্যবহৃত হত। এটাই ছিল ভারতীয় গ্রাম সমাজের ভিত্তি।...সবচেয়ে সরল রূপের গ্রাম-সমাজে সকলে একত্রে মিলে জমি চাষ করত এবং সমাজের সকল সভ্যের মধ্যে ফসল ভাগ করা হত। তার সঙ্গে প্রত্যেক পরিবারে সাহায্যকারী শিল্প হিসেবে সুতা-কাটা ও কাপড় বোনার ব্যবস্থা ছিল। এভাবে জনসাধারণ যখন সকলে মিলে একই কাজ করত, তখন দেখতে পাই যে, সমাজের প্রধান ব্যক্তি ছিল একাধারে বিচারক, পুলিশ ও কর আদায়কারী হিসাবরক্ষক যে হিসাব রাখত কত জমি চাষ করা হয়েছে। সীমান্তরক্ষক গ্রামের চৌহদ্দি পাহারা দিত ; ওভারসিয়ার জলাশয় থেকে সেচের জন্য জল বণ্টন করত; শিক্ষক ছেলেমেয়েদের লিখতে ও পড়তে শেখাত ; (এ ছাড়াও) একজন কর্মকার ও একজন ছুতোর মিস্ত্রি চাষের সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত করত, কুমোর গ্রামের সব থালা ঘটি বাটি ইত্যাদি প্রস্তুত করত, আরো ছিল ধোপা, নাপিত ও স্বর্ণকার বা রৌপ্যকার। যদি কোন সমাজের জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেত, তাহলে পার্শ্ববর্তী স্থানের অব্যবহৃত জমির ওপর ঠিক ঐ সমাজের মতই আর একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হত।'

আঠার শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এই ছিল বাংলাদেশ সহ সারা ভারতের অবস্থা। এ সমাজব্যবস্থা যুগ-যুগান্ত কাল হতে অসংখ্য বৈদেশিক আক্রমণকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে টিকে থাকতে পারলেও উন্নততর সামাজিক স্তরের কোন শক্তির আক্রমণ বাধা দেওয়া অথবা সেই শক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে টিকে থাকা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, আবার মার্কস-এর ভাষায়, 'মোগল বাদশার সমস্ত প্রতিনিধিরাই মোগল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে। সেই প্রতিনিধিদের ক্ষমতা চূর্ণ হয় মারাঠাদের হাতে, আর মারাঠা-শক্তি চূর্ণ হয় আফগানদের দ্বারা। এভাবে যখন সকলেই সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন ব্রিটিশ-শক্তি দ্রুত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে সকলকেই পরাভূত করতে সক্ষম হয়। ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যা কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই বিভক্ত নয়, এদেশটা বিভক্ত গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে। এ এমন একটা সমাজ, যার কাঠামোটা যে ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ভারসাম্যের সৃষ্টি ঐ সমাজের সকল সভ্যের একটা অবসাদগ্রস্ত বৈরাগ্য ও চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য থেকে। কোন বৈদেশিক শক্তির পর-রাজ্য-লোলুপতার শিকারে পরিণত হওয়া সেই দেশ ও সেই সমাজের বিধিলিপি না হয়ে কি পারে?'

এ প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যতম প্রতিনিধি ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গ্রহণ করে বাংলাদেশের রাজনীতি-অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা। এরা ভূমি রাজস্বের নতুন ব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্ব হিসেবে ফসল বা দ্রব্যের পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন করে। ইতোপূর্বে বাংলা-ভারতের শাসকগণ সমগ্র গ্রাম সমাজের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করত, কোন ব্যক্তির নিকট থেকে নয়। মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে গোমস্তা-জমিদার-জায়গিরদার-সামন্ত রাজগণ যেখানে যা পেত একরকম লুটেই নিত। এখন ইংরেজ বণিক-শাসকগণ গ্রাম সমাজের নিকট থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রথা তুলে দিল, কৃষকদের নিকট থেকে ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রথা প্রচলিত হল। মুদ্রা হল রাজস্ব গ্রহণের একমাত্র মাধ্যম। মোগল যুগের জমিদার বা রাজস্ব-আদায়কারী গোমস্তাদেরকেই তারা জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দিল। যেসব স্থানে জমিদার বা গোমস্তা ছিল না, সেখানে গ্রাম-সমাজের প্রধান ব্যক্তিদেরকেই জমির মালিক বলে স্বীকার করে নিল। এদের প্রধান কাজ হল কৃষকদের নিকট থেকে যত ইচ্ছা খাজনা ও কর আদায় করা এবং তা থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ইংরেজ শাসকদের হাতে তুলে দেওয়া। জমিদারগণ জমির বিলি-ব্যবস্থার মারফত তাদের সমর্থক একদল উপস্বত্বভোগীও সৃষ্টি করে। এরা গাঁতিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, তালুকদার প্রভৃতি নামে অঞ্চলভেদে অভিহিত হয়। এ ব্যবস্থার ফলে চাষীদের পিঠের ওপর বিভিন্ন প্রকারের পরগাছা শোষকদের একটা বিরাট পিরামিড চেপে বসে। শীর্ষদেশে থাকে ইংরেজ বণিকরাজ এবং নিচে বিভিন্ন প্রকারের উপস্বত্বভোগী দলসহ জমিদারগণ।

জমিদারদের সাথে ইংরেজ আমলের শুরুতে প্রথমে যে ভূমি রাজস্বের ব্যবস্থা করা হয় তার নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ খাজনা আদায় করে ইংরেজ শাসকদের দিতে না-পারলে জমিদারদের নিকট থেকে জমিদারি কেড়ে নেওয়া হত। কিন্তু সর্বস্বান্ত কৃষকদের নিকট থেকে পূর্ণ খাজনা আদায় কখনোই সম্ভব হত না। সুতরাং জমিদারি একজনার নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে আর একজনকে দেওয়া হত। এ ব্যবস্থার ফলে জমিদারি পুনঃপুন হস্তান্তরিত হতে থাকলে রাজস্ব আদায় অনেক কমে গেল। এ অব্যবস্থা দূর করা এবং রাজস্বের স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধির জন্য জমিদারদের সাথে প্রথমে পাঁচশালা ও পরে দশশালার বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু তাতেও সুবিধা হয় না দেখে ১৭৯৩-তে ইংলণ্ডের ভূমি-ব্যবস্থার অনুকরণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়। এর ফলে জমিদারদের জমির চিরস্থায়ী মালিক রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে শাসকদের নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়ে কৃষকদের নিকট থেকে ইচ্ছামত খাজনা আদায় ও জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করার অবাধ অধিকার লাভ করে। জমিদারদের শোষণের অন্তর্বর্তী স্তরে মহাজন নামক একটি দলেরও আবির্ভাব ঘটে। এরা কৃষকদের মুদ্রা যোগান দিত। আর কৃষকরা খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য তাদের নিকট জমি ও গৃহ বন্ধক রেখে তাদেরই কাছ থেকে অত্যধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হত। সেই ঋণ আবার সুদসহ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠত, যদি-না কৃষকগণ সময়মত তা শোধ করতে পারত। ঋণের দায়ে মহাজন কৃষকের জমি ও ঘর-বাড়ি কেড়ে নিত।

অপরদিকে, যে সেচ-ব্যবস্থার ওপর এদেশের জমির ফলন ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল ছিল তা একেবারেই অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে। কার্ল মার্কসের 'দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধের ভাষায়, 'এশিয়ায় স্মরণাতীত কাল থেকে শাসন ব্যবস্থা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা রাজস্ব বিভাগ অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ লুণ্ঠন বিভাগ, সমর বিভাগ অর্থাৎ বৈদেশিক লুণ্ঠন বিভাগ, এবং সবশেষে দেশের পূর্তবিভাগ।...(বাংলায়) ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের পূর্ববর্তী শাসকগণের নিকট থেকে রাজস্ব ও যুদ্ধ বিভাগের ভার গ্রহণ করে, কিন্তু পূর্তবিভাগটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে।' ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা জর্জ থমসন-এর ভাষায়, 'পূর্বের হিন্দু ও মুসলমান শাসকগণ দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য এবং দেশের মঙ্গলার্থে যে-সকল রাজপথ, পুকুর ও খাল তৈরি করেছিলেন সেগুলো জীর্ণ ও অব্যবহার্য হতে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে সেচব্যবস্থার অভাবে বারংবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে।'

আরো উল্লেখ্য যে, ইংরেজ শাসনের পূর্বে বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের শাসকরা শোষণ করলেও দেশের সম্পদ দেশের অভ্যন্তরেই থাকত এবং সাধারণ মানুষও কম বেশি কিছু কিছু সুফল ভোগ করত। মুদ্রা-সম্পদ হাতে পেত নানা প্রকার প্রয়োজনীয় উন্নয়মূলক ও জনহিতকর কার্যাবলীর মাধ্যমে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই দেশের সম্পদ সম্পূর্ণটাই দেশের বাইরে চলে যেতে লাগল হাজার হাজার মাইল দূরে ইংলণ্ডে। আর এভাবে বাংলা-বিহার লুণ্ঠন করে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী যে-বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ইংলণ্ডে নিয়ে গেল তাই সেখানে শিল্প বিপ্লব সফল করে তুলল। ইংলন্ডের পণ্য ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে ফেলল আর বাংলাদেশসহ ভারতের অন্যান্য স্থান অতি অল্প মূল্যে যোগান দিতে বাধ্য হল সেইসব পণ্যদ্রব্যের কাঁচামাল। এ অবস্থায় বিলেত থেকে আমদানি করা মেশিনে তৈরি জিনিসের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় দেশী শিল্প লাটে উঠল। এ বিষয়টি 'হাউজ অব কমন্স'-এর সিলেক্ট কমিটির সামনে জে. সি. মেলভিল, সি. আই. ট্রেভেলিয়ন, এইচ. লার্পেন্ট ও মণ্টগোমারি মার্টিন খোলাখুলিই স্বীকার করেছেন। লার্পেন্ট বলেছিলেন, 'আমরা ভারতবর্ষের শিল্প-উৎপাদন ধ্বংস করে দিয়েছি।' ফলে কৃষির অবনতি ঘটল। পেশাজীবীরা নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হতে থাকল।

অন্যদিকে, সারাদেশের শাসন-শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। আইনকানুন-সভ্যতা-ভব্যতা লুপ্ত হল। ইংরেজ কোম্পানি অর্থ আহরণের দিকে যেভাবে তাকাল প্রশাসনের দিকে তার কণামাত্র দৃষ্টিও দিল না। সারা বাংলা হল লুটপাটের অবাধ আখড়া। স্বয়ং ক্লাইভই এ সম্বন্ধে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর কাছে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৬৫তে লেখেন, 'কোম্পানির কর্মচারীদের ক্ষমতার ছত্রছায়ায় ইউরোপীয় দালাল এবং আবারও তাদেরই ছায়াতলে অসংখ্য দেশীয় ফড়িয়া ও তস্য ফড়িয়াদের যে স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচার চলছে, তাতে আমার মনে হয় যে ইংরেজদের নাম এদেশে চিরদিনের জন্য মসিলিপ্ত হয়ে থাকবে।' মেকলে'র ভাষায়, 'ব্রিটিশ কোম্পানির প্রতিটি কর্মচারী ছিল তার প্রভুর (উচ্চপদস্থ কর্মচারীর) শক্তিতে শক্তিমান। আর প্রত্যেকটি প্রভুর শক্তির উৎস ছিল স্বয়ং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। শীঘ্রই কলকাতায় বিপুল ধন-সম্পদ

সঞ্চিত হয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে তিন কোটি মানুষ দুর্দশার শেষ স্তরে এসে দাঁড়াল। সত্য যে বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ্য করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এ ধরনের শোষণ ও উৎপীড়ন তারাও কোনদিন দেখে নি।' এরই প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ ফুটে উঠল নানা বিদ্রোহ আর আন্দোলনে।

ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

মোগল শাসনের মধ্যভাগ থেকেই বাংলাদেশ ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বহু ফকির ও সন্ন্যাসীর দল স্থায়ী ভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল। কালক্রমে এরা চাষবাসের মারফত পুরোপুরি কৃষকে পরিণত হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের একটি বড় দল ময়মনসিংহ ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় বাস করত। আর ফকিরদের একটি দল বাস করত উত্তরবঙ্গে। ফকিররা প্রধানত ছিল মাদারি সম্প্রদায়ভুক্ত। উত্তরবঙ্গে এদের বহু দরগাহ, মাজার ও খানকাহ থাকায় এরা সেখানেই ভিড় করে। কৃষকে পরিণত হলেও এরা সন্ন্যাসী ও ফকিরের পোশাকই পরত এবং চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বছরের বিভিন্ন সময়ে দল বেঁধে তীর্থ ভ্রমণে বের হত। ইংরেজ শাসনের আগে কোন শাসকই এদের তীর্থভ্রমণে বাধা দেয় নি। কিন্তু বেনিয়া ইংরেজ শাসকগণ এদের মাথাপিছু বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য করে। দিতে ব্যর্থ হলে নানা প্রকার অত্যাচার ও তীর্থ গমনে বাধা দিতে থাকে। একদিকে কৃষক হিসেবে বেনিয়াসৃষ্ট জমিদারগোষ্ঠী দ্বারা অত্যাচারিত এবং অপরদিকে ফকির-সন্ন্যাসী হিসেবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে উৎপীড়িত হওয়ায় এরা একই সাথে জীবিকা ও ধর্মরক্ষার তাগিদে হয়ে ওঠে বিদ্রোহী।

এদের সাথে যোগ দেয় ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সেনাবাহিনীর ছত্রভঙ্গ, বেকার ও বুভুক্ষু সৈনিকদের বিরাট এক অংশ। মোগল সাম্রাজ্য পতনের ফলে কালে কালে বিশ লক্ষ সৈন্য তাদের জীবিকা হারায়। বাংলার নবাবের সেনাবাহিনীরও বহু সৈন্য কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। এই সর্বস্বান্ত সৈনিকরা সামরিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিদ্রোহকে শক্তিশালী করে তোলে। মূলে এরাও ছিল কৃষকেরই সন্তান। উইলিয়াম হাণ্টার এবং এল. এস. এস. ওম্যালি বলেছেন যে, এই বিদ্রোহীরা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সৈন্যদলের সিপাহী এবং সর্বস্বান্ত চাষী। ওয়ারেন হেস্টিংস এ বিদ্রোহকে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করলেও হাণ্টার স্বীকার করেছেন যে, বাস্তবিকপক্ষে এ ছিল কৃষক বিদ্রোহ।

এ বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রচুর সহযোগিতা লাভ করেছিল। বিদ্রোহী বাহিনী যেখানেই গিয়েছে সেখানেই জমিহারা-গৃহহারা কৃষকগণ তাদের সাহায্য করেছে, বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এর ফলে কখনো-বা বিদ্রোহীদের সংখ্যা একসঙ্গে পঞ্চাশ হাজারের ওপরও উঠেছে। লক্ষণীয়, বিদ্রোহীরা কখনোই স্থানীয় কৃষকদের ওপর উৎপীড়ন ও তাদের সম্পত্তি লুট করে নি। তাদের লুণ্ঠন ও পীড়ন কেবল জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ-শাসকদের ওপরই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে, কর আদায় করে এবং ইংরেজ শাসকদের ধনাগারে সঞ্চিত রাজস্বের অর্থ লুটে নিয়ে বিদ্রোহের ব্যয় নির্বাহ হত।

১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় ইংরেজ কুঠির ওপর আক্রমণের মাধ্যমে এ বিদ্রোহ সূচিত হয়। সে-সময় কোলকাতা কুঠির পরেই ছিল ঢাকা কুঠির স্থান। ঢাকা শহর ও আশেপাশের মসলিন বস্ত্র তৈরিকার কারিগরদের কাজ থেকে নামমাত্র মূল্যে মসলিন ও কেলিকো বস্ত্র ইংরেজ কুঠিঅলারা কেড়ে নিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যত বেশি সম্ভব এসব বস্ত্র সরবরাহের জন্য এদের বলপূর্বক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দানে কুঠিঅলারা বাধ্য করত। চুক্তি ভাঙলে তারা অকথ্য নির্যাতন করত। কথিত যে, কারিগরেরা বয়নের জন্য অপরিহার্য বুড়ো আঙুল কেটেও রেহাই পেত না। এজন্য বহু কারিগর, সম্ভবত এক-তৃতীয়াংশই, বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এরাই বোধহয় সংঘবদ্ধ হয়ে অত্যাচারের প্রতীকচিহ্ন ঢাকার কুঠি আক্রমণ করে। নেতৃত্ব দেয় কোন সন্ন্যাসী বা ফকির। রাতের অন্ধকারে তারা কুঠির চারদিকে নিঃশব্দে সমবেত হয়ে কুঠি আক্রমণ করলে সিপাহী-সান্ত্রী ও ইংরেজগণ ভয়ে পালায়।

দ্বিতীয় আক্রমণ হয় ১৭৬৩-তেই রাজশাহী জেলার রামপুর-বোয়ালিয়া ইংরেজ কুঠির ওপর। কুঠির সব ধনসম্পদ লুট করে বিদ্রোহীরা নিয়ে যায়। তৃতীয় আক্রমণ ১৭৬৪-তে পুনরায় এখানেই। ইংরেজ বণিক এবং স্থানীয় জমিদারদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। অতঃপর কোচবিহারে সিংহাসন নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হলে প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে সাহায্য করে ১৭৬৬-তে ইংরেজ বাহিনীকে বিদ্রোহীরা পর্যুদস্ত করে। জলপাইগুড়িতে তারা একটি দুর্গ তৈরি করে এবং ১৭৬৯-এ নেপালের সীমান্তে ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে।

চারদিকে পরাজিত হয়ে ইংরেজ শাসকগণ বিদ্রোহীদের তৎপরতা রোধের জন্য নানা স্থানে দেশীয় গোয়েন্দা নিযুক্ত করে। তবুও বিদ্রোহের সমর্থনে কৃষকেরা ইংরেজদের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে তা বিদ্রোহীদের চাঁদা হিসেবে দিতে থাকে। ইতোমধ্যে ১৭৭০-৭১-এর মহাদুর্ভিক্ষের করাল ছোবলে পড়ে দলে দলে চাষী বিদ্রোহীদলে যোগদান করতে থাকে। ১৭৭০-৭১এ বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় বিদ্রোহীদের এক আক্রমণ হয়। এখানে বাদী বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ইংরেজগণ জানতে পারে যে বিদ্রোহীদের প্রায় সকলেই স্থানীয় কৃষক। এ সময় দিনাজপুর জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিদ্রোহীরা বিভক্ত হয়ে অত্যাচারী ধনী ও জমিদারদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে। একটি দল ময়মনসিংহের বিদ্রোহীদের সাথেও মিলিত হয়। রংপুরের বিদ্রোহীদের সাথেও তাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৭৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ কুঠি ও জমিদারদের কাচারি একের পর এক লুণ্ঠিত হতে থাকে। বিদ্রোহীরা ধনী গোষ্ঠী ও জমিদারদের কাছ থেকে কর আদায় শুরু করে। বগুড়ার বিদ্রোহীরা মহাস্থান গড়ে মাটির প্রাচীর ঘেরা দুর্গ পর্যন্ত তৈরি করে।

এ সময় বিদ্রোহীদের ভেতর দূরদর্শী শক্তিমান নায়ক রূপে মজনু শাহ্‌র আবির্ভাব ঘটে। তিনি বিদ্রোহী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পান। তাঁর চেষ্টায় বহু দেশীয় কর্মচারী ইংরেজ চাটুকারিতা এবং চাকরি ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সাহায্যে অগ্রসর হয়। এ সংগ্রামে যাতে দেশী জমিদারগণও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে সেজন্যও মজনু শাহ্

চেষ্টা করেন। নাটোরের জমিদার রানী ভবানীর নিকট তাঁর লিখিত রূপক পত্রখানি এসঙ্গত উল্লেখযোগ্য : 'আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলাদেশে ভিক্ষা করিতেছি এবং বাংলাদেশও বরাবর আমাদের অভ্যর্থনা জানাইয়াছে। আমরা কাহাকেও গালি দিই না, অথবা কোন লোকের গায়ে হাত তুলি না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের ১৫০ জন নির্দোষ ফকিরকে হত্যা করা হইয়াছে।...তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র, এমনকি খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। এই সকল গরিব লোককে হত্যা করিয়া কি লাভ হয় তাহা বলার প্রয়োজন নাই। পূর্বে ফকিররা একাকী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, এখন তাহারা দলবদ্ধ হইয়াছে। ইংরেজরা তাহাদের ঐক্য পছন্দ করে না, তাহারা ফকিরদের উপাসনায় বাধা দেয়। আপনিই আমাদের প্রকৃত শাসক, আমরা আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। আপনার নিকট হইতে আমরা সাহায্য লাভের আশা করি।'

দ্ব্যর্থক হলেও চিঠিটির নির্গলিতার্থ স্পষ্ট : ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের এ বিদ্রোহে যোগদানের জন্য রানী ভবানীর নিকট আবেদন। কিন্তু রানী ভবানী বোধহয় এতে সাড়া দেন নি, কারণ নাটোর অঞ্চলে শীঘ্রই মজনু শাহ্‌র নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা তৎপর হয়ে ওঠে। অত্যাচারী ধনিক ও জমিদারদের এবং ইংরেজদের অনুচরবৃন্দের ধনসম্পদ লুট করে এবং কৃষকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা এ সময় স্থানীয় কামারশালায় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করত। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যগণ যাতে সাধারণ মানুষকে কোন অত্যাচার না-করে তার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া থাকত মজনু শাহের। নাটোরের সুপারভাইজার রেভেন্যু কাউন্সিলে প্রদত্ত তাঁর এক পত্রে লেখেন, 'আমার হরকরা সংবাদ নিয়ে এল, গতকাল ফকিরদের এক বিরাট দল সিলবেরি'র (বগুড়া জেলার) একটি গ্রামে এসে সমবেত হয়েছে। তাদের নায়ক মজনু তার অনুচরদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন জনসাধারণের ওপর কোনরূপ অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ না-করে এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছার দান ব্যতীত কোনকিছুই গ্রহণ না-করে।' এই পত্রপ্রেরক সুপারভাইজারই আর এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে, গ্রামবাসী নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বিদ্রোহীদের আহারের ব্যবস্থা করেছে এবং বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের ওপর কোন অত্যাচার করে নি। এ ছাড়া বহু কৃষক বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছে এবং কৃষকগণ ইংরেজ সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করে সেই কর বিদ্রোহীদের হাতে দিয়েছে।

১৭৭৩-এ পূর্নিয়া জেলা থেকে কয়েকটি বিদ্রোহীদল রংপুরের বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে ইংরেজ কর্মচারী ও অত্যাচারী জমিদারদের তাড়িয়ে দেয় এবং ইংরেজ বাণিজ্য-কুঠিগুলো লুট করে। ইংরেজগণ এক বিরাট বাহিনী তাদের দমনের জন্য নিয়ে আসে। এ অঞ্চলের সকল গ্রামের কৃষক-জনগণ তীরধনুক, বল্লম, লাঠি, সড়কি নিয়ে বিদ্রোহী দলে যোগদান করে ইংরেজদের ঘিরে ফেলে! ইংরেজরা তাদের অধীন দেশীয় সিপাইদের পাল্টা আক্রমণের আদেশ দিলে তারা স্বদেশের কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। ফলে ইংরেজ বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে রংপুর জেলার সুপারভাইজার পার্লিং-এর চিঠিতে আছে,

'কৃষকরা আমাদের সাহায্য তো করেই নি, বরং তারা লাঠি প্রভৃতি নিয়ে সন্ন্যাসীদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। যে সব ইরেজ সৈন্য জঙ্গলের লম্বা ঘাসের মধ্যে লুকিয়েছিল তাদের তারা খুঁজে বের করে হত্যা করেছে। কোন ইংরেজ সৈন্য গ্রামে ঢুকলে কৃষকরা তাদের হত্যা করে বন্দুকগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে।'

বিদ্রোহীদের হাতে এভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ইংরেজগণ ইংলণ্ড থেকে বহু নতুন অস্ত্র ও সৈন্য এনে শক্তি বৃদ্ধি করে এবং দিনাজপুরের সন্তোষপুর বিদ্রোহী ঘাঁটি ও জলপাইগুড়ি দখল করে। কিন্তু বগুড়ার বিদ্রোহীরা স্বীয় আধিপত্য এতই বিস্তার করে যে স্থানীয় শাসক ও জমিদারগণ কর দিয়ে তাদের সাথে আপস করে। এ সংবাদ পেয়ে ইংরেজ বাহিনী এগিয়ে এলে বিদ্রোহীরা ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হয় এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ এলাকা জুড়ে জমিদারদের কাচারি ও ইংরেজ কুঠি লুট করতে থাকে। এক আক্রমণে বিদ্রোহ দমনে আগত একটি ইংরেজ বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। একদল বিদ্রোহী সিলেটের দিকে গমন করে। আর একদল যশোর ও পশ্চিম-বঙ্গের নানা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিশেষে উত্তরবঙ্গের দিকে ফিরে যায়। রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করে অন্য একদল বিদ্রোহী জমিদারদের নিকট থেকে কর আদায় করে। বস্তুত ১৭৭৩-এর শেষ ভাগ থেকে ইংরেজ শাসকদের শক্তি বৃদ্ধি ও নতুন নতুন আক্রমণের ফলে বিদ্রোহীরা সর্বত্র বাধা পেতে থাকে। বিদ্রোহীদের গোপন সংগঠন, গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও চলাচল সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য জমিদারদের, এমন- কি কৃষকদের আইনের দ্বারা বাধ্য করা হয়। হেস্টিংস ঘোষণা করেন, যে-গ্রামের কৃষকরা ইংরেজ শাসকদের নিকট বিদ্রোহীদের সংবাদ দিতে অস্বীকার করবে এবং বিদ্রোহীদের সাহায্য করবে তাদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হবে। এ ঘোষণা অনুসারে বহু কৃষক ক্রীতদাসে পরিণত হয়। তাছাড়া বহুজনকে অবাধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে গ্রামের মধ্যস্থলে ফাঁসীকাঠে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ফাঁসীপ্রদত্ত পরিবারগুলোকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়। আইন দ্বারা তীর্থভ্রমণ প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিপদে যাতে ভুটান রাজ্যে আশ্রয় না-নিতে পারে সেজন্য ভুটান রাজার সঙ্গে চুক্তি করা হয়। এ ছাড়া হেস্টিংস দেশী সিপাইদের স্থলে কেবল ইংরেজ সৈন্যদের দিয়ে বাহিনী তৈরি করেন। দেশী সৈনিকরা বিদ্রোহীদের বিপক্ষে ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করতে চাইত না। হেস্টিংস এদের নাম দিয়েছিলেন 'বদমায়েস বাহিনী'। পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে বিদ্রোহীরা চলাচল করত বলে কয়েকটি নতুন বাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে নিয়োগ করে তা সুরক্ষিত করা হয়।

এত সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও ১৭৭৪-এর শেষভাগ থেকে আবার বিদ্রোহী দলগুলো নানা স্থানে আক্রমণ শুরু করে। ১৭৭৬-এর শেষদিকে মজনু শাহ্ উত্তরবঙ্গে ফিরে এসে ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীদের সঙ্ঘবদ্ধ করার ও নতুন লোক সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তাঁর উপস্থিতিতে ইংরেজগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং একদল সৈন্য পাঠিয়ে তাকে পর্যুদস্ত করার প্রয়াস পায়। মজনু কিছুটা বাধা দানের পর এ স্থান ত্যাগ করেন। অতঃপর বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহের বহু জমিদারের নিকট থেকে কর আদায় করে

ইংরেজ সরকারের কোষাগারও লুণ্ঠন করেন। ইতোমধ্যে ১৭৭৭-এ বগুড়া জেলার একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে মজনুর অনুচরদের কলহ হয়। কিন্তু তাঁর চেষ্টায় এর অবসান ঘটে। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহের বুকে তিনি উপস্থিত হন। তাঁকে ধরার জন্য ইংরেজ সেনাদল এলে মজনু মালদা জেলায় চলে যান। সেখানে তিনি ইংরেজ কুঠি ও জমিদারগণের ওপর আক্রমণ ও অর্থ লুণ্ঠন করতে থাকেন। ইংরেজ পক্ষের বহু বরকন্দাজ মজনুর দলের সঙ্গে যোগ দেয়। ইংরেজ সেনাদল এখানে এলে মজনু এস্থানও ত্যাগ করেন। ১৭৮৬-এর ডিসেম্বরে মজনু বগুড়া জেলায় আসেন। কলেশ্বর নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীর সাথে তাঁর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষে তিনি স্বয়ং আহত হয়েও দলবল নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাঁর আঘাত মারাত্মক আকার ধারণ করে! অবশেষে মাখনপুর নামক স্থানে এই দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী নেতা মৃত্যু বরণ করেন।

মজনুর মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য শিষ্য ও ভাই মুসা শাহ্ অন্যান্য ফকির নায়কদের সহায়তায় বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। তাঁর নেতৃত্বে একদল বিদ্রোহী আগে থেকেই উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ শাসক ও জমিদারদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের ধনসম্পদ লুট করছিল। ১৭৮৭-তে রানী ভবানীর বরকন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে মুসার অনুচরদের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। রানীর বাহিনী পরাজিত হয়। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ীই 'পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের সমস্ত লোক বেশ শান্তভাবেই এ যুদ্ধ দেখে। তারা বিদ্রোহীদের অর্থাৎ মুসার বিরুদ্ধে যোগদান করে নি কিংবা তার পলায়নের সময় বাধাও দেয়নি।' ইংরেজদের কঠোরতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ-যে বিদ্রোহীদের সমর্থন করত এ তারই প্রমাণ। আর এক আক্রমণের সময়ও দেখা যায় যে, মুসা শাহ্ পলায়ন করতে বাধ্য হলে, ইংরেজ সেনাদল কর্তৃক পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবনের সময় গ্রামবাসীরা সাহায্য করলে তাঁকে বন্দী করা সম্ভব হত। গ্রামবাসীরা তা তো করেই নি, বরং তারা ফকিরদের মালপত্র দ্রুত সড়িয়ে ফেলে। দিনাজপুরের কালেক্টর এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ যুদ্ধে গ্রামবাসীরা ফকিরদের পক্ষ হয়ে কাজ করেছে। বিপদের সময় ফকিরগণ যা ফেলে গেছে তা সযত্নে রক্ষা করেছে। পরে নিরাপদ স্থানে তাদের তা ফিরিয়ে দেবে।'

১৭৮৭-তে আরও দুজন খ্যাতনামা বিদ্রোহীর উল্লেখ পাওয়া যায় : ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী। কয়েকজন ব্যবসায়ীর নৌকা লুট করায় ভবানীর নামে তারা ঢাকার সরকারি কাস্টম্স্-এর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট অভিযোগ করে। ভবানীকে গ্রেফতার করার জন্য পরোয়ানা সহ একদল বরকন্দাজ প্রেরিত হয়। কিন্তু দেবী চৌধুরানী ও একদল বিদ্রোহী নিয়ে ইংরেজ এবং দেশীয় বণিকদের বহু পণ্যবাহী নৌকা ভবানী লুট করতে থাকেন। ফলে ময়মনসিংহ-বগুড়া অঞ্চলে শাসনব্যবস্থা অচল হওয়ার উপক্রম হয়। লেফটেন্যান্ট ব্রেনান-এর নেতৃত্বে একটি ইংরেজ বাহিনী ভবানী ও দেবীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। একদিন পাঠক তার অল্প কয়েকজন অনুচরসহ এক ইংরেজ বাহিনীর বেষ্টনের মধ্যে পড়ে যান। ভীষণ জলযুদ্ধে পাঠক অনেকের সাথে নিহত হন। বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ সাতটি ছিপ নৌকা ইংরেজ-অধিকৃত হয়।

একই সময়ের দিকে মজনুর আরো দু'জন শিষ্য ফেরাগুল শাহ্ ও চেরাগ আলি শাহ্ দিনাজপুর জেলার শাসক ও জমিদারগণকে অস্থির করে তুলেছিলেন। ১৭৯০-এর দিকে একদল বিদ্রোহী ফকির ময়মনসিংহে উপস্থিত হয় এবং একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কয়েকটি পরগণার জমিদার ও ইংরেজ বণিকদের অবস্থা সঙ্গিন করে তোলে। ঘরবাড়ি ও কুঠি ত্যাগ করে তারা পালিয়ে যায়। দুর্ভাগ্য যে, মুসা ও ফেরাগুল শাহর ভেতর শীঘ্রই নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব বাঁধে। ১৭৯২-তে মুসা ফেরাগুলের হাতে নিহত হন। মুসার মৃত্যুর পর বিহারে সোবান আলি ও বাংলাদেশে চেরাগ আলি বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে থাকেন। ইতোমধ্যে ১৭৯৩-তে পুলিশী ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দারোগা নামে কর্মকর্তার ওপর গ্রামাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আগে এ কাজ জমিদারদের ওপর ন্যস্ত ছিল। দারোগা পুলিশের সাহায্যে সেনাবাহিনী এসব বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হয়। তবু সোবান আলি বাংলা, বিহার ও নেপালের সীমান্ত জুড়ে ইংরেজ সরকার ও জমিদারদের সম্পত্তি লুট করেন। সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আর এক মিলিত বাহিনী রাজশাহি জেলায় প্রবেশ করে ইংরেজ সরকারের রাজস্ব, বাণিজ্য-কুঠি ও জমিদারদের কাচারি লুট করে। রমজানি শাহ্ ও জহুরি শাহ্র নেতৃত্বে একটি বিদ্রোহী বাহিনী পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও মালদা জেলায় ঘুরে ঘুরে জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ বণিকদের সম্পত্তি লুট করে নেয়। একই সময় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আর একটি মিলিত বাহিনী কোচবিহার ও আসামে উপস্থিত হয়ে ইংরেজদের আসাম থেকে বিতাড়নের প্রয়াস পায়। চেরাগ আলি সহ হাজারি সিং, ফটিক বড়ুয়া, যুগলগির প্রমুখ এই বাহিনী পরিচালনা করেন।

ইংরেজগণ বিদ্রোহীদের তৎপরতায় অতিষ্ঠ হয়ে নতুন নতুন সেনাবাহিনী গঠন করে। নানাস্থানে সতর্ক প্রহরারও ব্যবস্থা করে। এ সময় মতিগির নামক এক সন্ন্যাসীর ছুরিকাঘাতে চেরাগ আলি নিহত হন। এর পরও সোবান আলি একদল বিদ্রোহী নিয়ে দিনাজপুর, মালদা ও পূর্ণিয়া জেলায় ইংরেজ বাণিজ্য-কুঠি ও জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। কিন্তু সোবান আলির দুই সহকারী জহুরি শাহ্ ও মতিউল্লা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে যান। এর ফলে শত্রুপক্ষ বহু গোপন সংবাদ জেনে ফেলে। বিদ্রোহীদের লুকোনো এক বিরাট অস্ত্রাগার ইংরেজদের হস্তগত হয়। আমুদি শাহ্'র আর একটি বিদ্রোহীদলও শীঘ্রই ধরা পড়ে। তবু ১৭৯৭ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত সোবান আলি মাত্র তিনশ অনুচর নিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছোট ছোট আক্রমণ চালান। ইংরেজগণ এতে অতিষ্ঠ হয়ে সোবান আলিকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে বা তাঁর সংবাদ দিলে চার হাজার টাকা পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করে। কিন্তু কেউ তাঁকে ধরিয়ে দেয় নি। তবে সোবান আলির উল্লেখও আর পাওয়া যায় না। তাঁর সহকারী নেয়াজ শাহ্, বুদ্ধু শাহ্ ও ইমামবড়ি শাহ্ মিলিতভাবে ১৭৯৯ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত বগুড়ার নানা অঞ্চলের বুভুক্ষু ও উৎপীড়িত কৃষকদের নিয়ে বিদ্রোহের পতাকা উঁচিয়ে রাখেন। ১৮০০-এর পর এ ধরনের বিদ্রোহের খবর আর পাওয়া যায় না।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহই বাংলা-বিহার তথা সারা ভারতের প্রথম সশস্ত্র গণ-কৃষক বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খণ্ড খণ্ড আকারে চলার ফলে পরিচালকদের মধ্যে আদর্শ ও লক্ষ্যের ঐক্য গড়ে ওঠে নি। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব ও ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে কোন্দলে বিদ্রোহের শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। তবু সত্য যে এদেশের কৃষক-জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তি-সংগ্রামের এটিই পথিকৃৎ। বাংলা-বিহারের সামন্তপ্রভুদের ইংরেজ তোষণ ও চরম চাটুকারিতার লজ্জাজনক অধ্যায়ের মধ্যে বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ যে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন তা এদেশবাসীর জন্য পরম গৌরবের ব্যাপার, নইলে বিদেশী বণিকরাজ বুঝত যে, সামন্ত ভাঁড় এবং তল্পিবাহক মুৎসুদ্দি বেনিয়া চাটুকার ছাড়া কোন আত্মসচেতন মানুষ এদেশে নেই।

তন্তুবায়দের বিপর্যয়

স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলাদেশের তন্তুবায়গণ অতুলনীয় কাপড় তৈরি করে আসছে। এদেশের মসলিন একদা রোম, চীন, বাগদাদে রপ্তানি হত। আঠার শতকের প্রথমার্ধে তন্তুবায়রা বাংলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল। শতকের মধ্যভাগে দশ লক্ষের বেশি তন্তুবায় মসলিন বস্ত্র উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল। বাদশাহি-নবাবি আমলে তারা স্বাধীনভাবে কাপড় তৈরি করত। খ্যাতনামা তন্তুবায় পরিবারগুলো মূলধন যোগাত। ইচ্ছেমত বাজারজাতও করত।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। তারা দাদন প্রথার মাধ্যমে উৎপন্ন বস্ত্র হস্তগত করে শহরাঞ্চলে নিয়ে বিক্রি করতে শুরু করে। ইংরেজ বণিকদের পক্ষে তাদের নিযুক্ত বেনিয়া আর গোমস্তরা দাদন ব্যবসা চালাতে থাকে। এরা কারিগরদেরকে দাদন দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্ত্রের জন্য চুক্তি করত। বস্ত্র তৈরি হলে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাও কম দামে অথবা নামমাত্র মূল্যে সব কাপড় জোর করে নিয়ে নিত। এ ধরনের অত্যাচারে ফলে অনেকে কাপড়-তৈরি-ব্যবসা ত্যাগ করে কৃষিকাজ গ্রহণ করে। জমির ওপর চাপ পড়ে অত্যধিক। কেউ কেউ কাপড় তৈরির জন্য অপরিহার্য বুড়ো-আঙুল কেটে ফেলে বলেও কথিত। অনেকে অনাহারে উৎপীড়নে মারা যায়। আর অনেকে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহে যোগদান করে। শত প্রলোভন সত্ত্বেও কেউ কোম্পানির সীমার মধ্যে বসবাস করতে রাজি হয় না।

এভাবে বাংলাদেশের অতি উচ্চস্তরের বস্ত্রশিল্পটি ইংরেজ বণিকদের লোভলালসায় পড়ে একদিকে বিপর্যস্ত হয়ে যায়; অন্যদিকে সারা ভারত থেকে লুণ্ঠিত ধনসম্পদ এবং কাঁচামাল, বিশেষ করে তুলা নিয়ে ল্যাংকাশায়ারে গড়ে ওঠে বিরাট বিরাট কাপড়ের কল। মিলে তৈরি কাপড়ের দাম হয় অনেক কম। প্রতিযোগিতায় মার খেয়ে এদেশের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। বিশাল এক জনগোষ্ঠী হয়ে বেকার পড়ে। শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর একটি দেশে পরিণত হয়।

লবণ-শিল্পে বিদ্রোহ

সেকালে কৃষকরাই অবসর সময়ে লবণ তৈরি করত। বাদশাহি-নবাবি আমলে রাজস্বের একটি বিশেষ উৎসরূপে ইজাদারগণের মারফত ব্যাপক ভাবে লবণ প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হত। লবণ-উৎপাদক কৃষক ও ব্যবসায়িগণকে নানা প্রকার সুবিধা দেওয়া হত। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি ব্যবসায়ের নামে অবাধে লবণ শিল্প থেকে লুণ্ঠন শুরু করে। পূর্বে দেশী ব্যবসায়ীরা লবণ উৎপাদনকারী মালঙ্গিদের টাকা দাদন দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ সরবরাহ করার চুক্তি করে সারা দেশে তা করত। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে দেশীয়গণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়। কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারিগণ ব্যবসায়ী সেজে বসে। দেশী গোমস্তাদের মারফত লবণ ব্যবসা চালাতে থাকে। এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য ১৭৭২তে লবণ শিল্প সম্পূর্ণ সরকারি পরিচালনাধীনে আনা হয়। কোম্পানি লবণের উৎপাদন ও বিক্রয়ের ওপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে।

লবণ ইংরেজ বণিকদের হাতে পড়া মাত্র এর মূল্য অত্যধিক ভাবে বাড়তে থাকে। উইলিয়ম বোল্টস্ জানান যে, নবাব আলবির্দির শাসন আমলে প্রতি শ মন লবণের দাম ছিল ৪০ থেকে ৬০ টাকা, কিন্তু তাই ১৭৭৩-এ ১৭০ টাকা, ১৭৭৮-এ ৩১২ (ঢাকা শহরে), ১৭৯০তে ৩১৪ টাকা হয়ে যায়। এর ফলে তা জনসাধারণের কেনার ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। কৃষক-জনগণতো বটেই পশুর দলও প্রয়োজনীয় লবণ থেকে বঞ্চিত হয়। আর এই শিল্পের সাথে জড়িত উৎপাদক মাহিন্দার এবং সংগঠক মালঙ্গিরা ইংরেজ এজেন্ট ও দেশী দালালদের মাধ্যমে প্রতারণা, বঞ্চনা ও প্রচণ্ড উৎপীড়নের শিকার হয়। বহু লবণ শিল্পী এ ব্যবসা ছেড়ে পালিয়ে যায়। মেদিনীপুরে তো এ ব্যাপারে বিরাট বিদ্রোহই ঘটে প্রেমানন্দ সরকার-এর নেতৃত্বে (১৮০৪)।

এদিকে ইংলণ্ডে নতুন পদ্ধতিতে লবণ তৈরি শুরু হয়। ১৮১৭তে তা ভারতবর্ষে আসা শুরু করে। এর দাম হয় খুব কম। প্রতিযোগিতায় তা বাংলাদেশে প্রস্তুত লবণকে হারিয়ে দেয়। এদেশের কারখানাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে প্রায় পাঁচ লক্ষ অর্ধ-চাষী লবণ কারিগর বেকার হয়ে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে।

সমশের গাজি'র বিদ্রোহ

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ত্রিপুরা জেলার রাজস্ব প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিলে জমিদার-তালুকদারদের অবাধ লুণ্ঠনে রোশনাবাদ চাকলার চাষীরা ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়। বহু কৃষক ঘরবাড়ি ছেড়ে বনজঙ্গলে পালিয়ে যায়। অনেকে ধনী ব্যক্তির কাছে নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রি করে। নিজেদেরকেও বিক্রি করে। এমনি এক দরিদ্র কৃষকের সন্তান সমশের গাজি।

সমশেরের পিতা ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন দক্ষিণ শিক-এর প্রবল জমিদার নাসির মুহম্মদ-এর কাছে তাঁকে বিক্রি করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে নাসির সমশেরকে তহসিলদারের কাজে নিযুক্ত করেন। এখানে সমশের দেখেন কৃষকদের প্রচণ্ড দুঃখ ও দুর্দশা। তিনি সমবয়সী অনেককে বুঝিয়ে একটি দল গঠন করেন এবং জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জমিদারি দখল করেন। অতঃপর ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে নিজেকে তিনি রোশনাবাদ চাকলার স্বাধীন শাসক বলে ঘোষণা করেন। গাজি উপাধি নেন। হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়।

সমশের রাজ্যের দরিদ্র প্রজা ও ক্রীতদাসদের বিনা মূল্যে জমি বণ্টন করেন। দরিদ্রদের কর প্রদান রহিত করেন। বহু গ্রামে পুকুর খননের মত জনহিতকর কাজ করে তিনি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। চোরাকারবারীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করলে তিনি প্রত্যেক বাজারে দ্রব্য-মূল্য বেঁধে দিয়ে প্রতিটি জিনিসের তালিকা টাঙিয়ে দেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের ইংরেজ অধিকৃত ধনী ব্যক্তি ও জমিদারদের ধনভাণ্ডার লুট করতে থাকেন। বিদ্রোহ দমনের জন্য ত্রিপুরার যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্য কয়েকবার সেনাদল প্রেরণ করে অকৃতকার্য হলে মুর্শিদাবাদে নবাব ও ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাদের সহায়তায় অবশেষে সমশের গাজি পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তাকে হত্যা করা হয়।

এভাবে দু-বছর (১৭৬৭-৬৮) সমশের এক নতুন ধরনের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে গরিবদের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তাঁর এই রাজ্য স্থাপন অতীতের সামন্ত শ্রেণীর অনুকরণে হলেও, যেসব গণমুখী নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে, তা বস্তুতই বৈপ্লবিক ও অভিনব। অন্যান্য সামন্ত বিদ্রোহ থেকে সমশেরের বিদ্রোহের পার্থক্য এই যে, সমাজ-সচেতনতার এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস এতে লক্ষ্য করা যায়। আঠার শতকের মধ্যভাগে বাংলার কোন এক নিভৃত কোণে বসে তিনি যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাতে তাঁর সরকারকে পরবর্তীকালের যে-কোন জনদরদি সরকারের পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সন্দ্বীপে বিদ্রোহ

সন্দ্বীপে আবু তোরাপ চৌধুরী ছিলেন শৌর্যবীর্যশালী জমিদার। গভর্নর ভেরেলস্ট-এর কেরানী ও বেনিয়া গোকুল ঘোষাল বেনামিতে সন্দ্বীপের আহদ্‌দারি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়কারীর পদ লাভ করে একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার জন্য আবু তোরাপের বিরুদ্ধে ইংরেজদের কাছে নানা অভিযোগ পেশ করেন। ইংরেজগণ ১৭৬৬তে তোরাপের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাঁকে নিহত করে। গোকুল সুযোগ পেয়েই অন্যান্য জমিদারদের জমিদারিসহ আবু তোরাপের জমিদারিও কুক্ষিগত করার প্রয়াস পান। তাঁর অবাধ লুণ্ঠনে বহু প্রজা সর্বস্বান্ত হয়। প্রাণ বিসর্জন দেয়। বহু কৃষক-পরিবার সন্দ্বীপ থেকে পালিয়েও যায়। অবশেষে কৃষকগণ মরিয়া হয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তারা সন্দ্বীপের সর্বত্র সভাসমিতি করে খাজনা বন্ধ করে দেয়। গোকুলের পেয়াদা পুলিশ খাজনার জন্য কৃষকের ঘরে ঘরে হানা দিয়ে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিতে থাকে। কৃষকরা স্থানে স্থানে দলবদ্ধভাবে বাধা দেয়। ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হৃতসর্বস্ব ক্ষুদে জমিদারগণও এ বিদ্রোহে যোগদান করে। এক খণ্ড-যুদ্ধে জমিদার মুহম্মদ ফইম নিহত হন। অগত্যা বিদ্রোহ দমনের জন্য গোকুল ইংরেজদের কাছে সেনাবাহিনী পাঠানোর আবেদন জানলে ১৭৬৯-এর শেষভাগে সৈন্যদল এসে রক্ত-বন্যায় ডুবিয়ে বিদ্রোহের আপাত-উপশম করে। অন্যদিকে অবাধ লুণ্ঠনের মাধ্যমে যে অর্থ সঞ্চিত হয় তা দিয়ে গোকুল খিদিরপুরে ভূকৈলাসের রাজপ্রাসাদে ঘোষাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে।

তবে সন্দ্বীপের বিদ্রোহ থেমে থাকে না। থেকে থেকে হতেই থাকে। ফলে জমিদারগণ খাজনা আদায় করতে পারে না। বহু জমিদারি নিলাম হয়ে যায়। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস নামক জনৈক নতুন বহিরাগত জমিদার খাজনা নিতে গেলে প্রজাবিদ্রোহ আবার জ্বলে ওঠে। জমিহারা পূর্বের জমিদারগণও তাদের সাথে যোগ দেয়। প্রাণকৃষ্ণ খাজনা আদায় করতে না-পেরে অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালায় কিন্তু তার পাইক-বরকন্দাজ প্রজাদের হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। গোবিন্দ চরণ চৌধুরী নামে একজন বর্ধিষ্ণু কৃষক এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। ফলে ১৮২৪-এত প্রাণকৃষ্ণের জমিদারি প্রকাশ্যে নিলাম হলেও কেউ তা খরিদ করে না। এরপর অন্যান্য জমিদারদের দেয় রাজস্বও বাকি পড়ায় ১৮৩০-এর মধ্যেই অন্য সব জমিদারিও বাজেয়াপ্ত হয়ে সরকারের খাস দখলে চলে যায়।

এর পর বিভিন্ন জমিদারি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রজা অসন্তুষ্টির জন্য এ ব্যবস্থাও বানচাল হয়ে যায়। ১৮৭০-এ সন্দ্বীপের প্রায় অর্ধাংশ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হলে এচিনা কোর্জন নামে এক ইংরেজ তা কিনে নেন। তিনি প্রজাদের বিনা সম্মতিতেই তাদের তালুক প্রভৃতি পরিমাপ করাতে, জোরপূর্বক তাদের নিকট থেকে কবুলিয়ত সম্পাদন এবং রাজ-বিধি লঙ্ঘন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমির জমা বাড়াতে চান। কিন্তু সন্দ্বীপবাসিগণ একতার মাধ্যমে এই পরিকল্পনাও বাতিল করে দেয়। মুন্সী চাঁদ মিয়া এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে অসহযোগের পথ গ্রহণ করে। তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, জমিদারের কোন আমলা বা আমীনকে গৃহে স্থান দেবে না, তাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি বা দান করবে না, কেউ জমির পরিচয় দিয়ে আমিনের জমি মাপায় সাহায্য করবে না। এসময় একটি চমৎকার ছড়া রচিত হয় :

জুম্মার নমাজ পইরতে হুনলাম মজিদে ছল্লা
জরিপ কইরতাম দিতাম না বাই যায় যাবে কল্লা

অর্থাৎ শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়ে মসজিদে পরামর্শ হল যে, মাথা যায় যাবে, কিন্তু জমি জরিপ করতে দেওয়া হবে না। এরূপ সংঘবদ্ধতার কারণে জমিদার কোনরূপ অত্যাচার করতে সাহস পায় না। বিনা রক্তপাতেই এ আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ময়মনসিংহ বিদ্রোহ

১৭৮৭তে ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হয়। ওই বছরই জেলার অনেক স্থানে বন্যা হয়। এতে জমিদাররা রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে ইংরেজ জেলা মেজিস্ট্রেট তাদের অব্যাহতি দেয়। কিন্তু বন্যায় সর্বস্বান্ত কৃষককে স্ত্রী-পুত্র পর্যন্ত বিক্রয় করে হলেও জমিদারের খাজনা যোগাতে হয়। বন্যার পর দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। ছ' আনা মনের চাল দু' আড়াই টাকা হয়ে যায়। বহু লোক পেটের দায়ে স্ত্রী-পুত্র, এমন কি আত্মবিক্রয় করে। সেকালে এক টাকা থেকে চার টাকায় একজন মানুষ বিক্রি হত। জমিদারদের অত্যাচারে ময়মনসিংহ ও জাফরশাহী পরগনায় ৮০৪৯ জন মাতবর প্রজার মধ্যে ১০০৫ জন বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

উৎপীড়নের ফলে সকল কৃষকের জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। বিদ্রোহের আগুন ধুমায়িত হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৮১২তে কাপাকি নামক স্থান কেন্দ্র করে সারা পরগনায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহু অনুসন্ধান করেও পরবর্তীতে এই বিদ্রোহের বিবরণ সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। তবে কোম্পানি কোন কোন জমিদারি খাসে আনলে কেউ কেউ ফিরে আসে বলে জানা যায়।

যশোর-খুলনা বিদ্রোহ

মোগল আমল থেকে যশোর ও খুলনা মিলে এক জেলা ছিল। নবাবি শাসনের অবসানের পর ১৭৮১-এর আগে এখানে প্রায় কোন শাসন ব্যবস্থাই ছিল না। এ সময় ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় ও স্থানীয় জমিদাররা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। লবণ ও কাপড়ের ব্যবসার নামে তারা যে উৎপীড়ন ও শোষণ শুরু করে তার ফলে হাজার হাজার কৃষক জমিহারা ও বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। অনেকে সুন্দরবনে পালিয়ে যায়। অনেকে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে। আর অনেকে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত করে (১৭৮৪)। জমিহারা এসব কৃষক ডাকাত নামে এবং তাদের নায়করা ডাকাত-সর্দার নামে অভিহিত হত। এরা নানা স্থানে সরকার, জমিদার ও মহাজনদের অর্থ ও ধান-চাল লুট করত। কখনো-বা কৃষকরা ইংরেজদের হাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত জমিদারদের অধীনেও সংঘবদ্ধ হয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করত। যেমন নড়াইল-এর জমিদার কালীশঙ্কর কৃষকদের সংগঠিত করে ইংরেজদের অতিরিক্ত রাজস্ব দাবি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন (১৭৯৬)।

রংপুর বিদ্রোহ

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে খ্যাতনামা বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক রংপুর ও দিনাজপুরের পৈশাচিক তাণ্ডবের কাহিনী বর্ণনা করতে করতে ক্ষোভে রোষে তাঁর কথা শেষ করতে পারেন নি। সে-কাহিনী হল গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রিয় সুহৃদ দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শোষণ-উৎপীড়নের কাহিনী। দেবী সিংহ নায়েব-দেওয়ান মুহম্মদ রেজা খাঁর কৃপায় পূর্ণিয়া প্রদেশের ইজারা এবং শাসনভার লাভ করেছিলেন।

পূর্ণিয়ার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লাভ করেই দেবী প্রজাদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতে থাকেন। তাঁর অত্যাচারে কৃষকগণ অতিষ্ঠ হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বনেজঙ্গলে পালায়। অল্পকালের মধ্যে সমগ্র প্রদেশ প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। অসহনীয় শোষণ উৎপীড়নে যখন চারদিকে কৃষক-আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন হেস্টিংস ১৭৭২-তে তাকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু দেবী সিংহ উৎকোচ দিয়ে হেস্টিংসকে বশীভূত করে। হেস্টিংস তাকে দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। দেওয়ানি লাভ করার পরের বছরই দেবী সিংহ দিনাজপুর, রংপুর ও এদ্রাকপুর পরগনার ইজারা নেন এবং জমিদার ও ভূস্বামীদের ওপর অবিশ্বাস্য হারে কর স্থাপন করে কর আদায়ের জন্য সকলের ওপর অমানুষিক উৎপীড়ন চালাতে থাকেন। জমিদার জমি হারাতে শুরু করে আর সেই জমি দেবী সিংহ নামমাত্র মূল্যে কিনতে থাকেন। এমনকি লাখেরাজ নিষ্কর জমিও তিনি বাজেয়াপ্ত করেন। কর আদায়ের জন্য তিনি প্রজাদের স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি বিক্রি আরম্ভ করেন। কর দিয়ে দেবীর কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় কেউ কেউ মহাজনদের কাছ থেকে ঘটিবাটি বন্ধক দিয়ে ধার নিতে থাকে। ঋণ প্রতিদিন চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেয়ে তাদের গৃহহারা জমিহারা করে ছাড়ে।

চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে স্বয়ং দেবী সিংহ লেখেন, 'ইহা অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় যে, বাংলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা রংপুর প্রদেশের কৃষকদের মধ্যেই অধিক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। শস্য কাটার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় তাহাদের ঘরে কোনরূপ সম্পদ পাওয়া যায় না। কাজেই তাহাদিগকে অন্য সময়ে অতিকষ্টে আহারের উপায় করিতে হয়। এবং এই জন্য দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্যক লোক কালকবলে পতিত হইয়াছে। দুই-একটি মৃৎ-পাত্র ও এক একখানি পর্ণ কুটীর মাত্র তাহাদের সম্বল। ইহাদের সহস্রখানি বিক্রয় করিলেও দশটি টাকা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।'

এ ধরনের প্রচণ্ড অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উত্তরবঙ্গের প্রজাগণ দলবদ্ধভাবে ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ করে। ১৭৮৩-এর শেষভাগে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে সভা-সমিতি হতে থাকে। প্রথমে তারা রংপুরের কালেক্টারের নিকট তাদের দাবি সম্বলিত একটি আবেদনপত্র পেশ করে সেসব পূরণের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেয়। কালেক্টর দাবি পূরণের কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না-করায়, কৃষকগণ সশস্ত্র বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা কালেক্টরকে জানায় যে তারা আর খাজনা দেবে না। শাসনও মেনে নেবে না। তারা নূরুদ্দিন (নুরলদিন?) নামক একজনকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে নবাব বলে ঘোষণা করে। নূরুদ্দিন দয়াশীল নামে এক প্রবীণ কৃষককে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করেন। দেবী সিংহকে কর না-দেওয়ার আদেশ জারি করেন। বিদ্রোহের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কৃষকদের ওপর 'ডিং খরচা' নামে চাঁদা ধরেন। বিদ্রোহী কৃষকগণ রংপুরের সমস্ত অঞ্চল থেকে দেবী সিংহের কর-সংগ্রহকারীদের বিতাড়িত করে। বহু কর্মচারী তাদের হাতে নিহত হয়। টেপা জমিদারির নায়েব একদল বরকন্দাজ নিয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দিতে এলে তিনি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। বিদ্রোহীদের আহ্বানে কোচবিহার ও

দিনাজপুরের বহু স্থানের কৃষক নবাব নূরুদ্দিনের বাহিনীতে যোগদান করে স্ব স্ব অঞ্চলের মায়েব গোমস্তাদের বিতাড়িত করে।

দেবী সিংহ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রংপুরের কালেক্টরের শরণাপন্ন হন। কালেক্টর কয়েক দল সিপাই পাঠান। কোম্পানির সৈন্যগণ যাকে সামনে পায় তাকেই গুলি করে গ্রামের পর গ্রাম পোড়াতে পোড়াতে এগিয়ে আসে। বিদ্রোহীদের সঙ্গেও খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হতে থাকে। বিদ্রোহীরা অবশেষে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি মোগলহাট বন্দরের ওপর আক্রমণ করলে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে নবাব নূরুদ্দিন গুরুতরভাবে আহত হন। পরে মৃত্যু বরণ করেন। দয়াশীলও নিহত হন। অতঃপর ইংরেজগণ বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি পাটগ্রাম পরিবেষ্টন করে তাদের নির্মূল করে!

বিদ্রোহের জন্য ইংরেজ কোম্পানি দেবী সিংহের কাছ থেকে এক কপর্দকও রাজস্ব না-পেয়ে পিটারসন নামে এক ব্যক্তিকে সরেজমিনে সবকিছু তদন্তের জন্য পাঠায়। পিটারসন তদন্তের পর যে মন্তব্য করেন তাই এই বিদ্রোহ বোঝার জন্য যথেষ্ট। তিনি লেখেন, 'আমার প্রথম দুই পত্রে প্রজাদের ওপর কঠোর অত্যাচার এবং তারই জন্য-যে তারা বিদ্রোহী হয়েছে সেকথা সাধারণভাবে বিবৃত করেছি।...আমার প্রতিদিনের অনুসন্ধানে তা আরো দৃঢ় হচ্ছে। তারা যদি বিদ্রোহী না হত, তাহলেই আমি আশ্চর্য হতাম। প্রজাদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করা হয় নি, তাদের ওপর রীতিমত দস্যুতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা ও সবধরনের অপমানে জর্জরিত করা হয়েছে।...মানুষ চির অধীন অবস্থায় থাকলেও যেখানে অত্যাচার সীমা অতিক্রম করে, সেখানে প্রতিবিধানের জন্য তাদের বিদ্রোহ করা ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না।'

বাখরগঞ্জ বিদ্রোহ

ইংরেজ শাসনের প্রেক্ষাপটে বাখরগঞ্জের জমিদারগণ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে কৃষক শোষণ দ্বারা বিদেশী শাসকদের তুষ্ট করায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে জমিদাররাই ছিল আইন প্রয়োগকর্তা। সেই আইনই তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল লুণ্ঠন ও উৎপীড়নের একচ্ছত্র অধিকার। শাসক ইংরেজ বণিক নিজেরাও ব্যবসার নামে বাখরগঞ্জের প্রধান সম্পদ চাল, সুপারি ও নারকেল এবং দক্ষিণ অঞ্চলের লবণ দু হাতে লুটে বিদেশে চালান দিয়ে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করছিল। ইংরেজ বণিকগণ সরকারের সাহায্যে এ অঞ্চলের চাল নামমাত্র কিনে নানা গোলায় মজুত করে রাখত। অতঃপর সেই চাল অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করে বিপুল মুনাফা লাভ করত।

১৭৮৭-তে এসব লুণ্ঠনের ফলে সৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও ১৭৯১-এ জমির বন্দোবস্তে আগের চেয়ে বেশি ভূমি রাজস্ব আদায়ের সুপারিশ করা হয়। এর ফলে বহু লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তারা সুন্দরবনে গিয়ে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। এরা এ অঞ্চলে ইংরেজ দেখা মাত্র নৌকা লুট করত। মুহম্মদ হায়াত নামে একজন সর্দারের অধীন বহু কৃষক-ডাকাত দীর্ঘকাল যাবৎ এ পথে ইংরেজ

শাসক ও বণিকগণের নৌকা চলাচল অসম্ভব করে তুলেছিল। অবশেষে শাসকগণ এক বিরাট নৌবহর নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টার পর তাদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

১৭৯২-এ বাখরগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকরা ইংরেজ শাসন ও জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন বোলাকি শাহ্ নামে একজন ফকির। ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত বোলাকিও ছিলেন অন্যান্য ফকির ও সন্ন্যাসীর মতই একজন গৃহবাসী ফকির। তিনিও জমিদার ও ইংরেজদের উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি পান নি। তিনি বোঝেন যে, দুর্দান্ত জমিদার ও ইংরেজ বণিকদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে হলে চাষীদের সংঘবদ্ধ ও সশস্ত্র হয়ে বাধা দিতে হবে। তিনি তাই চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলেন। তিনি সুবান্দিয়া'র গ্রামাঞ্চলে তাদের সাহায্যে একটি ছোট দুর্গ তৈরি করেন এবং স্থানীয় চাষীদের নিয়ে রীতিমত সেনাদল গড়ে তোলেন। দুর্গের মধ্যে একটি কামারশালা এবং একটি গোলা-বারুদ তৈরির কারখানাও স্থাপন করেন। কামারশালে তলোয়ার ও বল্লম তৈরির ব্যবস্থা হয়। সাতটি কামান এবং বারটি জিঙ্গাল বা মাস্কেট বন্দুক সংগ্রহ করেন। কামানগুলো পূর্বে মোগলদের ব্যবহৃত। বোলাকি এগুলো কারিগরদের দ্বারা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন।

এভাবে সজ্জিত হয়ে বোলাকি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তার অনুচরগণ চতুর্দিকে প্রচার করে দেয় যে ফিরিঙ্গিদের রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। চাষীদের জমিদারের খাজনা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে তার গোমস্তা প্রভৃতিদের দুর্গের মধ্যে আটক করা হয়। স্থানীয় জমিদারের নায়েব খবর পেয়ে সিপাইদলসহ দুর্গ আক্রমণ করে। দুর্গের বাইরে ও ভেতরে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিদ্যায় অশিক্ষিত বোলাকির অনুচরগণ পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বোলাকি পলায়ন করেন। সিপাইরা দুর্গ ধ্বংস করে ফেলে।

সুবান্দিয়া বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও সাধারণ কৃষকও সুযোগ পেলে যে কিরূপ সুসংগঠিত হতে পারে, তারই দৃষ্টান্ত এটি রেখে গেছে।

ময়মনসিংহে পাগলপন্থী বিদ্রোহ

১৭৭৫-এ করম শাহ্ নামে একজন ফকির সুগঙ্গ গরগনায় এসে এ অঞ্চলের গারো ও হাজংদিগকে পাগলপন্থী নামক ধর্মে দীক্ষিত করেন। পাগলপন্থী ছিল আসলে সাম্যমূলক বাউল জাতীয় ধর্ম। মূল আদর্শ ছিল সত্যনিষ্ঠা; সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। জমিদারগোষ্ঠীর দীর্ঘকালের উৎপীড়ন ও শোষণে বিক্ষুব্ধ পাহাড়ী গারো, হাজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠী অল্পকালের মধ্যেই এ ধর্মমত গ্রহণ করে নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়। গারোগণ ঝুম চাষ পদ্ধতিতে তুলা ও ধান পাহাড়িয়া অঞ্চলে উৎপন্ন করত এবং সমতল ক্ষেত্রের বাজারে তুলা বিনিময় করে তেল, লবণ ইত্যাকার অত্যাবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহ করত। সামান্য পরিমাণ লবণের বিনিময়ে জমিদারগণ গারোদের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা হস্তগত করত। এছাড়াও তারা যেসব দ্রব্য বিনিময়ের জন্য সমতল ভূমির বাজারে নিয়ে আসত তার ওপর জমিদাররা অতি উচ্চ হারে কর ধার্য করত। অনেক সময় দ্রব্যাদি কেড়েও রেখে দিত। এ ধরনের উৎপীড়নের প্রতিবাদ করলে নিষ্ঠুরতা

আরো বেড়ে যেত। কখনো কখনো গারোগণও উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হয়ে দলবদ্ধভাবে সমতল ভূমিতে এসে লুণ্ঠন করে পর্বতে ফিরে যেত।

জমিদারদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুসঙ্গ পরগনার অন্তর্গত গারো অঞ্চলের শঙ্করপুর নিবাসী ছপাতি গারো নামে এক সর্দার ১৮০২-র দিকে গারো, হাজং, কোচ, মেচ, হাড়ি ও অন্যান্য অধিবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু জমিদারগণ এদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে ছপাতি তাদের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য মতলব আঁটছে। ফলে গারো ও অন্যান্যরা ছপাতির ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ছপাতি পলায়ন করতে বাধ্য হন।

১৮১৩-তে পাগলপন্থী ধর্ম প্রচারক করম শাহর মৃত্যু হলে সুসঙ্গের অধীন লেটিয়াকান্দা গ্রামের টিপু গারো স্বজাতীয়দের পাগলপন্থী মতে নতুন করে দীক্ষা দেন। টিপু তার ধর্মমতকে আরো উদার ও মানবিক করে তোলেন। তাঁর মতে সকল মানুষই আল্লাহর সৃষ্ট। কেউ কারো অধীন নয়। কেউ উচ্চ নয়। কেউ নিচও নয়। এই মত গারোদের ভেতর প্রচণ্ড উদ্দীপনা আনে। দলে দলে তারা দীক্ষিত হয়ে টিপুর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। প্রচণ্ড করভারে জর্জরিত সুসঙ্গ গরগনার প্রজাগণ ১৮২৫-এর দিকে টিপুর নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আবোয়াব, খরচা, মাথট প্রভৃতি নানাধরনের কর ধার্য করে জমিদারেরা প্রজার ওপর উৎপীড়ন আরম্ভ করলে, তা সহ্য করতে না-পেরে জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করলে জমিদারদের পাইক বরকন্দাজদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের গড়দরিপা'য় এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জমিদারগণ সপরিবারে পালায়। বিদ্রোহীরা শেরপুর শহর দখল পূর্বক টিপুর অধীনে এক নতুন গারো রাজ্য স্থাপন করে। শেরপুর শহরে বিচার ও শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বকসু নামে একজন বিচারক ও দীপচান নামে একজন ফৌজদার টিপু নিযুক্ত করেন। সুরক্ষিত গড়দরিপার প্রাচীরের অভ্যন্তরে বসে টিপু রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। শেরপুরের তৎকালীন পণ্ডিত রামানাথ বিদ্যাভূষণ এজন্য ব্যঙ্গ করে ছড়া লেখেন :

> বকসু আদালত করে দীপচান ফৌজদার।
> কালেক্টরের সরবরাকার গুমানু সরকার ॥

টিপুর রাজত্ব দু বছর স্থায়ী হয়। এর মধ্যে ইংরেজদের সঙ্গে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে রংপুর থেকে একদল ইংরেজ সৈন্য জামালপুরে আসে। ১৮২৭-এ প্রচণ্ড যুদ্ধে টিপুর অনুগামিগণ পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। গড়দরিপা থেকে টিপুকেও বন্দী করা হয়। পরে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

টিপুর পর তাঁর সহকর্মী গুমানু সরকার গারোদের দলপতি রূপে পুনরায় ১৮৩৩তে ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। উজির সরকার নামে আর এক গারো সর্দার হন তার সহকর্মী। ক্রমে জান্‌কু পাথর ও দোবরাজ পাথর নামে অন্য দুজন গারো সর্দারও বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন। ইংরেজদের এ সব বিদ্রোহ দমন করতে বহু বেগ পেতে হয়। ১৮৩৭ থেকে ১৮৮২-এর মধ্যে অন্তত ছ'বার এ ধরনের বিদ্রোহ

সংঘটিত হয়। ইতোমধ্যে ১৮৫২তে কারাগারে টিপুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরও টিপুর গৃহ তাঁর শিষ্যদের পীঠস্থান ছিল। তাঁর শিষ্যরা বিশ্বাস করত টিপুর গৃহে কাজ করলে ও তাঁর প্রতি ভক্তি থাকলে জীবনে অসাধ্য সাধন করা যায়। তাঁরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করত না।

তিতুমির-এর বিদ্রোহ

মির নিসার আলি ওরফে তিতুমির পরিচালিত বারাসত বিদ্রোহ সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত ওয়াহাবি আন্দোলনের একটি অংশ। আরব দেশের আবদুল ওয়াহাব এ আন্দোলন প্রবর্তন করেন। তাঁর নামেই এটি ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। তবে এর তাৎপর্যগত অর্থ নবজাগরণ। আসল নাম তারিকা-ই-মুহম্মদিয়া। সেকালে আরব এবং অন্যত্র মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম ও রীতি-নীতিতে যেসব কুসংস্কার ও আচার-আচরণ প্রবেশ করেছিল তা দূর করে মূল ইসলামকে জনসাধারণ্যে প্রচলিত করাই ছিল এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। উত্তর ভারতে রায় বেরিলি'র সৈয়দ আহমদ ছিলেন ভারতবর্ষে এ আন্দোলনের প্রবর্তক। তিতুমিরের সাথে মক্কায় তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিতু ওয়াহাবি আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে ১৭৭২-এ তিতুমিরের জন্ম। মক্কা থেকে দেশে ফিরে তিনি মুসলমানদের ভেতর থেকে বিধর্মী আচার-ব্যবহার দূর করায় মনোযোগ দেন। তাঁর মতে, পীর গয়গম্বর মানা বৃথা, মন্দির মসজিদ করার দরকার নেই, ফয়তা বা চল্লিশা অনুষ্ঠান অপ্রয়োজনীয়, টাকা ঋণ দিয়ে সুদ নেওয়া হারাম, আল্লাহর সাথে কারো শরিক করতে নেই, তাঁর সাথে মানুষের কোন গুণের তুলনা হয় না, ফেরেশতাদের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য-অর্চনা কিংবা ভুত-প্রেত দৈত্যে বিশ্বাস অথবা পির-শিক্ষকদের প্রতি অতিভক্তি বা পির পূজা খারাপ, হালাল উপার্জন কাম্য ইত্যাদি। তাঁর অনুসারীরা আলাদা থাকত। খাওয়াখাদ্যও নিজেদের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখত। মোল্লাদের নানা প্রকার অন্যায়-আব্দার উপেক্ষা ও অনৈসলামিক আচার পরিত্যক্ত করায় এবং জমিদার নীলকর-মহাজনের উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বক্তব্য থাকায় নিম্নশ্রেণীর বহু মুসলমান তিতুমিরের বক্তব্য গ্রহণ করতে থাকে। এর ফলে ধনী ও গোঁড়া মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হয় এবং জমিদার-জোতদাররাও আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে জমিদাররা তিতুর অনুসারীদের ওপর দাড়ির খাজনা ধার্য করে। মুসলমানগণ ধর্মীয় অনুশাসন হিসেবেই দাড়ি রাখত। এর ওপর খাজনা ধরলে স্বভাবতই তারা খেপে ওঠে। স্থানীয় জমিদার কৃষ্ণদেব রায় স্বগ্রাম পুঁড়া থেকে এ খাজনা আদায় করতে সক্ষম হলেও সর্পরাজপুর গ্রামে তাঁর বরকন্দাজরা খাজনা আদায় করতে গেলে গ্রামবাসিগণ তাদের তাড়িয়ে দেয়। অতঃপর জমিদার স্বয়ং বহু লাঠিয়াল নিয়ে এলে এক প্রচণ্ড দাঙ্গা শুরু হয়। জমিদারের লোক বহু গৃহ লুট করে। মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। পরে উভয় পক্ষ বাদুরিয়া থানায় মামলা দায়ের করলে জমিদারই নির্দোষ প্রমাণিত হয়। এতে জমিদার আস্কারা পেয়ে তিতুমিরের অনুসারীদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মামলা

এবং খাজনা আদায়ের ছলে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন শুরু করে। ওয়াহাবিগণ উচ্চ আদালতে আপিল করতে গেলে তার সুবিধেও পায় না।

এসব কাণ্ডকীর্তির ফলে তিতুমিরের বুকের আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ করে রসদ সংগ্রহ করতে থাকেন। সেসব নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে মজুত হতে থাকে। মিসকিন শাহ্ নামে একজন ফকির তাঁর শিষ্যদলসহ তিতুর দলে যোগ দিলে তাঁর শক্তি বহুগণ বেড়ে যায়। ১৮৩০-তে তিতুমির পুঁড়া গ্রাম আক্রমণ করেন। মসজিদ ধ্বংসের জন্য মন্দির গো-রক্ত দ্বারা অপবিত্র করেন। পুরোহিত বাধা দিতে গিয়ে আহত ও পরে নিহত হয়। গ্রামের বাজার লুট হয়। যেসব ধনী মুসলমান ওয়াহাবিদের বাধা দিত, তাদের গৃহও লুট হয়। এর কয়েকদিন পর তিতুমির ঘোষণা করেন যে, কোম্পানির শাসন সাঙ্গ হয়েছে। তিনি নিজেকে ভারতের মুসলমান শাসনের প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং জমিদারদের নিকট রাজস্ব দাবি করেন। ফলে জমিদার ও নীলকরগণ তাঁর ওপর খেপে ওঠে। কিন্তু কয়েকটি সংঘর্ষে তারা পরাজিত হলে তিতুমিরের আধিপত্য বেড়ে যায়। প্রজাগণ তাঁর নির্দেশে জমিদারদের দেয় খাজনা বন্ধ করে দেয়। নানা স্থানে লুট শুরু করে। নদীয়া এবং বারাসত অঞ্চলে যেসব নীলকুঠি ছিল তারও খাজনা আদায় বন্ধ হয়ে পড়ে। প্রজাগণ নীল চাষ বন্ধ করে দেয়। ফলে কুঠিয়াল এবং জমিদারগণ একত্রে প্রথমে নদীয়া ও বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এবং পরে বাংলার ছোটলাটের নিকট তিতুমিরকে দমনের জন্য আবেদন জানায়। ছোটলাটের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার-এর অধীনে একদল সিপাই প্রেরিত হলে তা তিতু-বাহিনীর হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। ফলে তিতুমিরের প্রভাব আরো বেড়ে যায়। বহু লোক তাঁর দলভুক্ত হয়। তিতুমির নিজেকে স্বাধীন বাদশা বলে ঘোষণা করেন। মইনুদ্দিন নামে এক জোলা হন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। তিতুর ভাগ্নে গোলাম মাসুম বা মাসুম খাঁ হন সেনাপতি। অনেক গ্রামের হিন্দু ও মুসলমানগণ তিতুকে স্বাধীন বাদশা বলে স্বীকার করে নেয়। তিনি নারকেলবেড়িয়া গ্রামে বাঁশের একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। অসংখ্য বাঁশ ও মাটি দিয়ে তাঁর অনুচরগণ এই বাঁশের কেল্লা তৈরি করে। কেল্লার ভেতরে তৈরি হয় অনেক প্রকোষ্ঠ। কোনটায় থাকে খাবার, কোনটায় অস্ত্রশস্ত্র, কোনটায় যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কাঁচা বেল ও ইটের টুকরো।

তিতুমিরের কাজকর্মের খবর ও আলেকজাণ্ডারের পরাজয় গর্ভনর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ-এর কাছে গেলে তাঁর আদেশে জমিদার-নীলকরদের সাহায্যে একটি ইংরেজ বাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। বাখারিয়া নামক স্থানে মাসুম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জমিদার-নীলকরদের পাইক-বরকান্দাজ সম্মিলিত সরকারি বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। এর ফলে তিতুমিরের প্রভাব ও আধিপত্য এত বেড়ে ওঠে যে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান প্রজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। ভূষণা রাজ্যের অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার মনোহর রায়ও তার দলভুক্ত হন বলে কথিত। এসব খবরে বেন্টিঙ একজন কর্নেলের অধীনে একদল গোরা সৈন্যসহ একটি সিপাইদল পাঠান। ১৮৩১-তে এ বাহিনীর কামানের গোলার আঘাতে তিতুর বাঁশের কেল্লা ধসে পড়ে। তিনি স্বয়ং নিহত হন। তাঁর আটশত

অনুচরকে বন্দী করা হয়। পরে একশ চল্লিশ জনকে নানা মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মাসুমকে দেওয়া হয় প্রাণদণ্ড।

এ আন্দোলনের মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে খ্যাতনামা আইনজীবী এনেস্টি প্রমাণ করেন যে, এ বিদ্রোহ বস্তুত কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়, বরং এটি ভারতের বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই। সওয়াল জবাবের মধ্য দিয়ে যেসব রাজনীতিক তথ্য প্রকাশিত হয়, সেসব ভারতের প্রথম স্বদেশী যুগের শত শত কর্মীকে অনুপ্রাণিত করে বলে পরবর্তীকালে বিপিন চন্দ্র পাল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। উইলিয়ম হান্টার এবং কান্টওয়েল স্মিথ নানাভাবে প্রমাণ করেছেন যে, এ অভ্যুত্থানের অংশগ্রহণকারিগণ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল জমিদারের গৃহ লুট করেছিল, রাজনৈতিক কার্যকলাপের কোনটিই কেবল হিন্দুবিরোধী ছিল না। বস্তুত, এ সংগ্রাম জমিদার-জায়গিরদার-নীলকর-মহাজনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল বলে বহু ক্ষেত্রে হিন্দু কৃষকগণও তাতে যোগদান করেছিল। তবে জমিদার-মহাজনের বেশির ভাগই হিন্দু থাকায় এ সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করা সুবিধা হয়। হান্টারের ভাষায়, ওয়াহাবিরা ছিল ধর্মীয় বিষয়ে ফরাসী বিপ্লবের এনাব্যাপটিস্ট এবং রাজনৈতিক বিষয়ে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী সাধারণতন্ত্রীদের অনুরূপ। সমসাময়িক সরকারি নথিপত্রেও বলা হয়েছে যে, ওয়াহাবিদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। এরা সকলেই নিম্নশ্রেণীর মানুষ। সংখ্যায় আশি হাজার। কান্টওয়েল স্মিথের মতে, এ আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় ধ্বনি দিয়ে আরম্ভ হলেও শেষ পর্যন্ত এটি ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জমিদার-নীলকর-মহাজন শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল।

ফরায়জি বিদ্রোহ

আরবি শব্দ ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য থেকে ফরায়জি কথাটি উদ্ভুত। হাজী শরিয়তউল্লাহ ও তার পুত্র মোহম্মদ মুহসিনউদ্দিন আহমদ ওরফে দুদুমিয়া ছিলেন এ মতবাদের প্রবর্তক। সেকালে প্রচলিত ইসলাম ধর্মের মৌলিক সংস্কার করে ফরজ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। যারা তাঁদের নির্দেশিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী ফরজ পালন করত তারাই ফরায়জি।

মাদারীপুর জেলার সামাইল গ্রামে শরিয়উল্লাহ্‌র ১৭৮১-তে জন্ম হয়। আঠার বছর বয়সে মক্কা গিয়ে ওয়াহাবি মতের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। বিশ বছর পর দেশে ফিরে এসে সংস্কার কাজে মনোযোগ দেন। মুসলমানদের কৃত অনৈসলামিক কাজকর্মকে তিনি কবিরা গুনাহ্‌ বা মহাপাপ বলে ঘোষণা করেন। এই সব পাপকে তিনি দুভাগে ভাগ করেন—বেদাত ও শেরক। কবর পূজা, পির পূজা, সেজদা দেওয়া ইত্যাদি হল শেরক যা আল্লাহর শরিক হওয়ার মত মনে হয়। আর গাজি-কালুর প্রশস্তি গাওয়া, পাঁচপির-পির বদর-খাজা খিজিরের দোহাই দেওয়া, ভেরা ভাসান, জারি গান গাওয়া, জন্মের সময় ছটি পালন, মহরমে শোক করা বা আশুরা পালন ইত্যাদি হল বেদাত বা ইসলাম-

অননুমোদিত। তিনি পির-মুরিদি প্রথা বাতিল করেন। পির অর্থে বোঝায় প্রভু, মুরিদ-এ অনুগত শিষ্য বা ভৃত্য। এতে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হয়, যা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। কারণ ইসলামে এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ প্রভু হতে পারে না। তিনি তাঁর শিষ্যগণকে ওস্তাদ বা শিক্ষক এবং সাগরেদ বা শিক্ষার্থী (ছাত্র) শব্দ দুটি ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি বইয়াত প্রথায় হাত মিলানো বাতিল করেন। তাঁর সাগরেদকে অতীত-গুনাহ্র জন্য অনুতাপ করা এবং ভাবী জীবনে সত্য ও ন্যায়ের তথা আল্লাহর রাহে চলার জন্য শপথ নিতে হত। তওবা করাতেন ওস্তাদ, সাগরেদকে স্পর্শ না-করে। তওবার ভাষা ছিল বাংলা। তৌহিদিবাদে অবশ্যই এদের আস্থাবান হতে হত এবং কুফর, শিরক ও বিদাহ্ থেকে মুক্ত থাকতে হত, যেমন হিন্দু উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান, ফাতেহা পাঠ ইত্যাদি। সুফিদের প্রতিও অতি ভক্তি, রসুল বা পিরে আত্মসমর্পণ, ওরস উদযাপন, পুঁথি পাঠ, চিল্লা বা চল্লিশা বাতিল ছিল। কেবল আকিকা ছিল সমর্থিত। প্রসবকালে দাই রাখা এবং বর্ণবৈষম্য ছিল অবশ্যই ঘৃণার্হ। কাপড়-চোপড় নির্দেশমত পরতে হত। পাজামা ও লুঙ্গি ছিল অনুমোদিত। ধুতি পরলে কাছাখোলাভাবে পরতে হত যাতে উরু ঢাকা পড়ে। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ দারুল হারব বা মুসলমান বাসের অনুপযোগী বলে ঘোষিত ছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ করা ছিল কর্তব্য। দারুল হারব বলেই এদেশে জুম্মার নামাজ পড়া এবং দু ঈদ উদযাপন নিষিদ্ধ ছিল। হানাফি আইনে যেখানে শাসক ও বিচারক আইনসঙ্গত মুসলমান সুলতান দ্বারা নিয়োজিত নয়, সেখানে এসব নাজায়েজ।

প্রচলিত এসব ধর্মীয় আচারের বিরুদ্ধে শরিয়তউল্লাহ্র প্রচার সাধারণ মুসলমানদের ভীষণ নাড়া দেয় এবং গ্রামের বহু গরিব কৃষক তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কৃষকদের ভেতর তাঁর প্রভাব ও সঙ্ঘবদ্ধতা দেখে জমিদারগণ ভীত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে প্রচলিত ধর্মের সংস্কারে প্রাচীনপন্থী মুসলমানরাও বিক্ষুব্ধ হয়। সামাজিক আচার থেকে হিন্দু প্রভাব দূর করার মাধ্যমে মুসলমান প্রজাগণ হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে খেপে যেতে পারে ভেবে হিন্দু জমিদারগণও শরিয়তউল্লাহ্র বিরোধিতা শুরু করে। বস্তুত হিন্দু জমিদার কর্তৃক গরু জবাই নিষেধ করা এবং নানাপ্রকার পূর্জাপার্বণ উপলক্ষে মুসলমানদের ওপর কর আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য শরিয়তুল্লা আহ্বান জানিয়েছিলেন। এর ফলে ফরায়জি কৃষক ও হিন্দুদের ভেতর অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। শরিয়তউল্লাহ নানা স্থানে নিগৃহীতও হন। তাঁর প্রচার কার্যের স্থান ঢাকার নয়াবাড়ি থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হলে তিনি জন্মস্থান ফরিদপুর চলে যান। অতঃপর সেখানে তাঁর প্রচারকার্য চলতে থাকে।

১৮৪০-এ শরিয়উল্লাহ্র মৃত্যুর পর ফরায়জি আন্দোলনকে সারাদেশে একটি সুসংঘটিত ভ্রাতৃত্বের রূপ দেন তাঁর পুত্র দুদুমিয়া। ১৮১৯-এ তাঁরা জন্ম। তরুণ বয়সেই মক্কা গমন করেন। সেখানে সৈয়দ আহমদের সাথে পরিচিতি ঘটে। ফিরে এসে তিনি প্রচার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পির প্রথার সমর্থন করেন নিজেকে পির বলে ঘোষণা করেন। তিনি নাকি খোয়াব বা স্বপ্ন দেখতেন এবং তার কাছে বাণী

আসত। আরবিয়গণের তিদ্দি বা পঙ্গপাল খাওয়া নিষেধ ছিল না বলে তিনি সাগরেদদের ফড়িং খাওয়ার অনুমতি দেন সেই অনুসরণে। শুক্রবারে জুম্মার স্থানে জহুর নামাজ ফরজ করেন। তিনি প্রচার করেন যে, সকল মানুষই সমান। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এ পৃথিবীতে কর ধার্য করার অধিকার কারো নেই। কারণ জমির মালিক আল্লাহ্‌, কোন মানুষ নয়। জমি আল্লাহ্‌র দান। ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বংশ পরম্পরায় দখল করে রাখার কোন অধিকার নেই। এর ওপর কর দেওয়ার কারো কোন প্রয়োজনও নেই। এ রকমের তেইশ ধরনের কর দিতে তিনি সাগরেদদের নিষেধ করেন। জমিদার ও নীলকরদের যাতে কোন করই না-দিতে হয় সেজন্য তিনি কৃষকদের সরকারি খাস-জমিতে গিয়ে বসতি স্থাপনের পরামর্শ দেন। জীবন-ঘনিষ্ঠ দুদুমিয়ার এসব কথা কৃষক-কারিগরদের ভেতর প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

সরকারি বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ সাধন এবং স্বাধীন ভারত বা স্বাধীন বাংলায় স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপনের জন্যই দুদুমিয়া চেষ্টা চালিয়েছিলেন। মুন্সিগঞ্জের রিকাবিবাজারস্থ ফরায়জিদের মতে, শরিয়তউল্লাহ্‌ যে-স্থানীয় পঞ্চায়েত সৃষ্টি করেছিলেন দুদুমিয়া সামাজিক বিচারের জন্য তা পরিবৃদ্ধি করেন। তিনি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ফরায়জি মতাবলম্বী বৃদ্ধ কৃষকদের অধীনে বিচার কাজ চালু করেন। কেউ এ বিচারালয়কে অমান্য করে ইংরেজদের বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। এ বিচারব্যবস্থা শীঘ্রই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া, তিনি তাঁর অনুসারীদের অধীন করে সমগ্র পূর্ববঙ্গকে কতকগুলো হাল্‌ক্‌ বা অঞ্চলে ভাগ করেন। প্রতিটি হাল্‌ক্‌ হয় ৩০০ থেকে ৫০০ পরিবার নিয়ে। তাতে তাঁরা সিয়াসি বা খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এরা নিজ নিজ অঞ্চলের সকল ফরায়জিকে একতাবদ্ধ করে রাখতেন। তাদের ওপর যাতে কোন উৎপীড়ন না-হয় তার ব্যবস্থা করতেন। তাদের নিকট থেকে নিয়মিতভাবে চাঁদা সংগ্রহ করতেন। এছাড়াও তারা দুদুমিয়াকে স্ব স্ব অঞ্চলের সব ধরনের সংবাদ প্রদান করতেন। যেখানেই জমিদারগণ কৃষকদের ওপর অন্যায় কর বসাত বা উৎপীড়ন করত সেখানেই কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করে ইংরেজদের আদালতে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা চালান হত। সম্ভব হলে লাঠিয়াল দল পাঠিয়ে জমিদার ও তাদের অনুচরদের শাস্তি দেওয়া বা সম্পত্তি ধ্বংস করা হত। দুদুমিয়া নিজেও শিষ্যদের ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করতেন, বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন এবং বিচার কার্য নির্বাহ করতেন।

দুদুমিয়ার সংগ্রাম যেহেতু শোষক জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে ছিল, সেজন্য হিন্দুগণও তাঁর সাথে যোগদান করে। তাঁর নেতৃত্বে অন্তত পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলমান কৃষক যে-কোন সময় জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লাঠি হাতে নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইতস্তত করত না। জালালুদ্দিন মোল্লা নামে এক লাঠিয়াল বীরকে সেনাপতি করে একটি সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে ওঠে। এভাবে ফরিদপুর, বিক্রমপুর, খুলনা, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি স্থানে তাঁর মত বিস্তৃত হয়। তাঁর নেতৃত্বে কৃষক প্রজাগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখে এবং তাদেরকে আর আগের মত দমন করতে না-পেরে

সকল জমিদার ও নীলকর তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা প্রজাদের দুদুর শিষ্যত্ব গ্রহণে বাধা দান ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে থাকে। একটা শাস্তি ছিল, কয়েকজন কৃষকের দাড়ি একত্রে বেঁধে তাদের নাকে শুকনো লঙ্কার গুঁড়া ঢুকিয়ে দেওয়া। এদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করার জন্য দুদুমিয়ার নির্দেশে কৃষক-লাঠিয়ালদলও জমিদার- নীলকরদের সম্পত্তি ও কুঠি ধ্বংস করতে থাকে। এভাবে নানা স্থানে দু দলে সংঘর্ষ চলতে চলতে ১৮৩৮-তে তা ভীষণ আকার ধারণ করে। সেটি দমনের জন্য ঢাকা থেকে একটি সিপাইদল যায়।

কোনমতেই জমিদার ও কুঠিয়ালগণ দুদুমিয়াকে দমন করতে না-পেরে অবশেষে গৃহ-লুণ্ঠনের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করায়। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত না-হওয়ায় তিনি ছাড়া পান। এরপরও আন্দোলন বানচাল করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বহু ফৌজদারি মামলা রুজু করার হয়। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে প্রতিটি মামলা থেকেই তিনি মুক্তি পান। অবশেষে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে তাঁকে ১৮৫৭তে কোলকাতায় অন্তরীণ করে রাখা হয়। মহাবিদ্রোহের অবসানের পর ১৮৬০তে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু জেলে থাকতে থাকতেই তিনি নানা ব্যধিতে আক্রান্ত হন। অতঃপর ১৮৬২-তে ঢাকায় পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর নেতৃত্বহীন অবস্থায় আন্দোলন ভেঙে পড়লেও বহুদিন পর্যন্ত ফরায়জি মতবাদ ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে সক্রিয় ছিল। ১৮৪০-এর দিকে ঢাকার এক-তৃতীয়াংশ লোকই ফরায়জি ছিল বলে জেমস টেইলর জানান।

আপাতদৃষ্টিতে ফরায়জি আন্দোলনকে ধর্মীয় আন্দোলন মনে হলেও এর মাধ্যমে দুদুমিয়ার নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা, কৃষক স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে এ সরকারের সেনাবাহিনী গঠন, স্বাধীন বিচারালয় স্থাপন, বিস্তৃত অঞ্চলের জনসাধারণের নিকট থেকে চাঁদা হিসেবে কর আদায় ইত্যাদি কাজকর্ম একে জনগণের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিশিষ্টতা দান করেছে।

সুন্দরবনে বিদ্রোহ

সুন্দরবন অঞ্চলের বারুইখালি গ্রামটি ছিল মরেল নামে এক ইংরেজ জমিদারের অধীন। জমিদারের ম্যানেজার ডেনিস হেলি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর উদ্ধত চরিত্রের ব্যক্তি। তার উৎপীড়নে গ্রামবাসীরা সবসময় ভীতসন্ত্রস্ত থাকত। কিন্তু বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করতেন গ্রামের কৃষক-মোড়ল রহিমউল্লাহ। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল। হেলির লাঠিয়ালগণ গ্রামের যেখানেই হানা দিত সেখানেই রহিম সদলবলে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীদের রক্ষা করতেন। তাই হেলিও সব সময় তাকে শায়েস্তা করার সুযোগ খুঁজত।

১৮৬১-এর নভেম্বর মাসে রহিমের সঙ্গে তাঁর বিত্তশালী প্রতিবেশী গুনী মাহমুদ তালুকদারের জমির সীমানা নিয়ে বিরোধ বাধে। গুনী ছিল জমিদারের দলভুক্ত। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এসে হেলি গুণীর পক্ষে রায় দিলে রহিম এই পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ করে তা অগ্রাহ্য করেন। হেলিকে অপমানিত হয়ে গ্রাম থেকে যেতে হয়। এর প্রতিশোধ

গ্রহণের জন্য হেলি কয়েকদিন পর একদল লাঠিয়াল নিয়ে রহিমকে শাস্তি দিতে গেলে রহিমউল্লাহ্‌র দলের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে হেলির দল পরাজিত হয় ও পলায়ন করে। পরদিন রাতে হেলি স্বয়ং বহু লাঠিয়াল ও বন্দুকধারী বরকন্দাজ নিয়ে রহিমের বাড়ি আক্রমণ করে। রহিমও তার দলবলসহ প্রস্তুত ছিলেন। সমস্ত রাত ধরে উভয় পক্ষের সংঘর্ষ চলে। অসম যুদ্ধে রহিমের সঙ্গীরা একে একে মারা গেলে রহিম একাই যুদ্ধ চালাতে থাকেন। অবশেষে গুলিগোলা শেষ হয়ে গেলে তিনি ঢাল ও রামদা হাতে হেলির বাহিনীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং গুলি লেগে প্রাণত্যাগ করেন। এরপর হেলির লোকেরা গ্রামের ঘরবাড়ি লুট করে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে। মহিলারাও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায় না।

বারুইখালির এই ঘটনার সময় খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন খুলনার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ব্যাপারটি স্বয়ং সরেজমিনে তদন্ত করে হেলির লোকজনদের বিচারের ব্যবস্থা করেন। সনাক্তকরণের অভাবে হেলি মুক্তি পেলেও কথিত যে সে পরে আসামে বজ্রাঘাতে মারা যায়। তদন্তকালে বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ টাকা ঘুষ সাহেবরা দিতে চেয়েছিল, এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছিল বলে জানা যায়। 'বারুইখালির এই সংগ্রামের কাহিনী,' সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায়, 'একদিকে যেমন বঙ্গদেশের জমিদারি শোষণ-উৎপীড়নের বীভৎস রূপ এবং পরাধীন ভারতের কৃষক জনসাধারণের অসহায় অবস্থা স্পষ্টরূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, তেমনই অপর দিকে ইহা এই সত্যও উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে যে, যতদিন শোষণ-উৎপীড়নমূলক সমাজব্যবস্থা বজায় থাকিবে ততদিন কৃষক জনসাধারণকেই একাকী দুর্দান্ত শত্রুর উৎপীড়ণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এবং কৃষক জনসাধারণের মধ্য হইতেই রহিমউল্লার মত বীর যোদ্ধারা আবির্ভূত হইয়া অসহায় ও হতাশাচ্ছন্ন কৃষক জনসাধারণের মধ্যে সাহস সঞ্চার করিবে। এই সকল কৃষক বীর অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য রহিমউল্লার মত শেষ রক্তবিন্দু দিয়া সংগ্রাম করিয়া কোটি কোটি কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিবে।'

নীল বিদ্রোহ

লুই বন্নো নামে একজন ফরাসী ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম নীল চাষ আরম্ভ করেন। পর বৎসর ক্যারেল ব্লুম নামে এক ইংরেজ আর একটি নীলকুঠি স্থাপন করে বাংলার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে জানান যে এদেশে নীলের চাষ বিপুল মুনাফা লাভের একটি উৎস হতে পারে। আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হলে বস্ত্রশিল্পের জন্য রঞ্জন দ্রব্য তথা নীল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এদেশে নীলের চাষও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। ১৮০৩ পর্যন্ত নীল চাষের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হত তা প্রায় সবই কোম্পানি অল্প সুদে নীলকরদের আগাম দিত। যে নীল প্রস্তুত হত, তার প্রায় সবটাই কোম্পানি কিনে নিয়ে ইংলণ্ডে চালান দিত। কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে নীল কিনত প্রতি পাউণ্ড এক টাকা চার আনা দরে আর তাই ইংলণ্ডে নিয়ে বিক্রি করত পাঁচ

থেকে সাত টাকায়। এ ধরনের লাভের ফলে নীলের চাষ এদেশে এত ব্যাপক হয় যে ১৮১৫ থেকে বাংলাদেশই সমস্ত পৃথিবীর নীলের চাহিদা মিটিয়ে আসতে থাকে। আর এ লাভ দেখে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও চাকরি ছেড়ে নীলকুঠি স্থাপন করতে থাকে। দেশীয় জমিদারগণও সেই পথ ধরে।

নীল চাষের ব্যবস্থা হত দু ভাবে : নিজ-আবাদী অর্থাৎ নীলকরদের নিজের জমিতে দিনমজুর বা খেতমজুর দ্বারা, এবং রায়তি-আবাদি বা দাদনি-আবাদি অর্থাৎ রায়তকে দাদন বা আগাম অর্থ দিয়ে তার জমিতে তারই ব্যয়ে নীলের চাষ করানো। নিজ-আবাদি ব্যবস্থায় বহুদূর হতে, যেমন বাঁকুড়া, বীরভূম, সিংভূম, মালভূম থেকে সাঁওতাল শ্রমিকদের আনতে হত। পুরুষ শ্রমিকদের মজুরী ছিল মাসে তিন টাকা, আর নারী ও বালকদের ছিল দু টাকা। এসব ব্যয় বহন করতে হত নীলকরদেরই। অন্যদিকে, রায়তি বা দাদনি আবাদে রায়ত তথা কৃষককে মাত্র দু টাকা দাদন বা অগ্রিম দিয়ে নীল চাষের সমস্ত কাজ করানো হত। দাদনের এ টাকা থেকেই তাকে লাঙ্গল, সার, বীজ, নিড়ানো, গাছ কাটা প্রভৃতি সব ব্যয় বহন করতে হত। পরে গাছগুলো বাণ্ডিল করে কুঠিতে পৌঁছিয়ে সে যে টাকা পেত তাতে তার তিন বা চারগুণ লোকসান হত, কিন্তু নীলকরের লাভ হত কমপক্ষে শতকরা একশত। এজন্য এ ব্যবস্থাই নীলকররা বেশি পছন্দ করত।

প্রতি বিঘায় দশ থেকে বারো বাণ্ডিল করে নীল গাছ হত। এক হাজার বাণ্ডিলে পাঁচ মন করে নীল প্রস্তুত হত। দু সের নীলের দাম ছিল দশ টাকা এবং প্রতি মণ দু শ টাকা। কিন্তু রায়তি চাষে দশ বাণ্ডিল নীল গাছের জন্য টাকায় চার বাণ্ডিল হিসাবে চাষী দু টাকা আট আনার বেশি পেত না। 'দশ বাণ্ডিল গাছ থেকে রং প্রস্তুত করতে', প্রমোদ সেনগুপ্ত *নীলবিদ্রোহ* গ্রন্থে জানান, 'নীলকরদের এক টাকার অনেক কম লাগত। যদি এক টাকাই ধরা যায়, তাহলে তার দুই সের নীলের মোট খরচ হত তিন টাকা আট আনা, আর এই দুই সের নীলের দাম পেত সে (নীলকর) ১০ টাকা। সুতরাং তার (নীলকরের) লাভ থাকত দুই সেরে ছয় টাকা আট আনা এবং এক মণ নীলরংয়ে (যার দাম ২০০ টাকা) সে (নীলকর) লাভ করত ১৩০ টাকা।' আসলে, প্রকৃত লাভ এর চেয়েও বেশি হত।

দাদন নেওয়ার সময় চুক্তিপত্রে নীলচাষের জমির পরিমাণ এবং নীলকরের কাছে বিক্রিয় মূল্য চাষীকে লিখে দিতে হত। চাষী কোন কারণে চুক্তির শর্ত পূরণ করতে না পারলে যেমন রেহাই ছিল না, তেমন একবার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলে তাকে আমৃত্যু নীল বপন করতেই হত। কেউ অস্বীকৃতি জানালে নীলকরের কারাগারে আবদ্ধ হয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হত, তার ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হত এবং স্ত্রী-পুত্রকে পথের ভিখারি হতে হত। বাংলার ফৌজদারি আদালতের সমসাময়িক নথিপত্র প্রমাণ করে যে রায়তদের যে-সমস্ত পন্থায় নীল চাষে বাধ্য করা হত তার মধ্যে হত্যাকাণ্ড, বিচ্ছিন্ন অথবা ব্যাপকভাবে খুন, গুণ্ডামি, বেত্রাঘাত, দাঙ্গা, লুটতরাজ, গৃহদাহ আর লোক-অপহরণ প্রধান। ১৮৪৮তে *ক্যালকাটা রিভিউ* পত্রিকায় লেখা হয়,' নীলকর সাহেব এক ভাগ্যান্বেষী বেপরোয়া দুর্বৃত্ত মাত্র।...তার উপায় হল পঞ্চাশ থেকে একশত বিঘা কিংবা আরো বড় আকারের একটা জমি কেনা এবং সঙ্গে কতকগুলো গামলা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি

সংগ্রহ করে একটা ফ্যাক্টরি স্থাপন করা।...ফ্যাক্টরির জমি, এমন কি ফ্যাক্টরিটিও বেনামিতে থাকত।'

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এ সময় দাসপ্রথার অবসান হলে সেখানকার বাগিচা শিল্পের দাসদের যারা পরিচালনা করত সেই অভিজ্ঞ ইউরোপীয় দাস-পরিচালকগণকে বাংলা ও বিহারের নীলচাষে নিযুক্ত কৃষকদের পরিচালনা করার জন্য আনা হয়। তাদের কাছ থেকে বাংলার স্বাধীন কৃষকরা ভূমিদাসের তুল্য ব্যবহারই পেত। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রেরিত এক মেমোরেণ্ডামে দেশীয় জমিদারগণ জানায়, 'যে-সব জেলায় নীলকর সাহেবগণ এসে নীলের চাষ আরম্ভ করেছে সেই সব স্থানের রায়তগণ বর্তমানে অন্যান্য স্থানের রায়তদের অপেক্ষা বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। এই শোচনীয় অবস্থা নীলকর সাহেবদের দ্বারা বলপূর্বক জমি দখল এবং ধানগাছ নষ্ট করে নীল চাষের অনিবার্য পরিণতি। (এর ফলে ধানের চাষ হ্রাস পেয়েছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে)। নীলকর সাহেবগণ রায়তগণের গরু-মোষ নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে এবং বলপূর্বক প্রজাদের অর্থ কেড়ে নেয়।' নীলকরদের উৎপীড়নে ইংরেজ শাসকগণও কিছুটা শঙ্কিত না-হয়ে পারেনি বলে এক সময় কিছু নীলকরের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়। কয়েকজনের বাংলায় বসবাসের অনুমতিও নাকচ করা হয়।

বাস্তবিকপক্ষে ১৮২৩তে জমির ওপর নীলকরদের স্বত্বাধিকার স্বীকার এবং ১৮৩০-এ দাদন গ্রহণ করে নীল চাষ না-করা গুরুতর অপরাধ বলে ঘোষণা দ্বারা ইংরেজ শাসকগণ নীলচাষে উৎসাহ দিয়ে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। ১৮৩৩-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদে বাংলায় ইংরেজদের জমি কেনার অধিকার দেওয়া হলে বহু নীলকর প্রচুর জমি কিনে বড় জমিদারে রূপান্তরিত হয়। বাংলার জমিদাররাও জমির মূল্য বেশি পেয়ে তাদের কাছে জমি বিক্রি করতে থাকে। কেউ কেউ অবশ্য নীলকর বা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের ভয়েও বিক্রি করে। বহু জমিদার আবার জমিদারি বিক্রি না-করে উচ্চ খাজনায় নীলকরদের কাছে পত্তনি দেয়। পত্তনি সাধারণত পাঁচ বছর করে দেওয়া হত, পরে তা নবায়ন করতে হত। নীলকরগণও রায়তিস্বত্বসহ জমিদারি কিনত না, তা প্রজারই থাকত, তা নাহলে জমির সব খরচ নীলকরের হত। রায়তি স্বত্ব চাষীর হাতে রেখে চাষীর খরচেই নীল বুনে বেশি মুনাফা করত তাঁরা। নদীয়ার মীরজান মণ্ডল ১৮৬০-এ নীল কমিশনের কাছে বলেন যে, 'নীলকর একাধারে নীলকর জমিদার ও মহাজন। সাধারণ মহাজনের নিকট বাজারদর ছিল টাকায় চোদ্দ থেকে ষোল কাঠা ধান, কিন্তু নীলকর সেখানে দেয় মাত্র আট কাঠা, আর আমরা (নীলচাষীরা) নীলকর ছাড়া অন্য কোন মহাজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারি না।' ১৮৩৫-এ লর্ড মেকলে মন্তব্য করেছিলেন, 'নীল চুক্তিগুলো নীতিগতভাবে অত্যন্ত আপত্তিকর। একদিকে নীল চুক্তির ফলে এবং অন্যদিকে নীলকরদের বেআইনি ও হিংসাত্মক কাজের ফলে কৃষক প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হয়েছে।' ক্রীতদাস কিনতেও বহু টাকা লাগত, খাওয়াতে পরাতেও হত, কিন্তু নীলচাষী মাত্র দু টাকা দাদনে আজীবনের জন্য কেনা হয়ে যেত।

সতীশচন্দ্র মিত্র *যশোহর-খুলনার ইতিহাস* গ্রন্থে লিখেছেন, 'নীলচাষের জন্য সাহেবগণ বহু যৌথ কোম্পানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল কারবারকে বলা হইত কনসার্ন। এক একটি কনসার্নের মধ্যে নানাস্থানে কতকগুলি করিয়া কুঠি (ফ্যাক্টরি) থাকিত। কনসার্নের মধ্যে প্রধান কুঠির নাম ছিল সদর কুঠি। ম্যানেজারের অধীনে কয়েকজন দেশীয় কর্মচারী থাকিতেন। তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন নায়ের বা দেওয়ান। উহার বেতন ৫০ টাকা। নায়েবের অধীনে থাকিতেন গোমস্তা। রায়তদের হিসাব-পত্রের সহিত উহাদেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই জন্য তাহারা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে দুস্তুরী বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বেশ সুপয়সা আয় করিতেন। সাহেবদের অশ্লীল গালাগালি এবং সময় সময় বুটের আঘাত উহারা বেশ হজম করিতে জানিতেন এবং কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা চক্রান্তে পশ্চাৎপদ না হইয়া ইঁহারাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ বা মর্মান্তিক যাতনার হেতু হইয়া দাঁড়াইতেন। ইঁহাদের মধ্যে ভাল লোক বেশী দিন ভাল থাকিতে পারিত না। গোমস্তা ব্যতীত জমি মাপের আমীন, নীল মাপের জন্য ওজনদার, কুলি খাটাইবার জন্য জমাদার বা সর্দার, খবর প্রেরণের জন্য ও সময়মত রায়তগণকে কাজের তাগাদা করিবার জন্য তাগিদগীর থাকিত।' অনেক চতুর লোক সাহেবদের কুঠির মুৎসুদ্দি বা প্রধান কার্যকারক হয়ে বহু টাকা উপার্জন করত। আর এসবের ফলে নীলকুঠির আমলা কর্মচারী অর্থাৎ গ্রামের মধ্যশ্রেণীর এক অংশের অবস্থা সচ্ছল হলেও, সমগ্র দেশ এক স্থায়ী দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ছিল। নীলকরগণ শাসকগোষ্ঠীর দলভূক্ত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করা কারো পক্ষে সম্ভব হত না।

নীল চাষ বাংলার সর্বত্র বিস্তার লাভ করলেও যশোর, খুলনা ও নদীয়া জেলায়ই সবচেয়ে বেশি হত। আর এই নদীয়া জেলারই কৃষকবীর বিশ্বনাথ সর্দার ওরফে তথাকথিত বিশু ডাকাতের নেতৃত্বে উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই নীল চাষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। তাঁকে পরে বন্দী করে ফাঁসী দেওয়া হয়। ১৮২৯-এ ময়মনসিংহেও হাজার হাজার কৃষক নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এখানে নীলকরদের পক্ষ হয়ে পুলিশ কোন গ্রামে ঢোকা-মাত্র দু-তিন হাজার কৃষক এসে তাদের ঘিরে ফেলত। তাদের আসার সংবাদ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দেওয়ার জন্য কৃষক-চরগণ উঁচু গাছের চূড়া থেকে ঘন্টা বা শঙ্খধ্বনি করত। এই সাংকেতিক শব্দে পাশের গ্রামগুলোর কৃষকরা সতর্ক হয়ে লাঠি, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে দৌড়ে এসে পুলিশ বাহিনী বিতাড়িত করত। ১৮৪৩-এ টাঙ্গাইলের কাগমারি নীলকুঠির প্রধান কিং-এর প্রজারা নীল বুনতে অস্বীকার করলে একজন প্রজার মাথা মুড়িয়ে তাতে কাদা মেখে নীলের বীজ বুনে দেয়। আর একজনকে একটি বড় সিন্দুকে বন্ধ করে অন্য কুঠিতে পাঠাবার চেষ্টা করে। এতে প্রজাগণ ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হয়ে কিংকে ধরে গুম করে রাখে। বহু দিন পর পাকুল্লা থানার দারোগার সাহায্যে তাকে উদ্ধার করা হয়। রেনী নামে খুলনার এক নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকসহ জমিদার তালুকদাররাও ক্ষেপে ওঠে। এদের ভেতর তালুকদার শিবনাথ ঘোষ ও তার পক্ষের লাঠিয়াল সর্দার সাদেক মোল্লা, গয়রাতউল্লাহ, ফকির মাহমুদ, গৌর ধোপা, আফাজউদ্দিন, খান মাহমুদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এরা সবাই মিলে রেনীর দর্প চূর্ণ করেছিল, যার ফলে গ্রাম্য ছড়াও লেখা হয় :

গুলিগোল্যা সাদেক মোল্লা, রেনীর দর্প করলে চূর
বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা, ধন্য বাংলা বাঙালী বাহাদুর!

তবে এ সমস্ত বিদ্রোহকে ছাড়িয়ে যায় ১৮৫৯-৬১-র সংগ্রাম। দীর্ঘকাল হতে ধূমায়িত নীল চাষের বিরুদ্ধে অন্তর্জ্বালা ১৮৫৯ র মধ্যভাগে ব্যাপক আকারে জেলায় জেলায় বিস্ফোরিত হয়। ঔরঙ্গাবাদ মহকুমায় এণ্ড্রুজ কোম্পানির আনকুরা কুঠির ওপর বিদ্রোহীরা প্রথম আক্রমণ করে। লাঠিয়াল কৃষকদের আক্রমণে বানিয়াগাঁও নামক স্থানে অবস্থিত কুঠিটি ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। আর এমনিভাবে সর্বত্র নীল চাষ বন্ধ এবং নীলকুঠির ওপর আক্রমণ চলে। ১৮৬০-র মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে নদীয়া, যশোর, বারাসত, পাবনা, রাজশাহী, ফরিদপুর ও অন্যান্য জেলায় বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সারা দেশে বিদ্রোহ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসকগণ ভীত হয়ে ১৮৬০-এর ৩১ মার্চ নীলচাষীদের বিক্ষোভের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি নীল কমিশন গঠন করে। মজার ব্যাপার, এতে কোন কৃষক প্রতিনিধি ছিল না। একজন ছাড়া সবাই ছিল ইংরেজ। এদিকে কৃষকগণ দলবদ্ধ হয়ে ঐ বছর নীলের হৈমন্তিক চাষ বলপূর্বক বন্ধ করবে শোনে যশোর নদীয়া জেলায় দু দল পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হয়। দুটি রণতরী এ দু জেলার নদীপথে টহল দিতে থাকে। কৃষকগণ এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কেবল নীলের চাষ বন্ধ করে না, দলবদ্ধ হয়ে নীলকর এবং জমিদার-তালুকদারের খাজনাও বন্ধ করে দেয়।

১৮৬০তে ইংরেজ মুখপত্র *ক্যালকাটা রিভিউ* লেখে, 'বাংলার গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আকস্মিক ও অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে। এক মুহূর্তে তাঁরা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। যে রায়তদের সঙ্গে আমরা ক্রীতদাসের মত অথবা রুশদেশের ভূমিদাসের মত ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, জমিদার ও নীলকরদের নির্বিরোধ যন্ত্ররূপে যাদের জানি, অবশেষে তারা জেগে উঠেছে, কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে এবং প্রতিজ্ঞা করেছে যে তারা আর শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে না।' নীলকরগণও এ সময় জানায় যে, 'মফস্বলের আদালতগুলোতে কোন রায়তের বিরুদ্ধে এখন কোন মামলা দায়ের করা সম্ভব হয় না, কারণ আমাদের অভিযোগ প্রমাণ করার মত কোন সাক্ষী যোগাড় করতে পারি না। এমন কি, আমাদের কর্মচারিগণ পর্যন্ত আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে সাহস করে না।' 'আমাদের অধিকাংশ চাকর-চাকরানী আমাদের ত্যাগ করে চলে গেছে। কারণ, রায়তগণ তাদের ভয় দেখিয়েছে যে, তারা তাদের হত্যা করবে নয় ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। যে দু একজন চাকর আমাদের সঙ্গে আছে, তারাও শীঘ্রই চলে যেতে বাধ্য হবে, কারণ পার্শ্ববর্তী বাজারে তারা খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারছে না।'

ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামে একটি মাসিক পত্রে ১৮৬০-এ জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী পাদ্রী লিখেছিলেন, 'কৃষকগণ ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিতে নিজেদের বিভক্ত করেছিল। একটি কোম্পানি হয়েছিল কেবল তীরধনুক নিয়ে, প্রাচীনকালের দায়ুদের ফিঙাদ্বারা গোলক নিক্ষেপকারীদের নিয়ে আর একটি কোম্পানি, ইটাঅলাদের নিয়ে আর একটি কোম্পানি, যারা আমার বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকেও ইটপাটকেল কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। আর একটি কোম্পানি হল বেলওয়ালাদের, তাদের কাজ হল শক্ত কাঁচা বেল নীলকরদের

লাঠিয়ালদের মাথা লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা। থালাঅলাদের নিয়ে আর একটি কোম্পানি। এরা তাদের ভাত খাবার পিতলের থালাগুলো অনুভূমিক ভাবে শত্রুকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। তাতে শত্রুনিধন ভালই হয়। আরো একটি কোম্পানি রোলাঅলাদের নিয়ে, যারা খুব ভাল করে পোড়ানো খণ্ড কিংবা অভগ্ন মাটির বাসন নিয়ে শত্রুকে অভ্যর্থনা জানায়। বিশেষত বাঙালি স্ত্রীলোকেরা এই অস্ত্র উত্তমরূপে ব্যবহার করতে জানে। একদিন নীলকরের লাঠিয়ালগণ যখন দেখতে পেল যে স্ত্রীলোকেরা এ সব অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে, তখন তারা ভীত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। এগুলো ছাড়া আরো একটি কোম্পানি গঠিত হয় যারা লাঠি চালাতে পারে তাদের নিয়ে। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনী হলো যুধিষ্ঠির কোম্পানি অর্থাৎ বল্লমধারী বাহিনী।' বিবরণটি নদীয়া সম্বন্ধে হলেও এ ধরনেরই সংগঠন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও গড়ে উঠেছিল। কোন কোন অঞ্চলে বিদ্রোহীদল বন্ধুকও সংগ্রহ করেছিল। অনাথনাথ বসু *মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ* গ্রন্থে লিখেছেন, 'লাঠিয়ালগণের (অর্থাৎ নীলকরের লাঠিয়ালদের) হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কৃষকগণ এক অপূর্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রত্যেক পল্লীর প্রান্তে তাহারা একটি করিয়া দুন্দুভি রাখিয়াছিল। যখন লাঠিয়ালগণ আক্রমণ করিবার উপক্রম করিত, কৃষকগণ তখন দুন্দুভি-ধ্বনি দ্বারা পরবর্তী গ্রামের রায়তগণকে বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেই তাহারা আসিয়া দলবদ্ধ হইত। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারি-পাঁচখানি গ্রামের লোক একত্র হইয়া নীলকর সাহেবদিগের লাঠিয়ালগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যপৃত হইত।' পূর্বোক্ত বইয়ে, সতীশচন্দ্র মিত্রও লিখেছেন, 'গ্রামের সীমায় একস্থানে একটি ঢাক থাকিত। নীলকরের লোক অত্যাচার করিতে গ্রামে আসিলে কেহ সেই ঢাক বাজাইয়া দিত, অমনি শত শত গ্রাম্য কৃষক লাঠিসোটা লইয়া দৌড়াইয়া আসিত। নীলকরের লোকেরা প্রায়ই অক্ষত দেহে পলাইতে পারিত না।'

সুপ্রকাশ রায় *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহে ৬০ লক্ষাধিক কৃষক যোগদান করিয়াছিল। নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, চব্বিশ পরগনা, পাবনা প্রভৃতি জেলায় এরূপ গ্রাম কমই ছিল যে-স্থানের সকল কৃষক সক্রিয়ভাবে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে নাই। এই বিদ্রোহ কেহ পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করে নাই। কোন অখণ্ড নেতৃত্বের সন্ধান মিলে না। এই সকল জেলায় সমগ্র কৃষক জনসাধারণের বহুকালের অসহনীয় শোষণ উৎপীড়নই এই বিদ্রোহকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছিল'। সতীশচন্দ্র মিত্রও এ কথাই উপরোক্ত গ্রন্থে বলেছেন, 'এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক নহে, যেখানে যতকাল ধরিয়া বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। উহার নিমিত্ত যে কত গ্রাম্য বীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম নাই।' প্রমোদ সেনগুপ্ত *নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ* গ্রন্থে বলেছেন, 'নীল-বিদ্রোহের জন্য সরকারী কর্মচারী, কিংবা পাদ্রী, জমিদার কিংবা বাহিরের কোন চক্রান্তকারী কাহারও উপর দায়িত্ব আরোপ করা চলে না। নীলচাষের ত্রুটিপূর্ণ অবস্থাই এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী, কৃষকেরা তাহাদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য নিজেরাই

নিজেদের সংগঠিত করিয়াছিল এবং এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইয়া তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছিল।'

বিদ্রোহের দু বছর যশোর, নদীয়া ও অন্যান্য জেলার কোন স্থানেই নীলের চাষ হয়নি। নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আইন করা হয় যে, কোন নীলকরই আর রায়তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক নীলের চাষ করাতে পারবে না। এই ঘোষণার পর ধীরে ধীরে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে আসে। ১৮৮৯-এ যশোরের বিজলিয়া কুঠির অধ্যক্ষ ড্যাম্বেল-এর অত্যাচারে শেষ বারের মত কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল। কয়েকটি নীলকুঠি অবশ্য চাষীদের সাথে সদ্ভাব রেখে আরো বহুদিন পর্যন্ত নীলের চাষ করেছিল। ইতোমধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল উদ্ভাবন হয়ে গেলে, এর খরচ অত্যন্ত কম বলে চাষের মাধ্যমে নীলের উৎপাদন কমে যায়। ১৮৯৫-এর দিকে এসে তা প্রায় বিলুপ্তই হয়ে পড়ে।

১৮৭৪ ২২শে মে তারিখের *অমৃত বাজার পত্রিকা*'য় শিশিরকুমার ঘোষ লিখেছিলেন, 'এই নীল-বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলনের ও সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছিল। বস্তুত বঙ্গদেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।' সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায়, 'এই নীল বিদ্রোহের মধ্য দিয়া বাংলার কৃষক পরাধীন ও সামন্ততান্ত্রিক বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের সম্মুখে জাতীয় সংগ্রামের এক নতুন, নির্ভুল ও ঐতিহাসিক আদর্শ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে।'

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ

কলকাতায় ব্যারাকপুর-এর সৈন্য-ব্যারাকে সিপাইদের বিদ্রোহ এবং মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসীর ঘটনা থেকেই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের শুরু। এর পরেই বিদ্রোহ হয় বহরমপুরের সিপাই ব্যারাকে। বহরমপুরের সিপাইবাহিনীর বিদ্রোহের সংবাদ শোনা মাত্র বহু সহস্র স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহী সিপাইদের সঙ্গে যোগদান করার জন্য বহরমপুর শহরে সমবেত হয়। তাঁরা অন্য কোন নেতৃত্বের সন্ধান না-পেয়ে বাংলার নবাবের বংশধর বহরমপুরবাসী ফেরাদুন খাঁ'র নিকটেই নির্দেশ প্রার্থনা করে। এতে মনে হয় যদি বহরমপুরের সমস্ত সিপাই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলত এবং মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ নবাবকে সামনে রেখে সিপাইদের সঙ্গে মিলিত হত, তাহলে হয়ত সারা বাংলায় তীব্র আগুন জ্বলে উঠত। কিন্তু তা হয় নি। এদিকে চট্টগ্রামে অবিস্থত ক্ষুদ্র একটি সিপাইদল বিদ্রোহ করে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা ঘুরে আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করার পর কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

বীরভুম জেলার রঞ্জন শেখ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। এ জেলার করিম খাঁ নামক জনৈক সর্দার প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহী মনোভাব দেখান এবং এজন্য তাঁর ফাঁসি হয়। মেদিনীপুর জেলায় বৃন্দাবন তেওয়ারী নামে জনৈক ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যেই জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করেছিলেন। তাঁরও ফাঁসি হয়। মালদহ জেলায় চমন সিং নামে এক ব্যক্তি

রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত সিপাইগণ বিদ্রোহ করলে একজন ক্ষুদ্র রাজার নেতৃত্বে দু'শ ভুটিয়া'র একটি দল তিনটি বন্দুক সহ বিদ্রোহী সিপাইদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ঢাকাতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছু সিপাই স্বাধীনতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। কিন্তু সরকার ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কয়েকজন সিপাইকে বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কের স্থানে ফাঁসি দেয়। ঢাকার অন্যান্য বিদ্রোহী ভুটানে ঢুকলে ভুটান-রাজ তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। হাতিয়া-রাজা বলে কথিত হরক সিং নামে একজন বিদ্রোহী সিপাইদের বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করেছিলেন। হুগলি জেলায় কুবের চন্দ্র চৌধুরী নমে জনৈক সরকারি জেল-ডাক্তার রাজদ্রোহমূলক ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যশোর জেলার পরাগ ধোবী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ফরিদপুর জেলার ফরায়জি নায়ক আবদুস সোবহান ও রিয়াসত আলি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফরায়জি নেতা দুদুমিয়াকে রাজবন্দী হিসেবে আলিপুর জেলে আটক রাখা হয়েছিল।

সি. ই. বাকল্যাণ্ড *বেঙ্গল আণ্ডার লেফটানান্ট গভর্নরস*-এ লেখেন, 'সিপাহী বিদ্রোহের সময় বঙ্গীয় সরকারের অধীনে এমন একটিও জেলা ছিল না যা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে নি অথবা যেখানে ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা ছিল না।' মহাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশ থেকে রসদ ও যানবাহন সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। বাংলার কৃষক জনতা এ ব্যাপারে অসহযোগিতাই করেছিল। জোর করে তাদের কাছ থেকে যানবাহন সংগ্রহ করার জন্য সরকারকে একটি ইমপ্রেসমেন্ট এ্যাক্ট পাস করতে হয়েছিল। মহাবিদ্রোহের প্রভাব ও এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যে এদেশের জনগণের ছিল তা নীল বিদ্রোহের সময় তাদের বিভিন্ন নেতাকে নানা সাহেব, তাতিয়া তোপি প্রমুখের নামে অভিহিত করা থেকেই বোঝা যায়। তবে এ ধরনের নানা ঘটনার কথা উল্লেখ করা গেলেও একথা সত্যি যে, বাংলার জমিদার তালুকদার-মহাজনগোষ্ঠী, শহুরে মধ্যবিত্ত ও গ্রামের মধ্যস্তরের লোকেরা এবং এমনকি কৃষকরাও তেমন সক্রিয়ভাবে ব্যাপক আকারে এ মহাবিদ্রোহে যোগ দেয় নি।

এ বিষয়ে প্রমোদ সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, 'মহাবিদ্রোহের সময় বাংলার অনেক জমিদার ও শিক্ষিত শ্রেণীর একটা অংশ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে তথা শ্রেণী-স্বার্থে....ইংরেজ সরকারকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু তারাই তখনকার বাংলার একমাত্র প্রতিনধি নয় বা তারাই বাংলার একমাত্র ঐতিহ্যও নয়। বাংলার কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে তখন বিদেশী সরকার সম্বন্ধে অসন্তোষ ও বিরোধী মনোভাবের মোটেই অভাব ছিল না।...অন্য প্রদেশের মত বাংলাতেও জাতীয় বিদ্রোহের অনেক উপকরণই জমা হয়েছিল এবং তাতে সিপাহী ও কৃষকের একটা সম্মিলিত বিদ্রোহ সংগঠিত করা বাংলাদেশে কঠিন কাজ হত না।...একথা বোধহয় বলা যেতে পারে যে, ১৮৫৭ সালে বাংলায় এই আরম্ভের কাজটা সফলভাবে হয় নি বলেই এখানে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটেনি।'

সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ

নাটোর রাজবংশের জমিদারির অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের সমস্ত জমি নিলামে উঠলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের পাঁচটি ধনী পরিবার সিরাজগঞ্জের সমস্ত জমি কিনে অল্প সময়ে বিপুল সম্পদ আহরণের জন্য কৃষকদের ওপর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন আরম্ভ করে। তারা নানারূপ শঠতা দ্বারা খাজনাবৃদ্ধি এবং কৃষকের দখলি জমির পরিমান হ্রাসের ব্যবস্থা করে। তহুরি, বিবাহকর, পার্বণী, স্কুলখরচ, তীর্থখরচ, ডাকখরচ, ভোজখরচ ইত্যাকার পনের প্রকারের অবৈধ আদায়ের মাধ্যমে তারা কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে তোলে। অবৈধ এ ধরনের কাজের বিরুদ্ধে কৃষকরা আদালতে মামলা মোকদ্দমা করে কয়েকটি ক্ষেত্রে জয়লাভ করে। এর ফলে উৎসাহিত হয়ে কৃষকগণ জমিদার গোষ্ঠীর সমস্ত বেআইনী আদায় বন্ধ করে দেয় এবং জমিদারদের খাজনা সরাসরি না দিয়ে আদালতে দাখিল করতে থাকে। এর প্রতিশোধে জমিদারগণ ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠিয়াল-পাইক-বরকন্দাজদের নিয়ে কৃষকদের ওপর আক্রমণ আরম্ভ করলে সমগ্র সিরাজগঞ্জে বিদ্রোহ শুরু হয়। কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কৃষক সমিতি গঠন করে এবং সভাসমিতি করে নিজেদের বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করে। তারা নানা স্থানের জমিদার-কাচারি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। সিরাজগঞ্জবাসী গ্রামাঞ্চলের জমিদার ও তাদের কর্মচারিবৃন্দ এবং সকল ধনী ব্যক্তি পালিয়ে পাবনা শহরে আশ্রয় নেয় ও ইংরেজ প্রশাসনের সাহায্য প্রার্থনা করে। শাসকগোষ্ঠী পুলিশবাহিনী দ্বারা বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে এবং বিদ্রোহের নায়ক ঈশানচন্দ্র রায়, গঙ্গাচরণ পাল, রাজু সরকার প্রমুখ নেতাসহ বহু কৃষককে কারাগারে আটক করে। পরে এঁদের বিচার করা হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

কঠোর হাতে এ বিদ্রোহ দমন করলেও, ইংরেজগণ ভীত হয়ে কৃষকদের বিদ্রোহের মূল কারণ দূর করার জন্য আইনদ্বারা চাষীদের দখলিস্বত্ব স্বীকার করে নেয়। ইস্ট বেঙ্গল ও আসাম-এর *ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার*-এ তাই বলা হয়, 'পাবনা জেলার ১৮৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দের কৃষক বিদ্রোহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, এরই পরিণতি স্বরূপ কৃষিভূমির ওপর প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল এবং সেই আলোচনারই চূড়ান্ত ফল হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়েছিল 'প্রজাবৃন্দের সনদ' বলে কথিত ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন।' ১৭৯৩-র জমিদারিস্বত্ব আইন ও ১৮৫৯-র জমিদার-প্রজা বিষয়ক সপ্তম আইনের বলে জমিদারগণ নিম্ন আদালতের অনুমতি নিয়ে ইচ্ছেমত খাজনা-বৃদ্ধি এবং চাষীদের কৃষিজমি হতে উচ্ছেদ করতে পারতো। ১৮৮৫-এর আইনে তা রহিত করে স্থির হয় যে, যে-চাষী নিরবচ্ছিন্নভাবে বার বৎসরকাল জমি চাষ করে আসছে তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

পরিবর্তনের প্রক্রিয়া

উল্লিখিত বিদ্রোহগুলো ছাড়া আরো অনেক বিদ্রোহ আঠার-উনিশ শতক জুড়ে হয়েছে। এর কারণ ব্রিটিশরা বাংলায় শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করার প্রথম ভাগেই প্রধান

শিকার হয় কৃষক ও ভূস্বামী যাদের অনেকে ছিল মুসলমান। আর তাই শুরু থেকে দীর্ঘ একশ বছরেরও ওপর এরা বিদেশী ইংরেজ প্রভুদের উৎপাদনের জমিজমার মালিক রূপে বরণ না-করে শত্রুরূপে গ্রহণ করে এবং এদেশের মাটি থেকে তাদের শাসনের উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য সবধরনের চেষ্টা করে। বড়লাট মেয়ো একদা খেদোক্তি করেছিলেন, 'মহারানী (অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া)র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কি ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান!' কথাটা মিথ্যে নয়। অন্যায় জবরদখলকারী শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ইসলাম ধর্মের অনুষঙ্গই বটে। *মুসলিম শরিফ* হাদিস থেকে জানা যায় যে, রসুল (সঃ) বলেছেন 'মান রা'য়া মিনকুম মুন্‌কারান ফাল য়গায়্যিরহু বিয়াদিহি ফাইল্লাম য়াসতাতি ফাবিলিসানিহি ফা-ইল্লাম য়াসতাতি ফাবি কালবিহি ওয়া যালিকা আদআফুল ইমান।' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে কোন অন্যায় কাজ হতে দেখে তার উচিত তার হাত (শক্তি) দিয়ে তা বন্ধ করা। যদি সে-ক্ষমতা না রাখে তাহলে মুখের সাহায্যে তা বন্ধ করবে। যদি-তাও সম্ভব না হয় (ক্ষমতা না রাখে) তা হলে উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে এবং এটি দুর্বলতম ইমানের পরিচয়।' হব্বুল ওয়াতানু মিনাল ঈমান—স্বদেশপ্রেম ঈমানেরই অঙ্গ।

উক্ত আন্দোলনগুলোর কোন কোনটি কিছু সফল হয়। তবে ব্যর্থতার কাহিনীই বেশি। সাংগঠনিক দুর্বলতা, ব্যাপক প্রচারের অভাব, গণ-চেতনার দুর্বল ভিত, নেতৃত্বের নানাধরনের অসুবিধার ভেতর এসব ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু বড় এবং মূল কারণ ছিল উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্রম-পরিবর্তন এবং সে-কারণে উদ্ভূত ও ঘনীভূত সংকট। বহুদিন ধরে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজপদ্ধতি আঘাত পাচ্ছিল ইংরেজ শাসনের সাথে তাদের আনীত বণিক-ব্যবসায়ী ধারা এবং তাতে সম্পৃক্ত এদেশী ব্যক্তিবর্গের নানাবিধ কর্মপ্রক্রিয়ায়। জীবন এবং জীবিকার তাগিদে এদেশের কেউ কেউ ইংরেজ সংস্পর্শে আসছিল এবং গড়ে তুলছিল, ধীরে ধীরে যদিও, নতুন সমাজ-সম্পর্ক। একদিকে একটি ধারায় চলছিল বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ, অন্যদিকে চলছিল ইংরেজ-সম্পর্কে সহযোগিতার অপর একটি ধারাও—বিদ্রোহের বিরুদ্ধে অথবা নির্লিপ্ত অবস্থানকারী মানুষদের মধ্য দিয়ে।

বস্তুত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সকল মুসলমানই ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে গিয়েছিল এমন ধারণা করা ভুল। রুটি-রুজি হারিয়ে অনেকে যেমন বিদ্রোহ আর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয় তেমন আরো অনেকে এ অবস্থা মেনে নিয়ে জীবনধারণে হয় অগ্রসর। যে-কোন অবস্থা বা পরিবেশেই এধরনের দুটি ধারা কখনই দুর্নিরীক্ষ্য নয় অবশ্যই। অবস্থাভেদে কোনটি বেশি চোখে পড়ে, কোনটি কম। ইংরেজ শাসন মেনে-না-নেওয়ার বিদ্রোহী-ধারাটির পাশাপাশি তাই দেখা যায় সহনশীলতা ও সহযোগিতার ধারা। তবে নতুন এ সমাজসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রক্রিয়াতে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু হিসেবে অভিহিতরা বেশি সংখ্যায় নানা কার্যকারণে কিছুটা আগে অগ্রসর হয়ে যায়।

পরিবর্তনটা বেশ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ'র সময় থেকে তো বটেই। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য মুর্শিদকুলি 'মাল জমিনি' অর্থাৎ ইজারাদারদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করে চড়া রাজস্ব প্রদানের শর্তে জায়গির ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এর ফলে বিলাসব্যসনে মগ্ন পুরানো বহু খানদানি পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। এদের মধ্যে মুসলমানও ছিল। বাকি খাজনার দায়ে তিনি তাদের জায়গির বন্ধ করে জমি খাস করে নেন। পরে সেসব ইজারা দেন তাঁর অধীনে খাজনা আদায়কারী ও হিসেবে দক্ষ এমন কর্মচারীদের যাদের অনেকেই ধর্মে (?) ছিল 'হিন্দু'। এরা রাজস্ব প্রদানে গড়িমসি করত না, হোক তা শাসকের প্রতি ভয়েই অথবা নবলব্ধ সম্পত্তি রক্ষার তাগিদেই। তার ওপর পশ্চিম থেকে রাজকর্মচারী না-এনে মুর্শিদকুলি বিশ্বস্ত ও চতুর বাঙালি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য দেওয়ান, কানুনগো ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত করেন। এই কর্মচারীদের অনেকে পরে জমি ইজারা নিয়ে জমিদার হয়ে বসে।

বস্তুত বাদশাহি-নবাবি আমলে সারা উপমহাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং টাকাকড়ি লেনদেনের কাজ হিন্দুদের মধ্যেই প্রায় একচেটিয়া ছিল। সতের শতকে মানরিক, থিবনট প্রমুখ বিদেশী পর্যটক এদেশের যেসব বিবরণ দিয়েছেন তাতে কোলকাতা, দিল্লি, লাহোর, সুরাট, আহমেদাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি বড় বড় শহরে ব্যবসার ক্ষেত্রে হিন্দুদের বিপুল প্রাধান্য দেখা যায়। এটা অস্বাভাবিকও ছিল না। মুসলমানরা সাধারণত সৈনিক-বৃত্তিতেই নিয়োজিত থাকত। চাকরি-বাকরি ছিল বিচার বিভাগেও। রাজস্বেও। এজন্য মুসলিম জমিদার সংখ্যায় তেমন ছিল না। ১৭২৮-এ বাংলায় বৃহত্তম ১৫টি জমিদারের মধ্যে মাত্র ২টি এবং ২১টি ছোট জমিদারির মধ্যে মাত্র ২টি ছিল মুসলমান।

সারা বাংলায় ব্যবসা এবং টাকাকড়ি লেনদেনের ব্যাপারটা-যে হিন্দুরাই করত সতের শতকের প্রথমদিকে আলাউদ্দিন ইস্পাহানি ওরফে মির্জা নাথন-এর *বাহারিস্তান গায়েবি* থেকেও জানা যায়। হিসাবপত্রের ব্যাপারে মুসলমান উচ্চবিত্ত সামন্ত বা সাধারণ মানুষও তাদের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। বাংলার অর্থনীতিতে মুর্শিদাবাদের *শেঠ* পরিবারের প্রভাব তো সুবিদিত। তারা ছিল আঠার শতকে এদেশের ব্যাংক বিশেষ। নবাবি আমলেই *শেঠ* এবং বসাকরা সুতানুটিতে ইংরেজদের রক্ষণাবেক্ষণে থেকে কোম্পানির দাদনি ও দালালি ব্যবসা করত। বৈশ্যরাও কোম্পানির বেনিয়াগিরি করে সমৃদ্ধি অর্জন করে। পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগেই উমিচাঁদ, গোপীনাথ *শেঠ*, রামকৃষ্ণ *শেঠ*, শোভারাম বসাক, লক্ষ্মীকান্ত প্রমুখ ব্যবসায়ী কোম্পানির দাদন ও দালালি করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। দাস্তক নিয়ে কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীর সাথে দেশী কর্মচারিগণও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে। আর এভাবেই কোম্পানির স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থ অভিন্ন হয়ে যায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তারের সাথে সাথে ব্যবসায়ী ও কর্মচারীর সংখ্যাও বেড়ে ওঠে। এ সময় সীমাহীন লোভ নিয়ে বাণিজ্যের নামে কোম্পানি অসৎ উপায়ে ধন উপার্জনের যে-রাজত্ব কায়েম করে তার প্রধান সহায়ক হয় দেশীয়

গোমস্তা কর্মচারিগণ। এরাও অসৎ পথে বিপুল অর্থের অধিকারী হয়। কালক্রমে এক একজন ক্ষুদে রাজামহারাজা বনে যায়। ক্লাইভ-হেস্টিংস-এর মুন্সি-দেওয়ান-কানুনগোরাও এভাবেই জমিদার হন। যেমন, সেলবর্ষের শ্রীকৃষ্ণ হালদার, মুক্তাগাছার শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী, নাটোরের রঘুনন্দন প্রমুখ। বেনিয়াগিরি করেও অনেকে বিপুল অর্থ অর্জন করে। গোকুল ঘোষাল, হৃদয়রাম ব্যানার্জি, অক্রুর দত্ত, মনোহর মুখার্জি, কৃষ্ণকান্ত নন্দী, মহারাজ নবকৃষ্ণ, জয়নারায়ণ ঘোষাল আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধের খ্যাতনামা ধনী। এরা কোম্পানির সহযোগিতায় চাল, কাপড়, তামাক, আফিম, গাঁজা ইত্যাদি নানরকম পণ্যের ব্যবসা করে সম্পদশালী হয়। আঠার থেকে উনিশ শতকের মধ্যেও বহু ব্যক্তি নিতান্ত নগণ্য অবস্থা থেকে ব্যবসার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী হয়।

তবে এসব ধনীব্যক্তি কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার মত সামর্থ অর্জন করুক তা ইংরেজরা কখনো চাইত না। সেজন্য তাদের ব্যবসায়ে তারা নানা বাধানিষেধ আরোপ করত। পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এদের সঞ্চিত টাকা জমিতে খাটাবার একটা সুযোগ কর্নওয়ালিস করে দেন। ধনীব্যক্তিদের বংশধররাই কোলকাতায় বাবু বলে পরিচিত হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজে এরূপ যখন বেনিয়াসুলভ মনোবৃত্তি ক্রম-প্রসারিত হচ্ছিল তখন মুসলমানরা বাস্তব কারণে এবং কিছুটা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞায় তাতে ঠিকমত যোগ দিতে পারে নি। ব্যবসায়ী বণিকদের কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল কোলকাতা, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় মোটেই বেশি ছিল না। অন্যান্য শহর-বন্দর-গঞ্জেও মুসলমান ছিল নগণ্য সংখ্যক। এসময়ে তারা গ্রামাঞ্চলেই বাস করত বেশি। জমি-সম্পৃক্ত ও বৃত্তিগত প্রয়োজনে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা তো আগে থাকতেই গ্রামাঞ্চলে থাকত। বাদশাহ্-নবাবদের ক্ষমতার ক্রম-অধোগতিতে অন্যেরাও চাকরিবাকরি হারিয়ে জমিজমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরেই এসময়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়। পরিসংখ্যানের অভাবে আগের কথা সঠিকভাবে বলা-না-গেলেও, ১৮৮১-এর আদমসুমারিতে দেখা যায়, বাংলার শতকরা ৬২.৮১ ভাগ মুসলমান ছিল ভূমির সাথেই সংযুক্ত। এর অধিকাংশই রায়ত।

অন্যদিকে, ইসলাম ধর্মে সুদের কারবার নিষিদ্ধ-থাকায় টাকার বাজারে ওভাবে মুসলমানদের প্রবেশ করা ছিল নীতিগত কারণেই কিছুটা অসুবিধাজনক, অন্তত ভিন্নতর সামান্য-সুযোগ থাকলে। জমি বা টুকটাক ব্যবসা এ সুযোগ একটু-আধটু দিচ্ছিল। তাই এখানে আফগানিস্তানের মুসলমানদের মত সুদ-ব্যবসা তারা তেমনভাবে গ্রহণ করে নি। সংখ্যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রচুর মহাজন-সাহুকারদের মত মুসলমান সম্প্রদায়ে তা সৃষ্টিও হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন, তা মুসলমানরা তাই মেটাতে পারেনি। অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতির পুঁজি তাদের হাতে এ সময় জমা হয় নি।

এ অবস্থার ফল হল এই যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোক যে-সুবিধা ও সুযোগ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পেয়ে অর্থ সঞ্চয়ে হতে পারল প্রবৃত্ত, মুসলমানরা সাধারণভবে তা

থেকে রইল বাইরে। আবার এ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা হিন্দুদের যত কাছাকাছি এল, মুসলমানদের তত কাছাকাছি আসতে পারল না। হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবাদিতেও ইংরেজরা ১৮৩২ পর্যন্ত সরকারিভাবে যোগ দিত বলে জানা যায়। এ ঘনিষ্ঠতার ফলে ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই প্রথমে জন্ম নিতে থাকে। রামপ্রসাদ মিত্র, জয়নারায়ণ ঘোষাল, মহারাজ নবকৃষ্ণ প্রমুখ হলেন প্রথম ইংরেজিভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি। বিত্ত, প্রতিপত্তি এবং চাকরি লাভের একটি প্রধান উপায়ই তখন হয়ে দাঁড়ায় ইংরেজি ভাষাজ্ঞান। কাজেই ইংরেজ-ঘনিষ্ঠ হিন্দুরা জীবিকার উপায় হিসেবে ইংরেজি শেখার তাগিদ বোধ করে। মিশনারি-প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য ধরনের আধুনিক নানা প্রতিষ্ঠানে স্কুলে-কলেজে তারা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে থাকে। মিশনারিরাই এদেশে প্রথমে এসব ধরনের স্কুল তখন খুলেছিল।

ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাতে মুসলমান

ইসলাম ধর্মে জ্ঞানার্জন শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, পণ্ডিতের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। তিনি আরো বলেছেন, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানের সন্ধানে ফিরবে। জ্ঞান আহরণের জন্য চিন (তৎকালের জানা সবচেয়ে দূর) দেশে যেতেও উপদেশ মহানবী দিয়েছেন বলে জানা যায়। তিরমিজি অনুসারে, রসুল (সঃ) বলেছেন, 'যে শিক্ষার অনুসন্ধান করে, তার পূর্ব গুনাহ্‌র প্রায়শ্চিত হয়ে যায়।' তিনি আরো বলেছেন, 'যে বিদ্যার অনুসন্ধানে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে থাকে।' 'তালাবন এলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লে মুসলেমিন ওয়া মুসলেমাতিন—'জ্ঞানর্জন প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ' বলেছেন তিনি। মুত্তাফাক আলাইহি থেকে জানা যায় যে, ইসলাম অনুসারে দু ব্যক্তির ঈর্ষা করা বৈধ—যাকে আল্লাহ্ সৎপথে ব্যয় করার সামর্থ দিয়েছেন এবং যাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছেন এবং যিনি সেই অনুসারে বিষয়টির মীমাংসা করেন ও জ্ঞান অন্যকেও দান করেন। অবশ্য এসব বক্তব্য কারো কারো মতে কেবল ইসলামিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অর্থাৎ কেবল ইসলাম সম্বন্ধেই জানার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন যে, তাহলে চিন দেশে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে কেন—সেখানেও কি ইসলামি শিক্ষার জন্য কেবল! মহানবীর সময়তো সে, দেশে ইসলামী শিক্ষা ছিল না! এসব কূটতর্কে সাধারণ মুসলমান যায় না। বরং মহানবীর বাণী অনুসারে সচ্ছল মুসলমানরা লেখাপড়ার প্রতি সবসময়েই মনোযোগ দিয়েছে। ইংরেজ শাসনের সময়ও এর ব্যত্যয় হয় নি।

১৭৮০-তে (মিরজাফরের মৃত্যুর পনের বছরের মধ্যেই) ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কাছে কোলকাতার বিশিষ্ট মুসলমানরা কোম্পানির চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে 'কোলকাতা মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান। তাঁদের দরখাস্তে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে বিচার বিভাগের জন্য যোগ্য কর্মচারী তৈরির কেন্দ্ররূপেই মাদ্রাসাটি খোলার কথা বলা হয়। হেস্টিংসের উদ্যোগে ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে সেটি খোলা

হয় এবং নায়েব-নাজিমদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে ফৌজদারি আদালতে কোন পদ খালি হলে তা যেন ঐ মাদ্রাসার উপযুক্ত ছাত্রদের দিয়ে পূরণ করা হয়। মাদ্রাসায় কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নি। মুসলমানরাও চায়নি। অনেক পরে, ১৮২৯ এর আগস্ট মাসে মাদ্রাসায় ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৩২ পর্যন্ত হিন্দু ছাত্রও মাদ্রাসায় পড়তে পারত, কিন্তু এর পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দেখা যায়, ১৭৯৩ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত যে-সব মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে সাধারণ মুসলমান ছাত্ররাও পড়ত। মিশনারিরা ধর্মপ্রচারের জন্য দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যে বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করত। চুঁচূড়া অঞ্চলে আগত মিশনারি রবার্ট মে ১৮১৪-তে বাংলা স্কুল খোলেন। তাঁর স্কুলগুলোয় অনেক মুসলমান ছাত্র ছিল। জে-লং জানান যে, '১৮১৮-এ যখন তিনি (রবার্ট মে) মারা গেলেন তখন তাঁর তত্ত্বাবধানে ছত্রিশটি স্কুল ছিল যেগুলোর হিন্দু মুসলমান মিলিত ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০০০ (তিন হাজার)-এর ওপর।' আবার 'মির্জাপুর-এর মিশন সংলগ্ন স্থানে একটি খ্রীস্টান স্কুল ছিল...এবং একটি আলাদা স্কুল ছিল মুসলমান সাধারণের জন্য।'

১৮০০-তে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে আরবি-ফারসি পড়াত মুসলমানরাই। কেউ কেউ বিলেতে হেলিবারি কলেজেও অধ্যাপনা করতে যেতেন। ১৮১৭-তে প্রতিষ্ঠিত 'কোলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'তে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সদস্য ছিল। সোসাইটি পরিচালিত স্কুলগুলোয় মুসলমান ছাত্ররা হিন্দু ছাত্রের তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও পড়াশোনা করত। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা লাভের খবরও এসময় পাওয়া যায়। ১৮২০-এর ২৭ ডিসেম্বর তারিখের *সমাচার দর্পণ* জানাচ্ছে, '১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশটার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকাদের বিদ্যা পরীক্ষা হইয়াছিল। এই পরীক্ষাতে হিন্দু-মুসলমানের বালিকা সর্বশুদ্ধা প্রায় দেড়শত পরীক্ষা দিয়াছে।' সুতরাং মুসলিম মহিলারাও পিছিয়ে ছিল না একেবারে।

ইংরেজির প্রতি মুসলমানরা-যে মোটেই অনীহ ছিল না তা বোঝা যায়। ১৮২৯-এ মাদ্রাসায় এ্যাংলো-এরাবিক বিভাগ খুলে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হলে এক বছরের মধ্যেই এ বিভাগে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গেলে দ্বিতীয় একজন শিক্ষক নিযুক্ত করার দরকার হয়ে পড়ে। ১৮৩০-এ এ বিভাগের ছাত্ররা বার্ষিক পরীক্ষায় খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। তবে অব্যবস্থা ও পরিকল্পনার ত্রুটির জন্য কোলকাতা মাদ্রাসা থেকে কোন মুসলমান ভাল ছাত্র ১৮৩৫-এ মেডিক্যাল কলেজ খুললে তাতে ভর্তির জন্য পাওয়া যায় নি। বহু সচ্ছল মুসলিম অভিভাবক মাদ্রাসার পরিবর্তে সেন্ট পল এবং পেরেন্টাল একাডেমি'র মত অমুসলিম প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত সন্তানকে পড়তে পাঠাতেন।

মফস্বলের মুসলমানরাও ইংরেজি শিখতে আগ্রহী ছিল। মুর্শিদাবাদে মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত নিজামত কলেজে ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। হাজী মুহম্মদ মহসিন-এর দানে স্থাপিত হুগলি কলেজেও ইংরেজি শিক্ষালাভের অনুরূপ সুযোগ ছিল। ১৮২৪-এ ঢাকায় বিশপ হেবর-এর কাছে মুসলমানরা ইংরেজি পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং স্কুল খোলার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানায়। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, ১৮৩৪-

এ ঢাকায় নয়টি বিদ্যালয় এবং ১১৫ জন শিক্ষার্থী ছিল। বস্তুত শহরবাসী মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পেলে তা গ্রহণ করতে মোটেই অনীহ ছিল না।

মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য প্রথমদিকে লাভ করে প্রধানত খানসামা গোছের পেশাভুক্ত লোকেরা। সমাজজীবনে তাদের প্রভাবের কথা কোলকাতা শহরের রাস্তার নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, যেমন ছক্কু খানসামা লেন, কলিম খানসামা লেন ইত্যাদি। এরা দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের আহার ও বাসস্থান দিয়ে এবং শিক্ষার ব্যয় বহন করে তাদের পড়ার সুযোগ করে দিত হয়ত-বা ধর্মীয় একটা কর্তব্য মনে করেই। এ হিসেবে কোলকাতার নিম্নবিত্ত মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের চেয়ে বেশি বাস্তবমুখি ছিল। কোলকাতা মাদ্রাসার এ্যংলো-এরাবিক বিভাগের অধিকাংশ ছাত্র ছিল দোকানদার, ফেরিঅলা, মুহরি ও এটর্নির সন্তান।

তবে একথা সত্য যে, ব্যাপকভাবে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। হয় নি অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে। বাদশাহি-নবাবি আমলে শিক্ষা ছিল সরকারি বা উচ্চবিত্তদের দানে-অনুদানে পুষ্ট। ইংরেজ আমলে অবস্থাটা হয় বিপরীত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে বিত্তবানরাই কেবল অর্থ দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হত। নবাবি আমলে অর্থাগমের যে-তিনটি পথ ছিল বলে উইলিয়াম হান্টারও বলেছেন—সামরিক পদ, রাজস্ব ভোগ এবং বিচার বিভাগ ও রাজনৈতিক নিয়োগ, কোম্পানি আমলে তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উচ্চবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমেই গরিব হতে থাকে। আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ কালেক্টর ও ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের নিয়োগ করতে থাকলে মুসলমান কর্মচারীদের স্থান আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অতঃপর ১৮৩৬-এ ফারসির বদলে দেশী ভাষা বাংলা আইন আদালতে এবং ইংরেজি সরকারি ভাষা রূপে চালু হলে পুরানো ধারায় শিক্ষিত মুসলমানদের চাকরি-বাকরি পাওয়ার সুযোগও কমে যায়।

অপরদিকে, এদেশের কাঁচামাল বিলেতে নিয়ে যাবার ফলে এবং ক্রমান্বয়ে নীলচাষ, চা ইত্যাদির আবির্ভাবে এবং ইংলণ্ডে শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বস্ত্র, রেশম ও পাট শিল্পের প্রাদুর্ভাবে গ্রামবাংলার সাধারণ নিম্নবিত্তের মুসলমানরাও প্রচণ্ড মার খায়। তাঁতীদের বিরাট সংখ্যা ছিল মুসলমান। হাতে পাটজাত দ্রব্যও তৈরি হত বহুদিন ধরেই। সুতি কাপড় আমদানির আগে পাটজাত কাপড়ের প্রচলন ছিল, বিশেষ করে গরিবদের ভেতর। পাটের রপ্তানিও ছিল লাভজনক। ১৮৩০-এর আগে পর্যন্ত হাতে তৈরি গানিব্যাগ এবং কাপড় ছিল বাংলার তাঁতীদের একচেটিয়া ব্যবসা। কিন্তু ডাণ্ডিতে চটকল স্থাপিত হলে কাঁচা পাট রপ্তানি বেশি লাভজনক হওয়ায় উক্ত গ্রামীণ ব্যবসা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে মুসলিম প্রাধান্য ছিল বেশি। এরাই ছিল এসব কারিগর। এদের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়ে। রংপুর, বগুড়া, হুগলিতে কাগজ তৈরির যেসব শিল্প ছিল তাও বিনষ্ট হয়ে যায় বেলি এবং তিতাগড় মিলে তৈরি কাগজের জন্য। এ শিল্পেও প্রচুর মুসলমান থাকায় তারা আর্থিকভাবে দীন হয়ে পড়ে।

শিল্প হারানোর ফলে জমি হয় জীবিকার একমাত্র আশ্রয়স্থল। চাপ পরে এর ওপর অত্যধিক। শুরু হয় ভাগ-বাঁটোয়ারা। দারিদ্র্য হয় বিস্তৃত। অপরপক্ষে, ১৭৯৩ থেকে

১৮২৮ পর্যন্ত আয়েমাদারি ও লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে অনেকগুলো আইন তৈরি হয়। এগুলো সাধারণ্যে গোচরীভূত করার কোন ব্যবস্থাই হয় নি। ফলে অনেকের সম্পত্তি তাদের অজান্তেই নতুন আইন অনুসারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ১৮৪৬ পর্যন্ত আয়েমাদারগণ এ নিয়ে মামলা চালাতে গিয়ে অনেকে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

এভাবে চতুর্দিক থেকে নানা কার্যকারণ এসে মুসলমান সম্প্রদায়কে দারিদ্র্যের কবলে ফেলার ফলেই বেশি সংখ্যায় তারা নতুন শিক্ষা গ্রহণে তৎপর হতে পারে না। লেফটান্যান্ট গভর্নর রিভিস থমসন বাংলার ১৮৮৪-৮৫-র শিক্ষা পরিদফতরের সাধারণ রিপোর্টে বলেছেন যে, 'কোন সংস্কারের চেয়ে বরং মুসলমানদের আনুপাতিক দারিদ্র্যই তাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে বাধা দিচ্ছে। যে সব জেলায় মুসলমানরা সমাজের নিচু স্তরে সেখানেই তাদের শিক্ষার হার কম। যেখানে তারা সচ্ছল, সেখানে সেই হার বেশি।'

বস্তুত, অর্থ খরচ করে পড়ার মত সঙ্গতি খুব কম মুসলমানেরই ছিল। উপরন্তু পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে যেখানে মুসলমান ছিল সংখ্যাধিক, সেখানে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয় নি মোটেই। হয়েছিল কোলকাতায়, যেখানে মুসলমান সংখ্যায় ছিল কম অথবা যেখানে গিয়ে প্রচুর অর্থ খরচ করে পড়ার সঙ্গতি ছিল খুব কম মুসলমানেরই। এজন্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের দিক থেকে দেখা যায় পিয়ন, চাপরাশি, কলমদার, দারোয়ান, বেয়ারা ইত্যাদি নিম্ন চাকরিতে মুসলমান প্রাধান্য, যেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন প্রশ্ন ছিল না।

এ অবস্থায় সারাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের আরবি শিক্ষা ক্রমে চালু হতে থাকে। দরিদ্র জনসাধারণের দানে-অনুদানে সাহায্য-সহায়তায় অল্প পয়সার সাথে সঙ্গতি রেখে গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় মক্তব-মাদ্রাসা। এগুলোতে শিক্ষকরা যা পড়াতেন তার এক বর্ণও অনেকেই বুঝতেন না। তাদের কেউ কেউ নিজেদের নাম পর্যন্ত সই করতে পারতেন না। আরবি পাঠের একটা বিশিষ্ট রীতি অনুসরণে কোন রকম মানে-না-বোঝেই শিক্ষার নামে হত একপ্রকার প্রহসন। জনগণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারই ছিল তাঁদের শিক্ষাদানের প্রধান অবলম্বন। এরা মুসলিম সমাজকে সবরকম আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তাচেতনা থেকে বিমুখ রাখার প্রয়াস পেতেন। কোরান শরীফ পড়ানো ছাড়াও এঁরা বিয়ে, জানাজা, ফাতেহা, কুলখানি, গরু-ছাগল-মুরগি জবাই ইত্যাদি নানা রকম ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে অংশ নিতেন। এঁদের প্রভাব গ্রামের গরিব অশিক্ষিতদের ওপর ছিল অপরিসীম। এ অবস্থা বিশ শতকেও বিলীন হয় নি। মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ও বিজ্ঞ লোকের অভাবই এদের প্রভাব বাড়িয়েছিল। রংপুর জেলা সম্বন্ধে হ্যামিলটন বলেছেন যে, সেখানে মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন শিক্ষিত লোক ছিলেন না যাঁর কাছে সাধারণ মানুষ কোন পরামর্শ নিতে পারত। উপদেশ নেওয়ার প্রয়োজন হলে তারা হিন্দুদের কাছে যেত।

মুসলমানদের মধ্যে একাংশের জীবন-বিমুখতা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, কোলকাতা ও অন্যান্য শহরে যে-অল্পসংখ্যক সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান ছিলেন, তাঁদেরও অনেকে শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এ শুধু ইংরেজি শিক্ষার

ব্যাপারেই নয়, আরবি-ফারসি শিক্ষার ব্যাপারেও। রাজনৈতিক পরাজয় এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে কেবল ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক বিষয়াদিতে এঁরা আশ্রয় খুঁজে ফেরেন। এ ধর্মচেতনাও আবার সুসংস্কৃত শিক্ষিতদের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত না-হয়ে অজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ফলে ধর্মের নামে আসে আবেগ, অস্বচ্ছ ও আচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। সব ব্যাপারে সংকীর্ণ ও কূপমণ্ডুকতা বেড়ে যায়। মুসলমান হিসেবে নিজেদের আলাদা করে রাখার প্রবণতা দেখা দেয়। উইলিয়াম হান্টার *দ্য ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্‌* গ্রন্থে ১৮৭১-এ জানান যে, 'পোশাক, অভিবাদন ও অন্যান্য বাহ্যিক ব্যাপারের ন্যায় যেসব বৈশিষ্ট্যে মুসলমানরা তাদের প্রাধান্যকালে হিন্দুদের চেয়ে নিজেদের আলাদা করে রাখার প্রয়োজন অনুভব করে নি, বিগত চল্লিশ বছরের মধ্যে তারা সেসব ব্যাপারে নিজেদেরকে আলাদা করে ফেলেছে।'

সুযোগ-সুবিধা পেলে বা থাকলে মুসলমানদের অনেকেই আবার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে মোটেই নিরুৎসুক ছিল না। আগেই বলা হয়েছে, বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত কোন কোন মুসলমান সেন্ট পল এবং পেরেন্টাল একাডেমি'তে তাঁদের সন্তানদের শিক্ষালাভ করতে পাঠাতেন। কোলকাতা মাদ্রাসার প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং পাঠ্যক্রম উন্নত হলে দেখা যায়, ১৮৫৬-তে যেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১১, সেখানে পরের বছরই বেড়ে হয়ে যায় ১৫৮ জন। এদিকে মুসলমান পাড়ায় অবস্থিত 'কলিঙ্গ ব্রাঞ্চ স্কুল'-এ বেতন অত্যধিক থাকায় ১৮৫৫-৫৬-তে ১৪৩ জন ছাত্রের ভেতর মাত্র ১৪ জন ছিল মুসলমান। পরের বছর এই বেতনভার কমিয়ে স্কুলটিকে কেবল.মুসলমানদের জন্য সীমিত করলে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয় ১৫৬।

সচ্ছল মুসলমানরা উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকতে চায় নি। ১৮৫৭-তে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম বি. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮৫৮-তে। তাতে উত্তীর্ণ হন দুজন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরে খ্যাতনামা সাহিত্যিক) ও যদুনাথ বসু। মুসলমানদের মধ্যে থেকে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দেই প্রেডিডেন্সি কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করেন হুগলি জেলার দেলোয়ার হোসেন আহমদ। লক্ষণীয় যে, প্রথম দুজন হিন্দু গ্রাজুয়েট হওয়ার তিন বছরের মধ্যেই একজন মুসলমানও ডিগ্রি পান। পূর্বের দুজন যেমন ডেপুটি মেজিস্ট্রেট হয়েছিলেন, দেলোয়ার হোসেনও ডেপুটি হয়েছিলেন। কোলকাতা মাদ্রাসা থেকে তিনি এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন বলে সেই মাদ্রাসা প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট হিসেবে তাঁকে স্মরণ করে 'দেলোয়ার হোসেন দিবস' পালন করত। ইনি শেষ পর্যন্ত বাংলার রেজিস্ট্রেসন-এর ইন্সপেক্টর জেনারেল হয়েছিলেন। ১৮৯৪-এ তাঁকে খান বাহাদুর খেতাব দেওয়া হয়। বাংলার আইন পরিষদের সদস্যও তাঁকে করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ও বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট হলেন মোহাম্মদ দায়েম। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৬৫-তে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৭৪-এ তিনি বি. এল. ডিগ্রি নিয়ে সিলেট শহরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি সিলেট জেলার জালালপুর-এর অধিবাসী ছিলেন। বাংলার প্রথম মুসলমান এম. এ. হলেন সৈয়দ আমির আলি। ১৮৬৮-তে তিনি এই ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম মুসলমান ব্যারিস্টারও। ১৮৭৩-এ তিনি আদালতে ব্যবসার

অনুমোদন লাভ করেন। তিনি ছিলেন হাইকোর্ট-এর দ্বিতীয় মুসলমান বিচারপতি। প্রথম বিচারপতি হয়েছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ-এর পুত্র সৈয়দ মাহমুদ। প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটি অর্থাৎ তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবে সৈয়দ আমির আলিই ছিলেন প্রথম ভারতীয়।

কুমিল্লা জেলার প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট হলেন সিরাজুল ইসলাম। ১৮৬৭-তে তিনি বি. এ. এবং ১৮৭৩-এ তিনি ঢাকা কলেজ থেকে আইন ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কোলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। নওয়াব উপাধিও পেয়েছিলেন। ময়মনসিংহের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট হামিদউদ্দিন আহমদ। তিনি ১৮৬৮-তে পাস করেন এবং ময়মনসিংহ শহরেই আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। বরিশাল জেলার প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট মোহাম্মদ ওয়াজেদ—শেরে বাংলা ফজলুল হক-এর পিতা। ১৮৬৯-এ তিনি ডিগ্রি লাভ করেন। ময়মনসিংহের দ্বিতীয় গ্রাজুয়েট হলেন অষ্টগ্রাম-এর সৈয়দ ফয়জউদ্দিন হোসেন। ১৮৭৭-এ তিনি হুগলি কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৮৮০-তে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। রংপুরের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট তসলিমউদ্দিন আহমদ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৭৭-এ তিনি ডিগ্রি নেন। রংপুর শহরেই তিনি আইন ব্যবসা করতেন। পরবর্তীতে তিনি খান বাহাদুর উপাধিও লাভ করেন। যশোর জেলার প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট হলেন আবদুস সালাম। ১৮৮৩-তে তিনি কোলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৮৪-তে তিনি ইংরেজিতে এম. এ. ডিগ্রি নেন এবং ডেপুটি মেজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন।

১৮৭১-এ কোলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে জহীরউদ্দিন এবং লুৎফুল কবির আই. এম. এস. অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস পাস করেন। কুমিল্লা জেলার এবং সমগ্র ভারতবর্ষের প্রথম অক্সফোর্ডের বি. সি. এল. হলেন আব্দুর রসুল। তিনি ১৮৯৮-তে এম. এ. ও বি. সি. এল. একই সাথে অক্সফোর্ড থেকে লাভ করেন। বি. ই. পরীক্ষায় প্রথম মুসলমান হলেন তফাজ্জল আহমদ। ১৯০০-তে তিনি পাস করেন। আব্দুল্লা সোহরাওয়ার্দী হলেন প্রথম মুসলমান যিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯০৮-এ। এ বছরই সর্বপ্রথম কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের অনুমতি লাভ করে।

নিচে এ প্রসঙ্গে একটি তালিকা *হাবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী* থেকে দেওয়া হল।

নাম	বছর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
	প্রথম দিকের মুসলমান গ্রাজুয়েট	
দেলোয়ার হোসেন আহমদ	১৮৬১	প্রেসিডেন্সি কলেজ
মোহাম্মদ দায়েম	১৮৬৫	"
সৈয়দ আমির আলি	১৮৬৭	হুগলি কলেজ
সৈয়দ হোসেন	"	প্রেসিডেন্সি কলেজ
মোহাম্মদ ইউসুফ	"	"

ওবায়দুর রহমান	"	বহরমপুর কলেজ
সিরাজুল ইসলাম	"	"
হামিদউদ্দীন আহমদ	১৮৬৮	শিক্ষক
মোহাম্মদ ওয়াজেদ	১৮৬৯	"
ফজলুল কাদির	"	প্রেসিডেন্সি কলেজ
আবদুল বারি	১৮৭০	ক্যাথাড্রাল মিশন
আবদুল খালেক	১৮৭৩	হুগলি কলেজ
আবুল খয়ের	"	"
হজাদ বখ্শ	১৮৭৭	"
তসলিমউদ্দীন	"	প্রেসিডেন্সি কলেজ
সৈয়দ খয়রাত আহমদ	"	শিক্ষক
সৈয়দ ফয়জউদ্দীন হোসেন	"	হুগলি কলেজ
নিজামউদ্দীন হাসান	"	মুইর সেন্ট্রাল কলেজ
ফজলুল করিম	১৮৭৮	হুগলি কলেজ
সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন	"	"
মজহারুল আনোয়ার	"	"
ফরিদউদ্দীন আহমদ	১৮৮০	"
তকরিম উদ্দীন	"	প্রেসিডেন্সি কলেজ
হাসমত উল্লাহ	১৮৮১	মুইর সেন্ট্রাল কলেজ
হিম্মত আলি	"	হুগলি কলেজ
ফজলুল করিম	১৮৮৩	ঢাকা কলেজ
আবদুস সালাম	"	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
আবদুল রহমান	"	হুগলি কলেজ
রেয়াজউদ্দীন	"	মুইর সেন্ট্রাল কলেজ
আবদুল মজিদ	১৮৮৪	ঢাকা কলেজ
আবদুল জাওয়াদ	"	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউট
আবদুল জব্বার	"	হুগলি কলেজ
একিনউদ্দীন আহমদ	"	প্রেসিডেন্সি কলেজ
শামসুল হুদা	"	"
সমিরউদ্দীন আহমদ	"	"
মবিন উদ্দীন আহমদ	"	"
খান লোকমানউদ্দীন	"	ফ্যানিং কলেজ
আবদুর রহিম	১৮৮৫	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউট
বজলুর রহিম	"	ঢাকা কলেজ
ইমতিয়াজ আলি	"	ফ্যানিং কলেজ
লুৎফর রহমান	১৮৮৫	"
মোহাম্মদ ইব্রাহীম	"	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
তবরেজ আলি	"	হুগলি কলেজ
মোহাম্মদ আজিম উদ্দীন	"	মুইর সেন্ট্রাল কলেজ
আবদুল আজিজ	১৮৮৬	ঢাকা কলেজ
আবদুল ওয়াজেদ	"	"
হেমায়েদতউদ্দীন	"	"

জহুরুল হক	১৮৮৬	ঢাকা কলেজ
জাহহাদুর রহিম জাহেদ	"	"
আবদুল হক	"	শিক্ষক
আবদুল করিম	"	প্রেসিডেন্সী কলেজ
আবদুর রহিম	"	"
আহমদ	"	"
মাহমুদ	"	"
মোহাম্মদ ইসরাইল	"	"
মোহাম্মদ ইসরাইল খাঁ	"	"
আবদুস সামাদ	"	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউট
সৈয়দ নাজির হোসেন	"	"
মোহাম্মদ আলফাক	"	"
আজমত আলি ফিরোজ	"	মুইর সেন্ট্রাল কলেজ
মুবারক হোসেন	"	"
মোহাম্মদ হোসেন আলি	"	"
মীর্জা ওহীদউদ্দীন বেগ	"	ফ্যানিং কলেজ

প্রথম দিকের মুসলমান অনার্স গ্রাজুয়েট

সৈয়দ আমির আলি	ইতিহাস	১৮৬৮	হুগলি কলেজ
রেজা হোসেন	ফারসি	১৮৭৭	মুইর সেন্ট্রাল কলেজ
হাসমতউল্লাহ	আরবি	১৮৮২	"
গোলাম হায়দার খা	ইংরেজি	১৮৮৫	প্রেসিডেন্সি কলেজ
আবদুর রহিম	"	১৮৮৬	"

প্রথমদিকের মুসলমান এম. এ.

সৈয়দ আমীর আলি	১৮৬৮	হুগলি কলেজ
আবুল খয়ের	১৮৭৪	"
রেজা হোসেন	১৮৭৭	মুইর সেন্ট্রাল কলেজ
তকরিম উদ্দীন আহমদ	১৮৮১	প্রেসিডেন্সি কলেজ
আবদুস সালাম	১৮৮৪	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
গোলাম হায়দার খা	১৮৮৫	প্রেসিডেন্সি কলেজ
আবদুর রহিম	১৮৮৬	"
আবদুস সামাদ	"	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউট

প্রথম দিকের মুসলমান আইন ডিগ্রি লাভকারি

সৈয়দ আমীর আলি	১৮৬৯	হুগলি কলেজ
ওবায়দুর রহমান	"	বহরমপুর কলেজ
মোহাম্মদ ওয়াজেদ	১৮৭১	প্রেসিডেন্সি কলেজ
আবদুল বারি	১৮৭২	"
সিরাজুল ইসলাম	১৮৭৩	ঢাকা কলেজ
মোহাম্মদ দায়েম	১৮৭৪	প্রেসিডেন্সি কলেজ

মোহাম্মদ মজহার ইমাম	১৮৭৫	প্রেসিডেন্সি কলেজ
ইয়াদ বখশ	১৮৭৯	"
ফজলুল করিম	১৮৮০	ঢাকা কলেজ
মজহারুল আনোয়ার	"	হুগলি কলেজ
তসলিমউদ্দীন আহমদ	১৮৮২	প্রেসিডেন্সি কলেজ
তকরিমউদ্দীন আহমদ	১৮৮৩	"
ফজলুল করিম	১৮৮৫	ঢাকা কলেজ
আবদুল মজিদ	১৮৮৬	"
হিম্মত আলি	১৮৮৬	"
গোলাম হায়দার খা	১৮৮৬	সিটি কলেজ
মহিবউদ্দীন আহমদ	"	"
শামসুল হুদা	"	"
সৈয়দ ইউসুফ আলি	"	"
একিনউদ্দীন আহমদ	"	"

১৮৮১-৮২ সময়কালে শিক্ষার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ

প্রতিষ্ঠান	মোটছাত্র	মুসলমান	শতকরা
কলেজ (ইংরেজি)	২,৩৭৮	১০৬	৩.৮
কলেজ (প্রাচ্যবিদ্যা	১,০৮৯	১,০৮৮	৯৯.৯
উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়	৪৩,৭৪৭	৩,৮৩১	৮.৭
মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়	৩৭,১৫৯	৫,০৩২	১৩২
উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	নেই	শূন্য
মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৪	১১

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশে পাটচাষ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠে। আট দশকের দিকে পাটের চাহিদার ফলে চাষ যায় আরো বাড়ে। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক এবং এর পর পরই পাটের দাম হয় প্রচুর। পাটের এ ক্রমবর্ধমান চাহিদা প্রধানত মুসলমান-প্রধান উত্তর ও পূর্ববঙ্গের চাষীরাই মেটায়। ফলে গ্রামের কৃষকদের হাতে কিছু অর্থ-সম্পদ পাটের মাধ্যমে সঞ্চিত হয় এবং তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে (যে শিক্ষালাভের ফলাফল চোখের সামনেই দেখতে পায় জীবিকার আয়োজনে) আগ্রহী হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, ১৮৭১ থেকে ১৮৮৫-র মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে যে-কয়টি সরকারি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার সবগুলোতেই মুসলমান সমাজে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বনেরও সুপারিশ করা হয়। ১৮৭৩-এ ছোটলাট জর্জ ক্যাম্পবেল মুহসিন ফাণ্ডের টাকা হুগলি কলেজে ব্যয় না-করে তা বাংলাদেশে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয়ের পরামর্শ দেন। এর ফলে বড়লাটের অনুমোদনক্রমে মুহসিন ফাণ্ডের বার্ষিক

পঞ্চান্ন হাজার টাকা ও কোলকাতা মাদ্রাসার আটত্রিশ হাজার টাকা যোগ করে কোলকাতা ও হুগলি মাদ্রাসা পরিচালনার সুব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহিতে একটি করে মাদ্রাসা ও ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং খোলা হয়। শিক্ষার বিষয় হিসেবে ইংরেজি ভাষাও প্রবর্তিত হয়। ছাত্রদের স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। নয়টি জেলা স্কুলে ফারসির শিক্ষক নিযুক্ত হয়। স্কুল-কলেজে মুসলমান শিক্ষার্থীদের দেয় ফি'র দুই-তৃতীয়াংশ এ ফাণ্ড থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৮৭৩-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজ খোলার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের শিক্ষার পথ আরো প্রশস্ত হয়। তবে মাদ্রাসায় বাংলা ও অঙ্ক শিক্ষার ব্যবস্থা ১৮৮৪-এর আগে হয়নি। মুসলমান স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি পরীক্ষায় আরবি-ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও এসব সুপারিশের ফল। মুসলমানদের দান থেকে যেসব তহবিল গঠিত, তার অর্থ কেবল মুসলমানদের শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা হবে—এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে মুসলমান ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা হয়। এর সুফল দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যেই। ১৮৭১-এ বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১৪.৮ ভাগ যেখানে স্কুল-কলেজে পড়ত, ১৮৮১-৮২-তে সেই ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার ২৩.৮ ভাগ।

অস্বচ্ছ চেতনার বিকাশ

শিক্ষার প্রসার হতে-না-হতেই মুসলমানদের পক্ষ থেকে সরকারি চাকরির অংশ দাবি করা হয়। কিন্তু ১৮৮৫-র শিক্ষা প্রস্তাবে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয় যে, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অনগ্রসর বলে মুসলমানরা কোন বিশেষ সুবিধা পাবে না। লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই কেবল তারা ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট চাকরির অংশভোগী হতে পারবে। এর ফলে শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থী মুসলমানরা হিন্দুকেই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা শুরু করে। কারণ, এদেশে অবস্থিত অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু যেমন বৌদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ পাহাড়ি বা অন্য জাতিসমষ্টি ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ হিসেবে তখনো এগিয়ে আসতে পারে নি।

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুরা ইতোমধ্যে প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে পড়ছিল। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৮৮১-তেই মাত্র ১৭০০ গ্রাজুয়েটের অর্ধেকের বেশিই বেকার। এদের প্রায় সকলেই হিন্দু। ফলে জাগছিল রাজনৈতিক চেতনা—পরাধীন বাংলা তথা ভারতবর্ষকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করা। মুক্ত হলেই চাকরি-বাকরির হতে পারে অবারিত দ্বার। দেশী বণিক-ব্যবসায়ীরাও ইংরেজদের বৈমাত্রেয়সুলভ ব্যবহারে হচ্ছিল ক্ষিপ্ত। ভারতবর্ষে নবজাত শিল্পদ্রব্যের ওপর কর বসানো, রেলপথ ও অন্যান্য যানবাহন শিল্পে নিযুক্ত বিদেশী মূলধনের একচেটিয়া প্রভুত্ব রক্ষা করা এবং সাধারণভাবে ভারতীয় ধনবাদের আর্থিক বিকাশে বাধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে ইংরেজ শাসকরা দেশী-মালিক শিল্পপতি ধনিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে ধীরে ধীরে ঠেলে দিচ্ছিল। শাসকগোষ্ঠীর শোষণের ফলে দুর্ভিক্ষ সারা ভারতের ওপর

স্থায়ীভাবে আসন পেতে বসেছিল। শুধু ১৮৭৭-এর দুর্ভিক্ষেই পঞ্চাশ থেকে ষাট লাখ ভারতবাসী প্রাণ দেয়। কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে কেবল ধ্বংসের ছবি ভাসতে থাকে। সকলের ভেতর সরকার-বিরোধী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে।

এ অসন্তোষ যে-রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয় তা হল জাতীয়তাবাদ। আর জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্প্রদায়গত চিন্তাভাবনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবী তথা সামগ্রিকভাবে হিন্দু মধ্যবিত্ত জাতীয় চেতনার সাথে ধর্মকে গুলিয়ে একত্র করে ফেলে। এসময় ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার শুরু হলে বেদ-উপনিষদ-ষড়দর্শনসহ মহাবীর, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত আবিষ্কৃত হন। এতে এদেশের বহু শতাব্দীর গৌরব ও আত্মশ্লাঘার বিষয় প্রকাশিত হয়। এর সবই সাধারণভাবে হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অধিকার বলে শিক্ষিতজনের কাছে প্রতিভাত হতে থাকে। তাদের চেতনার বিস্তৃতি ঘটে অশিক্ষিতজনদের মধ্যেও। অন্যদিকে, উনিশ শতকের শেষদিক থেকে মুসলমানরা নানা সুযোগে ইংরেজি শিক্ষায় যেমন শিক্ষিত হতে থাকে তেমন চাকরি-বাকরিতেও নিয়োজিত হওয়ার কিছুটা সুযোগ লাভ করে। এর ফলে পূর্বে উত্থিত হিন্দু মধ্যবিত্ত নবউত্থিত মুসলিম শিক্ষিতদের প্রতিযোগীর চোখে দেখা শুরু করে। সম্প্রদায়গত ইতিহাস-চেতনায় পুষ্ট হয়ে হিন্দু মধ্যবিত্ত দেখে যে আঠার শতকের মধ্যভাগের পূর্ব পর্যন্ত বহু শতাব্দীর ইতিহাসে মুসলমানগণ ভারতবর্ষের শাসক হিসেবে এক অত্যুজ্জ্বল গৌরবের অধিকারী। ইংরেজ আগমনের জন্যই বোধ হয় হিন্দু মধ্যবিত্তের উদয় সহজতর হয়েছে। অথচ কালিক প্রয়োজনের সুযোগ সুবিধা ইংরেজ শাসকগণ দিতে সক্ষম হচ্ছে না। এ অবস্থায় মধ্য সম্প্রদায়গত চেতনা বাড়তে থাকে।

রাজনীতিতে সম্প্রদায়গত চিন্তা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলেই উদ্ভূত। কোন ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মনিষ্ঠার সাথে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক অবশ্যই নেই। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন একজন ব্যক্তি ধার্মিক নাও হতে পারে এবং ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্যই সে ধর্মকে ব্যবহার করতে পারে। ইংরেজ-পূর্ব যুগে সুদীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোত্র এবং জাতি-উপজাতিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কখনো নিরবিছিন্ন শান্তিপূর্ণ ছিল না, কিন্তু তাই বলে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাও ছিল না। তখনকার বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোত্র ও জাতি-উপজাতির মধ্যেকার সংঘর্ষগুলোর রূপ ও চরিত্র ছিল ছোটখাট মারামারি থেকে বড় আকারের যুদ্ধ। কয়েকশ বছর যাবৎ হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষে একত্রে পাশাপাশি বাস করছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ নিয়ে কখনো কোন বিদ্রোহ হয়েছে বলে জানা যায় না। ইংরেজ আমলের পূর্বে ভারতে ইংরেজ আমলের মত পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব দেখা যায় নি। মুসলমান শাসকদের অনেক হিন্দু রাজা ও আঞ্চলিক নেতাদের বশ্যতা স্বীকার করানো নিয়ে সুলতানি বা মোগল ভারতে নানা যুদ্ধ হলেও সেই যুদ্ধের কোন ধর্মীয় রূপ ছিল না। মুসলিম শাসকরা সে-সবকে ধর্মযুদ্ধ হিসেবেও কখনো আখ্যা দেন নি। ওইসব যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক তথা জমি দখলের যুদ্ধ। আওরঙজেব ও শিবাজীর ক্ষমতার

দ্বন্দ্বও কখনো ধর্মযুদ্ধ ছিল না। শিবাজী মোগল শাসকের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছিলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়। আওরঙজেবও হিন্দু শিবাজীর বিরুদ্ধে নয়, বিদ্রোহী প্রজা-নেতার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিলেন।

তৎকালীন সামাজিক অবস্থাটাও ছিল ভিন্নতর। বৃহত্তর সমাজের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের তেমন কোন সাক্ষাৎ যোগাযোগ থাকত না—কর গ্রহণ ও প্রদান ছাড়া। অর্থনীতি ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। বহির্জগৎ থেকে গ্রামগুলোর বিচ্ছিন্নতার জন্য গ্রাম-সমাজের লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনীয় সব বস্তু নিজেরাই উৎপাদন করত। ফলে কোন তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ছিল না। অথচ এ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির মূল কারণ। উনিশ শতকে এ প্রতিযোগিতার উদ্ভব ঘটে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাশ ধারায়। আর তাই, বিনয় ঘোষ রচিত *বাংলার বিদ্বৎ সমাজ* বই-এর ভাষায়, 'হিন্দু প্রীতি ক্রমে হিন্দুত্ব প্রীতির ভিতর দিয়ে সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হলো। রামমোহন-ইয়াংবেঙ্গল-বিদ্যাসাগরের উদারতা ও যুক্তিবাদের স্বর্ণযুগ ধীরে ধীরে অস্ত গেল। যুক্তির বদলে এল সেই সনাতন ভক্তি, সংস্কারের বদলে কুসংস্কার, উদারতার বদলে সংকীর্ণতা, মানবতার বদলে সাম্প্রদায়িকতা।' অথচ সাম্প্রদায়িকতা-যে ধর্মীয় কারণের ফল কখনই নয় বরং মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফল, তা বোঝা যায় এর উৎপত্তিস্থলগুলো দেখলেই। সেগুলো হল মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত শহরাঞ্চল—কোলকাতা, ঢাকা, বোম্বে, মাদ্রাজ ইত্যাদি। এসবে সংঘটিত সমস্ত দাঙ্গা সবসময়েই সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

বাস্তবিকপক্ষে, উনিশ শতকে যে-নবজাগরণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কোলকাতা কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয় তা আসলেই ছিল খণ্ডিত ও দুর্বল। ইউরোপের নবজাগরণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রতিটি বিষয়কে যুক্তির মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা। একে রেসানালাইজেসন বা যুক্তিবাদিতা বলা যেতে পারে। ফলে সেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা ও বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে এবং শিল্পবিপ্লব তথা পুঁজিবাদী সমাজের জন্মের দার্শনিক ভিত্তি তৈরি হয়। দেখা দেয় স্বচ্ছ জাতীয় চেতনা তথা জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ফলে ধনতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও বাইবেলের বিভিন্ন ভুলত্রুটি নির্দেশের মাধ্যমে প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মের মূলেও আঘাত করে। কিন্তু সারা বাংলার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের কথিত রেনেসাঁ বা নবজাগরণের হোতা ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিগণের কাছে অতীতের জাতিভেদ, বর্ণভেদ, বহু-ঈশ্বরবাদ ইত্যাকার বিষয় পুরাতন হিসেবে চিহ্নিত হয় না, বরং নবযুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার চেষ্টা চলে। হিন্দু মধ্যশ্রেণীর এ চিন্তা-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয় নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের বিচিত্র ধ্যানধারণা। বাংলার মুসলমানদের শীর্ষ স্থানীয় দুই ব্যক্তিত্ব নবাব আবদুল লতিফ (জন্ম ১৮২৩, মৃত্যু ১৮৯৩) এবং স্যার সৈয়দ আমির আলি (জন্ম ১৮৪৯, মৃত্যু ১৯২৭)-র সামাজিক ভূমিকায়ই তা স্পষ্ট।

আবদুল লতিফ দেশীয় রাজনীতির আলোচনা থেকে দূরে থাকতেন। ইংরেজ সরকারের সাথে প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতেন। তবে

মুসলমানদের ভেতর ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে তিনি উৎসাহী ছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা অঙ্গীভূত করার তিনি প্রয়াস চালান। তিনি মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের সুফলের ওপর ১৮৫৩-তে ফারসি ভাষায় এক রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। রচনাটির নাম উল্লেখযোগ্য : 'এডভান্সমেন্ট অব এন ইংলিশ এডুকেশন ট্যু দ্য মাহোমেডান ইয়থ ইন ইণ্ডিয়া এ্যণ্ড দ্য মোস্ট আনঅবজেকশানেবল মিন্‌স্ অব ইম্পার্টিং সাচ ইনস্ট্রাকসান'। বোম্বের স্যার জমসেদজি জিজিভাই স্কুলের শিক্ষক আবদুল ফাত্তাহ্ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে একশ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। এ প্রতিযোগিতা কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ লতিফকে ধর্ম বিরোধী, কাফের ইত্যাদি আখ্যা দেন।

আবদুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষার সাথে আরবি শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলেও একটি পুস্তিকা লেখেন। তিনি মুসলমান সমাজকে দুটি ভাগে ভাগ করেন—একটি বিজ্ঞ শ্রেণী বা শিক্ষিত শ্রেণী এবং অন্যটি বৈষয়িক শ্রেণী। প্রথমোক্তরা গরিব ও সংখ্যায় খুবই কম। এরা আরবির চর্চা করেন, ইংরেজির প্রতি অনাগ্রহী, জ্ঞান আহরণের জন্যই বিদ্যা শিক্ষা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা আরবি শিক্ষার জন্য আগ্রহশীল নন। কাজ চালানোর মত ফারসি হলেই তাদের চলে। এরাই সংখ্যায় বেশি এবং ইংরেজি শিখতে চান। তিনি প্রথমোক্তদের জন্য হুগলি মাদ্রাসাকে উন্নত এবং শেষোক্তদের জন্য এ্যাংলো-পারসিক স্কুল করার পরামর্শ দেন। তিনি মনে করেন যে, মুসলমানদের জন্য ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করলে তাদের মধ্যে ব্রিটিশ ভক্তি বাড়বে। কোলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ খোলার ব্যাপারে এজন্য তিনি সরকারকে সাহায্য করেন। বাংলার মুসলমানদের জন্য উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির দাবি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি বার বার তুলতে থাকেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে হিন্দু কলেজ 'প্রেসিডেন্সি কলেজ'-এ রূপান্তরিত হয় এবং সেখানে মুসলমান ছাত্রদের অধ্যয়নের দ্বার খুলে যায়—পূর্বে যে-দ্বার ছিল বন্ধ। ইংরেজি স্কুলগুলোর পাঠ্য বইয়ের বিষয়েও মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে যাতে আঘাত না-লাগে, সেজন্য সরকারকে তিনি পরামর্শ দেন, যেমন ওয়ালটার স্কট-এর *টালিসম্যান* বইটির ব্যাপারে তিনি যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেন মুসলমান-চিন্তার বিরোধী বলে।

তাছাড়া আবদুল লতিফ ১৮৬৩-তে 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন গড়েন। এর উদ্দেশ্য হয় মুসলমানদের পাশ্চাত্য ভাবধারার সাথে পরিচিত করানো এবং প্রয়োজনে সরকারকে পরামর্শের মাধ্যমে সাহায্য করা। এ প্রতিষ্ঠান ইংরেজ-বিরোধী সামান্যতম আন্দোলনেরও বিপক্ষে কাজ করত। ওয়াহাবিদেরকে এ প্রতিষ্ঠান গালমন্দ করত। তরিকা-ই-মুহম্মদিয়া'র ইংরেজ শাসক বিরোধী প্রভাবকে বাধা দেওয়ার জন্য ১৮৭০-এ কোলকাতায় এটি এক সভার আয়োজন করে। এ সভায় ধর্মীয় নির্দেশাবলী আলোচনা করে স্থির হয় যে, ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষ হচ্ছে 'দার-উল-ইসলাম'। এখানে শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ধর্মীয় নিষেধের পরিপন্থী। এ সভায় বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন মওলানা কেরামত আলি জৌনপুরি। ইংরেজ সরকারের সাথে

সম্পর্কের অবনতি হবে ভেবে ১৮৮৫-তে ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ পর্যন্ত সোসাইটি প্রত্যাখ্যন করে। এমনকি ১৮৯৯-এ সৈয়দ আমির আলি মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে অনুসৃত সরকারি নীতির সমালোচনা করলে সোসাইটি তার প্রতিবাদ করে সরকারি নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। সোসাইটি বাস্তবিকপক্ষে বাংলা ভাষা চর্চারও বিরোধিতা করে। এর সদস্যবর্গ সবাই ছিলেন অভিজাত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত। তাঁরা উর্দুকেই মাতৃভাষা হিসেবে গণ্য করতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মুহসিন তহবিলের অর্থ ব্যয়ে মাদ্রাসা স্থাপনেই এঁরা বেশি উৎসাহ দিতেন। এর ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে নতুন নতুন মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বহু সংখ্যক বৃত্তিরও ব্যবস্থা হয়। বলা বাহুল্য, এসব মাদ্রাসায় উর্দু ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

আবদুল লতিফ বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। একেবারে খাস ফরিদপুর জেলার অধিবাসী হয়েও এবং প্রথম জীবনে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের একজন শিক্ষক হলেও ১৮৮২-তে উইলিয়াম হাণ্টারের শিক্ষা কমিশনের কাছে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে লিখিতভাবে তিনি জানান যে, উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর মুসলমানরা আরব, ইরান প্রভৃতি দেশ থেকে আগত বলে তাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। তাই তাদের বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করা অবাস্তব। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানরা এ দেশজাত ধর্মান্তরিত ব্যক্তি হওয়ায় তাদের বেলায় বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়ত-বা সম্ভব। তবে সে-ভাষাও হিন্দু প্রভাবিত সংস্কৃত শব্দ ত্যাগ করে আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলার মাধ্যমে হতে হবে। তিনি বলেন, 'সংক্ষেপে আমার মত হল নিম্ন শ্রেণী, জাতিগতভাবে যারা হিন্দুদের কাছাকাছি, তাদের প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত বাংলাভাষা। কিন্তু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের মাতৃভাষা হবে উর্দু, কারণ এভাষাই তাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের সমাজে, গ্রামে ও নগরে একইভাবে। কোন মুসলমানই সম্ভ্রান্ত সমাজে স্বধর্মীদের মধ্যে স্থান পাবেন না যদি তিনি উর্দু না-জানেন।' তিনি আরো অভিমত প্রকাশ করেন যে, দারিদ্র্যের জন্যই মুসলমানরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। সরকারি সাহায্য না-পেলে তাদের উন্নতির আশা সামান্যই।

লতিফ এবং তাঁর সোসাইটি থেকে কিছুটা ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন সৈয়দ আমির আলি ও তাঁর প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' যার পরে নাম হয় 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। ১৮৭৮-এর মে মাসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন পাটনার নবাব আমির আলি খান বাহাদুর এবং সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আমির আলি। এ প্রতিষ্ঠানে অমুসলমানরাও সদস্য হতে পারতেন। হাণ্টার (শিক্ষা) কমিশনের কাছে এ এসোসিয়েশন মুসলমানদের দাবি সম্বলিত একটি মেমোরেণ্ডাম পেশ করে। এতে সরকারকে হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদ্রাসাগুলো তুলে দিয়ে ঐ সব খরচ বাঁচিয়ে কোলকাতায় কেবল মুসলমানদের জন্য একটি ইংরেজি কলেজ খুলতে বলা হয়। তাঁদের এই পরামর্শে মতামত দিতে বললে লতিফ মাদ্রাসাগুলো তুলে দেওয়ার ঘোর বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, সামাজিক

কর্তব্য পালন জন্য এবং ধর্মীয় শরা-শরীয়তের ব্যাপারে উপদেশ দেওয়ার জন্য এক শ্রেণীর আরবি শিক্ষিত কাজি ও মৌলবির প্রয়োজন আছে বলে এগুলো বর্তমান থাকা আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, এসোসিয়েশনের সদস্য মোহাম্মদ ইউসুফ ১৮৮৩-তে সর্বপ্রথম মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা দাবি করেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলোতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবিও তিনিই প্রথম ধ্বনিত করেন। এসোসিয়েশন ইংরেজ-বিরোধী চেতনা বিকাশের উদ্দেশ্যে হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে যেসব সভাসমিতি গঠিত হয় তাতে যোগ দিতে ইতস্তত করেনি, সোসাইটি যা অপছন্দ করত। সোসাইটি চেয়েছিল ইংরেজ পক্ষপুটে সুবিধা লাভ, এসোসিয়েশন, স্বাধিকার। তবে উভয়েই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কোন রকম সরাসরি আন্দোলনের বিরোধী ছিল। কিন্তু সৈয়দ আমির আলি মুসলমানদের মধ্যে যেমন ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন, তেমন তিনি তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনারও পরিবৃদ্ধি ঘটুক তা চাইতেন। কিন্তু সেটা কেবল উচ্চবিত্তের জন্য। ১৮৬৯-এ তিনি বলেছিলেন যে, কৃষিজীবিগণ বা নিম্নশ্রেণীর লোকজনের মাদ্রাসাতে পড়াও ঠিক নয়, কারণ তাদের বিদ্যাশিক্ষায় পারদর্শী করাটা হল প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সকল মানুষেরই সৃষ্টি হয়েছে এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার শেষ পরিণতি ঘটে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৭২ পর্যন্ত কোলকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হতে হলে অবশ্যই 'শরাফতনামা' অর্থাৎ অভিজাত ঘরের সন্তান কিনা তার প্রামাণ্য দলিল উপস্থিত করতে হত। আর এ ধরনের প্রত্যয়ন-পত্র দাখিল করার ব্যাপারে আবদুল লতিফ, মৌলবি আবদুল জব্বার, মির মোহাম্মদ ইসমাইল প্রমুখের মত তৎকালের স্বনামখ্যাত সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণও অত্যন্ত জোর দিতেন। কেবল ১৮৭২ থেকে শরাফতনামার স্থানে চরিত্র প্রত্যয়নপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

অথচ এদিকে মাদ্রাসা মক্তবের মুসলিম ছাত্ররা ছিল, ১৮৯৯-এর ২১ জানুয়ারির *মুসলিম ক্রনিকেল* পত্রিকার ভাষায়, 'বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন আরবি-পড়ুয়া ছাত্র হল বিচিত্র স্কলার। সে যেখানে আরবি দর্শনের ব্যাখ্যা করতে পারে এবং পারে ফারসি কবিতার বয়াত আওরাতে, তার জ্ঞান কিন্তু যে-জেলার কাজ করতে যাবে সেখানকার সম্বন্ধে খুবই সামান্য। আর তাই কাজকর্ম চালানোয় অক্ষম। সে না হতে পারে একজন কেরানি, না একজন সরকার, না সাংবাদিক বা লেখক।' এ রকম মানুষ সরকারি চাকরি পায় না, কোন প্রাইভেট অফিস বা ব্যবসায়ীর সেরেস্তায় বা স্থানীয় জমিদারিতেও কাজ জোটে না। কেবল অনুরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাকরি হতে পারে যেখানে পদের সংখ্যা নগণ্য, উন্নতির আশাও সামান্য।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দের আশরাফ-আতরাফ প্রশ্ন, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি ঝোঁক এবং দেশী ভাষা বাংলার প্রতি অবজ্ঞা মুসলিম সমাজে দারুণ বিপর্যয় ডেকে আনে। টোল-চতুষ্পাটি, মক্তব-মাদ্রাসা ছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু

ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে হিন্দুরা পাঠশালার অধ্যয়নে মনোযোগ দেয়, যেখানে সাধারণ শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে দেওয়া হত এবং যেখান থেকে ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ছাত্ররা পড়তে যেত। বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞার কারণে পাঠশালা শিক্ষার প্রতি মুসলিম নেতৃবৃন্দ অনীহ ছিলেন। ফলে পাঠশালা এবং মাধ্যমিক ইংরেজি স্কুলগুলোয় হিন্দুরা কেবল সংখ্যাধিকই হয়ে ওঠে না, বাংলাভাষায় তারা যেমন ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে তেমন প্রতিষ্ঠানগুলো বলতে গেলে হিন্দু প্রাধান্যের সাথে সাথে হিন্দুয়ানী ভাবধারায় যায় ভরে। পাঠ্যতালিকায় বইপত্রসমূহে হিন্দু পুরান-মহাভারত-রামায়ণের কাহিনীতে হয় পূর্ণ। কেবল হিন্দু মনীষীদের কথাই হয় বর্ণিত। মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে শিক্ষার তেমন-কিছুই এসব বিদ্যাপীঠে না-থাকায় অনেক মুসলমান এগুলোতে ছাত্র ভর্তি করতে হয় অনিচ্ছুক। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ওই হিন্দু-প্রভাব দেখা যায়।

এরূপ বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজ অগ্রসর হতে গিয়ে উনিশ শতকের শেষদিক থেকে মুসলমানদের একটা অংশ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। এদের মাঝে দেখা দেয় ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজনীতি সম্পর্কে সগর্ব ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে যে-কোন মানদণ্ডে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের বিষয় হয়ে ওঠে প্রধান। যুক্তি ও তর্কের খাতিরে অনেক পুরানো বিশ্বাস এঁরা বাতিল করতে চান কিন্তু আবার চান আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের ঐক্য প্রতিপন্ন করতে। বস্তুত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খ্রীস্টধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার যে-প্রয়াস দেখা যায় সৈয়দ আমির আলির রচনায়, সে-ধারাই অনুসৃত হয় শেখ আবদুর রহিম থেকে মোহাম্মদ কে. চাঁদ-এর রচনায়। শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র সংবাদপত্রগুলোও যেন এ প্রক্রিয়ায় পড়ে যায়। আরবি-ফারসি নাম নিয়ে এগুলো আবির্ভূত হতে থাকে, যেমন *মোহাম্মদী আকবর* (১৮৭৭), *মুসলমান* (১৮৮৪), *মোসলেম বন্ধু* (১৮৮৫), *কোহিনূর* (১৮৯৮), *নূর-উল-ইস্‌লাম* (১৯০০) ইত্যাদি। এগুলোর বক্তব্যও হতে থাকে পারস্য-আরব-তুরস্ক ঘেঁসে। অথচ শুরুতে কিন্তু পত্রিকাগুলোর অবস্থা এমন ছিল না, মুসলমানরাও বিদেশের দিকে এতটা দৃষ্টি দিত না, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দিকে। ফারসি ভাষায়-প্রকাশিত *'সমাচার সভা বা রাজেন্দ্র'* (১৮৩১) এবং *'জগদোদ্দীপক ভাস্কর'* (১৮৪৬) নাম ও ঢঙে ছিল একেবারেই এতদ্দেশীয়। দুটিই ছিল সাপ্তাহিক। প্রথমটি প্রকাশিত হত ফারসি ও বাংলা ভাষায় এবং দ্বিতীয়টি বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি এবং উর্দু ভাষায়।

২.

বিশ শতক এদেশে আসে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর এলোমেলো চিন্তায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বুকে নিয়ে। এরা আবার হিন্দু মুসলিম দুটি পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়গত স্বার্থচেতনায় হতে থাকে পরিপুষ্ট। শতাব্দীর শুরুতেই বঙ্গভঙ্গের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে এ পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যেও মুসলিম মধ্যবিত্তের

দুটি ধারা দেখা যায়—একটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান স্থির করে, অন্যটি স্বাতন্ত্র্যবাদী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী ধারাটি বেশ আগে থেকেই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে আসছিল। অনেক পত্র-পত্রিকা, যেমন *আহমদী* (১৮৮৬), *সম্মিলনী* (১৮৮৭), *কোহিনূর* (১৮৯৮), *নবনূর* (১৯০৩) দুই সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি এবং জাতীয় উন্নতিতে সমানভাবে অংশগ্রহণের কথা বলত। পরবর্তীতেও মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী, শেখ হবিবর রহমানের মত ব্যক্তি হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন সর্বদাই। মনিরুজ্জামান বলেছেন, 'হিন্দু ও মুসলমান ভারত-মাতার যুগল সন্তান। তাহারাই দেশের প্রধান অধিবাসী। মাতৃভূমির প্রকৃত সুখসম্পদ ও সমৃদ্ধির গৌরব যে এই উভয়ের সমবেত চেষ্টা, পরস্পর একতা ও সম্প্রীতির উপর নির্ভর করে, তাহা চিন্তাশীল ও জ্ঞানীলোক মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন।' শেখ হবিবর রহমানের অভিমত, 'হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতি কেবল নিজ নিজ স্বতন্ত্র জাতীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উভয় জাতি মিশিয়া যাহাতে একটি বিরাট জাতীয়তার পত্তন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।'

এ সম্মিলন ধারারই অনুবর্তীরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ, আবদুর রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, লিয়াকত হোসেন, মুজিবর রহমান, মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রমুখ বঙ্গভঙ্গের প্রবল বিরোধিতা করেন। 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' প্রবন্ধে একিনউদ্দিন আহমদ 'সৃষ্টিছাড়া বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করেন। খয়েরখাহ্ মুন্সি রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানদের যোগ দিতে উৎসাহ দেন এভাবে : 'ইংরেজদের কর্মশালার বহু দ্বার এ দেশীয়দের পক্ষে রুদ্ধ রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট মুসলমান প্রীতির বশে তাহার একটাও খুলিয়া দেন নাই।...গভর্ণমেণ্টের নিকট হিন্দু-মুসলমান উভয়ই বিজাতি।...ফলত কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের পক্ষেই রাজনৈতিক আন্দোলন সমান প্রয়োজনীয়।' মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা 'স্বদেশী আন্দোলন' প্রবন্ধে ১৩১২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের *নবনূর*-এ লেখেন, বঙ্গভঙ্গের সময়ে 'এখানকার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একত্রাবস্থাজনিত যে একটা সাম্য সংস্থাপিত হইয়া গেছে তাহার উচ্ছেদন বা উৎপাটন সম্ভবপর নহে। বিদেশীরা যত কিছু যেরূপভাবেই আমাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির চেষ্টা করুক না কেন, এ সাম্য, এ ঐক্য, এ সামঞ্জস্য যাইবার নহে। ...ইংরেজ আমাদের উন্নয়ন কার্যে যতটা সহায়তাই করুক না কেন, তাঁহার ভেদনীতিই আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে।' অবশ্য লেহাজউদ্দিনের মত সংশয়বাদীও ছিলেন। তাঁর মতে, হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সংগ্রাম বর্তমানের জন্য ভাল হলেও ভবিষ্যতের জন্য অশুভকর হতে পারে।

বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের জন্য ইংরেজ সরকার নানা কথাবার্তায় জানায় যে মুসলিম স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই নতুন প্রদেশ গঠিত হচ্ছে। যেসব অঞ্চল নিয়ে এ প্রদেশ গঠিত হচ্ছিল—চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো—তাতে মুসলমানরা সংখ্যাধিক ছিল। এজন্য কথাটা সাধারণ সকল মুসলমানের গ্রাহ্যও হয়। বঙ্গভঙ্গ হলে অনগ্রসর মুসলমান সমাজের অনেক সুবিধে হবে, সরকারের তরফ থেকে একথা জোরেসোরেই প্রচারিত হতে থাকে। প্রদেশ গঠনের পর লেফটান্যান্ট গভর্নর ব্লুমফিল্ড ফুলার তো বলেনই যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় হল তাঁর দুই স্ত্রীর মত। এদের মধ্যে মুসলমানই প্রিয়তর। সরকারের পক্ষে কাজ করেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ (যদিও প্রথমে তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ছিলেন, বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের জন্য সরকারের সলিমুল্লাহ্‌কে চোদ্দ লক্ষ টাকা প্রদানের কথা দিল্লির জাতীয় মহাফেজ খানা সূত্রে জানা যায়), নবাব সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরি প্রমুখ জমিদারগণ।

সরকারের উক্তি এবং প্রচারে হিন্দুদের বিরাগ এবং মুসলমানদের অনুরাগ লাভ করা যেমন অস্বাভাবিক ছিল না, তেমন হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস করাও অসম্ভব ছিল না। জীবন-জীবিকার তাগিদে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের অন্নসমস্যা হয়ে উঠছিল প্রবল। চাকরিবাকরির হচ্ছিল অভাব। ব্যবসাপাতিও প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ। আবার ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের ঘৃণার ভাব শিক্ষিতদের মান-অপমানবোধ করছিল জাগ্রত। আবেদন-নিবেদনের ধারা বহনকারী কংগ্রেসের উদারনৈতিক রাজনীতিবিদগণ বিশেষ কিছুই অর্জন করতে পারেন নি। বরং বিবেকানন্দের বক্তৃতায়, সিস্টার নিবেদিতার ভক্তিতে এবং হিন্দুধর্মের প্রতি থিওসফিস্টদের শ্রদ্ধা-নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মমর্যাদাবোধ বেড়ে উঠছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ ইউরোপীয় সামরিক শক্তির মাহাত্ম্য সম্পর্কে ভারতীয়দের সশ্রদ্ধ ভীতি খর্ব করেছিল। চীনে ইউরোপীয় পণ্যবর্জন আন্দোলনের সার্থকতা নতুন প্রেরণা এনেছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনে।

এসব কারণে বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্র করে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজে প্রতিরোধের মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯০৬-এ কোলকাতা কংগ্রেসে স্বদেশী এবং বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয়। আন্দোলনের মুখে সরকার নেয় দমননীতির আশ্রয়। ফলে প্রকাশ্যপথ ছেড়ে আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে গুপ্তপথে।

স্বদেশী আন্দোলন বাংলার হিন্দু-মানসে যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে তার সঙ্গে মিশে থাকে হিন্দু-ঐতিহ্যগর্ব। মুসলমানদের কাছে তা গ্রাহ্য হওয়ার কথা নয়। হয়ও নি। সন্ত্রাসবাদীদের অনেকেই মুসলমানদের বরং ইংরেজপোষ্য মনে করতেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'ঐ সময়ে (১৯০৫-৬) বিপ্লবী দলগুলো হিন্দু মধ্যবিত্ত থেকেই সংগৃহীত হত। বস্তুত সকল বিপ্লবী দলই ছিল মুসলিম-বিদ্বেষী। তারা দেখে যে, ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের ভারতীয় রাজনীতির সংগ্রামের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে এবং মুসলমানরাও সরকারি তালেই চলছে...তারা (সরকার) উত্তর প্রদেশ থেকে একদল মুসলমান অফিসার আনে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে শক্তিশালী করার জন্য। ফল হয় এই যে, বাংলার হিন্দুরা ভাবতে থাকে যে, মুসলমানরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। হিন্দু সম্প্রদায়েরও বিরুদ্ধে।'

এ অবস্থায় ১৯০৬-এর ১ অক্টোবর সিমলা'য় ভাইসরয় লর্ড মিন্টো'র সাথে ভারতীয় উচ্চবিত্ত মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল আগা খান-এর নেতৃত্বে দেখা করে তাদের অভাব-অভিযোগসহ মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দেন। ওই বছরের ডিসেম্বরে এঁদের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এক শিক্ষা-সম্মেলন। সম্মেলন-শেষে জন্ম হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ-এর। এ সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা সমর্থিত হয় এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

একটু খুঁটিয়ে দেখলে কিন্তু বোঝা যায়, বঙ্গভঙ্গের দরুন মুসলমানরা যতটুকু লাভবান হত, হিন্দুরাও তার চেয়ে লাভবান কম হত না। বোধকরি বেশিই হত। দেখা যায় যে, নতুন 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে' মোট তিন কোটি দশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক কোটি আঠার লক্ষ ছিল মুসলমান এবং এক কোটি বারো লক্ষ ছিল হিন্দু। অন্যরা বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও অন্যান্যধর্মী। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের জনসংখ্যার তফাত ছিল মাত্র ছ' লক্ষের। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে আগে থেকেই অন্যান্য অঞ্চলের মত এ অঞ্চলেও শিক্ষার প্রসার ছিল বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তীকালে হিন্দু শিক্ষক-ছাত্র সংখ্যার সাথে মুসলমান শিক্ষক-ছাত্র সংখ্যার তুলনা করলেই তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। পূর্ববঙ্গের মুসলমান জমিদাররা যতই প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করুক না-কেন, মধ্যবিত্তের কাছে তাদের সঙ্গত কারণেই জারিজুরি খাটত না, বিশেষ করে হিন্দু মধ্যবিত্তের কাছে। ডাক্তার-উকিল-মোক্তার-চাকরিজীবী প্রায় সকল মধ্যবিত্ত তো ছিল হিন্দুই। তাঁদের আর একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত ছিল 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'তেও। এ বিষয়গুলো তলিয়ে না-দেখে ভাবাবেগের বশেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন উত্তুঙ্গে ওঠে। ফলে এর মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়গত চেতনা বাড়ে বেশ কিছুটা। সুযোগসন্ধানীরা আপাত-দেখাতে পারে যে, হিন্দুরা মুসলমানদের উন্নতি চায় না বলেই বঙ্গভঙ্গ বহাল রাখতে চায় না।

সারা ভারতের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বাংলার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য ১৯১১-তে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে। ফলে মুসলমানদের এক অংশ ইংরেজদের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। হিন্দুদের বিরুদ্ধেও।

এদিকে বিশ শতকের প্রথম দশকে মুসলমান মধ্যবিত্তের বেশ অগ্রগতি হয়। ডকটর দেশাই বলেছেন যে, ১৯১২ থেকে তাদের রাজনৈতিক চেতনাও যথেষ্ট বেড়ে ওঠে। কান্টওয়েল স্মিথও বলেন যে, ১৯১২-এর দিক থেকেই মুসলিম মধ্যবিত্ত বিশেষভাবে ইংরেজ বিরোধী চেতনার পরিচয় দিতে থাকে। এ মনোভাব সৃষ্টির পেছনে বলকান যুদ্ধে (১৯১২) তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় এবং তুরস্কের পক্ষে মওলানা মুহম্মদ আলি ও মওলানা শওকত আলির জনমত গঠনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রচেষ্টায় ডাক্তার আনসারির নেতৃত্বে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে ১৯১২-তে একটি মেডিকেল মিশন পাঠানো হয়। বস্তুত স্বদেশে বঙ্গভঙ্গ রদের দরুন এবং বিদেশে তুর্কি খিলাফতের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব মিলে শিক্ষিত মুসলমানদের যথেষ্ট পরিমাণে রাজনীতি-সচেতন এবং শাসক ইংরেজদের প্রতি বীতস্পৃহ করে তোলে। মুসলমানদের এ ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব ক্রমে ক্রমে যুক্ত হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে।

উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে চিন্তার মাধ্যমে উপস্থিত হয় ১৯১৬-এর লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে এবং আরো পরে ১৯২০-এর খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে।

সন্দেহ নেই যে, খিলাফত আন্দোলনের সাথে ইংরেজ-বিরোধিতা যুক্ত ছিল, কিন্তু এ বিরোধিতা যতটুকু-না সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিবাচক ভাবধারা থেকে এসে অসহযোগ আন্দোলনের সাথে মিলিত হয়েছিল তার চেয়ে বেশি এসেছিল দূর দেশের মুসলিম ঐক্য ও সংহতির তথাকথিত প্রতীক-খলিফার পদ রক্ষার প্রেক্ষিতে, যে পদটি ঐতিহাসিকভাবে ১২৫৮-তেই হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণের সময় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, অথবা আরো সঠিকভাবে বললে, যে-পদটি তার অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য নিয়ে হজরত আলির ওফাতের পরই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কারণ এর পর উমাইয়াদের থেকে খলিফাপদ রাজতান্ত্রিক ধারায় উত্তরাধিকারসূত্রে হয় সূচিত। তবুও ১২৫৮ পর্যন্ত খলিফাপদটির বিশেষ ঐতিহ্যগত মূল্য থাকলেও অতঃপর এর নব-উদ্ভাবনে যে-কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। শেষ আব্বাসীয় খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহকে হালাকু খান হত্যা করার পর মুসলিম-বিশ্ব খলিফাহীন হয়ে পড়ে। এমনকি জুম্মার নামাজে খুতবায় নামোল্লেখ করার মত আব্বাসীয় বংশের কাকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। দু'বছর এভাবে মুসলিম জাহান খলিফা-শূন্য থাকে। অতঃপর মিশরের মামলুক সুলতান বাইবার্স (১২৬০-৭৩) অনেক খোঁজাখুঁজি করে আব্বাসিয় বংশের বলে কথিত আবুল কাসেম আহমেদ নামের একজন প্রতিনিধি মিশরে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে খুবই জাঁকজমকের সাথে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। এ খলিফার উপাধি হয় আল-মুসতানসিব। বাইবার্স তাঁর কাছ থেকে খেলাত ও সম্মানসূচক পোশাক লাভ করেন। কায়রো মুসলিম জাহানের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

এ অবস্থাও আবার পরিবর্তিত হয়ে যায় তুরস্কের ওসমানি (অতোমান) সুলতান প্রথম সেলিম (১৫১২-২০)-এর সময়। তিনি মিশরের মামলুক রাজ্য জয় করার পর আব্বাসিয় খলিফাকে কায়রো থেকে কনস্তানতিনোপল বা ইস্তাম্বুল নিয়ে যান এবং তাঁর কাছ থেকে মুসলিম জাহানের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব লাভ করেন। ১৯২৪-এ কামাল পাশা (আতাতুর্ক) কর্তৃক খিলাফত উচ্ছেদ না-করা-পর্যন্ত ওসমানি খিলাফত টিকে ছিল। তবে স্পষ্টতই বোঝা যায় এ খিলাফতের সবই ছিল এক প্রতীকী-ব্যাপার মাত্র। বাইবার্সের সময় থেকেই খলিফা ছিলেন এমন এক প্রতিষ্ঠান যাঁর যেমন কোন শাসনতান্ত্রিক বা অন্যতর কোন ক্ষমতা ছিল না, তেমন ছিলেন আধ্যাত্মিক বিষয়েও বস্তুত শাসকবর্গের ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল।

এ প্রসঙ্গে আরো স্মর্তব্য যে, খলিফা-পদটিও অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ছিল না। উমাইয়া আমলের শুরুতে হজরত আলির পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন ছিলেন এর দাবিদার। তাঁদের মৃত্যুর পর আবদুল মালেকের সময় পর্যন্ত আবদুল্লা ইবনে জুবায়ের খলিফা হিসেবে মক্কা-মদিনা-কুফা'য় অনেকদিন নিজেকে বহাল রাখেন। পরবর্তীকালে উমাইয়াদের মাধ্যমে আলাদা আমিরাত স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হলে এ বংশের তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২-৬১-খ্রিঃ) খলিফা ও আমীরুল মুমেনীন উপাধি ৯২৯-এ গ্রহণ করে

স্বনামে খুতবা পাঠ শুরু করেন। অতএব এ সময় সুন্নি মুসলমান জগতেই দুজন খলিফা বাস্তবিকপক্ষে শাসন পরিচালনা করছিলেন—আব্বাসিয়গণ বাগদাদ থেকে এবং উমাইয়াগণ কর্ডোভা থেকে। কেবল তাই নয়, একই সময় আর একজন শিয়া খলিফাও ছিলেন মিশরে। ৯০৯-এ ওবায়দুল্লাহ্ আল-মাহদী উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমিয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। এ খিলাফত আড়াইশ বছরেরও ওপর টিকে থাকে। ১১৭১-এ ফতেমিয় খলিফা আল-আজিদ-এর মৃত্যুর পর গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবি (১১৭৪-৯৬ খ্রীঃ) কোন নতুন শিয়া খলিফাকে খিলাফতে অধিষ্ঠিত না-করে বাগদাদের সুন্নি আব্বাসিয় খলিফা আল-মুসতাজির-এর নামে খুতবা পাঠের রীতি প্রবর্তন করেন। এভাবে শিয়া খিলাফত অবলুপ্ত হয়।

অতএব খোলাফায়ে রাশেদিনের পর খিলাফতের ব্যাপারটি কোন একটি নির্দিষ্ট ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে উঠতে পারে নি। ক্ষমতা ও মতদ্বৈধতার দ্বন্দ্ব-সহ এ প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীতে যেরূপ সংঘাতের সম্মুখীন হয় তাতে এর আধ্যাত্মিক মানমর্যাদা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়। সাধারণ মুসলমানগণ এসব বিষয়ে অজ্ঞ থাকলেও, বাংলাসহ ভারতবর্ষের শিক্ষিত মুসলমানরা খিলাফতের ইতিহাসগত-ভিত্তিটি-যে খুবই দুর্বল ছিল—এ বিষয়ে হয়ত তলিয়ে দেখার মত মন-মানসিকতা না-নিয়ে, এক বিশেষ ভাবাবেগে আপ্লুত হয়েই খিলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাদের চিন্তার অস্পষ্টতা আরো ধরা পড়ে যখন লক্ষ্য করা যায় যে, খোদ তুরস্কে জাতীয়তাবাদী যে-ভাবধারা 'নব্য তুরস্ক আন্দোলন' এর মাধ্যমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছিল, তার কোন খোঁজই এদেশী সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানরা রাখতেন না, বা রাখলেও তাকে তেমন কোন মূল্য দিতেন না, অথবা দিলেও হয়ত তাদের ধারণা হয়েছিল খলিফা-পদটি ইংলণ্ডের রাজার পদের মতই মুসলমান সংহতি ও ঐক্যের প্রতীক স্বরূপ বর্তমান রাখা উচিত।

আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এসব মুসলমান কিন্তু এ হিসেবে ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিলেন বলা যায়। বলা যায়, তাঁরা ইংলণ্ডিয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রী ধারণায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মে রাজতন্ত্রের-যে স্থান নেই, খলিফাবাদ বলে যে কোন 'বাদ' হতে পারে না তা হজরত মুহম্মদ (সঃ) বা খোলাফায়ে রাশেদিনের কার্যকলাপেই স্পষ্ট। উমাইয়া, আব্বাসি, অতোমান তুর্কি বংশগুলো রাজত্ব করে গেছে সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যানুসারে এবং সেই ধারায়, ইসলামী ঐতিহ্যের ধারায় নয়—হজরত মুহম্মদ (সঃ) বা প্রথম চার খলিফার অনুসরণে তো নয়ই। নব্য শিক্ষিত বাংলাদেশের মুসলমানরা এ আদর্শ একেবারে ভুলে বসেছিলেন একথা বলা বোধকরি পুরো ঠিক হবে না, তবে এর প্রতি অবিচলতাও-যে ছিল তাও বোধহয় সত্য নয়, বরং বলা যায় ধারণায় ছিল অস্বচ্ছতা। তাঁরা যত-না সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রী মূল্যবোধে উজ্জীবিত ছিলেন তত ইসলামের সাম্যবাদী নীতিগুলোতে নয়। সামন্তবাদী মূল্যবোধগুলোই তাঁদের কাছে ইসলামী মূল্যবোধ রূপে চিহ্নিত ও পরিগণিত হচ্ছিল। বস্তুত অতীতের সামন্তব্যবস্থার মধ্য থেকে ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছিল যে-মুসলিম মধ্যবিত্ত তার চিন্তাচেতনার স্তরে হিন্দু মধ্যবিত্তের মতই ধর্মীয় প্রভাব ছিল প্রবল। সে-

প্রভাব আবার সুস্থ ও অনুসন্ধিৎসু মনের এবং যুগোপযোগী হয়েছিল যত-না, তার চেয়ে বেশি হয়েছিল আবেগ ও অন্ধসংস্কারের বশবর্তী। সংস্কারমূলক একটি ধারা ফারায়জি-ওয়াহাবিদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা ছিল অনেকটাই অতীতমুখো। আধুনিক জীবন প্রণালী গ্রহণ করে এবং এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণভাবে এ ধারা মুসলমান সমাজকে গড়ে তুলতে পারে নি বলেই তাদের আন্দোলন হয় ব্যর্থ। আর এ ব্যর্থতার চোরাবালিতে পড়ে সাধারণ মুসলমানদের এক বিরাট অংশ থেকে যায় আধুনিকতার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। অপরপক্ষে, সৈয়দ আমির আলির মত নবউত্থিত মধ্যবিত্ত স্তরের ব্যক্তিরা *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*-এর ধারায় রচিত বইয়ের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের সাথে-যে ইসলাম অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাই করতে চান প্রতিপন্ন। পূর্বের মৌলবাদী চিন্তার বিপরীতে এ নমনীয় ধারাই যেন চলতি জীবনের সাথে হয় বেশি সাযুজ্যপূর্ণ। কেরামত আলি জৌনপুরির (জন্ম ১৮০০, মৃত্যু ১৮৭৩) মত ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ এর পরিবৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

কেরামত আলি গোঁড়া হলেও ছিলেন মধ্যপন্থী নীতিবাদী সংস্কারক। তিনি ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম বা দারুল আমান অর্থাৎ মুসলমানদের বাসের উপযোগী বলে মনে করতেন। এজন্য তিনি তাদের শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার উপদেশ দিতেন। তিনি তকলিদ বা চার ইমামের যে-কোন একজনের মজহাব স্বীকার করাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। নিজেকে তিনি হানাফি মজহাবভুক্ত বলে দাবি করতেন। আরবি 'তাইয়ুন' শব্দের অর্থ নির্দেশিত বা সনাক্ত হওয়া। তিনি বিশেষ একটি মজহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে তাঁর প্রচলিত আন্দোলনকে তাইয়ুনি আন্দোলন বলা হয়। তিনি ছয় হাদিস, তফসির, উসূল-ই-ফিকাহ বা বিজ্ঞবানদের প্রদত্ত আইনকানুন গ্রহণ করেন। তিনি ফরায়জিদের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। তাদের মতবাদকে খারিজি বলে ঘোষণা করে সমূলে ধ্বংস করার জোর প্রচার চালান। তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষে জুম্মা ও ঈদের নামাজ পড়া জায়েজ ও ফরজ বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষ দারুল হরব বা গৃহাভ্যন্তরে যুদ্ধসম পর্যায়ভুক্ত নয়। আর হলেও দারুল ইসলামের মতই এখানেও সব ফরজ পালন করা যেতে পারে। তিনি পির-মুরিদি স্বীকার করেন এবং মুজাদ্দিদ বা প্রতি শতাব্দীর শুরুতে একজন ধর্মীয় গুরু আসবেন বলে যে কথা আছে, তাও গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমদ বেরিলবিকে তিনি ত্রয়োদশ হিজরির সেই মুজাদ্দিদ বলে মেনে নেন। শেরক ও বিদা এবং ফসিক বা গুনাহগার ও কাফির-এর ব্যাখ্যা নিয়েও নানাজনের সাথে তাঁর মতভেদ ঘটে।

বস্তুতপক্ষে কেরামত আলি একদিকে ইসলামের সংস্কার এবং অপরদিকে রক্ষণশীলতা সংরক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত বিচিত্র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তাঁকে কখনো ফরায়জিদের সঙ্গে, কখনো পাটনা-মতবাদের প্রধান ওলায়েত আলি ও এনায়েত আলি এবং কখনো আহলে হাদিসঅলাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ফরায়জি এবং তাইয়ুনিদের ভেতর জুম্মা নিয়ে বাহাস বা তর্কযুদ্ধের কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কেউ কাউকে এরা বোঝাতে সক্ষম হন নি শেষ পর্যন্ত। আর তাই ১৯৪৭-এর

দেশভাগের আগে ফরায়জিগণও জুম্মার নামাজে শরিক হন নি। কেরামত আলি হয়ত ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতার অসারতা বুঝেই (?) শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। সারা পূর্ব বাংলায় তিনি এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। চল্লিশ বছর শুধু নৌকায় বাস করে সারা বাংলা ভ্রমণের মাধ্যমে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। ফরিদপুর-ঢাকা-ময়মনসিংহ-নোয়াখালি বরিশালসহ বহু স্থানেই ভক্তরা তাঁর অত্যন্ত গভীর ছাপ অনুভব করেছেন। রংপুরে সমাধিস্থ হওয়ার সময় সারা বাংলায় বোধহয় এমন গ্রাম খুব কমই ছিল যেখানে তাঁর মুরিদ ছিল না।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে উত্তরবঙ্গে আহলে হাদিস নামে আন্দোলনটিও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। এ আন্দোলনের মূল বক্তব্য হল, পয়গম্বর মুহম্মদ (সঃ) কোরান শরীফের মাধ্যমে যা শিখিয়েছেন এবং হাদিসে যা আছে, শুধু তাই কেন্দ্র করে হবে ইসলাম ধর্ম। তাঁদের মতে ইসলামের চিরায়ত সরলতা ও আন্তরিকতাই হওয়া উচিত মূল কথা। তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ব, ইল্‌ম-উল-গায়েব স্বীকার এবং পিরবাদ ত্যাগ, তকলিদ বা চার ইমামের অন্ধ অনুসরণ ও ইজমা ত্যাগ করা, ইজতিহাদ বা প্রতিটি মুসলমানের ইসলাম ধর্ম পর্যালোচনা করার অধিকার, স্বীকার এবং সমস্ত অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণা আচার-আচরণ দূরীকরণ যাতে সত্যিকার ইসলাম সবার বোধগম্য হয়— ইত্যাদি হল আহলে হাদীস অনুসারীদের মতাদর্শ। যেহেতু এঁরা নামাজের সময় বার বার কানে হাত তোলেন, সেজন্য তাঁদের রফি ইয়াদায়েন-ও বলা হয়। তাঁরা অবশ্য নিজেদের মোহম্মদী বলেন। মওলানা আবদুল্লাহিল বাকি, মওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ এ মতবাদ প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

এছাড়া, শাহ আহম্মদউল্লাহ মাইজভাণ্ডারি (১৮২৭-১৯০৫) প্রবর্তিত কানুন অবলম্বন করে 'মাইজভাণ্ডারি' তরিকা গড়ে ওঠে। তাঁর ভাতিজা শাহ্ গোলামুর রহমান 'মওলবিয়া' তরিকার পুনঃপ্রবর্তন করেন। এ তরিকায় জিকর-আজকারের সাথে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হয় বিশেষ ধরনের নাচ আর গান।

এসব আন্দোলন সংস্কারবাদী হলেও মূলত ছিল গোঁড়াপন্থী মৌলবাদী ধারায়ই সম্পৃক্ত। এ ধারায় কেউ কেউ মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদিও কিছুটা যুগোপযোগী করে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। সুফি নিসারউদ্দিন ১৯১৫-তে শর্শিনা'য় দারুস সুন্নত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তবে মওলানা আবু নসর ওহীদ'এর তত্ত্বাবধানে যে নিউ স্কীম মাদ্রাসা ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্র করে ১৯১২-তে চালু হয় তা গোঁড়া মুসলিম সমাজকে কিছুটা আধুনিক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে। নিউ স্কিম মাদ্রাসায় আরবি ও উর্দু এবং ইসলামিয়াত শিক্ষার সাথে ফারসির বদলে ইংরেজি, অঙ্ক ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। চল্লিশের দশকে মওলানা আতাহার আলি কিশোরগঞ্জে জামে এমদাদিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারির সুবিখ্যাত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন মওলানা মোহাম্মদ হাসান দেওবন্দির মুরিদগণ। মওলানা বিলায়েত হোসাইন, মওলানা মোহাম্মদ হোসাইন সিলেটি এবং গাছবাড়ির মওলানা ইব্রাহিম-এর নামও এ ধরনের শিক্ষার ব্যাপারে স্মর্তব্য।

মৌলবাদী এ ধারার বিপরীতে ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তাভাবনা। এরা ঠিক গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদে যেতে চাচ্ছিল না, আবার ধর্মকে জীবন থেকে বিচ্যুতও করতে পারছিল না। ইচ্ছুক ছিল মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে থাকতে, যেখানে পাবে ধর্মীয় প্রশান্তি এবং আধুনিক যুগের উপযোগী জীবনব্যবস্থা। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে শহরাঞ্চলে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে এ ধারাটা ক্রমেই হচ্ছিল প্রসরমান।

এদেশের সমাজে মধ্যস্তর অতীতেও একটা ছিল যারা বাদশাহি-নবাবি আমলে চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য করত। কিন্তু তা মোটেই তখন সমাজ-নির্ধারক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে নি। ব্রিটিশ আমলে এ স্তরটির কালে কালে পরিবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সারা ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োজিত হওয়ার ফলে নীল, চা, পাট, তামাক প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের উৎপাদন হতে শুরু করে। শিল্পায়ন ঘটে। খনিজ শিল্প, বনজ শিল্প, কুটির শিল্প, বস্ত্র শিল্পের আবির্ভাব হয়। প্রচলিত নানা মুদ্রা বাতিল করে মাত্র এক ধরনের অর্থব্যবস্থা চালু হয়। স্থানে স্থানে বন্দর ও শিল্প শহর গড়ে ওঠে। গঞ্জ-হাট-বাজারের প্রসার ঘটে। কোম্পানির কাজের সঙ্গে জড়িত বেনিয়া, মুৎসুদ্দি, কয়াল, পাইকার, দালাল, ব্যাপারি প্রভৃতি মধ্যবিত্ত স্তরের লোকদের এসব স্থানে আবির্ভাব ঘটতে থাকে। ক্রমে এ স্তরে যোগ হয় শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজসেবী ইত্যাদি। বিচারক, উকিল, মোক্তার, মোহরার, জোতদার, মহাজন, ধনী গৃহস্থ, ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সরকারি-বেসরকারি চাকুরে, দোকানদার প্রভৃতিও এ স্তরে যুক্ত হতে থাকে। এসবের মধ্যে মুসলমানরাও সংখ্যায় একটু একটু করে বাড়তে থাকে।

মধ্যবিত্ত এ সমাজের সমস্যাদির সমাধান, দাবিদাওয়া পূরণের জন্যই গড়ে ওঠে নানা ধরনের সংগঠন-সভা-সমিতি। আবার এসব সাংগঠনিক চিন্তা থেকেই উদ্ভূত হয় রাজনৈতিক দল—ভারতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ইত্যাদি। সামন্তযুগে খোলা রাজনীতির বালাই ছিল না। ফলে সেখানে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হত বিদ্রোহ-ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের মাধ্যমে। সে-সময় জীবনের গতিধারা কর্মদ্বারা স্থির না-হয়ে জন্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত বলে রাজনীতি ছিল তোষামোদ আর আনুগত্যের। মধ্যবিত্তের আবির্ভাবে জন্মশক্তি দুর্বল হয়ে কর্মশক্তির প্রভাব বিস্তৃত হয়। আসে জন্মগত প্রত্যয়নপত্রের বদলে চরিত্রগত প্রত্যয়নপত্র। কিন্তু ব্রিটিশ আধিপত্যে এ শ্রেণী ছিল দুর্বল। খর্বিত। তাদের এ খর্বতা ছিল ব্রিটিশ অর্থনৈতিক প্রাধান্যের কারণে। দুর্বল ভিতের জন্য এ তেমন কোন বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে নি আমূল সমাজ পরিবর্তনে। বরং একটা সংস্কারমূলক মনোভাব এবং সহাবস্থান ও সমঝোতার নমনীয় নীতির মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে থাকে। চিন্তা-চেতনা ধ্যান-ধারণা এ স্তরে ছিল তাই অস্বচ্ছ। বিজ্ঞানের সাথে অবিজ্ঞান, সুযুক্তির সাথে কুযুক্তি এবং আধুনিক বুর্জোয়া ব্যবস্থার সাথে সামন্ততন্ত্রীয় মূল্যবোধের এক জগাখিচুরি দেখা দেয়। এজন্যই এস্তরের যে-লোকটি বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে বিশ্বাসী হয়, ঠিক সেই আবার হয় ধর্মীয় বা অন্য অনেক সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্নও।

তবে এ মধ্যবিত্তের মধ্যেই যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানবাদী অন্য একটি ক্ষীণ ধারা লক্ষ্য পড়ে আবদুর রহিম (আনুমানিক ১৭৮৫-১৮৫৩ খ্রিঃ), দেলোয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৩) প্রমুখের মধ্যে। সালাহউদ্দীন আহমদ রচিত *ইতিহাসের সন্ধানে* বই থেকে জানা যায় যে, রহিম ছিলেন সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। আরবি-ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁর নামের পাশে 'দাহরি' অর্থৎ মুক্তমনা শব্দটি সংযুক্ত করা হয়। দেলোয়ার ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত প্রথম মুসলিম বি.এ.। তিনিও ধর্মের দ্বারা সকল বাস্তব সমস্যা সমাধান সম্ভব নয় মনে করতেন। বিশ শতকে বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের দিকে ঢাকার 'শিখা' গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবিগণও ছিলেন মুক্ত মনের অধিকারী। ১৯২৬-এ 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূলমন্ত্র ছিল, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। এজন্য এটি 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামেও পরিচিত। এর প্রধান পুরুষ ছিলেন আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ। তাঁদের মুখপত্র ছিল 'শিখা' পত্রিকা। এঁদের বলা যায় মুসলিম সমাজের ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপ। চলতি সমাজব্যবস্থার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। অসাম্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বিরোধী। কিন্তু রক্ষণশীলদের প্রতিরোধে এবং নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও বিস্তৃতির সুযোগের অভাবে এঁরা শেষ পর্যন্ত বেশিদূর এগোতে পারেন নি। আবুল হোসেনের মত ব্যক্তিদের ঢাকার আহসান মঞ্জিল নবাববাড়িতে গিয়ে প্রগতিশীল লেখালেখি এবং বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাড়ার সাথে সাথে তাদের প্রগতিবাদী চিন্তাধারা সেই স্রোতে লীনও হয়ে যায়।

বামপন্থী শ্রমজীবী সংলগ্ন সমাজতান্ত্রিক আর একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছিল 'অল ইণ্ডিয়া ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পিজেন্টস্ পার্টি'র মধ্য দিয়ে মুজাফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের উদ্যোগে ১৯২৮-এর দিকে। এটিও মূল নির্ধারকে পরিণত হতে পারে নি জাতীয় স্বাধীনতার ওই চেতনার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে। তাঁরা যে-শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে চাচ্ছিলেন, সে-শ্রেণী আপন প্রাধান্য বিস্তার করে মধ্যবিত্তের হাত থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নিজেরা ছিনিয়ে নিতে পারে নি। এমনকি পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও মুখ্য ভূমিকায় যেতে পারে নি।

এদিকে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন যতই জোরদার হতে থাকে ততই দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মের আচরিত ফারাকগুলো শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বার্থের দ্বন্দ্বের সামনে এসে হাজির হয়। শ শ বছর একত্রে থেকেও যেসব বিষয় তাদের মনে কোনদিন উদয় হয় নি অথবা হলেও সমঝোতা করে নিয়েছিল পারস্পরিক সৌহার্দ্যের পরিপ্রেক্ষিতে (যেমন গরু জবাই, মসজিদের সামনে দিয়ে বাজনা বাজানো ইত্যাদি) তাই বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত উদিত হতে থাকে।

অতঃপর ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭-এ যে-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ মুসলিম প্রাধান্যের বিষয়টি হিন্দু মধ্যবিত্তের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে বাংলার সমাজে মুসলমানদের অপ্রতিহত প্রভাব ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি

করার ব্যাপারটিও পরিষ্কার হয়ে যায়। এর কিছু কিছু আলামত কোটাভিত্তিতে মুসলমানদের চাকরি-বাকরি পাওয়া বাস্তবেই দেখা দিতে থাকে। ফলে বাংলার হিন্দু মানসিকতায় মুসলিম আধিপত্য ও সেই সাথে নিজেদের নিরাপত্তাহীনতার অভাব দেখা দেয়। অন্যদিকে, মুসলমান মধ্যবিত্ত চাকরি-ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগলাভ পুরোপুরি গ্রহণ করায় এগিয়ে আসতে গিয়ে হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রবল উপস্থিতিও প্রতি পদে টের পায়। তারা আরো উপলব্ধি করে যে, বাংলা বা বিশেষ কোন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বৃহত্তর ভারতের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে না কোনদিন। কেন্দ্রে তারা কোনদিনই প্রাধান্য তেমনভাবে বিস্তার করতে পারবে না। থাকতে হবে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতই। শ্যামল চক্রবর্তী 'জাতিতত্ত্বের বিচারে বাংলাদেশের সংগ্রাম' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'এটা ঠিক যে, মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশ যুক্তবাংলায় লীগ মন্ত্রিসভার আমলে সরকারি চাকরিতে প্রচুর পরিমাণে ঢুকতে পেরেছিলেন, কিন্তু তবুও উপরতলায় অফিসারদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল হিন্দুদের। উপরন্তু ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা বা অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও মুসলমানরা নিতান্তই সংখ্যালঘু। এমনকি সাহিত্য-সৃষ্টি ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও হিন্দুদের প্রাধান্য। সুতরাং শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের পক্ষে ভাবা সহজ ছিল—আমরা পিছিয়ে আছি, হিন্দুরা বৃটিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাদের চেপে রেখেছে বলে, আমরা পিছিয়ে আছি, আমরা স্বতন্ত্র বলে।' ফলে উভয় সম্প্রদায়ের ভেতর বিচ্ছিন্নতাবাদের একটা ভাবনা ধীরে ধীরে ঠাঁই নিতে থাকে।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারাটি জন্ম দেয় পাকিস্তান চিন্তার। এ ধারার আপাত-আবরণ ধর্মীয় পার্থক্য, কিন্তু মূলত এর সৃষ্টি অর্থনৈতিক অক্ষমতা বা সুযোগ-সুবিধার অভাব, যার সম্মুখীন হচ্ছিল উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্ত। আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই নবউত্থিত মধ্যবিত্ত থেকে আগত—হোন তা মুহম্মদ আলি জিন্নাহ বা সোহরাওয়ার্দি বা আকরাম খাঁ, আর হোন তা প্রগতিবাদী আবুল হাশেম-এর মত ব্যক্তিত্ব। এঁরা সবাই কেবল ইংরেজি শিক্ষিতই ছিলেন না, ছিলেন কেউ কেউ কিছুটা বাম-ভাবেও উদ্বুদ্ধ। আবুল হাশিম, আবুল ফজল প্রমুখ পাকিস্তান হলে যেমন দেখছিলেন হিন্দু-অনুপস্থিতির দরুন ফাঁকা এক ময়দান, তেমন পাকিস্তানের মাধ্যমে চাচ্ছিলেন সমাজতান্ত্রিক বা ওই ধাঁচের রাষ্ট্রের পত্তন। জিন্নাহ স্বয়ং পর্যন্তও বলেছিলেন যে, পাকিস্তান হবে 'হ্যাভ-নট'দের রাষ্ট্র। কথাগুলো মুসলিম লীগ প্লাটফর্ম থেকে বেশ জোরেসোরেই প্রচার করা হত। এজন্যই সিন্ধু, বেলুচ ইত্যাদির অভিজাত সামন্তপ্রভুরা মুসলিম লীগে বহুদিন পর্যন্ত যোগই দেয় নি।

বস্তুত, যে-ইসলাম ধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও সাম্যবাণীর কথা বলে রাষ্ট্রটির জন্য আন্দোলন হচ্ছিল তা বাংলার উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্তকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। এ মধ্যবিত্ত ছিল মূলতই পাতি-বুর্জোয়া। নিম্নবিত্ত বা প্রায়-বিত্তহীন। সমাজতন্ত্রের ও অর্থনৈতিক সাম্যের কথাগুলো তাই তাদের লেগেছিল খুবই চমকপ্রদ। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেকে কোমড়

বেঁধে পাকিস্তান হাসিলের জন্য আন্দোলনে নামে। এরা এবং অন্য সকল মহল মিলে তখনকার নির্বাচিত সরকারকে হেয় করতে ওঠে পড়ে লাগে। শেরে বাংলার জনপ্রিয়তা ছিল মুসলিম লীগের প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। তাই *সাংবাদিকের রোজনামচা* বইয়ে লেখেন মোহাম্মদ মোদাব্বের, 'মওলানা সাহেব (আকরাম খাঁ) আজাদের সম্পাদকমণ্ডলীকে কলমে শান দিয়ে সংগ্রামে নেমে পড়ার নির্দেশ দিলেন।...প্রগ্রেসিভ কোয়ালিসন মন্ত্রীসভা কিংবা কৃষক প্রজা কংগ্রেস কোয়ালিসন মন্ত্রীসভা না বলে এই মন্ত্রীসভার নাম দিলাম 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা। যদিও এই মন্ত্রীসভায় হিন্দু মহাসভার মাত্র দু'জন শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর ভগ্নিপতি প্রমথ ব্যানার্জি ছিলেন, তবুও শ্যামাপ্রসাদকে সামনে টেনে আনার মতলব আর কিছু নয়, হক সাহেবের জনপ্রিয়তা হ্রাস করার পথ সহজ করা।...শ্যামাপ্রসাদ সৎ ও সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা আমরা, অর্থাৎ 'মোহাম্মদী' (সাপ্তাহিক ও মাসিক) আগেই কাহিল করে রেখেছিলাম।' ঠিক একই সঙ্গে উস্কে দেওয়া হয় সাম্প্রদায়িক মনোভাবও। মোদাব্বেরই লেখেন, হক মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে 'মুসলমান সদস্যরা আনাস্থা প্রস্তাব আনলেও সকল দোষ চাপলো কংগ্রেস ও হিন্দু সদস্যদের কাঁধে।'

রাজনীতিতে 'ফেয়ার অর ফাউল'-এর কোন স্থান নেই (?), ধর্ম ত দূরের কথা, সেই মধ্যযুগের সামন্তদের মতই এ বিশ শতকের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরও। মোদাব্বের জানান, 'মুসলিম লীগ আন্দোলনের জোয়ারের মুখে অবস্থা এমন হয়েছিল যে, অনেক সময় যুক্তির কোন স্থান ছিল না। মানুষ স্রেফ ভাবাবেগে চলছিল। তা নইলে শ্রী পদ্ম নিয়ে আকাশ পাতাল তোলপাড় করার কোন প্রয়োজন থাকতো না। পাকা মুসলমান এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন শ্রী সুন্দরের প্রতীক আর পদ্মফুল নিষ্কলঙ্ক ও মধুর চরিত্রের প্রতীক। কিন্তু যেহেতু হিন্দুদের দেবী সরস্বতীকে পদ্মাসনা রূপে কল্পনা করা হয়, সেহেতু পদ্মও মুসলমানদের নিকট পবিত্র বলে গণ্য হবে না, এমন পাগলামী সুস্থতার পরিচায়ক নয়। তবুও পাগলামী চলেছিল মুসলিম স্বার্থের নামে এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে।'

আসলে বিষয়গুলো ছিল-যে একেবারেই স্বার্থান্বেষী রাজনীতির, ধর্মের কোন সুষ্ঠু প্রত্যয় প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য নয়, তা আরো বোঝা যায় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের অন্যান্য কর্মকাণ্ডেও। শেরে বাংলার উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তা কাজে লাগানোর জন্যই অত্যন্ত সুচতুরভাবে তাঁকে দিয়েই ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় মুসলিম লীগ থেকে। অথচ এই তাঁকেই অত্যন্ত তুচ্ছ অজুহাতে পরবর্তীতে মুসলিম লীগ থেকে করা হয় বহিষ্কৃত। আর যে-হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দির অকুণ্ঠ সাহায্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া বাংলার গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে শহরে-বন্দরে পাকিস্তানের 'প'টিও প্রবেশ করতে পারত কিনা সন্দেহ, তিনি তো পাকিস্তানে ঢোকারই অনুমতি পান নি বহুদিন। শেরে বাংলার জনপ্রিয়তা এবং সোহ্‌রাওয়ার্দির সাংগঠনিক ক্ষমতা কেন্দ্রের লীগ নেতৃবৃন্দ কাজে লাগায় ঠিকই, কিন্তু একই সাথে ভয় পেয়ে যায় তাঁদের ব্যক্তিত্বকে—যার অবস্থান তাদের প্রভাব, অন্তত পূর্বাঞ্চলে, ক্ষুণ্ন করতে পারে। একারণেই তাঁরা তাঁদের কাছে হন ভীতিপ্রদ। সুতরাং সুকৌশলে তাঁদের করা হয় বিদূরিত।

শেরে বাংলা এবং সোহ্‌রাওয়ার্দি নিজেদের অবস্থান খুঁজতে গিয়ে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সম্ভবত বোঝেনও যে, যে-পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য তাঁদের অবদান ন্যূন নয় মোটেই, সেখানেই তাঁরা অবাঞ্ছিত। হয়ত-বা তাঁরা এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হলে বাংলাদেশের অধিবাসীদের কী বাস্তব পরিস্থিতিতে পড়তে হবে! সম্ভবত সেজন্যই পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাইরে বৃহত্তর এক স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন সোহ্‌রাওয়ার্দি শরৎ বসুর সঙ্গে ১৯৪৭-য়েই। অন্যদিকে, শেরে বাংলার পাকিস্তান সম্বন্ধে ধারণা বোঝা যায় ১৯৫৪-এ কোলকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতায় : 'আমার মতে পাকিস্তান বলতে কিছুই বোঝায় না। এই শব্দটি বিভ্রান্তি সূচনা করবার এবং স্বার্থসিদ্ধির একটি পন্থা মাত্র।' কিন্তু তাঁদের এসব উপলব্ধি এত পরে এসেছিল যে ততদিনে এদেশের মধ্যবিত্তের মন পাকিস্তানের পক্ষে সুদৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। সে-প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল শ্রমজীবী জনগণের মাঝেও, যার ফলে তারা এমনও ভেবেছিল (বা তাদের বোঝানো হয়েছিল) যে, পাকিস্তান হলে আর ট্যাকস-খাজনা কিছুই দিতে হবে না, উঠে যাবে জমিদারিও। শ্যামল চক্রবর্তীর কথায়, 'পূর্ববাংলার অধিকাংশ মানুষ তথা কৃষকের চেতনায় ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের মানে ছিল, সে এবারে জমি পাবে, ঋণের জাল থেকে মুক্তি পাবে, ছেলেপিলে লেখাপড়া শিখবে, দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে—এক কথায় গড়ে উঠতে চলেছে স্বাধীন উন্নতিশীল দেশ।'

পাকিস্তান সৃষ্টির ক'বছর পর ১৯৫২-তে জমিদারি উঠে যায় বটে কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের, যেমন ট্যাকস-খাজনা উঠে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং যে-ধর্মের ভিন্নতার ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল সে-ধর্মের সাম্যবাদী নীতিগুলো পালিত হওয়া তো দূরের কথা, সেসব চরমভাবে অবহেলিত হতে থাকে। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হয় অসম্ভব। ভিন্নতর সমস্যা হয় উদ্ভূত। ভারত থেকে মোহাজেরদের আগমন, পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দুদের দেশান্তর গমন সমাজে ওলটপালট অবস্থার সৃষ্টি করে। ছাপান্ন'র সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক হিসেবে কেবল শব্দের মাধ্যমে বন্দী করে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোনদিনই কি ইসলামী সাম্যনীতির ধারা, কি নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন পদ্ধতি, কি আর্থিক সমতার যেসব উদাহরণ রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বা মহান খোলাফায়ে রাশেদীন রেখে গেছেন সে-সবের কিছুই অনুসৃত হয় নি। বরং মধ্যযুগের সামন্তদের মতই পাকিস্তানেও গড়ে ওঠে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক সমাজের ভিত্তিস্তম্ভ এক একজন আদমজি, ইস্পাহানি, দাউদ, সায়গল প্রভৃতির মত 'বিজনেস টাইকুন' যারা অদৃশ্য থেকে চালায় রাষ্ট্রের কলকাঠি। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এরা স্বাধীনভাবে তাদের ব্যবসাটাও করতে হয় অক্ষম। অর্থের জন্য নির্ভর করতে হয় লগ্নিকারক বিদেশী পুঁজিপতিদের ওপর। গাঁটছড়া বাঁধে তাদের সাথে। দেশের অর্থনীতি হয় মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদী।

পুঁজিবাদ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ—অবশ্যই একদল থাকবে ধনী, অপরদল গরিব। ধনীরা টাকা গড়ে অন্তত তিনভাবে—হোক সে মুসলমান বা অন্য ধর্মের : এক, শ্রমজীবীর উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে, দুই, বিদেশী পুঁজি অবাধ ও ইচ্ছেমত ব্যবহার

করে, এবং, তিন, অবস্থার সুযোগে দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে, যেমন লবণের দাম একদা পাকিস্তান আমলে হয়েছিল ষোল টাকা সের। আরো একভাবে অর্থসঞ্চয় হয়—অপরের দেশ অথবা বাজার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দখল করে। কিন্তু এধরনের খালি জায়গা আর পৃথিবীতে নেই। পূর্বে উত্থিত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোই তা দখল করে রেখেছে। অতএব কেবল নিজদেশেই শোষণ যতটুকু সম্ভব করা যায়। অথবা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের দালাল-ব্যবসায়ী বা মুৎসুদ্দি-মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে যতটুকু লাভ করা সম্ভব তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। স্বউন্নতিকামী পাকিস্তানের পুঁজিপতিরাও হয় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া। ব্যবসার নামে লুণ্ঠনের মাধ্যমে রাতারাতি অফুরন্ত ধনসম্পদের মালিক হয়ে যায়। সম্পদের বেশিটাই আসে আপামর জনসাধারণকে ঠকিয়ে—শোষণ করে, যার প্রায় সবাই মুসলমান। তারা বাস করতে বাধ্য হয় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। এক টুকরো রুটির অভাবে কেউ মারা যায়, কেউ কাপড়ের অভাবে নামাজটুকুও রীতিমত পড়তে পারে না। অথচ ধনিকদের অঢেল সম্পদ গড়াগড়ি খেতে থাকে তাদের নানা বিলাস-ব্যসনে। নিরীহ মুসলমানরা, বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানীরা শুধু ধনী গরিব হিসেবেই শোষিত হয় না, শোষিত হয় দু অঞ্চলের ধন-বণ্টনের মধ্যেও। পূর্বের সম্পদ চলে যেতে থাকে পশ্চিমে। মাশরেকির বড়ভাই হয় মাগরেবি পাকিস্তান।

সাতচল্লিশে দেশভাগের সাথে সাথেই ভারত-থেকে আগত ধনিকরা ঠাঁই নিয়েছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানে, কিছুটা জাতিগত ঐক্যবোধ এবং কিছুটা ভাষাগত সাযুজ্যের কারণেই আপন মনে করে। পাকিস্তান-প্রবক্তাদের মূল নেতৃবৃন্দও ভারত থেকে ওখানেই ঠাঁই নেন—জিন্নাহ্, লিয়াকত আলি প্রমুখ; সম্ভবত বাংলায় এসে শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দির ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা অসুবিধাজনক ভেবেই অথবা সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ বা সমালোচনার ভয়েই। পশ্চিমে এসব ঝামেলা ছিল না। ছিল যে-অভিজাত সামন্তপ্রভুরা তারা আগতদের নেতৃত্ব আপাত-মেনে নেয়। সামরিক বাহিনীর বিরাট অংশও ছিল ওখানকারই; চাকরিজীবীদেরও অনেকে। ফলে একদা-ব্রিটিশ-অনুগত ব্রিটিশ-সৃষ্ট ব্রিটিশ-চাকুরে-সামরিক কর্মকর্তা-মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়া এবং সামন্তনেতাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক চমৎকার আঁতাত। সারা পাকিস্তানের শোষণের ক্ষেত্রটিকে এরাই চুষতে থাকে। পূর্ব-পাকিস্তানে এ সুবিধাগুলো না-থাকায় এখানে নিম্নমধ্যবিত্তের সংখ্যাই ক্রমে বাড়তে থাকে। নিজেদের দেখতে পায় পশ্চিমের এক কলোনি হিসেবে জিম্মি! চাকরি-ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুতে তারা হয় বঞ্চিত। পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-সাধ ছিঁড়ে টুটাফাটা হয়ে যায়।

ইসলামের যে-আদর্শের কথা বলে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম তা কেবল কথার বাগাড়ম্বর অথবা ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার জয়জয়কার ছাড়া সাম্যের ও সমতার বাণী একান্তভাবেই ব্যর্থ হতে দেখে পাকিস্তান-সমর্থক সরলমনা 'বাম বাম'-ভাব মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও মর্মাহত হন। লেখেন আবুল ফজল, 'আশ্চর্য, স্বাধীনতার আগে যতটুকু উদ্যোগ আয়োজন সাধনা ও সংকল্প দেখা গিয়েছিল তার চিহ্নও আজ অবলুপ্ত।' আরো

লেখেন, ‘এত বড় স্বপ্ন কেন ব্যর্থ হল চিন্তাশীলদের মনে এও এক বড় জিজ্ঞাসা। ইসলামী ন্যায়-নীতি রূপায়নের এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েও ফসকে যেতে দেওয়া হল কেন তাও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।...শাসকদের কারো মনে এতটুকু আন্তরিকতা ছিল না।’

আসলে আবুল ফজল বুঝতে পারেন না যে ‘আন্তরিকতা’ নয়, অর্থনীতির অমোঘ নিয়মেই পাকিস্তানে ‘ইসলামী ন্যায়-নীতি রূপায়নের’ কোন সম্ভাবনাই ছিল না। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে চলে না, চলে লাভ-লোকসান-মুনাফার ভিত্তিতে। কোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ন্যায়নীতি পালিত হওয়া অসম্ভব। অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতা-সম্পদ-সম্পত্তিই আসলে সেখানে সবকিছুর মাপকাঠি। ন্যায়নীতি নয়। ধর্ম নয়। সম্পদের অধিকারী স্বচ্ছন্দে অন্যায়কে ন্যায় এবং ন্যায়কে অন্যায় করে ফেলতে পারে শুধু এরই জোরে। ধর্মের সুমহান বাণী সেখানে নীরবে নিভৃতে কাঁদে। ‘বেরাদরনে ইসলাম’ হওয়া সত্ত্বেও এরূপ অন্যায়ের সূচনা পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই দেখা দেয়। পূর্ব বাংলায় ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের শুরুতেই যে গোলযোগ উপস্থিত হয় তা বৃহত্তর ক্ষেত্রে অন্যায়ের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে।

সন্দেহ নেই সারা বাংলায় পূর্ব থেকেই সামান্য কিছু উর্দুভাষী ছিল—মাত্র ০.৬৪ ভাগ। পাকিস্তান হওয়ার পর ভারত থেকে পূর্ব বাংলায় আগত ও আশ্রিত মোহাজের’দের ভাষাও ছিল মোটামুটি তাই। কিন্তু সংখ্যায় এরা ছিল একেবারেই নগণ্য। বিশাল জনগোষ্ঠী ছিল বাংলা ভাষাভাষী। স্বাভাবিক লোকসংখ্যার ভিত্তিতে হলে সারা পাকিস্তানে বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত ছিল, যেমন জনসংখ্যার ভিত্তিতে ও মুসলমানিত্বের দোহাইয়ে হয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু সে-তো ‘দূর অস্ত’ বটেই, বাংলা ‘পাক’-রাষ্ট্রের কোথাও ঠাঁই পাওয়ার উপযুক্তই বিবেচিত হয় না। পশ্চিমের মূল ভাষাভাষী পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচি ও পশতুর ওপর যেমনভাবে উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হয়, পূর্ব বাংলার লোকদের ওপরও তাই দিতে চায় নবসুবিধাপ্রাপ্ত পশ্চিম পাকিস্তানের আঁতাত গোষ্ঠী। ‘ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেসন’ বা জাতীয় সংহতির কথা মুখে বললেও মূলত ভাষার প্রশ্নটি ছিল ষড়যন্ত্রমূলক। জাতিসত্তার বিকাশে ভাষা এক মৌলিক উপাদান। জাতিসত্তার বিকাশ মানে গণমানুষের বিকাশ লাভ তথা গণজাগরণ। সে-জাগরণের অর্থই হল আজকের দিনে শোষণের অবসান অর্থাৎ জনগণের অধিকার আদায়—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব ধরনের। অধিকার প্রদান মানেই পুঁজিপতিদের সংকোচন। সংকোচন তাদের শোষণের ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্র বিস্তৃত রাখার প্রয়োজনেই আধিপত্যকামী অর্থসম্পদের মালিক উর্দুভাষী-পুঁজিপতি চাকরি-ব্যবসায়ী মোহাজেররা উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্নভাষী লোকদের উপর সাধারণভাবে চাপিয়ে দিতে পেরেছিল সেখানকার উচ্চবিত্তের মুখে আগে থাকতেই ওই ভাষা কমবেশি চালু ছিল বলে এবং সাধারণ মানুষের চেতনার স্তর তত উন্নত ছিল না বলে। সচেতন মধ্যবিত্তও সেখানে তেমন ছিল না। ভাষাগুলোও বাংলাভাষার মত তত উন্নত ছিল না। নইলে ভাষার প্রশ্নে সেখানেও প্রতিরোধ আসা ছিল খুবই স্বাভাবিক, যেমন প্রতিরোধ সৃষ্টি হল পূর্ববাংলায়।

উর্দু পূর্ববাংলার জন্য মূলত একটি বিদেশী ভাষা। ইংরেজির মতই। উর্দু চালু করার মানে কেবল প্রায় সকলের মুখের ভাষাকেই পরিত্যাগ করা নয়, এতদিনের যে চমৎকার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল তাও ক্রমান্বয়ে বাতিল করা। যে-কোন নতুন ভাষা আয়ত্ত করতে সময়ের দরকার। সৃষ্টিশীল কিছু করতে লাগে আরো বেশিদিন। অন্য কথায়, উর্দু রপ্ত করতে গিয়ে পূর্ববাংলার মানুষ সামগ্রিকভাবেই—কি শিক্ষাদীক্ষা, কি মননের উৎকর্ষে, কি জাগতিক জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে (উর্দু মোটেই বাংলার চেয়ে উচ্চতর বা উন্নত কোন ভাষায় নয়, বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারের আকর ত নয়ই—ইংরাজি-ফরাসি ইত্যাদির মত), কি আলাপচারিতার সাবলীল গতিধারায় পিছিয়ে যেত অনেকদিনের জন্য। ভুগতো বাংলাভাষীরা উর্দুভাষীদের সামনে এক হীনমন্যতায় (দেখা গেছে তা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অবরুদ্ধ দিনগুলোতে জোর করে উর্দূ 'বাতচিত' করার বেলায়)। এরকম নিচুস্তরে রেখে অপরপক্ষে পশ্চিমা ধনিকগোষ্ঠী অবাধ ধনবাদের সুযোগে ধনী থেকে মহাধনী হয়ে ক্ষমতা চিরদিনের জন্য রাখত কুক্ষিগত।

এমন ষড়যন্ত্রের দোসর খুঁজে পেতে পশ্চিম পাকিস্তানের অভাব হয় না এদেশে। নাজিমউদ্দিনের মত এদেশী উর্দু ভাষী ছাড়াও মেলে পূর্বেবাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন, শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের মত খাস বাংলাভাষী ব্যক্তিবর্গ। আপামর জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ থাকলেও তা ছিল অনেকটাই উচ্চনিচ ভেদজ্ঞানের মধ্য দিয়ে। এঁরা উচ্চ বা অভিজাত শ্রেণীর ভাষা মনে করতেন উর্দু, বাংলা নয়—সেই উনিশ শতকী সমাজনেতৃবৃন্দের মতই। এর বিপরীতে বেরিয়ে আসেন গণমানুষের কণ্ঠরূপী ডক্টর শহীদুল্লাহ'র মত ব্যক্তিত্ব বাংলা ভাষার পক্ষে। আসে সংগঠন—'তমদ্দুন মজলিশ'। এঁরা দেশের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে আপামর জনগণের ভাষাকেই রাষ্ট্রের ভাষা হিসেবে চালু করতে চান। আর তা করতে গিয়ে শুরু হয় আত্মানুসন্ধান। যে-পরিচয়ে পাকিস্তান কায়েম হয়েছিল, সে-পরিচয় প্রসঙ্গে অনেকেই দেখে যে সে-পরিচয় তাদের কোন সমস্যার সমাধান করতে তো পারেই নি, বাড়িয়েছে বরং অনেক। মুসলমানিত্ব দূর করতে পারে নি আর্থিক বৈষম্য। সুতরাং পাকিস্তানের-জন্য ফেলে-আসা ভাষাপরিচয়ে বাঙালিত্ব জাতীয়তাবোধ মাথাচাড়া দেয়। বাংলাদেশের মুসলমানরা যেন প্রত্যাবর্তন করতে চায় স্বদেশে। ১৯৪৮-এর ৩১শে ডিসেম্বরেই পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি মুহম্মদ শহীদুল্লা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালাতিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জো-টি নেই।'

বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গে গ্রন্থে পরে লেখেন আবদুল হক, 'নৃতত্ত্ব ভাষা বা ইতিহাস যেদিক দিয়েই দেখা যাক বাঙালি মুসলমান যে বাঙালি, এটা একটি বাস্তব ব্যাপার, একটা সরল সত্য। কিন্তু এই সরল সত্যটি অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গেই স্বীকৃত হয়েছে।...বাঙালী মুসলমান তার দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে নিজেকে প্রবলভাবে এবং

অবিচ্ছিন্নভাবে, অকুণ্ঠিতভাবে, এবং সগৌরবে নিজেকে বাঙালি বলে ঘোষণা করেনি।...বাঙালী মুসলমান অতীতে সর্বদাই নিজেকে মুসলমান মনে করেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙালীও মনে করেনি এবং এই কারণে তার ইতিহাস পৃথিবীর অন্যান্য ভূ ভাগ থেকে আগত মুসলমানদের ইতিহাসের অপ্রধান অংশেমাত্র পর্যবসিত হয়েছে।...বাঙালী মুসলমান যে বাঙালী, পশ্চিমাগত নয়, এই চিন্তার দ্বারা যেন সে পীড়িত হয়েছে ; বাঙালী হওয়াটাকে সে যেন একটা অপরাধ বলেই গণ্য করেছে ; আর তাই সকল ক্ষেত্রে পশ্চিমাগত মুসলমানদের নেতৃত্বকে—তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক—মেনে নেওয়াটাকেই তার মনে হয়েছে অবশ্যকরণীয় ; বাঙালী মুসলমান তার নাম, তার পরিচ্ছদ, তার ধর্মচিন্তা, তার দর্শন-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি চিন্তা পুরোপুরি তাদের কাছ থেকে নেওয়ার চেষ্টা করেছে ; সাহিত্যের উপাদান ও উপাখ্যনও প্রধানতঃ নিয়েছে তাদের কাছ থেকে; তার ভাষাকে বদলাবার চেষ্টা করেছে, কখনো কখনো বাংলা বর্ণলিপিও বর্জন করতে চেয়েছে, এমনকি বাংলা ভাষাকেও অস্বীকার করার প্রয়াস পেয়েছে। সেই সঙ্গে অনেক বাঙালী মুসলমানের প্রবল ঔৎসুক্য দেখা গেছে নিজেকে কোন আরব অথবা ইরানীর উত্তরপুরুষ বলে প্রমাণ করার জন্য।...বাঙালী মুসলমান স্বদেশের ইতিহাস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য মুসলিম দেশের ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে চেয়েছে, অন্যভাবে বলতে গেলে, বাঙালী মুসলমান অন্যদেশের মুসলমানদের ইতিহাসকেই নিজের ইতিহাস মনে করেছে, নিজস্ব ইতিহাস সৃষ্টির চেষ্টা করেনি; অন্য দেশের মুসলমানদের জয়ে আনন্দবোধ করেছে এবং পরাজয়ে বিমর্ষ হয়েছে, নিজে বিজয়ী হতে চায়নি। বাঙালী মুসলমানদের কল্যাণ-চিন্তাকে সে খুব প্রশ্রয় দেয়নি, এমন কি বাঙালি মুসলমানের যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে এই চেতনাও তার মধ্যে কোন সময়েই খুব লক্ষ্যণীয় হয়নি। বাঙালী মুসলমানের চেয়ে বিশ্ব-মুসলমানের জন্য 'জান কোরবান' করাই সে শ্লাঘার ব্যাপার মনে করেছে। অন্যান্য কারণ ছাড়া এই কারণেই বাঙালী মুসলমান 'মুসলমানে মুসলমানে ভাই ভাই' নীতি অনুসরণ করেনি।'

এ ধরনের আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়ে জাগ্রত হয় সাতচল্লিশে-ছেড়ে-আসা বাঙালী জাতীয়তাবাদ। ধর্মভিত্তিক চিন্তাধারা হতে থাকে পরিত্যক্ত। সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাজ্য। চুয়ান্নর প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে অসাম্প্রদায়িক শক্তি। বৃহত্তর জনতার কাছে পাকিস্তান-সৃষ্টির মূল রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ হয়ে পড়ে অপাঙক্তেয়। সিকিউলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা, সঠিকভাবে বললে ইহজাগতিকতা, জাগতে থাকে। পূর্বপাকিস্তানের ব্যবসায়ী-বণিকরা পশ্চিম পাকিস্তানের নানা বাধা-নিষেধের সামনে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এদেশের অর্থনৈতিক উদ্যোক্তারা ক্ষেপে যায়। চাকরি-বাকরিতে সমঅধিকার না-পেয়ে শিক্ষিতজনও প্রচণ্ডভাবে অসন্তুষ্ট হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান—এই দু শাখার বৈষম্যগুলো দৃষ্টিকটুভাবে চোখে পড়ে। 'মুসাফির' ছদ্মনামে তোফাজ্জল হোসেন দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর 'রাজনৈতিক মঞ্চে' লেখেন, 'পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাঙালী অবাঙালী, পূর্ব পাকিস্তানী, পশ্চিম পাকিস্তানী কোন কিছুরই প্রশ্ন উঠে নাই। সকলেই আমরা পাকিস্তানী এবং সকলের উন্নতি বিধানই রাষ্ট্রনায়কদের লক্ষ্য হইবে, ইহাই ছিল সকলের

কামনা। কিন্তু আল্লাহর কি মর্জি, আল্লাহর রহমতে পাকিস্তান কায়েম হইলেও ঠকবাজরা আল্লাহর প্রিয় ধর্ম ইসলামের মুখোশ পরিয়া আল্লাহ্‌র রহমত হইতে মানুষকে বঞ্চিত করিল। একদম বৃটিশ আমলের অবস্থা—শাসক ও শাসিত—এ সম্পর্ক করিয়া তুলিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে।'

এ অবস্থায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও তাদের প্রতিভূ বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বেরিয়ে আসেন এ ধারার পক্ষে আবদুল হকের মতই অনেকে—মুনীর চৌধুরী, সিকান্দার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। *সমকাল* মাসিক পত্রিকা হয় তাঁদের মুখপত্র। তাতে যোগ দেন আবুল ফজলের মত পুরানো দিনের প্রগতিমনা অনেক ব্যক্তিত্বও। পাকিস্তানের পুঁজিবাদী অর্থনীতি কেবলই সংকট বাড়ায় দেখে এঁদের বক্তব্য হয় অনেকটাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে। ভয় জাগে পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের মনে। অতএব পূর্ববাংলার সমঅধিকারের দাবিদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় তিনটি বিষয় : ধর্ম, ভারত এবং কমিউনিস্ট জুজু। তিনটিই আবার একইসূত্রে গাঁথা। দেশভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে এবং ভারত তা মেনে নিতে পারে নি, তাই পাকিস্তান-ধ্বংসে সে উদ্যত, অতএব ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের 'দুশমন' ভারতের বিরুদ্ধে সদাপ্রস্তুত থাকা প্রয়োজন—এই ওঠে জিগির। জীবনের বাস্তবসমস্যা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে 'জেনোফোবিয়া' সৃষ্টির চেষ্টা চলে। সাথে ধর্ম-নিস্পৃহ বামপন্থীদের কর্মতৎপরতা কমিউনিস্ট কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের হিন্দু-ঘেঁষা ভারত-ঘেষাঁ ভারতীয়-দালাল বলে চিহ্নিত করে দেশবাসীর কাছে ভারত-ভীতি তথা দেশভাগের আগের হিন্দুভীতি সঞ্চারের চেষ্টা চলে। পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে দেখানো হয় হিন্দু-সংস্কৃতি হিসেবে। বাংলা ভাষার হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের চিহ্নিত করা হয় মুসলিম সংস্কৃতির বিরোধী বলে। রবীন্দ্রনাথ বর্জনের চেষ্টা চলে। অপরদিকে, জনগণের মাঝে অর্থনৈতিক সমতা আনার কোন ব্যবস্থাই করা হয় না। আর্থিক বৈষম্যও দূর করার কোন উদ্যোগ গৃহীত হয় না। গৃহীত হয় না কোন প্রকার সুষ্ঠুবোধসম্পন্ন নীতিমালাও।

এ প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার প্রতি পূর্ব বাংলার মুসলমানদের প্রীতি বাড়ে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে বেসরকারিভাবে পালিত হয়। 'ছায়নট'-এর মত প্রতিষ্ঠান বাঙালিয়ানার প্রতি শিক্ষিতজনের দৃষ্টি প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ জাঁকজমকভাবে পালিত হতে থাকে। একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা-শহীদ দিবস মানুষের মনের কাছে চলে আসে। আলপনা আঁকা কেবল হিন্দুর কোন বিষয় হয় না, ভাষা আন্দোলনে শহীদ বেদিতে অঙ্কিত হয়। মেয়েদের কলাপে টিপ পড়া হয় না সিন্দুর ব্যবহারের মত, হয় বাঙালি সৌন্দর্যের প্রতীক। দোকানপাটের নাম হতে থাকে বাংলায়। সন্তানাদির নাম হতে থাকে বাংলা। গাড়ির নম্বর প্লেট হতে থাকে বাংলায়। বাড়ি-ঘরের নামকরণ চলতে থাকে বাংলায়। এমনকি, উচ্চশিক্ষিতরা অফিস আদালতের কাজকর্মে নামসই ইত্যাদি করতে থাকেন বাংলায়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্রম-প্রসরণের এই রূপ দেখে, গণ-মানুষের আর্থিক অবস্থায় কোনরূপ উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হওয়ায়, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং সকলের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য ১৯৬৫-তে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। কিন্তু বিদেশী সংবাদপত্রের ভাষায়, 'দুই ফকিরের যুদ্ধ' (যুদ্ধ করতেও প্রচুর অর্থ-সামর্থের প্রয়োজন) বেশিদিন চলতে না-পেরে উভয় রাষ্ট্রই সতের দিনের মাথায় যুদ্ধ বন্ধ করে তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম মধ্যবিত্তের পাকিস্তানের প্রতি মোহমুক্তি আর একবার সরাসরি ঘটে। ওই যুদ্ধে অরক্ষিত পূর্বপাকিস্তান নিতান্তই ভারতীয় সহনানুভূতির ওপর নিজের অবস্থান দেখতে পায়। দেখতে পায়, যে-'ভেতো' বাঙালিরা সামরিক বাহিনীর অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়ে এতে 'চান্স' পাওয়ার প্রায় অনধিকারী ছিল তারাই আকাশ যুদ্ধে, এমনকি স্থল যুদ্ধেও অমিতবিক্রমে 'পাকিস্তানকে রক্ষা করে' প্রবল বিপর্যয়ের মুখে। পূর্বপাকিস্তানীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আত্মবিশ্বাস জন্ম দেয় অধিকারের। 'ছয় দফা'র মাধমে সেই অধিকার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ১৯৬৬-তে দাবি করে। কিন্তু শোষণের ওপর যে-সমাজ প্রতিষ্ঠিত সে-তো অধিকার দিতে পারে না, দাবিকে দেখে প্রবল বিরুদ্ধপক্ষ হিসেবে। সুতরাং নেমে আসে দমন-পীড়ন। কিন্তু আত্মপ্রত্যয় একবার জেগে উঠলে তা বিলুপ্ত করা বড় কঠিন। ছয় দফার পক্ষে সারা পূর্বপাকিস্তানের জনমত সৃষ্টি হয়। জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতা, ছয় দফার প্রবক্তা শেখ মুজিবর রহমানসহ আরো অনেকের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা'। সেই চিরপুরাতন পাকিস্তানের শত্রু ভারতের যোগসাজসে নাকি তাঁরা পূর্বপাকিস্তানকে আলাদা (স্বাধীন) করার প্রয়াস চালাচ্ছেন!

ইতোমধ্যে গত বিশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানেও মোটামুটি কিছু মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়েছিল। এই নতুন ধনিকরা চাচ্ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরো সুযোগ-সুবিধা। তারা দেখছিল যে 'পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশের সবচেয়ে ধনী' প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁন এবং তার অনুগ্রহভাজনরা সে-সব পথ রেখেছে বন্ধ করে। কেবল বাইশটি পরিবারই পাকিস্তানের সম্পদ নাড়াচাড়া করতে পারে। সুতরাং তারা বিক্ষুব্ধ জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে জমায়েত হতে থাকে। বিক্ষোভ দানা বাঁধে। বিক্ষোভ রূপ নেয় গণআন্দোলনের। পূর্বপাকিস্তানের সচেতন ছাত্র সমাজ দেয় এগার দফা দাবি। অবস্থা আয়ত্তে আনতে না-পেরে আইয়ুব বিদায় হন। সামন্তযুগের রাজার মতই যেন উত্তরাধিকারের ভার দিয়ে যান আর এক সামরিক কর্মকর্তা ইয়াহিয়া খাঁন-কে। ইয়াহিয়া প্রতিশ্রুতি দেন নির্বাচনের। পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাসে হয় প্রথম জাতীয় নির্বাচন ১৯৭০-এ। নিরঙ্কুস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আওয়ামী লীগ। এটা শঙ্কিত করে তোলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে। এতদিনের মৃগয়াক্ষেত্র পূর্বপাকিস্তানকে আর বুঝি অবাধে শোষণ করা যাবে না। সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে তেইশ বছরের পাওনা-দাওনা। কিন্তু শোষকগোষ্ঠী কি তা দিতে চায়! তাদের পথ খোলা থাকে একটিই—বর্বরভাবে দমন করা এ আত্মসচেতনতা। 'বেরাদরনে ইসলাম'-এ আর তখন

না থাকে 'বেরাদরন,' না মনে আসে ইসলামের ন্যায়নীতির বাণী। হিংস্র হায়েনার মত অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের রাতে ধর্মীয় নীতির সমস্ত চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর—সেই জনগণ যারা মাত্র চব্বিশ বছর আগে, ছেচল্লিশে ভোট দেওয়ায়ই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল পাকিস্তানের। তাদের ভোটেই পূর্ব বাংলায় ১১৯-টি আসনের ভেতর তখন ১১২-টিই পেয়েছিল মুসলিম লীগ। পরে ছ'জন অ-লীগারের মধ্যে তিনজনও যোগ দিয়েছিল পাকিস্তানের জন্য 'জান কোরবান' করতে। শতকরা হিসেবে না সিন্ধু (৩৫ জনের ভেতর ২৮), না পাঞ্জাব (৮৬-এ'র ভেতর ৭৫), না আসাম (৩৪-এর ভেতর ৩১), না উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (৩৮-এর ভেতরে ১৭) পড়েছিল এত ভোট পাকিস্তানের জন্য। নিয়তির পরিহাস। 'আদমি নেহি মিট্টি মাংতা' হলো সেই ভোট দানের পরিণতি ১৯৭১-এ পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বীরদর্প উক্তির মাধ্যমে, যারা চিরকালই করেছে চাকরির জন্য ব্রিটিশের গোলামি। স্বাধীনতা আনতে ছাড়েনি সামান্যতম আপন সুযোগ-সুবিধা!

তবে অভাব হয় না তাদেরও দোসর পাওয়ার। 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো' ইসলামের শিক্ষা ভুলে যায় অনেক মুসলমান। স্বার্থেই হোক বা হোক অন্য কোন 'বুঝে', পাকিস্তানী অন্যায়কারী শাসকগোষ্ঠীর হাতে হাত মেলায় বঙ্গসন্তানেরই কেই কেউ। সৃষ্টি হয় আল-বদর, আল-শাম্‌স্ আর রাজাকারদের। শরিক হয় নৃশংসতম নিধনযজ্ঞে। যাঁদের নিয়ে দেশ গর্বে বুক ফোলাতে পারে বিশ্ব দরবারে, তাঁদের হত্যা করে শত্রুপক্ষ লাভবান হতে পারে বটে, কিন্তু যারা তা করে বা করতে সহায়ক হয়, তারা কি মাথাউঁচু করে দাঁড়াতে পারে কোনদিন! মির্জাফর-মোহাম্মদী বেগ কি সম্মানিত হয় কখনো! এদেশে বহু যুদ্ধ সংঘর্ষ হয়েছে, বহু রাজা-উজির আমির-সুলতানের উত্থান-পতন ঘটেছে, বহু মানুষ নৃশংসভাবে নিহতও হয়েছে, কিন্তু সাতচল্লিশের দেশভাগের আগে সাধারণ মানুষের জীবন ও ঘরবাড়ি এমন করে তচনচ হয়েছে সামান্যই। সাতচল্লিশে যাও-বা বাকি ছিল, একাত্তরে তাও একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এমন একটি ঘরও এদেশে থাকে না যে ওই রক্তলোলুপ-সম্পদলোলুপ বিকৃতচিন্তার হাত থেকে রেহাই পায় প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে। এদেশের সংগ্রামী মানুষও দৃঢ়চিত্তে প্রতিরোধ করে ঠিকই। তবুও একথা সত্য যে, পাকিস্তানের দুটি শাখা বার শ মাইলের ব্যবধানে থাকায় এবং মাঝখানে অবস্থিত ভারত সেই মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করায়ই সম্ভব হয়ে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশ পত্তনে। নইলে বাংলাদেশের বায়াফ্রা হওয়াটা অসম্ভব ছিল না একেবারে।

নতুন রাষ্ট্র পুরানো মাটি

বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে এদেশের বহু মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই ছিল। শুধু পাকিস্তান আমলে নয়, উনিশ শতকেই এর উন্মেষ ঘটেছিল। প্রথমে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হতেই। নব্য-শিক্ষিতদের মধ্যে এটা বরং মানসিক কিছুটা সমস্যারও সৃষ্টি করে—এ জাতীয়তাবাদ সর্বভারতীয় হবে, না হবে বাঙালি! বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের লেখায় এ দ্বৈতরূপ স্পষ্ট। ক্রমে

সর্বভারতীয় চেতনা বিস্তৃত হতে থাকলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপা পড়তে থাকে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না। বরং প্রচণ্ড প্রকাশ দেখা দেয় বঙ্গভঙ্গের সময়। পরবর্তীতে ক্রমশ আবার তা একদিকে সর্বভারতীয় জাতীয়তা এবং অন্যদিকে মুসলিম জাতীয়তার জোয়ারের তোড়ে মনে হয় ভেসে যায়। আসলে এ সময়ও তা ভেসে যায় না। তলানি পড়ে মাত্র। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চনা তা আবার আলোড়িত করে।

এক্ষেত্রেই বোঝা যায়, পাকিস্তানি চেতনার ভিত্তিটিই ছিল খুব দুর্বল। অন্তত পূর্বপাকিস্তানিদের কাছে। বাঁধন ছিল মাত্র একটি—ধর্ম ইসলাম। রসিকজনেরা অবশ্য বলতেন পি. আই. এ. বা পাকিস্তানের যাত্রীবাহী বিমান সংস্থা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স ছিল আসল যোগসূত্র। অথচ অপরপক্ষে, বাংলাদেশ জুড়ে জাতীয়তার (ধর্মসহ) সবসূত্রই ছিল বাংলাদেশ উদ্ভবের পক্ষে। যে-ইতিহাসচেতনা সৃষ্টি করে জাতীয়তার অন্যতম প্রধান উপাদান, সেখানেই লয় পায় তা চমৎকারভাবে। কোটালিপাড়ার ধর্মাদিত্য-গোপচন্দ্র থেকে তো বটেই, তারো আগে জৈন ধর্ম প্রবর্তক মহাবীর যখন এদেশে এসে অনাদৃত হন, তখন থেকেই, এমনকি রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, পুণ্ড্র জনপদের আমল থেকেই সে-উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। শাসক পাল বংশ থেকে শুরু করে স্বাধীন সুলতানী আমল হয়ে, বার ভূঁইয়ার বীরত্ব-গৌরব নিয়ে একেকারে সিরাজদ্দৌলা-মিরকাশিমসহ মজনু শাহ্-দেবী চৌধুরানী-তিতুমিরের সংগ্রাম পাড়ি দিয়ে হাল-আমলের সোহ্‌রাওয়ার্দি-শরৎ বোসের স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব পর্যন্ত জড়িয়ে আসে এ জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারায়। সঙ্গে যুক্ত হয় হাজার হাজার বছরের প্রাচীন দেশীয় সংস্কৃতি-লোকাচার, জীবনধারা, ভৌগোলিক ঐক্যবোধ এবং অর্থনৈতিক একত্ব। এ চেতনা, স্পষ্টই বোঝা যায়, একান্তভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ। সকল ধর্মের রাজ-রাজড়া-জনগোষ্ঠী থেকে আহৃত সংস্কৃতির সকল উপাদান এখানে সম্পৃক্ত।

অবশ্য বাংলাদেশের ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীগুলো এক্ষেত্রে কিছুটা সংশয়ী, যদিও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তাদের সম্পৃক্তি অবহেলা করার নয় মোটেই। বাঙালি জীবনে তাদের অনেককিছুই গৃহীত। মনিপুরি নাচের তো কথাই নেই। বিপরীত দিকে বাঙালি সমাজের অনেককিছুই তারাও গ্রহণ করেছে। ভাষা শিক্ষা অক্ষরজ্ঞান থেকে জীবনধারণ পদ্ধতি পর্যন্ত। তবু 'বাঙালি' হিসেবে চিহ্নিত হতে হয়ত কারো কারো আপত্তি রয়েছে। আপন নৃবৈশিষ্ট্য কিছু কিছু সংরক্ষণে কেউ কেউ উৎসুকও। সংখ্যায় যত ক্ষুদ্রই হোক, সমমর্যাদা বা প্রয়োজনীয় ভাগ না-পেলে অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠের পশুবল তাদের ওপর চেপে বসতে পারে—কিছুটা ওইরকম ভয় থেকেই মনখুলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থনে এদের কেউ কেউ কুণ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদে আরও একটি প্রশ্ন আছে—এর ঐতিহ্য অন্বেষায়। আজকের বাংলাদেশের উদ্ভবের পেছনের সংগ্রামের ইতিহাস ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পেছনে গেলেই প্রশ্ন আসে যে, বর্তমান বাংলাদেশের জন্যতো মোটেই তার আগের মানুষেরা চিন্তা করে নি, করে নি আন্দোলনও, যদিও এ দেশসীমার ভেতরে তাদের নানা আন্দোলন-দাবিদাওয়া বাংলাদেশ সৃষ্টির পথে উৎসাহ-

উদ্দীপনা যুগিয়েছে এন্তার। এ থেকে যদি সৃষ্টি-হয়ে থাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, তাহলে তার 'ব্রেক' বা ভঙ্গ পড়েছে সাতচল্লিশে। ওই সময়ের দেশভাগের বিষয়টা এর সাথে মিশ খায় কি করে! ওই মানসিকতাটা কি একেবারে মিথ্যে? হতে পারে তাতে যথেষ্ট রং চং আছে। কিন্তু মুসলমানিত্বের মনস্তাত্ত্বিকতাটা তো অন্তরের অন্তস্থলে রয়ে গেছে অনেকের মনেই। একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ—যে স্বাতন্ত্র্যবোধ খুঁজেছিল আলাদা পরিচয়। এখানেই ঘা খায় কিছুটা বাঙালিত্বের প্রশ্ন। বাঙালি বলতে কি বোঝায়? কাকে বোঝায়? এর উদ্ভব কবে থেকে! আজ থেকে কতদিন আগের মানুষেরা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিত? উনিশ শতকে অনেকে দিয়েছে। এর ভেতর হিন্দুই বেশি। শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ। কিন্তু অশিক্ষিত মূক জনগণের পরিচয়টা কি? বিশ শতকের প্রথম দিকেও শরৎচন্দ্র জানান তার সুবিখ্যাত উপন্যাস শ্রীকান্তের শুরুতে যে, তখনকার দিনে 'বাঙালি আর মুসলমানদের' ফুটবল খেলা হত। অর্থাৎ তখনো মুসলমানরা বাঙালি হয় নি। আজো হয়েছে কতটুকু? রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বাঙালিত্ব মুছে গিয়ে স্বচ্ছন্দে হয়ে যেতে পারে বাংলাদেশের মুসলমান বাঙালিরা 'বাংলাদেশী'। রাষ্ট্রগত পরিচয়ে বাংলাদেশী হতে পারে, কিন্তু জাতিগত পরিচয়ে? নাকি বাঙালি কোন একটা আলাদা জাতি বলে পরিচিত হতে পারে না? এ ধরনের নানা প্রশ্ন বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে বোঝা যায় ধর্ম-সম্পৃক্ত জাতীয়তা এবং ধর্মনিস্পৃহ জাতীয়তার একটা সংঘাত বাংলাদেশে রয়ে গেছে আজো। সামগ্রিকভাবে সিকিউলার বা ইহজাগতিক বাঙালিত্ববোধ এখনো সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হয় নি। অথচ তাই হওয়া ছিল স্বাভাবিক। পাকিস্তানের ইতিহাস থেকেই এ শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সৃষ্টির পেছনের ইতিহাস ও মুসলমানিত্বের কথা বলে যত পেছনেই যাওয়া যাক আসলে তা বড়জোর সাত বছরের (১৯৪০-৪৭) অথবা আরো সঠিকভাবে বললে, দু বছরের (১৯৪৫-৪৭) আন্দোলনের ফসল। ইসলামের কথা বলে মুসলমানদের এদেশে আগমন পর্যন্ত তা নেওয়ার চেষ্টা চালালেও সে-ইতিহাস তো কেবল পাকিস্তানের নয়। সেখানকার উত্তরাধিকারী আরো অনেকেই আছে। ভারত বাংলাদেশ তো বটেই। আরো পরের ইতিহাসে গেলে কথাই নেই। পাকিস্তানের মত রাষ্ট্রকেও তখন স্বীকার করতে হয় একেবারে সিকিউলারিজম বা ইহজাগতিক ভাবধারা। অর্থাৎ স্বীকার করতে হয় আরো অনেক সভ্যতা। আরো জনগোষ্ঠী। তাদের কর্মকাণ্ড। তাদের অবদান। তা পাকিস্তান করেও। করে গর্বিতও হয়। মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার যুগে পাকিস্তান অবশ্যই ছিল না। অথচ ওই ঐতিহ্য অত্যন্ত গৌরবের সাথেই ঘোষিত হয় *ফাইভ থাউজেণ্ড ইয়ার্স অব পাকিস্তান*—পাকিস্তানের পাঁচ হাজার বছর নামক বইয়ে। আর এ ঘোষণার সাথে সাথেই পাকিস্তানের কথিত 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' ভিত্তিটিও ধসে যায়। এটাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় প্রয়োজনের দাবিতে। কেবল কোন ভাবাদর্শ দিয়ে নয়। আদর্শতো আসে বাস্তবেরই তাগিদে। বাস্তবের সাথে সেই আদর্শের যত বেশি মিল খায়, রাষ্ট্র হয় ততই স্থিতিশীল। বাস্তবের মূলভিত্তি অর্থনীতি। পাকিস্তান সৃষ্টি এবং ভাঙার ভেতরই তা প্রত্যক্ষ করা গেছে সরাসরিভাবে। অতীতের সামন্ত-ইতিহাসেও এর সাক্ষ্য

মেনে। সুবিখ্যাত রাজা-সুলতান-বাদশা সবসময়েই ছিলেন প্রজারঞ্জক। প্রজার হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এজন্যই তাঁরা হয়েছেন মহান। যেমন অশোক বা আকবর! অর্থাৎ জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন বা আর্থিক উন্নয়নের দিকে থাকত তাদের লক্ষ্য। এতে দেশেরও মোট সম্পদ বাড়াত। দেশও হত উন্নত। জনগণও আর্থিকভাবে সচ্ছল থাকার সম্ভাব্য পথ পেত শ্রেণী বিভক্ত সমাজেও। উচ্চনিচ ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানের মাঝেও কিছুটা স্বস্তির ব্যবস্থা হত। সৎ-রাজার কর্তব্য হত প্রজার মঙ্গল-সাধন। স্ব-স্বার্থেই। যেমন, রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে।

আজকের দিন আর রাজা-বাদশার নয় ঠিকই। রাষ্ট্রের অধিবাসীরাও এখন আর প্রজা নয়। তারা সমঅধিকারসম্পন্ন নাগরিক। রাষ্ট্রের কর্ণধারের অনুগ্রহভাজন নয়। রাষ্ট্র সৃষ্টিও হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণেরই ইচ্ছায়। কোন রাজা-বাদশার জয়ে-বিজয়ে নয়। তাই প্রতিটি নাগরিকই এ হিসেবে এক একজন রাজা। তারা বাস করে তাদেরই ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত এক একটি রাষ্ট্রে।

বাংলাদেশেও বিষয়টি আসছে ওইভাবে। এদেশের পত্তন হয়েছে মোটামুটি সকল মানুষেরই ইচ্ছায়। মুষ্টিমেয় ছাড়া প্রতিটি মানুষই স্বাধীনতার সংগ্রামী সৈনিক। সেহেতু সে অর্থনৈতিক সাম্যেরও হক দাবিদার। এদেশের উদ্ভবের পেছনের আন্দোলন-গুলোতেও সকল মানুষের আর্থিক মুক্তির কথাই প্রতিধ্বনিত—হোক তা ছয় দফা, হোক এগার দফা বা আরো আগের একুশ দফা।

গোলটাও ওখানেই। যে-মধ্যবিত্ত বাংলাদেশ সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তাদেরই মধ্যে আছে মতদ্বৈধতা। মধ্যবিত্তের সমবণ্টন মানেই নিজের কিছু ছেড়ে দেওয়া। নিজের কমে যাওয়া। কমে তো আর এমনিতে বা আপনাআপনি যায় না। কমাতে হয়। আইন করে। নীতির মাধ্যমে। মূল্যবোধ দিয়ে। অন্যকথায়, যা ইচ্ছা তাই করার স্বাধীনতায় করা হয় হস্তক্ষেপ। বিশেষ করে অর্থবিত্তের ক্ষেত্রে। ওখানেই আপত্তি। ব্যক্তিস্বাধীনতায় নাকি হয় হস্তক্ষেপ। অথচ উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও একেবারে নিয়ন্ত্রণ নেই অর্থনীতিতে, যাচ্ছে তাই করতে সক্ষম পুঁজিপতিরা, তা সত্য নয়। রাষ্ট্রকে সবদিকে খেয়াল রেখে কমবেশি অনেককিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নইলে দেশে সরকার টেকে না। হয় নৈরাজ্য। পুঁজিবাদী ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা ছিল, তখন তাকেও কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা অবশ্যই মেনে চলতে হয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের। তাদের নিজেদেরই স্বার্থে। বর্তমান কালের ট্রাস্ট, কার্টেল, কর্পোরেশন বৃহৎপুঁজির একত্রীকরণও এমন নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে শোষণ করারই চিহ্ন।

ওরকম পুঁজিবাদী উন্নত দেশ হওয়া বাংলাদেশের মত অনুন্নত সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর পক্ষে কতটুকু সম্ভব! প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন উন্মুক্ত স্ব-দেশের মাঠ পেয়ে সন্দেহ নেই এদেশের স্বল্পবিত্তের অধিকারীদের কেউ কেউ দেশীয় প্রেক্ষাপটে মস্তবড় ধনী হয়ে উঠেছে। আরো ধনী হতে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের সীমিত সম্পদ, জনসংখ্যার প্রবল চাপ, প্রচণ্ড দারিদ্র্য এবং বহির্বাজারের অভাবে কতদূর পর্যন্ত ওটা তাদের পক্ষে সম্ভব! অকর্ষিত স্থানেই কেবল ধনবাদ বাড়তে পারে। একদা অনুন্নত আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন

আমেরিকার সম্পদ লুটপাট-ডাকাতি-অন্যায় দখল ও সেসব দেশের জনগণকে মেরেধরেই আজকের পুঁজিবাদী দেশগুলোর অবস্থা এত রমরমা। বর্তমান বিশ্বে তাদেরই অপ্রতিহত আধিপত্য। সেই আধিপত্যে ঠোক্কর দিতে গিয়েই একদা জার্মানি-ইতালি-জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার খায়। এর ফলে অবশ্য পুঁজিবাদী অন্য দেশগুলোও বোঝে লভ্যাংশ আর বখড়া কিছু ছেড়ে না দিলে এ প্রথা টেকানো যাবে না। তাই নিয়মশৃঙ্খলার ভিত্তিতে তারা গড়ে তোলে আঁতাত। সারা বিশ্বে। বর্তমান কালের বিশ্ব-বাজার এদেরই দখলে। তাদের অধিকৃত বা আওতাভুক্ত স্থান তথা বাজার কি দরিদ্র দেশগুলোর উন্নতির জন্য ছেড়ে দেবে! উপরন্তু, দরিদ্র দেশগুলো তাদের মত উন্নতইবা হবে কি করে? ওই প্রযুক্তিগত বিদ্যা? অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা? ওই শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী? এসবের জন্যই নির্ভর করতে হবে উন্নত দেশগুলোর ওপর। করছেও তাই। এ করার জন্য অবশ্য কিছু কনসেসনও পাচ্ছে। পাচ্ছে স্বদেশের কাঁচামাল যোগানদারের ব্যবসা। হচ্ছে দালাল। মুৎসুদ্দি। মধ্যস্বত্বভোগী। এজেন্ট। আর এজেন্টরা তো কোনদিনই স্বাধীন ব্যবসায়ী-নীতি নিতে পারে না। বিরাট বড় নীতিনির্ধারক ধনিকও হতে পারে না।

মোটকথা, সারা বিশ্বেই আজ ধনবাদী অর্থনীতির আওতায় উন্নয়নকামী দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি খুবই সীমিত। দেখা গেছে তা পাকিস্তান আমলেই। প্রায়-মধ্যযুগের বদ্ধজলাশয়ের ভেতর পাকিস্তান আমলের কিছু কিছু উন্নতি (যেমন আইয়ুব আমলের কয়েকটি রাস্তাঘাট করাটাই) বিরাট ব্যাপার বলে অনুন্নত-চেতনায় মনে হয় বটে কিন্তু তা যে কত অকিঞ্চিৎকর, একবার উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এমন উন্নতির দু'টি ত্রুটিও রয়েছে : এক, দীর্ঘ সময়, এবং দুই, উন্নতির বিস্তৃতি বা সুফলের ক্ষুদ্র পরিধি। পাকিস্তানি-স্টাইলে তথা পুঁজিবাদী পথে অগ্রসর হলে উন্নতির জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। অখণ্ড পাকিস্তানের তেইশ বছরে যে হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে, জনজীবনের যে উন্নতি হয়, শিক্ষার প্রসার যেভাবে ঘটে এবং হয় সমাজের মানসিক-আনুষঙ্গিক অন্যান্য সব পরিবর্তনসহ আধুনিক চিন্তা-চেতনার উদ্ভব, তাই একথার সাক্ষ্য দেয়।

দেয় বাংলাদেশের বিগত বছরগুলোও। এ হারে এগোলে শত সদিচ্ছা সত্ত্বেও দেশের সকল মানুষ শিক্ষিত হতে, সকল মানুষে জন্য শুধু ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করতে, প্রাচীন কুসংস্কার ধ্যান-ধারণা দূর করতে শত শত বছর লেগে যাবে। লেগে যাবে না, বরং হবে না বলাই ভাল। কারণ ইতোমধ্যে মানুষের সংখ্যা বাড়বে, নতুন নতুন সংকট আসবে এবং উন্নত বিশ্ব আরো অনেক বেশি উন্নত হয়ে যাবে নব নব প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের বদৌলতে। যেমন গেছে বিগত কয়েক দশকে। তাছাড়া ওই উন্নতিটুকু করতে যে অর্থসম্পদের প্রয়োজন তাই-বা আসবে কোত্থেকে! দেশের অভ্যন্তর থেকে? কীভাবে? দেশের সম্পদইতো অতি সামান্য। বাইরের উন্নত দেশের সাহায্য দিয়ে? কেনই-বা দেবে তারা সে-সাহায্য লাভের কোন হিস্যা ছাড়া? অন্যকথায়, এদেশ থাকবে বা বাধ্য হবে থাকতে চিরস্থায়ীভাবেই অনুন্নত। পরানুগতও। ওই সাহায্য-সহায়তার জন্য।

আবার উন্নত হলেই হবে না, সেই উন্নতি কার জন্য, কতজনের জন্য, কীরূপ উন্নতি, কোন উন্নতি—ইত্যাকার প্রশ্নগুলোরও সদুত্তর থাকতে হবে। স্থির করতে হবে দেশের সকল মানুষের উন্নতি চাই নাকি চাই মুষ্টিমেয়ের উন্নতি। অর্থাৎ উন্নতির বিস্তারটা দেশের সকল মানুষের ভেতর পরিব্যাপ্ত হবে নাকি থাকবে কেবল তা জনকয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যেমনটা হয়েছিল পাকিস্তানে? সুতরাং শুরুতেই দেশ-গঠনের লক্ষ্য স্থির করাটাই সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য। এদেশের পত্তনের সময় অমন একটা উদ্যোগ আদর্শগতভাবে নেওয়াও হয়েছিল কিছুটা। কিন্তু বিনাযুদ্ধে কি কেউ দেয় সুচ্যাগ্র মেদিনী!

বাংলাদেশ উদ্ভবে সহায়ক মধ্যবিত্ত তো শ্রেণীগত কারণেই বাংলাদেশের ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারে না। অন্যায়-অত্যাচারের মুখে গণমানুষের উন্নতি করার বিষয় গণ্যের ভেতর আনলেও, সুবিধেমত সময়ে তা পরিত্যাগ করাটাই স্বাভাবিক। যেমন হয় বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর। এদেশের মধ্যবিত্ত বাস্তবিকপক্ষে চেয়েছে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আর একটি নতুন রাষ্ট্র যেখানে তারা অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ লুটপাট ও শোষণ চালাতে পারবে। রাষ্ট্রের হতে পারবে কর্ণধার। শ্রমজীবী মানুষদের সমর্থন তারা অধিকার আদায়ের সংগ্রামকালে লাভ করেছিল তাদের দুঃখদুর্দশার কথা বলে। শ্রমজীবীরাও ভেবেছিল নতুন দেশে তাদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন হবে। কিন্তু হা হতোস্মি! মূলতই যে-শ্রেণীভেদ রয়ে গেছে শ্রমজীবী এবং মধ্যবিত্তের ভেতর তা অসত্য নয় বলেই সারা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসেনি। অথচ মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত হয়ে গেছে অনেকে। শ্রমজীবীরা গেছে নেমে নিচে। আর এই ফারাকটা ভরছে ধর্মের নানা কথা বলে! অন্যদিকে নির্ভর করছে বিদেশী খয়রাত-লিল্লাহ অর্থাৎ ঋণ এবং দানের ওপর। এই ঋণ এবং দান গ্রহণ করে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না, কিছু কিছু প্রাথমিক স্তরের কাজ ছাড়া। এদেশের মুৎসুদ্দিবুর্জোয়ারা তা চায়ও না। কারণ শিল্প গড়ার মানেই শ্রমিকের আত্মসচেতন হওয়া। সংঘবদ্ধও হওয়া। অনেক ধনিকের অর্থ তাই বিদেশের ব্যাংকে পাড়ি দেয়।

অবস্থার এই প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্তের যে বামধারাটি অতীত থেকেই কমবেশি ধনবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল তারা ক্রমে আরো বেশি বেশি সমাজতন্ত্রাভিমুখি হতে চায় স্বাধীনতার পর পরই। তাদের মতে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। ধনবৈষম্যের প্রশ্নটা হয় অবান্তর। অর্থের জোরে হা'কে না করা যায় না। রাষ্ট্র পালন করে সকল নাগরিককে। চাকরি-ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রত্যেকে সাধ্য অনুযায়ী কাজ করে। কাজ অনুযায়ী বেতন পায়। বেকারত্ব থাকে না। সুযোগ থাকে না মানুষকে ঠকিয়ে লুটপাট করে ধনী হওয়ার। অর্থ জমিয়ে কেউ হতে পারে না আঙুল ফুলে কলাগাছ, আর কেউ না-খেয়ে মরে-না পথে-ঘাটে। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হয় গণমানুষের স্বার্থে, গুটিকয় ধনীর প্রয়োজনে নয়। প্রযুক্তিগত উন্নতি আসে। সমগ্র নাগরিকের জীবনে আরাম-আয়েস বাড়ে। প্রতিটি নাগরিকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে। আর এভাবে, জাতীয় রাষ্ট্র যেহেতু প্রতিটি নাগরিকেরই রাষ্ট্র, সেহেতু এ চিন্তাচেতনার সাথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাযুজ্যপূর্ণও। প্রযুক্তির উন্নতি ধনবাদে যেখানে বেকারত্বের সৃষ্টি করে, অটোমেশন আতঙ্কিত করে সাধারণ মানুষকে চাকরি হারাবার, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তা বরং মানুষের কাজের সময় কমাতে পারে, বিনোদনের সময় পারে বাড়াতে। কাজেই এমন ব্যবস্থা মানুষের কাছে জনপ্রিয় হবেই।

কিন্তু এধরনের চিন্তা-চেতনা বাস্তবানুগ করে তুলতে বাংলাদেশে দ্বিমত দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করে স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য সমমনা সমাজতান্ত্রিক পার্টিকে নিয়ে বামধারার রাজনীতি করে দেশকে ক্রমশ সমাজতন্ত্রাভিমুখি করা সম্ভব। আর কেউ কেউ মনে করে, মধ্যবিত্তের দল আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্র কায়েম করতে উৎসাহী হবে না শ্রেণীগত স্বার্থেই। সুতরাং এর বিরোধিতা করাই কর্তব্য। বামপন্থীদের কেউ কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষেও ছিল এ যুক্তিতে যে, এর সৃষ্টি হলে আর একটি মধ্যবিত্তের রাষ্ট্রেরই পত্তন হবে মাত্র, গণমানুষের কোন লাভ হবে না। লাভ হবে মুষ্টিমেয় বাঙালি ধনিকের। এ চিন্তা থেকে তারা-যে বিরোধিতা করে, লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, বাংলাদেশ পত্তনে বিরোধী অন্য ধারা পাকিস্তানপন্থীদের সাথে একমুখে গিয়ে মেলে। বাংলাদেশের উদ্ভব হলে পরও এ দুটি মত প্রত্যক্ষে পরোক্ষে বাংলাদেশকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মধ্যবিত্তের যে-অংশ ছিল পুঁজিবাদী উন্নতির পক্ষে তাদেরও বিক্ষোভ। ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক নীতি এবং জাতীয়করণ তাদের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করছিল বলেই সম্ভবত।

এমনি ধরনের অর্থনৈতিক উন্নতির পদ্ধতি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তারই ফলে পঁচাত্তরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। ধনবাদী ধারাটির পক্ষে নিরঙ্কুশ বিজয় হয়। কিন্তু তাদেরও ভিত খুব একটা শক্ত মাটির ওপর থাকে বলে মনে হয় না। আসলে তারা তখনো না-করতে পেরেছে অফুরন্ত অর্থ যা দিয়ে রাষ্ট্রের সব সম্পদ কিনে নিতে পারে অথবা না-করতে পেরেছে তেমন ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি যা দিয়ে সেসব কলকারখানা চলাতে পারে সুষ্ঠুভাবে। উপরন্তু, যে রক্তাক্ত পদ্ধতিতে পঁচাত্তরে এদেশে রাজনীতির পরিবর্তন ঘটে তা নিয়ে ওঠে অনেক প্রশ্নও। মানবিক মূল্যবোধ দারুণভাবে এ সময় মার খায়। জাতীয় বুর্জোয়াদের কেউ কেউ এ নৃশংসতায় হয় শঙ্কিত। হয়তবা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের কর্মকাণ্ডে তাদের পরিবৃদ্ধি অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে ভেবেই। মধ্যবিত্তেরও অনেকেই ঘটনাটি চরম অমানবিকতার জন্য সহজে নিতে পারে নি। সমর্থন করতে পারে না শ্রমজীবী জনগণেরও বিরাট অংশ। তাদের কোন লাভ এ ঘটনা ঘটার ফলে হয়েছে বলে মনেও করতে পারে না। তেমন সদর্থক কিছু তাদের পক্ষে ঘটেও নি পঁচাত্তরোত্তর কালে। বস্তুতপক্ষে, সারা দেশই একটা মনস্তাত্ত্বিক অপরাধে জর্জরিত বলে মনে হয়। সেজন্যই ওই ঘটনার সৃষ্টিকারীদের কেউ কেউ তীব্র উল্লাস জানিয়ে আসলে নিজের অপরাধ ঢাকতে চেয়েছে। অপরাধবোধ ঢাকা যায় প্রায়শ্চিত্ত করে, নয় প্রবল প্রতাপে, যেমন করতে চেয়েছিল পাকিস্তান অস্বাভাবিকভাবে ২৫ মার্চের ঘটনায়।

পঁচাত্তরের হিংস্রতা যে সারা দেশে আদৃত হয় না তা দেখা যায় আশির দশকের শুরু থেকেই। রাজনীতির হাওয়া বদলে যায় যেন এ সময়। ওই হাওয়া বাগে রাখার জন্য দরকার হয় বাহুবলের। এ ধরনের রাজনীতি চলে ১৯৯১ পর্যন্ত সমরনায়কদের দ্বারা। একানব্বই থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার চালু হলেও নানা টানাপোড়েন এ নিয়ে চলছে। শত শত বছরের সামন্ত-ঐতিহ্য মনমননে এমনভাবে গেঁথে আছে যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোও ঠিক যেন গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারে না। ভেতরের স্বৈরাচারী আদলটা বেরিয়ে আসতে চায়। কখনোবা ধর্মের খোলসে ঢুকে পড়ে অতিপ্রগতিশীল দলটিও।

এ অবস্থা টিকিয়ে রাখলে লাভ উঠতি ধনিকদের। কারণ এর বিপরীত বক্তব্য তাদের বিরোধী—যেখানে আসে শ্রমজীবী জনগণের কথা, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও দুবেলা দুমুঠো ভাত এদেশে জোটাতে পারে না। কর্মের স্থান নেই, বেকারত্ব বিধিলিপি, কৃষিকাজের জন্য জমি নেই, শ্রম বিকোবার কারখানা নেই। যাও আছে, তা অফুরন্ত মানুষের ভারে উপচে পড়ছে। তাই শ্রমের মূল্য সামান্য। চেহারাছবির বিবর্ণ বিশুষ্ক ধরনই তার সাক্ষী। সাক্ষী ফুটপাত। বাড়িঘর নয়, বস্তি। মানবেতর জীবন যাপন প্রণালী। হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয় বলে আজকের দিনে আর পার পাওয়া যাচ্ছে না সারা দুনিয়ার টেকনোলজিক্যাল উন্নতির জন্য। টিভি রেডিও সংবাদপত্র জানিয়ে দিচ্ছে অনেককিছুই। অতীতের মত বিধির বিধান, ভাগ্য আল্লাহর হাতে (অথচ আল্লাহই বলেছেন, তার ভাগ্য কখনোই ফেরান না যে নিজে চেষ্টা না-করে), সকলে এক রকম হয় না ইত্যাকার কথা বলে আর বুঝ দেওয়া যায় না। বুঝ দেওয়া যাচ্ছে না বলেই উন্নতিকামী দেশগুলোয় আজ এত হৈচৈ বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। না এদের অনেকে গ্রহণ করতে পারছে পরিবর্তিত পদ্ধতি (স্বার্থবাদীদের স্বার্থক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে), না দেশকে করে তুলতে পারছে উন্নত দেশে। মৌলবাদী একটি ধারা এ অবস্থায় ধর্মের কথা বলে আপন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে।

অপরপক্ষে, মাঝামাঝি একটা পথ নিয়ে কোন কোন রাষ্ট্র চেষ্টা করে ওয়েলফেয়ার স্টেট, কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে। এরা কিছু কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানা রাখে, কিছু কিছু ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি দেয়। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এর অর্থনৈতিক গতিটি কোন দিকে—গণমুখী, জনগণের জন্যই, নাকি মুষ্টিমেয়ের জন্য। দেখা যায়, এসব দেশে বড় পুঁজিপতি হয়ে ওঠে সরকার। সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত খাত থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে তা দিয়ে শিল্পকারখানা তৈরি করে ব্যক্তিমালিকানায় অনেক সময় দিয়ে দেয়, যেমন দিয়েছে পাকিস্তান। অজুহাত ব্যক্তিমালিকানায় চলে ভাল। রাষ্ট্রীয় হলেই এদেশের মানুষের বোধ আসে 'সরকার কি মাল দরিয়া মে ঢাল'। এজন্য রসিক কেউ কেউ অবশ্য বলেন, সরকারটিও একটি কোম্পানিকে দিয়ে দিলে ল্যাঠা চুকে যায়। এদেশেত এ ব্যাপারে অতীত উদাহরণ আছেই। ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিইত একদা এদেশের রাজা ছিল একশ বছর।

শ্রমজীবী মানুষের উন্নতি মধ্যবিত্ত-শাসিত রাষ্ট্র একটা পর্যায় পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না-করে করতে পারে। তারপরও যদি এগোতে হয় তাহলে অবশ্যই সেটা শ্রমজীবী মানুষকেই করতে হয়। এধরনের প্রয়াস-যে এদেশে হয় নি তাও নয়। চল্লিশের দশকের শেষভাগের তেভাগা আন্দোলন এমনি এক ঐতিহ্যসৃষ্টিকারী গণসংগ্রাম। সারা বাংলার উনিশটি জেলায় তেভাগার এ সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল বিশেষ জঙ্গি আকারে। ষাট লক্ষ বর্গাচাষী-ভাগচাষী হিন্দু-মুসলমান আদিবাসী মেয়েপুরুষ জীবন তুচ্ছ করে ওই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শিক্ষিত মুসলমানদের কেউ কেউ এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। একইভাবে সিলেটের নানকার এবং টং প্রথার বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও আন্দোলন হয়েছিল। এসব আন্দোলন মধ্যবিত্ত রাজনীতির ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তেভাগা আন্দোলনকারীদের সম্বন্ধে *স্টেটসম্যান* পত্রিকা বর্ণনা দিয়েছিল এভাবে, 'বিগত শত শত বছরের মূক (কৃষকরা) আজ শ্লোগানের ধ্বনিতে (যেন) পরিবর্তিত হয়ে গেছে। রাইফেলের মত লাঠি কাঁধে মিছিলের অগ্রভাগে লাল পতাকা ধরে যখন সকল কৃষক মাঠের পর মাঠ পার হতে থাকে তখন দেখতে লাগে খুবই আকর্ষণীয়। নিঝুম বাঁশঝাড়ের মাঝে মুষ্টিবদ্ধ বামহাত কপালে তুলে একে অপরকে সম্ভাষণ 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' শোনা যায় বিচিত্র।' এ আন্দোলন সংগঠিত করেছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন কিষাণ সভা। ১৯৩৭-এ এর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৯১০৮০, ১৯৪৫-এ তা বেড়ে হয় ২,৫০,০০০। এ আন্দোলন দমাতে পরস্পর প্রতিযোগী ও শত্রুভাবাপন্ন মধ্যবিত্তের পার্টি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিল। এতেই বোঝা যায় ধর্ম নয়, শ্রেণী চরিত্রই আসল কথা।

বস্তুত ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে মার্কসবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নানা গ্রন্থ পাঠ-পঠন, রচনা অনুবাদ-আলোচনা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বামপন্থী একদল কর্মী ও নেতার সৃষ্টি করেছিল। তাঁদের অনুপ্রেরণায় ১৯৩৩-এ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও গঠিত হয়। তবে ১৯৩৪-এ এর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০। ক্রমে নানা স্তরের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সংগঠনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পরিবেশ গড়ে উঠে। ওই পরিবেশ তখনকার কর্মীদের শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীগত আন্দোলনের সূত্রে নিজেদের যুক্ত করতে অনুপ্রাণিত করে এবং খেত-খামার-কারখানা-যানবাহন চা বাগানের ছোটবড় নানা সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে কর্মীদের উৎসাহ যোগায়। ১৯৪৪-৪৫-এ কোলকাতার ট্রাম শ্রমিকদের আশি দিনের ধর্মঘট এধরনের একটি প্রাথমিক পর্যায়ের সচেতন আন্দোলনের ঘটনা স্মরণ করা যায়।

শ্রমিক ও কৃষকদের ওইসব আন্দোলন সংগঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন মুসলিম সম্প্রদায় থেকে আগত অনেকে। মুজাফফর আহমদ, আবদুল্লাহ রসুল, আবদুল হালিম থেকে শুরু করে মোকলেসুর রহমান, ইয়াকুব মিয়া, আলতাব আলি, জহুরউদ্দিন মুন্সি, সাব্বির মণ্ডল, মন্তাজউদ্দিন, কছিম মিয়া, ডাক্তার আবদুল কাদের চৌধুরী, নূরজালাল মিয়া, নিয়ামত আলি, মামুদ প্রমুখ। তাদের অনুসৃত পথ ধরে পরবর্তীকালে আরো অনেকে এ ধারায় এগিয়ে আসেন। তবে সারা পাকিস্তান আমলেই বামপন্থী

রাজনীতি মোটামুটি নিষিদ্ধ থাকায়, এ ধারার রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিবৃদ্ধি ঘটতে পারে নি। পরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবেগের মুখে মাথা তুলেও তেমন দাঁড়াতে পারে নি।

তবু সেই সুদূর অলিখিত অতীত থেকে আঠার-উনিশ শতক ধরে যেসব আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা এদেশের মাটির পরতে পারতে গেঁথে রয়েছে এবং বিশ শতকেও যতসব প্রতিবাদ-সংগ্রাম সংগঠিত হচ্ছে, সে-সবই হলো এ সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রত্যয়। এদেশের মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল ভূমিকা এখন প্রশ্নযোগ্য। এখন তার স্বার্থ সংরক্ষণে কখনো আনবে ধর্ম, কখনো আঞ্চলিকতা, কখনো ভাষা, কখনো অন্য অরো কিছু। আবিষ্কার করবে এক একবার এক এক পরিচয়। সবচেয়ে বড় পরিচয় যে শ্রমজীবীর গায়ের ঘাম, তা তারা রাখতে চাইবে অনাবিষ্কৃত। ইসলামের বাণী—'শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগে তার পারিশ্রমিক দাও', তুলে রাখবে উহ্য, বরং বঞ্চিত করবে তার ন্যায্য পাওনা। চুরি করবে ব্যবসায়ে, পরিমাপে দেবে কম—যা বার বার কোরান শরিফে নিষেধ করা হয়েছে। এ দেখে কখনো সমাজের একটা অংশ শ্রেণীচ্যুত বামপন্থী হয়ে মিলাবে হয়ত শ্রমজীবীর কাঁধে কাঁধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রমঝীবী শ্রমিক-কৃষকের নিজেদেরকেই আবিষ্কার করতে হবে তাদের আসল পরিচয়। নির্ণয় করতে হবে সমাজে তাদের স্থান। যতদিন পর্যন্ত তারা তাদের ভূমিকার সুনির্দিষ্ট অবস্থান খুঁজে না পাবে, ততদিন পর্যন্ত থাকতেই হবে তাদের বঞ্চিত—হোক-না ধর্ম তাদের যা-ই।

জন-জীবনে ইসলাম

মুসলিম শাসন-আমলে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী ছিল অমুসলমান ও মুসলানদের নিয়ে গঠিত। মুসলমান ছাড়া অন্য সকলকেই সাধারণত হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হত। হিন্দুরাই সংখ্যায় ছিল বেশি। এর মধ্যে আসলে বৌদ্ধ, কিছু জৈন, ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী বা পাহাড়ী এলাকার লোকজন এবং কিছু পার্শি অগ্নিপূজকও ছিল। ষোল শতক থেকে পর্তুগিজ এবং আর্মেনিয়গণও কিছু কিছু করে বসবাস করতে থাকে। সেকালে জনসংখ্যার জরিপ না-হলেও মোটামুটি জানা যায় যে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে মহামন্বন্তরের আগে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত জনসংখ্যা ছিল আড়াই কোটির ওপর। এর ভেতর এক কোটি চল্লিশ লক্ষের ওপর ছিল হিন্দু এবং প্রায় এক কোটি দশ লক্ষের মত ছিল মুসলমান। এছাড়াও ছিল এনিমিস্ট বা সর্বপ্রাণবাদিগণ ও অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠী যাদের মিলিত সংখ্যা চার লক্ষ।

১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বের দু তিন শতক ইসলামে ধর্মান্তরিত ব্যাপকভাবে হওয়া কমে যায়। তবে বেশকিছু মোগল, পারসিক ও উত্তর ভারতের লোকজন বাংলায় বসতি স্থাপন করে। শতকরা দশভাগ এ ধরনের ধর্মান্তরিত ও বহিরাগত ধরা হয়ে থাকে। অবশ্য রাজনৈতিক প্রভাব ও ছত্রছায়ায় অর্থনৈতিক সুবিধা, আরাম-আয়েশ, বহু-বিবাহ-প্রথা ; খাবারের ধরন ও বিধবা বিবাহের জন্য মুসলিম জন্মহার তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের চেয়ে সব সময়েই বেশি ছিল। হিন্দুদের ভেতর বাল্য-বিবাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ থাকা ও অন্যান্য সামাজিক-ধর্মীয় কারণেই এ ধরনের প্রবৃদ্ধি অর্থাৎ জন্মহার কম বলে ইতিহাসবিদ আবদুর রহিম-এর মত পণ্ডিতগণ মনে করেন। পনের-ষোল শতকের বাংলা সাহিত্যেও মুসলমানদের ভেতর উচ্চ জন্মহারের কথা বলা হয়েছে।

ব্রিটিশ আমলেও মুসলমানদের জন্মহার ছিল শতকরা একশ ভাগের ওপর। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের প্রথম আদমসুমারির সময় খাস ব্রিটিশ বাংলায় মুসলমান ছিল প্রায় ১ কোটি ৬৪ লক্ষ এবং হিন্দু (সর্বপ্রাণবাদিগণসহ) ছিল ১ কোটি ৮১ লক্ষের ওপর। সর্বমোট জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬৯ হাজারের ওপর। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পূর্বে ১৯৪১-এর আদমসুমারি অনুযায়ী প্রায় ৭ কোটি বাংলার অধিবাসীদের ভেতর ৩ কোটি ১০ লক্ষ হয়েছিল হিন্দু আর ৩ কোটি ৭০ লক্ষ হয়েছিল মুসলমান। একচল্লিশ-এর সেন্সাস সঠিক নয় বলে অনেকে মনে করেন। এ জন্য ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাস ধরে ১৮৭২ থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে চল্লিশ বছরে হিন্দু ও মুসলমানের আনুপাতিক বৃদ্ধির হার দেখা যায় শতকরা ২৩.৫ ভাগ হিন্দু এবং শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমান। অন্য কথায়, একশ বছরে মুসলিম জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার হল শতকরা ১২৫ ভাগ আর হিন্দুদের

মাত্র ৫৭ ভাগ। এভাবে প্রতি শতাব্দীতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১১০ ভাগ অন্তত ধরে (১০০ ভাগ জন্মসূত্রে এবং ১০ভাগ বহিরাগত) ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার মুসলমান জনসংখ্যা বলা যায় ৫০ লক্ষের ওপর এবং ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে ২৫ লক্ষের ওপর। বস্তুতপক্ষে যতদূর জানা যায়, ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দের দিকে বাংলাদেশে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ এবং হিন্দু ৪১ লক্ষ। আর অন্যান্য সকল ধর্মের লোকজন নিয়ে এ সময় সর্বমোট জনসংখ্যা ৭০ লক্ষ। অর্থাৎ মুসলমানরা এ সময় বাংলার জনসংখ্যার মাত্র ৩৯.৫ শতাংশ ছিল। সারা ভারতের লোকসংখ্যা ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে ১০ কোটি ছিল বলে ধরা হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এ ছকটা মোটামুটি নিম্নরূপ ছিল বলা যায় :

খ্রীস্টাব্দ	মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য	মোট
১৫৭০	২৭ লক্ষ	৪১ লক্ষের বেশি	২ লক্ষের মত,	৭০ লক্ষের মত
১৬৭০	৫২ "	৯৪ " মত	২ " "	১ কোটি ৫০ লক্ষের মত
১৭৭০	১ কোটি ৯ লক্ষ	১ কোটি ৪১ লক্ষ	৪ " "	২ " ৫০ " বেশি

অত:পর প্রথম সেন্সাস থেকে জনসংখ্যা নিম্নরূপ :

খ্রীস্টাব্দ	মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য	মোট	মন্তব্য
১৮৭২	১ কোটি ৬৪ লক্ষ	১ কোটি ৮১ লক্ষ	×	৩ কোটি ৬৭ লক্ষ	অবিভক্ত বাংলায়
১৮৮১	১ " ৭৮ "	১ " ৭২ "	×	×	
১৮৯১	১ " ৯৫ "	১ " ৮০ "	×	×	
১৯০১	২ " ১৯ "	২ " ১ "	৭ লক্ষের ওপর	×	
১৯১১	২ " ৪২ "	২ " ৯ "	১১ লক্ষের ওপর	×	
১৯৪১	৩ " ৭০ "	৩ " ১০ "		×	
১৯৫১				৪ কোটি ২১ লক্ষ	কেবল বাংলাদেশের
১৯৬১				৫ " ৮ লক্ষ	
১৯৭৪				৭ " ১৪ লক্ষ ৭৯ হাজার	স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ১৯৭১-এ গণনাহয়নি
১৯৮১				৮ " ৭০ হাজার	
১৯৯১	৮৮.৩%	১০.৫%	১.২%	১০ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৯২	

১৫৭০-এ যদি সারা বাংলার সত্তর লক্ষ লোকসংখ্যা ধরা যায় তাহলে ১৪৭০-এ বাংলার অধিবাসী (লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে) মনে করা যেতে পারে পঞ্চাশ লক্ষের মত। ১৩৭০-এ লাখ ত্রিশেক। অর্থাৎ তুর্কিদের বাংলা তথা লক্ষনৌতি বিজয়কালে (১২০৫ খ্রীঃ) লাখ পনের লোক এর সীমার মধ্যে বাস করত বলে ধরা যেতে পারে। এর কতজন হিন্দু এবং কতজন ছিল মুসলমান বলা কঠিন। বখতিয়ার দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিব্বত অভিযানে গিয়েছিলেন। এদের ভেতর সকলেই মুসলমান

ছিল-না বলে জানা যায়। এ হিসেবে তের শতকের প্রথম পাদে নারী ও শিশুসহ হাজার পঞ্চাশেক মুসলমানও সারা বাংলায় কল্পনা করতে কষ্ট হয়। অর্থাৎ সারা দেশের জনসংখ্যার শতকরা চারভাগও মুসলমান ছিল কিনা সন্দেহ। এ হিসেবটি পরিসংখ্যানের অভাবে নির্ভুল নয়। আলোচনার সুবিধার্থে এমন সম্ভাব্য অনুমান করা গেল।

বাংলাদেশের মুসলমানদের ভেতর ছিল বহিরাগত মুসলমান এবং দেশীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান। বহিরাগতদের মধ্যে তুর্কি, আফগান, মোগল, ইরানি এবং আরবিয়গণই ছিল প্রধান। এছাড়া কিছু ওসমানি (তাও তুর্কিই ?), আবিসিনিয় এবং অন্যান্য মিশ্র অধিবাসীও ছিল। ১৫৭০-এ বহিরাগত মুসলমান ধরা হয় ২৯.৫ ভাগ এবং ধর্মান্তরিত দেশীয় ধরা হয় ৭০.৪ ভাগ। একইভাবে ১৭৭০-এ ৪০ লক্ষের মত ছিল বাংলার বাইরে থেকে আগত মুসলমানদের সংখ্যা এবং ৭০ লক্ষের মত স্থানীয় ধর্মান্তরিত। স্মর্তব্য যে, ইসলাম ধর্মানুসারে ধর্মান্তরকরণের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়া যেখানে সম্ভব, সেখানে হিন্দু ধর্মে এ ধরনের ব্যবস্থা নেই বলে এবং কেবলমাত্র জন্মসূত্রেই সেখানে ধর্ম এবং বর্ণ স্থির হয় বলে কেবল বংশবৃদ্ধির মাধ্যমেই হিন্দুর সংখ্যা বাড়তে পারে। তাও আবার সীমিত থাকতে বাধ্য বিধবা বিয়ে নিষিদ্ধ থাকায়। এ হ্রাস বৃদ্ধির ব্যাপারে দেখা যায় যে, প্রথম ১৮৭২-এর সেন্সাসে হিন্দু জনসংখ্যা বাংলায় বেশি, পরের সেন্সাসেই (১৮৮১) তা কমে গেছে। ক্রমে আরো কমছে। অথচ এ সময় বিধবা বিয়ে, বাল্য বিয়ে, সতীদাহ প্রথা নিবারণ ইত্যাদি সংস্কারের চেষ্টার ফলে হিন্দু সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তাতে জনসংখ্যা এত কমার কথা নয়। তবুও এমনটি হওয়ার কারণ এখনও অনির্ণীত।

বাংলার মুসলিম শাসনামলে দেশীয় মুসলমানদের ভেতর ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে চণ্ডাল পর্যন্ত ছিল। সমাজের নিচু স্তরের লোকেরাই বেশি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল বলে জানা গেলেও, ধর্মান্তরিতদের একটা অংশ ছিল মিশ্র রক্ত এবং হিন্দু উচ্চস্তরের লোকজন। বহিরাগত বহু মুসলমান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ রমণী বিয়ে করেন। ইলিয়াস শাহ্ এক সুন্দরী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা বিয়ে করেন বলে কথিত। কবি মোহাম্মদ খান-এর পূর্ব-পুরুষ ব্রাহ্মণ তরুণী বিয়ে করেছিলেন। বিজয় গুপ্ত জনৈক কাজীর উচ্চ বংশীয় হিন্দু নারী বিয়ে করার কথা জানিয়েছেন। ঈশা খাঁ শ্রীপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার কেদার রায়-এর বোন সোনামনিকে বিয়ে করেন। সোনামনির দুই পুত্র আবার কেদার রায়ের দুই কন্যা বিয়ে করেন। সমশের গাজীও ব্রাহ্মণ কন্যা বিয়ে করেছিলেন বলে শোনা যায়। *অমৃতকুণ্ডগ্রন্থ* অনুযায়ী ভোজের ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ভোজ বর্মা?) নামে জনৈক বেদান্ত-জ্ঞানী ব্রাহ্মণ কাজী রুকনউদ্দিন সমরকন্দির সংস্পর্শে এসে দর্শন আলোচনার মাধ্যমে ক্রমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। একই সূত্র জানায় কামরূপের আর এক ব্রাহ্মণ সন্ত অম্ভবনাথ-এর ইসলাম গ্রহণের কথা। গণেশ-পুত্র যদুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা সবার জানা। কররানি সুলতানদের সেনাপতি রাজু বা কালাপাহাড়ের নামও সর্বজনবিদিত। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঈশা খাঁর পিতা রাজপুত ক্ষত্রিয় কালিদাস গজদানি ইসলাম গ্রহণ করে সোলায়মান নাম নেন বলে জানা যায়। বাগেরহাটের খান জাহান আলীর শিষ্য ও দেওয়ান মাহমুদ তাহির ছিলেন আগে ব্রাহ্মণ। পাবনার শাহজাদপুর-এর

জমিদার রাজা রায়ের পুত্র রঘু রায় ইসলাম খান এর সুবাদারির সময় মুসলমান হন। নবাব মুর্শিদকুলি খা ধর্মান্তরের আগে ছিলেন দাক্ষিণাত্যের উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ। সিংঘটিয়ার জমিদার কামালউদ্দিন চৌধুরী ও জামালউদ্দিন চৌধুরীও পূর্বে ছিলেন ব্রাহ্মণ। এ ধরনের যে সব লোক হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিলেন তাদের বলা হত 'গরসল'। মুকুন্দরাম-এর চণ্ডীকাব্য এ কথা জানায়।

বাংলাদেশে এ ভাবে যে মিশ্র মুসলমান সমাজ গড়ে উঠেছিল তাতে শেখ সৈয়দ এবং উলেমারা ছিল বিশেষভাবে সম্মানিত। এরাই সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করত। দ্বিতীয় স্তরে ছিল খান, মালিক, আমির, সদর, কবির, মারিফ ইত্যাদি। জমিদার, মুকদ্দম ও এমন ধরনের চাকরিজীবীরা ছিল তৃতীয় স্তরে। আর চতুর্থ স্তরে ছিল ফকির সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যগুলো থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈশ্য, শূদ্র এবং মুসলমান তাঁতীসহ অন্যান্যের বাসস্থান গ্রামে গ্রামে সুনির্দিষ্ট ছিল। শহরে সাধারণত উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা বাস করত। বিদেশ থেকে আগত মুসলমানগণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হত। থাকত সাধারণত শহরাঞ্চলেই।

সেকালের জন-জীবন

ইবনে বতুতা জানান : 'বাংলা একটি বিরাট দেশ। এখানে প্রচুর পরিমাণে চাল উৎপন্ন হয়। সারা পৃথিবীতে আমি এমন একটিও দেশ দেখি নি যেখানে বাংলাদেশের চেয়ে জিনিসপত্রের দাম সস্তা। তবে বাংলাদেশ স্যাতসেঁতে। খোরাসানিরা একে বলে 'দোজখপুর আজ নিয়ামত' (অর্থাৎ সম্পদসম্পন্ন নরক)। আমি বাংলাদেশের রাস্তায় দেখেছি, এক রূপার দিনার, যা আট দিরহামের সমান, তার বিনিময়ে দিল্লির ২৫ রত্‌ল (দিল্লির এক রত্‌ল বর্তমান যুগের চোদ্দ সের) ওজনের চাল বিক্রি হচ্ছে।....আমি শুনেছি যে, বাংলার লোকেরা মনে করে তাদের দেশে এটাই চড়া দর। মরক্কোর ধার্মিক প্রকৃতির লোক মুহম্মদ-উল-মশমুদি ছিলেন এ দেশের একজন পুরানো বাসিন্দা...। তিনি আমায় বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রী এবং একজন চাকর-এই তিন জনের এক বছরের উপযোগী জিনিস তিনি আট দিরহামে কিনতেন, আর ধান কিনতেন আট দিরহামে দিল্লির আশি রত্‌ল দরে। আমি সেখানে (বাংলাদেশ) তিনটি রূপার দিনারে একটি দুধেল গাই বিক্রি হতে দেখেছি...। দেখেছি এক দিরহামে আটটি করে হৃষ্টপুষ্ট মুরগি বিক্রি হতে এবং এক দিরহামে পনেরোটি করে বাচ্চা পায়রা বিক্রি হতে। পরিপুষ্ট একটি মেষশাবক বিক্রি হতে দেখেছি দু দিরহামে। চার দিরহামে এক রত্‌ল চিনি পাওয়া যেত...। এছাড়া, এক রত্‌ল গোলাপজল পাওয়া যেত আট দিরহামে। এক রত্‌ল ঘি চার দিরহামে। এক রত্‌ল তিল তেল দু দিরহাম। সবচেয়ে মিহি পাতলা একখান কাপড় আমি দু দিনারে ত্রিশ হাত দরে বিক্রি হতে দেখেছি। একটি সুন্দরী ক্রীতদাসী বালিকা, যে উপপত্নী হতে সমর্থ—তার দাম এক সোনার দিনার, যা মরক্কোর আড়াই সোনার দিনারের সমান।'

উল্লিখিত মূল্যমানগুলো বর্তমানকালে ঠিক করা মুশকিল। প্রফেসর নীরদভূষণ রায়-এর মতে একজন সুন্দরী দাসীর মূল্য ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের মূল্যমানে ৭ টাকা এবং একজন তাগড়া ছোকড়া চাকরের মূল্য ১৪ টাকা মাত্র। উক্ত মশমুদি (মশহাদি?) তিন জনের পরিবারের খাদ্যসামগ্রীর যে মূল্যমান দিয়েছেন তাও ৭ টাকা মাত্র। ১৯৪৮-এর মূল্যমানও আজকের (১৯৯৯ খ্রীঃ) সাথে মিলবে না, কারণ টাকার মান প্রচণ্ড পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং জিনিসপত্রের দাম শত শত গুণ বেড়ে গেছে।

১৩৪৯-৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে রচিত চীনা *তাও-য়ি-চি লিয়েং* [illegible] গ্রন্থে বাংলাদেশের (সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের) বিবরণ লেখক ওয়াব্‌তা ইউয়ান দিয়েছেন এরূপ : 'লোকেরা (এ দেশে) বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাস করে। সারা বছর তারা চাষ করে। বীজ বোনে। তাই পতিত জমি (এ দেশে) নেই। খেত (এ দেশের) খুবই শস্যসমৃদ্ধ। (এ দেশে) বছরে তিন বার ফসল ফলে জিনিসপত্রের দাম মোটামুটিভাবে সস্তা ও মানানসই।...লোকদের আচারব্যবহার ও প্রথাপদ্ধতি পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ। পুরুষ ও মহিলা সূক্ষ্ম তুলার পাগড়ি এবং লম্বা আলখাল্লা পড়ে।...(এ দেশের) সরকারি কর দু-দশমাংশ। সরকার টংকা নামে এক প্রকার মুদ্রা খোদাই করেন। কেনাবেচার সময় এরা কড়ি ব্যবহার করে। একটি ক্ষুদ্র মুদ্রার (অর্থাৎ টংকার) সঙ্গে ১০,৫২০টির মত কড়ি বিনিময় হয়! সাধারণের পক্ষে এই মুদ্রা অত্যন্ত সুবিধজেনক। এই লোকগুলো (অর্থাৎ বাংলাদেশের লোকেরা) নিজেদের গুণেই যাবতীয় শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। এর মূলে আছে কৃষিকাজের প্রতি তাদের অনুরাগ, যার ফলে তারা অবিরাম পরিশ্রম করে, চাষ করে ও (শস্য) রোপণ করে জঙ্গলে ঘেরা জমি উদ্ধার করেছে। মহাশতের (অর্থাৎ আকাশের তথা বৎসরের) বিভিন্ন ঋতু এ রাজ্যের উপরে পৃথিবীর সম্পদ ছড়িয়ে দিয়েছে।'

১৪২৫-৩০-এর দিকে রচিত *য়িং-য়া-শ্যং-লান* গ্রন্থে বাংলাদেশের লোকজীবনের বর্ণনা : '(বাংলা) দেশের আয়তন খুব বড়। লোকবসতিও অত্যন্ত ঘন। ঐশ্বর্যও অগাধ।....রাজধানীটি দেয়াল দিয়ে ঘেরা। শহরতলি এর অনেকগুলো। রাজার প্রাসাদ এবং বড় ছোট সমস্ত অমাত্যের প্রাসাদ শহরের মধ্যেই। তারা সবাই মুসলমান। স্ত্রী-পুরুষ এদেশের সকলেরই গায়ের রং কালো, যদিও ফরসা লোকও এদের মধ্যে হরহামেশাই দেখা যায়। পুরুষেরা মাথার চুল কেটে ফেলে এবং সাদা রঙের সুতি পাগড়ি মাথায় দেয়। তারা একধরনের লম্বা জামা পরে, তাতে গোল গ্রীবা-বেষ্টনী লাগানো থাকে। সেটি আবার জরির পাড় দিয়ে আটকে রাখা হয়। রাজা ও উচ্চপদস্থ অমাত্যরা মুসলমানি কায়দায় পোশাক ও টুপি পরেন। এই পোশাক দেখতে খুব সুন্দর। এখানে সর্বসাধারণের ব্যবহারের ভাষা বাংলা। অবশ্য কেউ কেউ ফারসি ভাষাতেও কথা বলেন।... এদেশের বিয়ে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মুসলিম ধর্মের বিধান অনুসারে হয়। অপরাধীদের নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা এদেশে আছে। যেমন ভারী বাঁশের লাঠি দিয়ে প্রহার এবং নির্বাসন। এদেশের রাজকর্মচারীদের নিজেদের সিলমোহর আছে এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখারও ব্যবস্থা আছে। সৈন্যদের জন্য নিয়মিত বেতন

এবং খাদ্য বরাদ্দের ব্যবস্থা রয়েছে। সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে বলা হয় সিপাহসালার।'

১৪৩৬-এ রচিত ফেই-শিন-এর *শিং-ছা-শ্যং-লান* পুস্তকে বাংলাদেশের বর্ণনার অংশবিশেষ এরূপ : 'রাজা (চিন) সম্রাটের প্রতিনিধিদের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন এবং আমাদের সৈন্যদের অনেক জিনিস উপহার দিলেন। ভোজে মেষ (খাসির?) মাংস ও গো-মাংসের কাবাব দেওয়া হয়। মদ্যপান নিষিদ্ধ, কেননা এতে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত এবং শিষ্টাচার লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা। তার বদলে তারা (চিন সম্রাটের প্রতিনিধিরা) গোলাপজলের সরবত পান করে। ... এদেশের লোকদের চরিত্র অত্যন্ত মহৎ। এদেশের পুরুষরা সাদা সুতির পাগড়ি মাথায় দেয় এবং সাদা রঙের লম্বা সুতির জামা পরে। তারা পায়ে দেয় সোনালি জরির কাজ করা ভেড়ার চামড়ায় তৈরি চটি জুতা। যারা একটু সৌখিন, তারা নানারকম নকশা-আঁকা জুতা পরে। প্রতিটি লোকেরই নিজস্ব ব্যবসা আছে যাতে দশ হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা অবধি খাটে। কিন্তু যখন লোকসান হয়, তারা কখনও দুঃখ করে না। মেয়েরা খাটো জামা পরে। তার চারদিকে সুতি, রেশমি বা কিংখাবের ওড়না জড়ায়। তাদের রং সাধারণত ফর্সা। এ জন্য তারা অঙ্গরাগ ব্যবহার করে না। কানে তারা দামি পাথর বসানো সোনার দুল পরে। গলাতে দোলায় হার। চুল মাথার পেছনে খোঁপা করে বাঁধে। হাতের কবজি এবং পায়ের গোড়ালিতে তারা সোনার বালা ও মল পরে। হাত ও পায়ের আঙুলে পরে আংটি।'

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ ভ্রমণকারী-বণিক দুয়ার্তে বারবোসা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে জানান : 'এ শহরের (অর্থাৎ বেঙ্গলা নামে বাংলাদেশের এক শহরের) মুরিশ (তথা মুসলমান) বণিকেরা দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে বহু পৌত্তলিক বালককে তাদের পিতা-মাতা বা যারা তাদের (এ সব বালকদের) চুরি করে, তাদের কাছ থেকে কিনে আনে এবং নপুংসক বানায়। তাদের (অর্থাৎ ওইসব বালকের) মধ্যে কেউ কেউ এতে মারা যায়। যারা বেঁচে যায়, তাদের এরা খুব ভালভাবে মানুষ করে এবং পণ্য হিসেবে ইরানিদের কাছে লোক-পিছু কুড়ি বা ত্রিশ ডুকাট দামে বিক্রি করে।...এ শহরের সম্ভ্রান্ত মূররা (অর্থাৎ মুসলমানরা) পরে লম্বা মরিসকো জামা। এগুলো সাদা রঙের এবং হাল্কা বুনটের কিন্তু পায়ের ওপর দিক পর্যন্ত প্রসারিত। ভেতরে এরা পরে এক ধরনের বস্ত্র যা কোমরের নিচে জড়ানো থাকে। এদের জামার ওপর থাকে কোমর ঘিরে জড়ানো একটি রেশমি বন্ধনি এবং রূপা-বসানো ছোরা। তারা আঙুলে রত্নখচিত আংটি পরে এবং মাথায় দেয় মিহি সুতি কাপড়ের তৈরি টুপি। এরা বিলাসী। খুব বেশি পরিমাণে পান-ভোজন করে। অন্যান্য খারাপ অভ্যাসও আছে। এদের বাড়িতে আছে বড় বড় পুকুর। তাতে বার বার গোসল করে। এদের অনেকগুলো করে চাকর থাকে। প্রত্যেকের আছে তিন চারটি করে স্ত্রী। আরো যতগুলো (উপপত্নী?) তারা রাখতে পারে রাখে। তাদের (স্ত্রীদের) এরা একেবারে বন্ধ করে রাখে। খুব দামী পোশাক পরায় এবং রেশম ও রত্নখচিত স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে রাখে। এরা রাতে পরস্পরের সঙ্গে দেখা এবং মদ্য পান করতে বের হয়। উৎসব ও বিয়ের ভোজ এরা রাতেই সারে। এদেশে নানা ধরনের

মদ তৈরি হয়। প্রধানত চিনি এবং তালগাছ থেকেই তা হয়। এছাড়া অন্য অনেক জিনিস থেকেও হয়। মহিলারা এ মদ খুব পছন্দ করে। এতেই তারা অভ্যস্ত। এরা (অর্থাৎ-বেঙ্গলার লোকেরা) ভাল সঙ্গীতামোদী। গান বাজনা দুইই পারে। সাধারণ স্তরের পুরুষ খাটো সাদা জামা পরে। সেগুলো উরুর আধখান অবধি প্রসারিত। এছাড়া এরা পাজামা পরে এবং মাথায় তিন চার পাক দিয়ে জড়ায় পাগড়ি। এরা সবাই চামড়ার জুতা পায়ে দেয়। কেউ পরে বড় জুতা। কেউ পরে খুব সুন্দর করে তৈরি রেশমি ও সোনালি সুতায় সেলাই চটি। (এখানকার) রাজা খুব বড় এবং ধনী। তার রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ঘনবসতিপূর্ণ। শাসকদের অনুগ্রহ পেতে এ অঞ্চলগুলোর পৌত্তলিকরা প্রতিদিনই মুর (অর্থাৎ মুসলমান) হয়ে যায়। বেঙ্গালা শহর থেকে দূরে দূরে দেশের অভ্যন্তরে ও সমুদ্রতটে আরো অনেক শহর আছে। সেখানেও এমনি মুর ও পৌত্তলিকদের বাস। তারাও এই রাজার প্রজা।'

স্বাধীন বাংলার স্বাধীন সুলতানরা দিল্লির সুলতান অথবা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা বা সুলতানদের সাথে প্রতিযোগিতা করে অতি জাঁকজমকপূর্ণ দরবার, প্রাসাদ ও সুরম্য অট্টালিকা তৈরি করতেন। পাণ্ডুয়া এবং গৌড়-এ এসবের চিহ্ন আজো কিছু কিছু আছে। আজম শাহ্'র সময় হয়ত সৌন্দর্যের জন্যই গৌড় নগরী 'জান্নাতাবাদ' হিসেবে পরিচিত হয়। হুমায়ুনও গৌড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এর নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'। হোসেন শাহ্'র সময়ের খবর পাওয়া যায় যে বাংলার ধনী ব্যক্তিরা তখন সোনার থালায় খাবার খেতেন। কোন উৎসবের দিনে যিনি যত বেশি সোনার থালা প্রদর্শন করতেন, তিনিই তত বড় ধনী ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হতেন। গৌড়ের এ ধরনের ধনী ব্যক্তির তেরশ সোনার থালা হোসেন শাহ্ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। বস্তুত সামন্ত অভিজাতগণ সমাজে ও সামাজিকতায় সোনার প্লেটের সংখ্যা দিয়েই মর্যাদা যাচাই করতেন। তাদের ভোগের জন্য সেই সময় চার রকম উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত করা হত। বিত্তবানরা হাজার টাকা ব্যয়ে নানা কারুকার্যখচিত খড়ের ঘরও প্রস্তুত করতেন। *বাবরনামা*'য় আছে : 'কোন রাজার পক্ষে পূর্ববর্তী রাজাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করা অগৌরবজনক বলে (বাংলায়) গণ্য হয়। রাজা হওয়ার পর তিনি নিজেই নিজের অর্থ সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশে আরো একটি নিয়ম আছে। প্রত্যেক রাজকীয় ব্যয় এবং কোষাগার, মন্দুরা প্রভৃতি ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন পরগণা নির্দিষ্ট আছে। এ সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য অন্য কোন জমি থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয় না।' অন্যদিকে গরিব-দুঃখী মানুষ বৃষ্টিতে মাথা বাঁচাবার ঠাঁইও পেত না। সোনারগাঁয়ের বিখ্যাত মসলিন সুলতান ও সামন্তদের নয়নরঞ্জন করত, বিদেশে রপ্তানি হত, ভেট যেত দিল্লিতে কিংবা চিনে, কিন্তু যারা তা প্রস্তুত করত তারা সে মসলিন ব্যবহারের কল্পনাও করতে পারত না।

মাসালিক-উল আবরার-এর বর্ণনায়, 'সকল দেশের সার্থবাহ খাঁটি সোনা নিয়ে ভারতে ক্রমাগত আসছে এবং বিনিময়ে সুগন্ধি, বস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে যাচ্ছে।' বাংলায়ও যে একই ব্যাপার ঘটত তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এডওয়ার্ড টেরি বাদশাহ জাহাঙ্গিরের সময় ভারত ভ্রমণ করে বলেছেন, 'নদী যেমন সাগরে ছোটে, তেমনি রূপা অন্য দেশ থেকে এ রাজ্যে ছুটে আসে।' ফ্রাসোঁয়া বার্নিয়ের বলেছেন (১৬৫০ খ্রীঃ), 'সোনা পৃথিবীর সব

দেশ ঘুরে হিন্দুস্থানে এসে গ্রাস হয়ে যায়। ভারতের খ্যাতি কেবল চাল, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্যের জন্য নয়, রেশম, তুলা, নীল প্রভৃতি পণ্যের পর্যাপ্ত সম্ভারের জন্যও বটে।' কথাগুলো সারা ভারত সম্বন্ধে বলা হলেও আবুল ফজল বাংলার ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির পরিচয় যেভাবে একটি মাত্র শব্দ 'জান্নাত-উল-বিলাদ' বা স্বর্গরাজ্য দ্বারা দিয়েছেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় এদেশে প্রাচুর্য ছিল অঢেল। বার্থিলো ১৫০৩-৮ খ্রীস্টাব্দে সফর করে লিখেছেন, 'বাংলা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ; আর তুলা, রেশম প্রভৃতি বস্ত্র, আদা, চিনি, খাদ্যশস্য, মাংস সবকিছু দিয়ে সবচেয়ে প্রাচুর্যময়।' বার্নিয়ের বলেন, 'বাংলার বিপুল পরিমাণ মসলিন বস্ত্র পারস্য তুরস্ক কোভি আরব পোলাণ্ড মিশর ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হত।' তিনি আরো লিখেছেন, 'যুগে যুগে লোকেরা মিশর দেশকে সোনার দেশ বলেছেন। ফল-ফুল-ফসলে ভরা এমন সোনার দেশ নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। কিন্তু বাংলাদেশে দু দুবার বেড়াতে এসে যে অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি, তাতে আমার মনে হয় যে, মিশর সম্বন্ধে এতদিন যা বলা হয়েছে, সেটা বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে ধান চাল এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে, আশেপাশের এবং দূরের অনেক দেশে ধান চালান দেওয়া হয় এখান থেকে।...বিদেশেও ধান চাল যায় বাংলাদেশ থেকে, প্রধানত সিংহলে ও মালদ্বীপে। ধান ছাড়াও বাংলাদেশে চিনি পাওয়া যায় প্রচুর, এবং গোলকুণ্ডা, কর্ণাট প্রদেশে এই চিনি চালান হয়। বাইরে আরব, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য দেশ পর্য্যন্ত বাংলার চিনি রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশে নানা রকমের মিষ্টি তৈরি হয়। মিষ্টান্নের বৈচিত্রের জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত।' বাংলাদেশের আহার্যের প্রাচুর্যের কথাও বার্নিয়েরের বর্ণনায় আছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিন-চার রকমের তরকারি, ভাত, মাখন ইত্যাদিই হল বাংলার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। খাদ্যের দামও খুব সস্তা। এক টাকায় পাওয়া যেত কুড়িটার বেশি মুরগি। হাঁসও সস্তা। নানা রকমের মাছ প্রচুর। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং খাদ্যদ্রব্যের নেই কোন অভাব। নানা রকমের সরু মোটা সাদা রঙিন তাঁতের কাপড়ের প্রাচুর্যের কথাও আছে তাঁর বর্ণনায়। সিল্কের কাপড়ও তৈরি হত। তাভার্নিয়ের-এর (১৬৬৩ খ্রীঃ) বর্ণনায়ও বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্যের এ রকম প্রাচুর্যের কথা বলা হয়েছে।

এদেশের কাব্যেও পাওয়া যায় সেকালের জনজীবনের ছবি। মুকুন্দরাম-এর *চণ্ডীকাব্য*-তে মুসলিম জীবন এরূপ :

ফজর সময় উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
সোলেমানি মালা ধরে, জপে পীর-পয়গম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ।
দশ বিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কিতাব কোরান।
বড়ই দানিশমন্দ, কাহাকে না করে সন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।

মুসলমানদের পোশাক-অভ্যাস–ধরন ইত্যাদির বর্ণনা :

ধরয়ে কমোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ

বুক আচ্ছাদিত রাখে দাড়ি।
না ছাড়ে আপন পথে, দশ রেখা টুপি সাথে
হাজার পরয়ে দড় করি।
যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা
সরিয়া ঢেলার মারে বাড়ি।

বৃত্তিভেদে নিম্নবিত্তের নিরক্ষর দেশজ মুসলিম সমাজের বর্ণনাও মুকুন্দরাম দিয়েছেন :

রোজা নমাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা।
বলদে বাহিয়া নাম বলয়ে মুকেরি
পিঠা বেচিয়া নাম ধরাইল পিঠারী।
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাইল কাবারী
নিরন্তর মিথ্যা করে নাহি রাখে দাড়ি।
সানা বান্দ্রিয়া নাম ধরে সানাকার
জীবন উপায় তার পাইয়া তাঁতিঘর।
পট পড়িয়া কেহ ফিরএ নগরে
তীরকর হয়্যা কেহ নির্মএ শরে।
কাগজ কুটিয়া নাম ধরাইল কাগতি
কলন্দর হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি।
বসন রাঙাইয়া কেহ ধরে রঙ্গরেজ
লোহিত বসন শিরে ধরে মাহাতেজ।
সুন্নত করিয়া নাম বোলাইল হাজাম...
গো-মাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই...
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা...

সাধারণভাবে সৈয়দ, শেখ, তুর্কি, মোগল, পাঠান প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমানরা অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হলেও এবং শিক্ষিতদের মধ্যে কাজী, মোল্লা, আলিম, সুফিসাধক, ফকির প্রভৃতি সমাজে মর্যাদাবান ও সম্মানিত হলেও বিদ্যা-ধন-মানের পরিবর্তনে সামাজিক মানেরও উন্নতি-অবনতি হত। তাদের অবস্থাচ্যুত বংশধরগণ অতীত স্মৃতির পুঁজি নিয়ে কয়েক পুরুষ ধরে বাস্তব জীবনে মোড়লিপনা করত। সৈয়দ, খন্দকার, মোল্লা, পুরুত, কায়স্থ গোমস্তা, মুৎসুদ্দি ও ছোট বেনেরাই ছিল সে-যুগের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। নিরক্ষর সমাজে এদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। গ্রাম-সমাজে কর্তাব্যক্তি। তবে দরবারের বাইরে রাজনীতি ছিল-না বলে এদের কোন রাজনৈতিক ভূমিকা তেমন ছিল না। দেশজ মুসলমানদের মধ্যে মুন্সি-মোল্লা-খনকার-মৌলভী-কাজী মুয়াজ্জিন-উকিল এবং ক্বচিৎ কখনো সেনা-সিপাই থাকলেও বড় চাকুরে বা দরবারের আমির-উজির-লস্কর হতে পারত বলে জানা যায় না। বড়পদে বহাল হত আরব ইরান ইরাক তুরান (তুরস্ক) ও উত্তর ভারত থেকে আগত মুসলমানরা। বৈষম্য ছিল দেশী-বিদেশীতে, ধনী-নির্ধনে, আশরাফে আতরাফে। সাধারণভাবে বিদেশী মুসলমানগণই ছিল আশরাফ। দেশীয়রা আতরাফ। আরবি-ফারসি-উর্দু শিক্ষিত মুসলমানরা শহরাঞ্চলে বা প্রশাসনকেন্দ্রে বাস করত। গ্রামেগঞ্জে থাকত অতিসামান্যই। মুখ্যত ধনই ছিল মানের মাপকাঠি। সৈয়দ সুলতান *নবীবংশ*-তে লেখেন :

ধন হোন্তে অকুলীন হয়ন্ত কুলীন
বিনি ধনে হয় যথ কুলীন মলিন।

সম্পদে গর্বিত ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে বলতে পারত, 'গত বছর জোলা ছিলাম, এবার শেখ হয়েছি, ফসল ভাল হলে আগামী বছর সৈয়দ হব'। কাব্যে আছে :

আগে ছিল উল্লা-তুল্লা পরে হৈল মামুদ
পিছনের নাম আগে নিয়া এখন হৈল মোহাম্মদ।

কৃতি ও সফল পুরুষ ছিল সেই-ই

যে দোলা ঘোড়া চড়ে,
আর
দশ বিশ জন যার আগে পাছে নড়ে।

মুসলমান সমাজেও কোন কোন বৃত্তি-বেসাত ঘৃণ্য ছিল। সামাজিক বৈবাহিক সম্পর্কও অবাধ ছিল না। *নবীবংশ* -এ আছে :

নারী বলে আমি হই ধীবরের জাতি
আম্মাতু অধিক হীন নাহি কোন জাতি

অথবা

জাতিকুল না জানিয়া বিহা দিলে তোরে
শুনি জ্ঞাতিগণ সবে গঞ্জিবেক মোরে

প্রথম দিকে গায়ে-গঞ্জে মুসলমান ছিল খুবই কম। দীক্ষিত বা দেশজ কিছু কিছু থাকলেও তারা সবাই ছিল নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির—জোলা, নিকেরি, কাহার, কৈবর্ত, মুলুঙ্গি, তেলি, ধুনকর, শালকর, বারুই, ছুতার, বাউল ইত্যাদি নানা ক্ষুদ্রপেশার। তারা আজলফ বা আতরাফ হিসেবে বিবেচিত হত। ছিল নিরক্ষরও। অর্থের অভাবে শিক্ষাগ্রহণ ছিল অসম্ভব। এসব সাধারণ মানুষের জীবন ছিল ভীষণ কষ্টকর। এরা থাকত অর্ধনগ্ন বা খালি গা খালি পা। হত নিঃস্ব। অনাহার অর্ধাহার ছিল নিত্যসঙ্গী। ভাতচুরি উপোস ভিক্ষাবৃত্তি ভাঙাঘর ছেঁড়াকাপড় তেনা-ন্যাকড়া দাসত্ব দুর্ভিক্ষ ছিল তাদের ললাটলিপি। 'ওগ্‌গার ভত্তা ও নালিতাগচ্ছা' যোগাড়ের সঙ্গতিকেই সুখ ও সৌভাগ্য, স্বস্তি ও স্বাচ্ছান্দ্য মনে করা হত। এদের জীবনে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ছিল অকল্পনীয় যদিও জিনিসপাতির দাম ছিল খুবই সস্তা। গণমানুষ এতই দারিদ্র্য-পীড়িত ছিল যে, তাদের ক্রয়ক্ষমতাই ছিল না। টংকা বা পয়সা ত দূরের কথা, সাধারণ্যে প্রচলিত কড়ি যোগাড়ই ছিল অতি শ্রমসাধ্য। ধানের দর পাছে বাড়ে, এ ভয়ে সকলেই আতঙ্কিত থাকত। চোরডাকাতও কম ছিল না। ছোট ছেলের গায়ে অলঙ্কার থাকলে চুরি হয়ে যেত। ছেলেটিকে বিক্রি করে অর্থ পেত। অলঙ্কারের মিলত মূল্য।

মুকুন্দরাম ও বিজয়গুপ্ত মুসলমান মোল্লাদের সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন। তারা মাত্র দশগণ্ডা কড়ি পেত মুরগি জবাই করে। খাসি জবাই করে পেত এর মাথা আর ছয় কুড়ি কড়ি। চার আনা পেত বিয়ে পড়ানো বাবত। ধর্মকর্মের ব্যক্তি হিসেবে সমাজে সম্মান থাকলেও ইজার ও টুপি ছাড়া তাদের অনেকেরই পরার কাপড়ও থাকত না। অর্থাৎ কেনার সামর্থ ছিল না। হাসানহাটি নামে এক জায়গার জনৈক কাজীর মোল্লা কেবল ইজার পরে চলত। বাড়ি বাড়ি ঘুরে জীবিকার্জন করত। নিম্নস্তরের গরিব মুসলমানরা

কেবল ধুতি লুঙ্গি নিমা ও টুপি পরত। হাসানহাটির জনৈক তাঁতী সাপের কামড়ে মারা গেলে দেখা যায় যে, সে মাত্র চার কড়ি (প্রায় আধ আনা) তার বিধবা স্ত্রীর জন্য রেখে যেতে পেরেছে। দরিদ্ররা পর্ণকুটিয়ে থাকতে বাধ্য হত। মান্‌রিক ও অন্যান্য পর্যটকের বিবরণ থেকে দরিদ্রের ভাঙা ঘরের সম্পদের মধ্যে ছেঁড়া কাঁথা, মাদুর, চাটাই, মাটির হাঁড়ি, সরা এবং জীর্ণ ছিন্নবস্ত্রের কথা রয়েছে। আবুল ফজল বর্ণিত পণ্যমূল্যের তালিকায় একখানা সুতি কাপড়ের দাম মাত্র আট আনা এবং একখানা কম্বল মাত্র চার আনা। অথচ দরিদ্র চাষী পয়সার অভাবে নেংটি পরে ও কাঁথা গায়ে দিয়ে দিন যাপন করে। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় *মধ্যযুগের বাঙলা* গ্রন্থে জানান, 'সেকালে টাকায় পাঁচ মনের কম চাল কোনকালেই বিক্রয় হয় নি, কখনো তা সাত-আট মন পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে, কিন্ত সেখানে সাধারণ শ্রমজীবীর দৈনিক মজুরী ছিল চার পয়সারও কম।'

দেশে মাঝে মাঝেই দুর্ভিক্ষ হত। গণমানুষের দৈন্যদশা তখন উঠতো চরমে। ১৫৫৭-৫৮-তে আগ্রা ও বায়ানার নিকটবর্তী অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হলে বদাউনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, 'মানুষ স্বজাতিকে খাচ্ছে এবং দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত কঙ্কালগুলোর বীভৎস্য রূপে দেশ ছেয়ে গেছে। সারা দেশ জনশূন্য হয়ে গেছে। কৃষিকাজ করার জন্য একজনও কৃষক নেই।' ১৫৭২-এ গুজরাটের মতো ধনধান্যে ভরা দেশে এমন দুর্ভিক্ষ হয় যে, ধনী দরিদ্র সবাই দেশ ত্যাগ করে। ১৫৯৫ থেকে '৯৮ পর্যন্ত যে দুর্ভিক্ষ হয় তখন মানুষ পথঘাট মৃতের স্তূপে ভরে গছে। সৎকার করার জন্যও কাউকে পাওয়া য়ায় নি। ইরফান হাবিব *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা* (১৫৫৬-১৭০৭) গ্রন্থে জানান যে, আবুল ফজল লিখেছেন, 'ব্যাপক সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা উলঙ্গ হয়েই থাকে এবং কাপনি (লুঙ্গি) ছাড়া কিছুই পরে না।' বাংলায় লবণ ছিল খুবই দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। এখানে এবং আসামে মানুষ ব্যব্রহার করত কলাগাছের খোসা পুড়িয়ে একধরণের উৎকট বস্তু যার মধ্যে কিছু পরিমাণ লবণ থকত। বাংলায় লবণ নেবার কথা জাহাঙ্গীরের আমলেও *বাহারিস্তান গায়েবি* গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এ সময় একজন ওলন্দাজ পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষ এমন প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে যে তাদের জীবনের নিখুঁত বিবরণ দিলে বলতে হয়, এ জীবন শুধু তীব্র অভাব ও নিদারুণ দুঃখের পটভূমি। ১৬৩০-৩২-এ দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় যে আবদুল হামিদ লাহোরি বলেন, 'মানুষ পরস্পরকে খেতে লাগল এবং পিতার নিকট পুত্রের দেহটাই স্নেহের চেয়ে বেশি কাম্য হয়ে উঠল।' এক ডাচ বণিক লিখেছেন, 'যারা পথে আধমরা অবস্থায় পরে থাকত তাদের অন্যরা কেটে খেত। এজন্য পথে-প্রান্তরে মানুষ বের হত না, খাদ্য হিসেবে অন্যের খাবার হয়ে যাবার ভয় ছিল প্রবল।' বাংলা-যে এমন অবস্থার বাইরে থাকত না অসময়ে-দুঃসময়ে তা বুকানন-এর বর্ণনায় বোঝা যায়। তিনি রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে লক্ষ্য করেছেন আধা-উলঙ্গ দরিদ্রের সংসার, যেখানে গৃহস্থালি আসবাব হল কয়েকটি মাটির কলস, দা-বাটি-ঘটি ও কাঁথা। দুর্ভিক্ষে এদেশের অবস্থা-যে কী হতে পারত ইংরেজ আমলের শুরুতে ছিয়াত্তরের মহামন্বন্তর হল তার চরম উদাহরণ!

২.
সেকালের সমাজে সচ্ছল মানুষের জীবন ছিল নানা অনুষ্ঠান-বৈচিত্রে ভরপুর। ১৬৬৮-তে বাংলায় আগত জন মার্শাল জানান যে, নবজাতকের নাম রাখা হত দ্বিতীয় দিনে। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারে সাধারণত আরবি নামই রাখা হত। জন্মদিনও পালন করা হত। চার বছর চার মাস চার দিনে শিশুকে শিক্ষার জন্য শিক্ষক বা মৌলবির কাছে সবক দেওয়া হত। এ অনুষ্ঠানকে বলা হত 'বিসমিল্লাখানি' বা হাতেখড়ি। কোরানের একটি নির্ধারিত আয়াত শিক্ষক পড়াতেন আর শিশু তাই পুনরাবৃত্তি করত। এতে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হত—পায়েস সিন্নি গুড় বাতাসা পান ইত্যাদি। পণ্ডিতের ঘরে টোল এবং আলিমের ঘরে বা মসজিদে মক্তব থাকত। পাড়ার ছেলেমেয়েরা তাদের কাছে পড়ত। কোন কোন ধনীগৃহেও মক্তব থাকত। মক্তবে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হত—ধর্ম নীতিশাস্ত্র গদ্য পদ্য। সাত বছর বয়সে শিশুর হত খত্‌না। দ্বিতীয় পর্যায়ের পড়াশোনা হত মাদ্রাসায়। হাদিস ফেকাহ্‌ তর্কশাস্ত্র অঙ্ক চিকিৎসা রসায়ন পড়ানো হত। মেয়েরাও পড়াশোনা করত। পর্দাপ্রথার জন্য মাদ্রাসায় অবশ্য যেতে পারত না। ভূস্বামীদের ঘরে চিত্রাঙ্কন ও সূচীশিল্পের চর্চা হত। ধর্মশিক্ষাই ছিল সকলের মুখ্য বিষয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্বচিৎ-কখনো-কোথাও সরকারি বা সামন্ত সাহায্যে শিক্ষায়তন পরিচালিত হত। ব্যক্তিগত বিদ্যায়তনই ছিল বেশি। পড়ুয়ার সংখ্যাও ছিল নগণ্য। শিক্ষকরা দক্ষিণা বা নজরানা পেত। তবে সবসময় কড়িতে বা অর্থে নয়, ফসলে। ফসল তোলার মৌসুমে ধান বা ফলমূল তরিতরকারির আকারে। বার্ষিক বরাদ্দে তা দেওয়া হত। গুরু ও ওস্তাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থিগণ শিক্ষকের নিষ্ঠুর শারীরিক পীড়নের শিকার হত—বেত মারা, বেঁধে রাখা, হাত-পা জড়ো করে নাড়ুগোপাল করা, ধান বা কাঁটা দিয়ে কপাল চিড়ে রক্ত ঝড়ান, সূর্যের দিকে মুখ করে বসান, বিছুটি পিঁপড়ে গায়ে লাগান ইত্যাদি। কলম ছিল কঞ্চি কিংবা হাঁস শকুন বা ময়ূরের পালকের। বালকরা তালপাতায় লিখত। তুলট কাগজ প্রচলিত ছিল। নানা পদ্ধতিতে কালি তৈরি হত। ছাত্র ও শিক্ষকরা বসত চাটাই মাদুর পাটি কুশান বা ফরাসের ওপর। পাণ্ডুলিপি লেখা হত হাতে। বইপত্রও কপি করা হত হাতেই। লেখার জন্য ছিল পেশাদার লিপিকর।

দৈনন্দিন জীবনে শিশুরা শিক্ষা পেত পিতামাতা পির গুরুজনদের কদমবুসি করা, গুরুজনদের চোখে চোখ রেখে কথা না-বলা, তাঁদের সামনে থেকে উঠে আসতে পিছু হটে আসা, লাঠি হাতে বা জুতো পায়ে তাঁদের সামনে না-যাওয়া, তামাক-না খাওয়া, উচ্চাসন বা সুমুখ সারিতে না-বসা, বাম হাতে দেওয়া-নেওয়া না-করা, কিছু দিতে বা নিতে হলে জোড় হাতে নত শিরে দেওয়া-নেওয়া করা, উচ্চ বা রূঢ় কণ্ঠে কথা না-বলা, পথে তাঁদের আগে না-চলা, মজলিশে বা ঘরে একসঙ্গে খাওয়া শুরু ও শেষ করা, তাঁদের দেহের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা, বৈঠকে বা মজলিশে দুজনের মধ্য দিয়ে চলতে হলে দুই বাহু প্রসারিত করে দেহ বাঁকিয়ে (রুকুর মত)চলা, বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম ধরে না-ডাকা, বয়স্ক কনিষ্ঠদেরও নাম ধরে না-বলে অমুকের বাপ অমুকের মা বলে ডাকা,

বাসনে অল্প অল্প খাবার নিয়ে ছোট ছোট গ্রাসে খাওয়া, মুরুব্বিদের সালাম দিয়ে সম্ভাষণ করা ইত্যাদি।

সেকালের বিয়ে-শাদি কীভাবে হত সে-খবর বেশ পাওয়া যায়। মুসলমানদের বিয়েতে পণপ্রথা চালু ছিল। বিশেষ করে কন্যাপণ। বাল্যবিয়ে ছিল জনপ্রিয়। বেশি বয়সে বিয়ে করা খারাপ চোখে দেখা হত। বিয়েটা ব্যক্তিগত ব্যাপারের চেয়ে পরিবারগত বিষয় ছিল। মুরুব্বিরাই এর ব্যবস্থা করত। জামাতা নির্বাচনে তার শাস্ত্র জ্ঞান, ভদ্রতা, যোগ্যতা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ দেখার চেষ্টা হত, অশিক্ষিতদের মধ্যে হত হেয়ালি ধাঁধাঁ দিয়ে। ধনীরা সাধারণত বহুপত্নিক এবং গরিবরা এক পত্নিক থাকত। বিয়ের সময়ে ঝগড়া-বিবাদ মারামারি প্রতারণা ও বিয়েভাঙ্গাও ঘটত। বিয়ের প্রস্তাব পয়গাম পাঠান থেকে বিয়ের পরের কয়দিনও উভয় পক্ষের মধ্যে ভোজ উৎসব চলত নানাভাবে, যেমন ঘরবাড়ি দেখা, বরকনে দেখা, পাকা কথা দেওয়া, দিনতারিখ ঠিক করা, বিয়ে-ভোজ, বর-ভোজ, কনে-ভোজ ইত্যাদি। বিয়ের সময় দিন ক্ষণ তিথি লগ্ন মানা হত। বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি হত। এর নাম ছিল মারোয়া। কলাগাছ পোঁতা হত, আমের ডাল জলপূর্ণ মঙ্গলঘট কলসির মুখে বসান হত। উপরে থাকত চাঁদোয়া। এর অন্য নাম ছিল আলম বা ছত্র। মেঝেয় আঁকা হত আলপনা। মারোয়ার মধ্যেই বরকনের চারচোখের মিলন হত। দুপক্ষের সখী বন্ধু আত্মীয়রা তখন হর্ষধ্বনি ও শুভকামনার সঙ্গে ঠাট্টামস্করা রঙ্গরস করত। একে বলা হত জুলুয়া বা জোলুয়া। বরকনের মধ্যে পাশাদি খেলাও চলত, বিশেষ করে হিন্দু সমাজে। বরকনে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষরূপে ফুলের স্তবক দিয়ে ছোঁড়া-লোফা খেলা করত। এর নাম ছিল গেরুয়া খেলা। বরকনের জন্য বাড়িতে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা থাকত। এর নাম গস্ত্ ফিরানো। নিরক্ষর গরিব মুসলমান ধুতি পরেই বর সাজত, ধনী বা মধ্যবিত্তরা ইজার-পাগড়ি। তাঞ্জাম চৌদোলা শিবিকা পাল্কি ছিল বাহন। বিয়ে অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদ দেবার প্রথা ছিল। ডালায় ধান দুর্বা দীপ হলুদ ও বিয়ের আগের দিন বরকনের বাড়িতে দই-মাছ পাঠান, বরযাত্রার সময় বরের কোলে কোন শিশু বসান ছিল দেশীয় সংস্কার। কনেপক্ষ বধু দেখতে যাবার আগে বাধা দিত। বরের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে ছাড়ত। এ ছিল ঠাট্টারই অঙ্গ। সাধারণের বিয়েতে মেয়ে, নইলে বাঁদী শ্রেণীর ভাড়াকরা নারী কিংবা গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝিরা নাচ গান করত। ধনীগৃহে নাচিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে বেশ্যা আনা হত। বেশ্যারা সমাজে তখন ঘৃণ্য ছিল না। ধনীদের দাসীসম্ভোগ ও উপপত্নী রাখার প্রচলন ছিল। এ ছিল আভিজাত্যের মাপকাঠি। ঘরজামাই বরের বা শ্বশুরের ঘরে বউয়ের তেমন কোন মর্যাদা ছিল না। বিশেষ করে মেয়েদের বাপের বাড়ি ছিল, শ্বশুরবাড়ি ছিল কিন্তু নিজের বাড়ি বা সংসার থাকত না। বধূর ওপর পীড়ন-আশঙ্কায় বিবাহিতা মেয়ের আত্মীয়-স্বজন সবসময় বর পরিবারের সাথে তোয়াজের ভাষায় কথা বলত। কন্যারূপে পিতার, জায়ারূপে স্বামীর এবং মাতা রূপে সন্তানের আশ্রয়ে নারীর জীবন কাটত।

সামাজিক উৎসব পালা-পার্বণে নাচ-গান বাদ্য প্রমোদের জন্য থাকত নিচ জাতীয় গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে নাটুকে বৃত্তিজীবী। বাদ্য-গান-বাজনা ছিল খুবই জনপ্রিয়।

বিয়ে, খত্না, কান ফোড়ন, আকিকা, অন্নপ্রাশন, নামরাখা, গায়ে হলুদ, হাতে মেহেদির মত নানা উৎসব অনুষ্ঠান গৃহে অনুষ্ঠিত হত। এতে বাদ্য-বাজি, নাচ-গান, আবির-ফাগু, সোহাগ-কেশর-অগুরু-চুয়া, আতর, রঙ-মাখা-ছোঁড়া, কাদা-ছোঁড়া, মেয়েলী নাচ গান গীত, পুতুল নাচ, যাদুকরের খেলা, প্রভৃতির ব্যবস্থা আর্থিক সাচ্ছল্যানুসারে থাকত। ছেলেমেয়ের বিয়েতে নবদম্পতি ও নতুন কুটুম্বকে নজর সেলামি, শিকলি ও বিভিন্ন উপহার দেওয়া ছিল রেওয়াজ। নবজাতকের খত্না কিংবা কান ফোড়নেও এসব দেওয়া হত। নাপিত, ধোপা, মোল্লা, মুয়াজ্জিন, ওস্তাদ, ভৃত্য, গোলাম, বাঁদীরাও এধরনের অনুষ্ঠানাদিতে বখশিস পেত। মৌলবি, মুন্সি, ওস্তাদ, মোল্লা, খোন্দকার, সৈয়দরা গাঁয়ের উৎসবে বিয়ে পার্বণে সৎকারে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করত। মুরগি জবেহ, ফাতেহাপাঠ, জানাজা, ইমামতি, মসজিদের মোয়াজ্জিন হওয়ার কাজ ছিল তাদেরই হাতে।

সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি হত মাটির। বাঁশের। গরিবের দোচালা। মধ্যবিত্তের চৌচালা। উচ্চবিত্তের আটচালা। গরিবের ঘর কুটির। মধ্যবিত্তের বাড়ি-ভবন। ধনীর অট্টালিকা। রাজা-আমিরের হত প্রাসাদ-মহল। বাড়ি হত যথারীতি চকমিলান। সাধারণের গৃহে কোন শৌচাগার থাকত না। প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে মাঠে খেতে জঙ্গলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিত। গ্রামের মানুষের এক বা একাধিক 'মাহালত' বা সমাজ থাকত, কখনো দলাদলির জন্যে কখনো আশরাফ-আতরাফ ভেদে একজন প্রধান সমাজপতি। সরদার বা মাতব্বরের নেতৃত্বে প্রতি গোষ্ঠীনেতার সহযোগে তারা সামাজিক-পার্বণিক অনুষ্ঠানাদির কাজ এবং মৃতের সৎকারাদি, জেয়াফত, বিয়ে ও দ্বন্দ্ব-বিরোধের সালিস-ইনসাফ-মীমাংসা হত।

নানা ধরনের রান্না সমাজে প্রচলিত ছিল। রকমারি ব্যাঞ্জন, হরেক জাতের পিঠা চিড়া মুড়ি তৈরি হত। পিঠার অনুপান ছিল হাজারো। গুড়, চালের গুঁড়া, তেল, ঘি, দুধ। তাল কলা নারকেল খেজুররস ইত্যাদিও কোন কোনটিতে মেশানো হত। চালভাজা খই দই মোয়া নাড়ু বাতাসা মিছরি ইত্যাদিও ছিল। দুধের রূপান্তরে দই মাখন ঘোল ঘি সন্দেশ মিঠাই মণ্ডা পায়েস রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন চালু ছিল। মাছ মাংস সুটকি ছাড়াও খিচুরি ছিল প্রিয় খাদ্য। বাদশা শাহজাহান, নবাব আলিবর্দি ছিলেন খিচুড়ির ভক্ত। এক রকমের নেশা চালু ছিল—চুলার কাছে জলভরা ঘড়ায় এক মুঠো ভাত রেখে কয়েকদিন পর ওই ভাতপচা পানি ছেকে নিয়ে পান করত। এর নাম আমানি বা ঘড়াকাঁজি। সামান্য নেশা আসত এতে। তাছাড়া ধেনো মদ, তালের খেজুরের মদ, গাঁজা, চরস, চণ্ডুস প্রচলিত ছিল। পান সুপারি ত ছিলই। তামাক সেবন গোড়াতে ছিল সামন্ত আভিজাত্যের দর্প ও দাপটের প্রতীক। মান্যজনের সামনে তা সেবন ছিল বেয়াদবি।

সাজগোজের ব্যাপার ছিল বড় বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিশেষ করে মেয়েদের। নানা ধরনের অলঙ্কার তারা পরত। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। মাথায় পরত সিঁথিপাঠ, টিকলি। গলায় হাঁসুলি, মালা, টাকার ছড়া, এক বা তিন অথবা সাত লহরি হার, তাবিজ। হাতে দিত কঙ্কন, বালা, তাড়, চুড়ি, খাড়ু, পেঁচি, অঙ্গদ, অনন্ত। আঙুলে আংটি। নাকে পড়ত কোর, চাঁদনোলক, বালি, ডালনোলক, নোলক, নাকমাছি, নাকছবি, কেশর। কানে দিত কানফুল, বোলতা, কুমড়োফুল, ঝুমকা, কুন্তল, নোলক, ঝিঙ্গাফুল, কুণ্ডল, কানপাশা,

বালি। পায়ে লাগাত গাজর, পাঁসুলি, নূপুর ঘুঙুর, মকর, খাড়ু, মলতোড়র, বাঁশপাতা কঙ্করাজ, মল, উনচর্য, উঝটি। কোমরে জড়াত চন্দ্রহার, ঝুমঝুমি, নীবিবন্ধ, কিঙ্কিনী। হাতের পাতায় আঙুল সংলগ্ন করে রাখত রতনচূড়। গ্রীবায় দিত গ্রীবাপত্র। বাহুতে লাগাত তাড়, কেয়ূর, জসম, বাজুবন্ধ। আর্থিক অবস্থাভেদে এগুলো তালপাতা, ঝিনুক, শিঙ থেকে তামা পিতল সীসা রূপা সোনা মুক্তা হীরা কাচ পাথর প্রভৃতি উপাদানে তৈরি হত। অভিজাত ও ধনী ঘরের মেয়েরা পরত কাঁচুলি। নানা ছাচের বেণি ও কবরী করত। কবরী ও বেণিতে নানা রঙের ফিতা ছাড়াও ফুল জড়াত। পুরুষেরাও পরত বাহুতে কবজ ও বাজু। বাহু গলায় ও কটিতে বাঁধত তাবিজ। কানে দিত কুণ্ডল। হাতে বালা ও গলায় একছড়ি হার, কোমরে সুতার 'তাগা' পরত। ধার্মিক মুসলমানরা খিলালের প্রয়োজনে লোহার বা পিতলের খিলাল শলাকা গলায় ঝুলিয়ে রাখত। প্রলেপ-প্রসাধন দ্রব্য ছিল সিঁদুর, চন্দন, মেহেদি, কুমকুম, কস্তুরি, কাফুর, কেশর, অগুরু, কাজল, অঞ্জন, সুর্মা, তেল, আতর এবং ঠোঁটে তাম্বুলরাগ। পুরুষরাও উৎসব-পার্বণে-পালায় দেহে এসব লাগাত। চুল-দাড়ি রাঙান ছিল মুসলিম ধার্মিক সমাজে প্রচলিত।

সামন্ত-শাহ্ আমির-ওমরাহদের এবং উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের পর্দাপ্রথা ছিল। তবে শাসন-প্রশাসনে জড়িত বা নিয়োজিত নারীর পর্দারীতি ছিল শিথিল। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের ঘরেও পর্দা ঠিক প্রথারূপে চালু ছিল না। দরিদ্র ঘরের নারীদের ঘরে-বাইরে খেতে-খামারে হাটে-বাজারে ঘাটে-মাঠে জীবিকার্জনের জন্য কিংবা স্বামীসন্তানের সাহায্যকারী হিসেবে যেতে হত। গরিব-গোর্বারা কাজের সময় কৌপীন-গামছা ও অন্য সময় খাটো সাদা ধুতি-তহবন-লুঙ্গি পরত। মাথায় টুপি পরত কাপড়ের, তালপাতার বা বেতের। পাগড়ি পরত। সাধারণ মানুষ জুতা পরত পালা-পার্বণে। পাগড়ি বাঁধার পদ্ধতিতে হিন্দু-মুসলমানে ভেদ ছিল। চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যত্র নারীরা শাড়ি পরত। আরাকানি প্রভাবে সেখানে ঘামছা ও উড়নি দুই খণ্ড কাপড় পরত। উচ্চবিত্তরা পরত ইজার কামিজ কাবাই চাপকান আসকান আলখাল্লা চোগা সিনাবন্ধ কোমরবন্ধ। তাছাড়াও পাগড়ি, শামলা কিংবা টুপি। গলাবন্ধ দোয়াল আংটিও তারা পরত। আর্থিক অবস্থানুযায়ী এসব পোশাক হত সুতি রেশম জরি বা সোনা-রূপা-মণি-মুক্তা খচিত। ধনী ঘরের বউ-ঝিরা কাঁচুলি ও অন্তর্বাস বা সায়া পরত। গরিব ও মধ্যবিত্তের পোশাক হত তাঁতে নির্মিত। মোটা। ছটক মটক গরাদ ধুতি ছাড়াও শাড়ির মত মোটা-পেড়ে নানা ধুতি ছিল। মেয়েদের ছিল ময়ূরপেখম, আগুনপাট, কালপট, আসমানতারা, হীরামন, নীলাম্বরী, যাত্রাসিদ্ধি, খুঁএগ্রা, মঞ্জাফুল, অগ্নিফুল, মেঘডুম্বুর, মেঘলাল, গঙ্গাজলি ইত্যাদি নামের শাড়ি। মসলিন পাটাম্বর তথা রেশমের কারুকার্যখচিত বহুমূল্য শাড়ি ছাড়াও উচ্চমূল্যের বেলনপাটের (সিল্কের) নেতের শাড়ি অনুষ্ঠানাদিতে পরা হত।

মির্থা নাথান, গোলাম হোসেন প্রমুখের লেখায় দেখা যায় যে, মুসলমানরা ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, রমজান, শবে বরাত ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠান এবং মহরম খুবই জাঁকজমকের সাথে পালন করত। খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে বেরা অনুষ্ঠান ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিশেষ করে শাসকগণের কাছে। কলাগাছের বেরা ও তার ওপর বাড়িঘর

মসজিদ তৈরি ও তা আলোকমালায় সজ্জিত করে নদীতে ছেড়ে দেওয়া হত। সাথে হাউই, আতসবাজি হত পোড়ানো। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এ অনুষ্ঠান হত। মুর্শিদকুলি খাঁ এ অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করতেন। মতিঝিল প্রসাদে শাহমত জঙ্গ ও সউলত জঙ্গ এবং মনসুরাবাদ প্রাসাদে সিরাজদ্দৌলা হোলি উৎসব পালন করতেন। মীরজাফরও হোলিতে অংশ নিতেন। মোবারকদ্দৌলাও সাড়ম্বরে ভেলা ভাসান পর্ব ও হোলি উৎসবের আয়োজন করতেন। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণবদের কীর্তন গান শোনা খুব পছন্দ করত। কেউ কেউ হিন্দুদের ঘৃণাও করত। তাদের সাথে খেত না পর্যন্ত। কোন মুসলমান হরিনাম অথবা হিন্দু-আচার-আচরণ পালন করলে শাস্তি পেত। আবার অনেকে রামায়ণের কাহিনী শ্রদ্ধাভরে শুনে অশ্রু বিসর্জন করত। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে মিরজাফর দেবী কীর্তিশ্বরীর পাদোদক পান করতে দ্বিধা করেন নি।

প্রতিবেশীর ঘর

মুসলিম সমাজের পাশাপাশি অবস্থিত হিন্দু সমাজে ইসলাম ধর্মের আগমনে বেশ কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল বোঝা যায়। হিন্দুদের মধ্যে কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে অনেক সময় তাতে তারা ঔদাসীন্য দেখাত। মুসলিম রাজশক্তি অপ্রসন্ন হওয়ার ভয়ে হিন্দুদের কেউ কেউ কীর্তনাদির অনুষ্ঠান করতে আপত্তি জানাত। কখনো-বা কীর্তনকারীদের শাসকদের হাতে তুলে দেবার কথাও ভাবত। বহু হিন্দু, বিশেষ করে বামুনরা মুসলমানদের নিচ জাতি বলে মনে করত। বৃন্দাবন দাস-এর *চৈতন্য ভগবত* (রচিত সম্ভবত ১৫৩৮-এ) আছে যে, এ সময় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ততটা মধুর ছিল না। আবার ১৬৩২-তে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ-এর *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তখনকার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ একটা সম্প্রীতি বিরাজিত ছিল, বিশেষ করে গ্রাম-বাংলায় বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সহনশীল মনোভাব ছিল। দু সম্প্রদায়ের লোকদের ভেতর গ্রাম-সম্পর্কও স্থাপিত ছিল। ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-মুসলমানদের পরিচিত প্রতিবেশীসুলভ প্রেম-প্রীতি স্নেহ-সখ্য ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গভীরভাবেই গড়ে উঠত বলে মনে হয়। *চৈতন্যচরিতামৃতে* আছে :

> গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা
> দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা
> নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা
> সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।

সাধারণ নিম্নস্তরের মুসলমানরা হিন্দু তথা সংস্কৃত নামও রাখত এবং হিন্দুর নানা আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবাদিতে যোগ দিত। মুসলমানরা সংস্কৃত ভাষা শিখত কখনো কখনো। এ ছাড়া হিন্দু কিংবদন্তির সাথে পরিচিত তো ছিলই। সাহিত্যকর্মেও হিন্দু উপাখ্যান উপস্থাপন করত। সাবিরিদ খান-এর মত ব্যক্তিরা বিদ্যা ও সুন্দরকে নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। মুসলমান দরজির কাছে হিন্দু ব্রাহ্মণরাও কাপড় সেলাই করত। *চৈতন্য ভাগবতে* আছে :

শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন।

একথা যবন তথা মুসলমানদের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাবেরই প্রকাশ। সহনশীল হিন্দুরা ফারসি ভাষা শিখত। রুমির মসনবি বহু হিন্দু ভদ্রলোকের কণ্ঠস্থ ছিল। আরবি-ফারসি শব্দও তারা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করত। জয়ানন্দ *চৈতন্য মঙ্গল*- এ লিখেছেন :

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে ॥
মোজা-পাএ নড়ি-হাতে কামান ধরিবে ॥
মসনবি আবৃত্তি করিবে দ্বীজবর।
ডাকা-চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর।

কোন কোন বামুন দাড়ি রাখত। ফারসি পড়ত। মোজা পরত। মাছ মাংস খেত। মদ খেত। চুড়ি-ডাকাতি করত। পরদারগামী হত। কুৎসিত গালিগালাজও করত। নবদ্বীপের জগাই-মাধাইরতো নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণে মোটেই অনীহা ছিল না। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলমানদের মতই পোশাক পরত। হিন্দু মহিলারা মুসলমান রমণীর মত ঘাগড়া, ওড়না ও কাঁচুলি বা বেণি করত। হিন্দু কবি, রাজা ও জমিদারগণও মুসলমানি ধরনে চলত। মুসলমানদের তারা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। বিজয়গুপ্তের নায়ক চাঁদ সদাগর লক্ষ্মীন্দরের বাসরে কোরান শরীফ পাঠেরও ব্যবস্থা রেখেছিল। *শেখ শুভোদয়া*'য় জলালের এবং পাঁচালীতে সত্য-মানিক-পিরদের যেমন মাহাত্ম্য কীর্তন আছে, জাফর খানেরও তেমন গঙ্গাস্তোত্র আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত রামচন্দ্র খান হিন্দু হিসেবে নন, বার্ষিক রাজস্বের জন্যই বিদ্রোহী হয়েছিলেন। আবার রূপ-সনাতনের বড় ভাই চন্দ্রদ্বীপের প্রশাসক ছিলেন পর-পীড়ক এবং অর্থ আত্মসাৎ করে বিদ্রোহীর মত আচরণ করেছিলেন বলে *চৈতন্য চরিতে* হোসেন শাহের জবানীতে আছে, 'তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার/জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস।' গুণরাজ খান, মালাধর বসু, বিদ্যাপতি, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবিচন্দ্র মিশ্র, রূপরাম, মথুরেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কৃত্তিবাস, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র, যশোরাজ খান, মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম, গদাধর দাস, কৃষ্ণরাম দাস, মহাদেব আচার্য সিংহ প্রমুখ কবিগণ প্রতিপোষণ পেয়ে বা না-পেয়েও রুকনউদ্দিন বারবক শাহ, শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ, জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ, আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ, পরগল খান, ছুটি খান, লস্কর, শাহজাহান, সুজা, মুসা খান, আওরঙবেজ প্রমুখ শাসক প্রশাসকের বহু স্তুতি গেয়েছেন। লস্কর রামচন্দ্র খান, হিরণ্য মজুমদারের মত জমিদার, বিজয়গুপ্ত-যশোরাজ খান-শ্রীকর নন্দীর মত কবিগণ ছিলেন সরাসরি মুসলিম শাসকদের অধীনে কর্মরত। এছাড়াও বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সরকারি দপ্তরে নিয়োজিত ছিলেন। হিন্দু পাইক অধ্যুষিত ছিল মুসলমান সেনাবিভাগ। আর এদের সবার মাধ্যমেই দু সম্প্রদায়ের ভেতর একটা সমঝোতা ও নিবিড় সম্পর্ক কালক্রমে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে, গায়ের নিরক্ষর মানুষ

এবং নিঃস্ব-নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের লোকেরা স্বাতন্ত্র্য ও সচেতনতা রক্ষা করা বা এর অনুশীলন করার গরজ তেমন কখনোই অনুভব করে নি। ব্যবহারিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রের ঘরোয়া জীবনে নাপিত-ধোপা-বারুই-বৈদ্য-গোচিকিৎসক-বাদ্যকর-চাষী-মাঝি-তাঁতী-মুচি ইত্যাদি নানা পেশার লোকদের সঙ্গে সে-যুগে পারিবারিক সম্পর্ক প্রয়োজনের তাগিদেই রাখতে হত। তাই মন ও মত বাঁচিয়ে গায়ে গঞ্জে হাটে মাঠে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমান প্রাত্যহিক জীবনে সহযোগিতা ও সদ্ভাব রেখে সহাবস্থান করত।

তবে কখনো কখনো-যে দু সম্প্রদায়ের ভেতর তিক্ত সম্পর্কেরও সৃষ্টি না-হত তা নয়। *মঙ্গলকাব্য*গুলোতে এর চিহ্ন বর্তমান। নবদ্বীপে বৈষ্ণবরা একবার গোলযোগ করেছিল বলে খবর আছে। জয়ানন্দের কাব্যে ব্রাহ্মণ-মুসলমান সংঘর্ষের কথা আছে। কোন কোন ব্রাহ্মণ খুব সন্তুষ্ট মনে মুসলমানদের আধিপত্য ও শাসন মেনে নিতে পারে নি বহুদিন পর্যন্ত। রূপ এবং সনাতন একদা চৈতন্যের কাছে বলেছিলেন যে, তাদের মানসিক সততা মুসলমানদের অধীনে চাকরি করতে করতে নষ্ট হয়ে গেছে। তবে একথাও সত্য যে, রাজনৈতিক অঙ্গনের টানাপোড়েনের ওপরই সম্পর্ক অনেকটা নির্ভর করত। বিপ্রদাস পিপিলাই বলেন :

(তুর্কিদের) কেহ বা জুলুম করে কেহ গুণল শিরে ধরে
রুকু করি করএ নছাব।

বিজয়গুপ্ত কাজীর শ্যালক মুখী হালদার ও পেয়াদা দাপটে প্রবল ও পীড়নে পটু বলে দেখিয়েছেন :

তার ভয়ে হিন্দু সব পালায় তরাসে
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাত।
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে স্কন্ধে
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে।

মোল্লাকে হিন্দুরা অপমান করলে কাজী বলে :

হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান।
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যথেক ছেমরা।
এডা রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা।

তবে হিন্দুরাও-যে মুসলমানদের ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে থাকত তাও মনে হয় না। বৃন্দাবন দাস বলেন :

গদাধর বলে আরে কাজী বেটা কোথা
রাধে কৃষ্ণ বোলে নহে ছিঁণ্ডো এই মাথা।

জয়নন্দও লিখেছেন :

নবদ্বীপ সীমএ যবন যদি দেখ
আপন ইচ্ছাএ মার প্রাণে পাছে রাখ।

লক্ষণীয় যে, সুলতান ফৌজদার কাজী প্রভৃতি শাসক-প্রশাসকের হিন্দু পীড়নের কিছু কিছু উদাহরণ থাকলেও, মুসলিম প্রতিবেশীর হাতে পীড়ন প্রাপ্তির কোন কথা কখনো নেই। বিদ্যাপতি বস্তুত *কীর্তিলতা*-য় বলেন :

হিন্দু তুরুকে মিলন বাস/একক ধম্মে অওকো উপহাস/
কতহুঁ মিলমিশ/ কতহুঁ ছেদ।

আসলে ঠিক এ ধরনেরই বাস্তব অবস্থা ছিল বলে মনে হয়। তাই দ্বিজ বংশীদাস লিখতে পারেন :

একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু মুসলমানে
যার তার কর্ম সেই করে ধর্ম জ্ঞানে।
সকলের কুলাচার যথা দিল গোঁসাই
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য নাই।

বিজয়গুপ্ত তো তাঁর সময়ের সুলতানের তারিফে মুখর :

সুলতান হোসেন শাহ নৃপতিতিলক
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত।

ধার্মিকরা ইসলামের দীক্ষা দেয় বলে বিপ্রদাস পিপিলাই পূর্বেই জানিয়েছেন :

জতেক সৈয়দ মোল্লা জপএ ও বিসমিল্লা
সদা মুখে কালিমা কেতাব
হিন্দুত কালিমা দিলা মুসলমানি শিখাইল
যথা বৈসে জত মুসলমান।

কিন্তু এজন্য কোন মারামারি কাটাকাটি হয়েছে বলে জানা যায় না। তখন গাঁয়ে গঞ্জে মুসলমান কম ছিল। হিন্দু জমিদার-তালুকদাররাই সরাসরি প্রজাশাসনে লিপ্ত ছিল। প্রধান কাজ রাজস্ব আদায় প্রায়শ তারাই করত। ফলে সার্বভৌম ক্ষমতা তুর্কি-মোগল মুসলমানদের হাতে থাকলেও তাদের ক্ষমতা ছিল পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ পর্যায়ে বৃহত্তর হিন্দু জনগণের শাসক ছিল হিন্দুই। ফলে সর্বোচ্চ শাসক মুসলমানদের সাথে শাসিত হিন্দুর সংঘর্ষ ঘটা ছিল প্রায় অসম্ভবই।

এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষণীয় যে, নানা লেখায় মুসলমান কর্তৃক ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ কর্তৃক মুসলমান লাঞ্ছনার কথা পাওয়া যায়। সৈয়দ সুলতান, জয়েনউদ্দিন, শা' বিরিদ খান, গরীবুল্লা, সৈয়দ হামজা'র মত কবি রসুল, হামজা, আলী, হানিফা প্রমুখ ইসলামের উন্মেষ যুগের বীরপুরুষদের দিগ্বিজয় বর্ণনাসূত্রে পরাজিত ব্রাহ্মণ, রাজা ও রাজকন্যাদেরই সপ্রজা ইসলাম বরণে আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যথায় হত্যারও হুমকি দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রেও দেখা যায় কাফের নয় কুফরি বা পৌত্তলিকতাই তাদের ঘৃণার বিষয়। আবার ঘৃণাটা বাস্তব সংঘর্ষের চেয়ে কথায় বেশি ছিল বলেই প্রজাগণও নির্ভয়ে শাসকের পীড়নের কথা লিখেছেন। শাসকের ধর্মের চেয়ে শাসিতের (তথা হিন্দু বা অন্য ধর্মের) শ্রেষ্ঠতা প্রমাণেরও প্রয়াস পেয়েছেন। শাসকগোষ্ঠীর চেয়ে শাসিতের দেবতার আভিত্ব ও সাহায্য স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন। *অন্নদামঙ্গল* অবধি অনেক কাব্যেই এমন

চিত্র মেলে। নির্যাতনকারী শাসকের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। এ হিসেবে শাসকশাসিতে সুসম্পর্কই ছিল বলা যায়। উপরন্তু, ব্রাহ্মণ সবাই অথবা অন্য বর্ণের লোকেরা তত ইসলাম বিদ্বেষীও ছিল বলে মনে হয় না। তারাও অনেক ব্রাহ্মণ দ্বারা নিষ্পেষিত হত। ব্রাহ্মণদের কেউ কেউ স্বীয় স্বার্থে হিন্দু সমাজের আচারাদি রক্ষায় বিশেষ উৎসাহী ছিল। সমাজে বিভিন্ন মত ও পথ পূর্ব থেকেই অবস্থিত ছিল বলে গণমানুষের মন ছিল অনেকটাই উদার ও সহনশীল। ইসলামকেও নানা আদর্শের মধ্যে একটি বলে তারা গণ্য করত। প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মণদের মত তাদের তেমন কোন লাভও ছিল না। এজন্যই মুসলমান কর্তৃক ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষকে হালকাভাবে বিধর্মী হিন্দু পীড়ন বলা সঠিক মনে হয় না।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ *বাংলা সাহিত্যের কথা*য় বলেছেন, 'মুসলমান রাজত্বের পূর্বে হিন্দু-জাতীয় কোন নামই ছিল না। ছিল ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণসূচক-কর্মসূচক জাতি কিংবা স্বর্ণকার, কর্মকার, তন্তুবায় ইত্যাদি ব্যবসায়সূচক জাতি। ছিল শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর বা গাণপত্য সম্প্রদায়।' সমাজের এরূপ প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় মতাদর্শগত কোন্দল হিন্দু-মুসলমান দুই বৃহত্তর সম্প্রদায়ের ভেতর তেমন বিরাট কোন বিক্ষোভ কখনই সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয় না। ব্যক্তিগতভাবে কেউ ক্বচিত কখনো বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী বিদ্বেষী হয়। বরং ইসলাম ধর্মানুসারীদের সংস্পর্শে আসার ফলে হিন্দু মতাবলম্বীদের ভেতর নানা মতবাদের আবির্ভাব ঘটে। বিশেষ করে দুটি ধারার লক্ষণ দেখা যায় : একটি রক্ষণশীল ও অন্যটি সহনশীল। নৃলো পঞ্চানন-এর মত ব্যক্তিরা ছিলেন রক্ষণশীলতার ধারক। শূলপানি, বৃহস্পতি এবং পণ্ডিত রঘুনন্দনও ছিলেন এ দলে। এঁরা হিন্দু সমাজকে পুরাতন ধারায় রাখতে চাইতেন। স্মৃতিশাস্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী ভাবধারার প্রচার রোধের চেষ্টাও তারা করেছেন। এদের কাছে হিন্দুধর্ম থেকে সামান্য হেরফের করলেই পতিত হতে হত। এভাবে খানজাহানের দেওয়ান পির আলির সাথে মাখামাখির ফলে পিরালি ব্রাহ্মণ, শেরখানের সাথে মেশার জন্য শেরখানি এবং পূর্ববঙ্গের কুশারী পরিবারের শ্রীমন্ত খানের মুসলমানদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রীমন্তখানিদের আবির্ভাব ঘটে। কায়স্থদের ভেতরও কুলীনত্ব রক্ষার জন্য পরমানন্দ বসুর মত লোকেরা চেষ্টা করেছেন।

সহনশীলগণ অবশ্য মনে করেন যে, এধরনের অতিরক্ষণশীলতা হিন্দুধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। তারা মুসলমান সংস্পর্শে এসেই জাতকুল নষ্ট হত বলে ভাবতেন না। দত্ত খান, উদয়নাচার্য ভাদুরী ও দেবীবর ঘটক ছিলেন এ ধরনের সহনশীল মনোভাবাপন্ন। দত্ত খান 'জাতিমালা কাচারি' নামে এক সামাজিক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। সাতান্ন সমীকরণের মাধ্যমে তিনি ব্রাহ্মণদের কুলীনত্ব রক্ষারও চেষ্টা করেন। তাছাড়া বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন পতি বা দলে ভাগ করেন। ১৪৮০-৮১-তে দেবীবর 'মেলবন্ধন' প্রথার প্রবর্তন করেন এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ছত্রিশ জাতে বিভক্ত করেন। আর এভাবেই যেসব ব্রাহ্মণ পতিত হয়েছিল তাদের জাতে তোলার চেষ্টা চলে। যবন-দোষ কাটিয়ে হিন্দু-ধর্মে ঠাঁই দেবার প্রয়াস হয়। ভৈরব ঘরকী দেহাতা, হরি-মজুমদারী এমনি ধরনের মেল। পিরালি, শেরখানি, শ্রীমন্তখানিও এসব মেলের অন্তর্ভুক্ত।

এভাবে দেখা যায়, কেউ কেউ যেমন ইসলাম ধর্মের জন্য আত্মসংস্কারে হয়েছে, ব্রতী, তেমন আবার কেউ কেউ এ ধর্ম থেকে গ্রহণও করেছে অনেককিছু। বৈষ্ণব ধর্মে, 'ধর্ম' মতবাদে এবং নাথ সম্প্রদায়ের ভেতর এ ধরনের গ্রহণ-প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট। বৈষ্ণববাদে বর্ণভেদ প্রথা অনুপস্থিত। সব মানুষই এ মতে সমান। কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করলে চণ্ডাল আর চণ্ডাল থাকে না। দুর্নীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণও কখনো সত্যিকার ব্রাহ্মণ হতে পারে না। কৃষ্ণভক্তিই এ মতবাদের মূল কথা। এরা একক ঈশ্বরেও বিশ্বাসী। অনুরূপভাবে কেবল ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করেই ধর্ম মতবাদ গড়ে ওঠে। এখানেও সকল মানুষ সমান এবং কোন ভেদজ্ঞান নেই। বরং ধর্মঠাকুর মতবাদ আরো স্পষ্ট করেই ইসলামের ভাবধারা আঁকড়ে ধরতে দ্বিধা করে নি। রামাই পণ্ডিত-এর *নিরঞ্জনের রুষ্মা বা উষ্মা*-তে আছে, 'ধর্ম হইল যবনরূপী মাথাতে কালো টুপি'। ধর্মের কোন আকৃতি নেই অর্থাৎ তিনি নিরাকার। তিনি চিরঞ্জীব। এ মতবাদে পশু জবাই করার ঢং ইসলামী ধরনের। শুক্রবার তাদের পুণ্য দিন। পশ্চিম দিকে তারা দেখায় শ্রদ্ধা। 'শূন্য পুরাণ' অংশে মুহম্মদ, আদম, হাওয়া এবং ফাতেমাকে ব্রহ্মা, শিব, চণ্ডী এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে সনাক্ত করা হয়েছে। ধর্মপূজা বিধানে 'কালেমা জল্লোল' নামক অংশে উড়িষ্যায় মুসলিম আক্রমণ ছাড়াও জনৈক মুসলমান খন্দকারকে ধর্মঠাকুরের সাথে একীভূত করা হয়েছে। ধর্মঠাকুর হিন্দু-মুসলমান কলহে মধ্যস্থতা করেছেন বলেও এতে জানান হয়েছে। তিনি যেন একজন মুসলমান কাজী বা বিচারকের মতই, মুসলমান পোশাকও পরেন, ইসলামী প্রথা মান্য করেন, মুসলমানের খাদ্যও খান। মুসলমান কবিরা ধর্মঠাকুরের নানা শব্দ ব্যবহার করে বুঝিয়েছেন তাদের ওপর এ মতবাদের প্রভাব। অনুরূপভাবে, নাথ ধর্মের প্রভাবও মুসলিম সমাজে যথেষ্ট ছিল। ফয়জুল্লা গোরক্ষনাথকে নিয়ে লিখেছিলেন *গোরক্ষবিজয়*। মীননাথ ও গোরক্ষনাথের গান এবং *গোপীচন্দ্র রাজার গান* তথা *ময়নামতীর গান* পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের যোগী ও মুসলমানদের ভেতর রয়েছে। কোন কোন গল্পে গোরক্ষনাথকে বলা হয় গবাদি পশুর রক্ষা দেবতা এবং মানিক পিরকে বলা হয় তার শিষ্য।

বস্তুত, আত্মসন্তুষ্ট এবং রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদ অথবা শরাশরিয়তপন্থী ইসলাম ধর্ম সমাজের বৃহত্তর পরিসরে যত প্রভাব ফেলেছে তাঁর চেয়ে কম ফেলে নি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক ধর্ম, সংস্কার ও বিশ্বাস; সম্ভবত বেশিই ফেলেছে।

ইসলাম ও লোকায়ত বিশ্বাস

অনেক সময় কেউ কেউ ঠাট্টা করে বাংলাদেশের মুসলমানদের বলেন 'শুইন্যা' মুসলমান। অর্থাৎ শোনে-মুসলমান। এদেশের অধিকাংশই সুন্নি মুসলমান বলে-যে কথাটা বলা হয়, তা নয়—যদিও অনেকে তাই মনে করেন। আসলে বলা হয়, এখানকার ইসলামধর্মানুসারীদের জীবন-যাপন-প্রণালী দেখে। ইসলামের মূল তত্ত্ব ও তথ্যাদি না জেনে শোনে অথবা আচারাদি তেমনভাবে পালন না-করেই এদেশের অনেক মানুষ মুসলমান। অনেকে আবার মুসলমান হয়েও পুরানো বহু আচার-আচরণ ও

সংস্কারে আবদ্ধ। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ইসলাম ধর্মের নানা বিধান পালনের সাথে সাথে তাদের ভেতর আবহমানকালের অনৈসলামিক এত অনুষ্ঠান আচার ও লোকায়ত চিন্তা-চেতনা সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে যে, সৈয়দ আহমদ একদা ইসলামের অবস্থা দেখে 'ইসলাম ও কুফর-এর খিচুড়ি' বলে যে-কথাটি সারা ভারত সম্বন্ধে বলেছেন, তা বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামের বেলায়ও প্রযোজ্য বলে মনে করা যায়।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে এর সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিদ্যা যতটুকু প্রসার সকল মুসলমানের মধ্যে হওয়া উচিত হল, তা হয় নি। কোরান শরীফ আরবিতে লেখা। এর তফসির-ভাষ্য, মসলা-মসায়েল, টীকা-টিপ্পনী এবং হাদিস ইত্যাদি আরবি অথবা ফারসি ভাষায় রচিত। এগুলো বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় কোন ভাষায় অনূদিত হয় নি। বাংলা ভাষায় তো নয়ই। বাংলা বা অন্য ভাষায় লিখলে অশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা, এমনকি গুনাহ্ হবে—এই ছিল এক সময়ের ধারণা। সাধারণ অক্ষর-জ্ঞান নিয়ে আরবি বা ফারসির ওইসব তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বিরাট বিরাট পুথি বা সাহিত্যের সামান্য কিছুও হজম করা তো দূরের কথা, ধারে কাছেও ঘেঁষার কল্পনা কেউ করতে পারত না। সশ্রদ্ধ ও বিস্ময়পূর্ণ ভাব প্রকাশ করত মাত্র। উক্ত শিক্ষায় শিক্ষিতের হারও ছিল আঙুলে গোনা। ইসলাম সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা তাই ছিল অপরিসীম। মাতৃভাষায় বা মৌখিকভাবে যেটুকু জ্ঞান লাভ সম্ভব, তাই ছিল তাদের একমাত্র সম্বল।

বহু ধর্মান্তরিতই কেবল কলেমা পড়েই মুসলমান হয়ে যেত, নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত অর্থাৎ ফরজ অন্য কাজগুলো করতে পারলে তো কথাই নেই। অনেক সময় গোষ্ঠীপতি, দলপতি, বা গ্রামপতি ধর্মান্তরিত হলেই বাকিরাও ধর্মান্তরিত হয়েছে বলে ধরা হত। পার্বত্যজাতি বা ট্রাইবাল গোষ্ঠীর ভেতর এভাবে অনেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে বলে জানা যায়। অহোম, ত্রিপুরা এবং কামরূপের খেন এবং কোচদের কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কখনো-বা অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকের যদু-মধু-রাম-শ্যাম-এর স্থলে রহিম-করিম-আবদুল নামকরণ করলেই, আর কখনো-বা গরুর মাংস খেলেই মুসলমান হয়ে গেছে বলে ধরা হত। এ ধরনের অসম্পূর্ণ ধর্মান্তরিতগণ স্বাভাবিকভাবেই পুরাতন আচার-আচরণ বাছ-বিচার ছাড়তে পারত না। মাত্র কদিন আগে যে ছিল মূর্তি-পূজক ও আনুষঙ্গিক নানা অনুষ্ঠানে জড়িত, তার পক্ষে সে-সব সংস্কার ছাড়াও মুশকিল। বরং যুগ যুগ সঞ্চিত ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাস সমেত এরা নামে-মুসলমান হত।

১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এমন কতকগুলো সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে যেগুলো না-হিন্দু, না-মুসলমান। বলা যায়, দুয়ের মিশ্রণজাত। 'কর্তাভজা সম্প্রদায়'-এর প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসী আউলাচাঁদ (মৃত্যু ১৭৬৯)-এর শিষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। তাঁর প্রচারিত 'সত্যধর্ম'তে সম্প্রদায়ভেদজ্ঞান ছিল না। ১৮৩৮-এও মনোহরনাথ-এর স্মৃতি-তর্পণ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই করেছে। ১৮৫০-এর দিকেও সাধারণ মুসলমানতো দূরের কথা, মুসলিম-প্রধান গ্রামের মূকদ্দমও জানত না যে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সঠিক জন্মস্থান কোথায়। জনৈক পাদ্রী এমন একজনকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান যে, পয়গম্বর (সঃ) বাংলাদেশের এক মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন!

বাংলার মুসলমানগণ আসলে ইসলামের জন্মভূমি থেকে বহুদূরে অবস্থান করত। এবং এমন এক পরিবেশে বাস করত যেখানকার আশেপাশের সবাই ছিল তার ধর্মান্তরিত-হওয়ার-আগেরই আত্মীয়-বান্ধব। তাদের ভাষাতেই সে কথা বলত। কবিতা-গল্প শুনত। নানা অনুষ্ঠান দেখত। পালা পার্বণে যেসব অনুষ্ঠান হত তার সবটুকুতেই ফেলে-আসা ধর্মের ঐতিহ্যই প্রকাশিত হত। নাচ-গান-বাদ্য-বাজনা ইসলাম ধর্মে উৎসাহিত না-হলেও এসব অনুষ্ঠানে সাধারণ মুসলমান যোগ দিত। উপরন্তু, প্রথমদিকে মুসলমানরা সংখ্যায় কম থাকায়, বহিরাগত মুসলমান বা ধর্মান্তরিতগণও সদ্ভাব রেখেই স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে চলত। এজন্য স্থানীয় বিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠান গ্রাহ্য করতে হত। যুগের পর যুগ পাশাপাশি বাস করার ফলেও স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের আচার-আচরণের প্রভাবে পড়ে যেতে হয় বাধ্য। কোন কোন মুসলিম বা হিন্দু শাসক বা সামন্তর কখনো উদারতা আর কখনো প্রয়োজনে প্রদত্ত সুবিধাদির কারণেও দুই সম্প্রদায় কাছাকাছি আসত।

মারি টি. টিটুস *ইণ্ডিয়ান ইসলাম* গ্রন্থে এদেশীয় ইসলামের ওপর স্থানীয় প্রভাবের চারটি কারণ বা সূত্র নির্ণয় করেছেন। এক, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিয়ে, বিশেষ করে স্থানীয় স্ত্রী-গ্রহণ মুসলমানদের মধ্যে একটা বহুল প্রচলিত প্রথা। দুই, মুসলমান পিরের হিন্দু মুরিদ ও হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্য গ্রহণ। তিন, মুসলিম মানসে বৈদিক চিন্তাধারা ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব। এবং, চার, ধর্মান্তর গ্রহণের অসম্পূর্ণতা। আহমদ শরীফ *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* গ্রন্থে বলেন, 'দেশজ মুসলমানের মধ্যে বৌদ্ধ-হিন্দু, পিতৃপুরুষের আচার-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, তত্ত্বচেতনা ও মননধারা থেকে গিয়েছিল। নিরক্ষর অজ্ঞ মানুষ সূফী-দরবেশের ব্যক্তিত্ব ও কেরামত প্রভাবে ইসলামে দীক্ষিত হল বটে, কিন্তু প্রতিবেশ ছিল প্রতিকূল। শাস্ত্রটি ছিল দূর দেশের এবং অবোধ্য ভাষার। তার আচারিক কিংবা তাত্ত্বিক আবহ ছিল না এদেশে। তাই ব্যবহারিক ও মানস-চর্যায় বৌদ্ধ-হিন্দুর আচার-সংস্কারই রইল প্রবল। দেশী মুসলমানের এ ধর্মাচরণকে বুঝবার সুবিধার জন্যে বিদ্বানেরা চিহ্নিত করেছেন 'লৌকিক ইসলাম' নামে।' লৌকিক এ ইসলামের নানা প্রকার আচার-আচরণ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞজনরাও খুব একটা যুক্তিহীন কিছু বলে মনে করেছেন বলে মনে হয় না। বরং তাঁরা দেখেছেন যে, ইসলামের ভেতরই এমন অনেক প্রথা-আচার গৃহীত হয়েছে, যা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হলেও ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবদেশে প্রচলিত ছিল, যেমন, হজ ইসলাম-পূর্ব থেকেই আরববাসিগণ পালন করত, হজরে আসওয়াদের মত পবিত্র পাথর চুম্বনও প্রচলিত ছিল। রোজা এবং খত্‌নার প্রথা ইহুদীদের উপবাস ও রেওয়াজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামে যেসব কঠিন ও কঠোর সত্যের মুখোমুখি হতে হয়, সে-সবের সমাধান কেবল যেন অদৃশ্য কোনকিছুতে সমস্ত ভক্তি ও বিশ্বাস অর্পণ করে কেউ কেউ সান্ত্বনা পায় না। প্রতীকী নানা উপকরণের মাধ্যমে একটা শান্তি ও স্বস্তি অনেকেই মানসিকভাবে লাভ করতে চায়। ইসলাম ধর্মের বিমূর্ত আলোচনা ও তত্ত্বকথার চেয়ে এবং নিরাকার আল্লাহর ওপর সমস্ত বিশ্বাস রেখেও, সাকার কোনকিছুর কাছে কিছুটা আত্মসমর্পণ যেন ঠিক ইসলাম-বিরোধী নয় বলেই এদেশের মুসলমানরা মনে করে। আর

তাই ইসলাম-বহির্ভূত কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেও এগুলো যেন তাদের কাছে ঠিক বেদাতি-শেরেকি মনে হয় নি বা শরিয়ত-বিরোধীও বলে ভাবে নি। এদেশের মানুষ ইসলামকে জীবনের অঙ্গীভূত একটি উপাদান হিসেবে আত্মস্থ ও অতীতের সকল ঐতিহ্যের সাথে একীভূত করার প্রয়াস পেয়েছে। ইসলামের শক্তিশালী মানবিক মর্মবাণী তাদের মনের গভীরে দাগ কেটে সে-ধর্ম গ্রহণে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছে, তেমন অতীত-চেতনা-প্রবাহও প্রাত্যহিত জীবনের ওপর প্রভাবের কমতি ঘটায় নি, অথবা সংস্কার-কুসংস্কারসহ সকল চিন্তাধারাই একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কেবল নবতর কিছু গ্রহণে তাদের উদ্দীপিত করে নি। প্রতিদিনের জীবন-সত্যকে তারা উপেক্ষা করতে পারে নি, পূর্বের আচার-আচরণও ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে নি। আর তাই নানা ধরনের প্রথা ও মতবাদ বাংলার ইসলামের মানব জীবন-ধারার সাথে মিলিত হয়ে গেছে।

পিরপ্রথা এ ধরনের একটি প্রচলিত ব্যবস্থা। পির শব্দের অর্থ প্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে এ দ্বারা বোঝায় আধ্যাত্মিক নেতা, যিনি মুরিদ বা শিষ্যকে স্বীয় অভীষ্ট পথে দীক্ষিত করেন। ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ ও রসুল ছাড়া মধ্যবর্তী আর কাকেও আল্লাহ্র সান্নিধ্যলাভের জন্য স্বীকার করা হয় না। সুফি-দরবেশগণও নিজেদের সেভাবে কখনোই উপস্থিত করেন নি। তাঁরা নিজেরাই ছিলেন আল্লাহ্-রসুলের ভক্ত শিষ্য মাত্র। কিন্তু কালে কালে তাঁরা নিজেরাই হয়ে দাঁড়ান সাধারণ-মানুষের বৈতরণী পারের কাণ্ডারী। তাঁদের মত যাঁরাই আধ্যাত্মিক পথে সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে মনে হয়েছে, তাঁরাই পির বলে খ্যাত হয়েছেন।

পিরপ্রথার উৎপত্তি-স্থল ইরান-আফগানিস্তান। কিন্তু বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে এ প্রথার উর্বর ভূমি প্রস্তুত হয়েই ছিল তান্ত্রিক গুরুবাদ ও বৈষ্ণব গোঁসাইবাদ-এর মাধ্যমে। গুরু ও চেলা অথবা গোঁসাই ও শিষ্য সম্পর্কই কালক্রমে এদেশে ইসলামীকরণ হয়ে পির ও মুরিদ অথবা ওয়ালি ও মুরিদ কিংবা ওস্তাদ ও সাকরেদ-এ রূপান্তরিত হয়। ব্রাহ্মণ বা গুরুদেব-এর স্থান গ্রহণ করেন পির। হিন্দু চৈত্য এবং বৌদ্ধ স্তূপ-এর রূপান্তর হয় পিরের মাজার এবং দরগা। খানকাহগুলোর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় অতীতের বৌদ্ধ বিহার-এর। ভক্তজনেরা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে ধর্মান্তরের পর অতীত দেবদেবীর স্থানে পিরকে বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে মানসিক শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দ লাভ করে। অতীতের চিন্তা-চেতনার ধারায়ই সাধারণের কাছে পিরেরা হন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তাঁরা ইচ্ছেমত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সক্ষম, দেহকে দৃশ্য-অদৃশ্য দুইই করা বা যে-কোন আকার ও রূপ ধারণে পারদর্শী, এমনকি একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতও হতে পারেন, মৃতকে জীবিত বা জীবিতকে মৃত এবং নিজেও ইচ্ছেমৃত্যু বরণ করতে পারেন—ইত্যাকার নানা কল্পনা তাদের নিয়ে করা হয় ঠিক সেই হিন্দু বা বৌদ্ধ দেব-দেবী বা মুনি-ঋষিদের মতই।

অতীতের দেব-দেবীদের কাছে যেমন নানা কারণে লোকেরা মানত করত, পূজা দিত, বলিদান করত, সন্ধ্যাবাতি জ্বালাত পিরের দরগায়ও মানত করা, জীবিত বা বিদেহী আত্মার কাছে প্রার্থনা, সমাধিতে সন্ধ্যাবাতি দেওয়া, ধুপধোঁয়ার স্থলে আগরবাতি

বা গন্ধবাতি জ্বালানোর রেওয়াজ হয়ে যায়। হিন্দুদের কাশী, পুরী, বৃন্দাবন, জগন্নাথ, মথুরা বা বৌদ্ধদের সাঁচী, বারহুত প্রমুখ স্থানে যেমন সাড়ম্বরে প্রয়োজনে বা বৎসরান্তে অনুষ্ঠানাদি হয়, তেমন পিরের দরগায়ও প্রচলিত হয় সাংবাৎসরিক ওরস। সেখানে শোভাযাত্রা করা, পতাকা-লাঠি-বল্লম-সরকি হাতে যাওয়া, নামাজ আদায় ও নানা ধরনের প্রার্থনা এবং প্রচুর জনসমাগমে সরগরম হওয়াটাতে হিন্দু-বৌদ্ধ নানা মেলার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পিরকে মুরিদের সেজদা করার প্রথা হিন্দু চেলার গুরুকে যাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করারই মত। মুর্শিদি, জারি, সারি, মারফতি, বাউল সঙ্গীত ইসলামী ভাবধারায় পুরিপুষ্ট হলেও কীর্তন, ভজন ইত্যাকার ধরনের অমুসলমান প্রভাব হতেই-যে উদ্ভূত হয়েছে তা স্পষ্ট। সুফিদের হাল, জিকর এবং সিমা বা গীতবাদ্যের জন্য তাদের একত্রিত হওয়া যেন গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের দশা, কৃষ্ণনাম ও কীর্তনেরই রূপান্তর। সূফিবাদের প্রেম-ভক্তির সাথেও বৈষ্ণববাদের মিল লক্ষণীয়ভাবে পরিস্ফুট। হয়ত একে অপরের ওপর প্রভাবেরই ফল এসব।

কদম রসুল জাতীয় পদচিহ্নগুলোও হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবিত। হিন্দুদের বিষ্ণুপদ এবং বৌদ্ধদের বুদ্ধপদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই-যে পদচিহ্নের প্রতি মুসলমানদের শ্রদ্ধাবোধ এসেছে তা বোঝা যায়। গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দির বা বর্ধমানের ধর্মপাদুকাই বোধহয় এসব স্মৃতির উৎস। হযরত মুহম্মদের (সঃ) পদচিহ্ন হিসেবেই কদম রসুল সাধারণ্যে পরিচিত। গৌড়, চট্টগ্রাম ও ঢাকার নবীগঞ্জ নামক স্থানে আজো এসবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। গৌড়ের কদম রসুল মসজিদ তো খুবই বিখ্যাত। দামেস্ক, শ্রীলঙ্কা, গুজরাটের আহমদাবাদ এবং দিল্লিতেও এ ধরনের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। এগুলো ছাড়া, মোজফফরপুরে শাহ লেঙ্গুর-এর দরগার পদচিহ্নও খ্যাত।

স্থানীয় নানা কিংবদন্তি ও কাহিনী অনুসরণ করে বাংলাদেশে বহু পির-দরবেশের নবতর রূপান্তর ঘটেছে, যাদের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মান্য করে, যেমন খাজা খিজির বা খোয়াজ খিজির এবং পির বদর। পানিতে আপদবিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উভয়কেই নদীমাতৃক বাংলাদেশের মাঝিমাল্লারা নৌকা চালানোর সময় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। জিন্দাগাজী, গাজী মিয়া এবং সাতপির সুন্দরবন অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। সেখানকার জঙ্গলে বা নদীতে যাওয়ার আগে তাদের স্মরণ করা হয় যাতে বাঘ বা কুমীর-এর আক্রমণ থেকে তাঁরা রক্ষা করেন। গাজী এবং তার ভাই কালুর স্মৃতিচিহ্ন ঢাকার লক্ষ্যা নদীর পারেও বিদ্যমান। মানিক পির, ঘোড়া পির, কুম্ভীরা পির, মাদারি পিরসহ পাঁচজন পির একত্রে পাঁচপির নামে পরিচিত। আপদ-বিপদ তড়াবার জন্য তাঁরা পূজিত হন। সোনারগাঁয়ে তাঁদের রওজা আছে বলে কথিত। পাঁচপিরের এ অভিব্যক্তি ইসলাম ও এনিমিজম বা সর্বপ্রাণবাদ-এর সমন্বয় বলা যায়। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব এবং বৌদ্ধদের পঞ্চ-ধ্যানী বুদ্ধ'র সাথেও এর মিল আছে। মিল আছে হিন্দুদের পঞ্চসতী, পঞ্চবটি, ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়ের পাঁচ পণ্ডিত এবং মুসলমানদের পাঁচবিশ্বাস অর্থাৎ ঈমান-নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত আর পাঁচওয়াক্ত নামাজের সাথেও।

ইসলাম ধর্মে সন্ন্যাসবাদ নেই, অথচ সন্ন্যাসব্রতও বৈদিক ধর্ম থেকে এতে আছর করেছে। এ ধরনের পাঁচটি ফকিরি সম্প্রদায়ের ভেতর অর্জুনশাহী, জলালি, বে-নওয়াজ

এবং মাদারিগণ বিখ্যাত। এদের প্রত্যেকের ভেতরও আবার বহু ভাগ-বিভাজন রয়েছে। শেখ সৈয়দ বাহাউদ্দিন মাদারির অনুসারী মাদারি ফকিরগণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান থেকে আগত। পূর্ণিয়া ও রংপুর অঞ্চলে এক সময় এদের বড় আস্তানা ছিল। তারা একত্রে মাদার-ঝাণ্ডা নিয়ে উৎসব করত, কেউ কেউ সন্ন্যাসীদের মত উলঙ্গ থাকত এবং অগ্নি-গোলকের ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারত। এছাড়া অন্য একদল ফকির মেয়েদের মত কাপড় পরত এবং মুর্শিদ-এর সামনে নাচ-গান করত। আবার কোন কোন ফকিরদল গাঁজা, ভাং, আফিং ও মদে আসক্ত ছিল। নারীসঙ্গও উপভোগ করত। এ যেন মনে হয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধন-ভজনেরই রূপান্তর মাত্র। কালান্দারিয়া ফকিরগণ ছিল যাযাবর। স্থান থেকে স্থানান্তরে যেত। হাতে আংটি পরত। বাহুতে পরত বাজুবন্ধ। সাথে সব সময় রাখত একটি বানর, একটি বিড়াল এবং একটি ভালুক।

এসব পির-দরবেশ-ফকিরগণই ইরান-তুরানের ধারায় বাংলাদেশে সুফি মতবাদ গড়ে তোলেন। কিংবদন্তির কথা বাদ দিলে হাসান বসরি (মৃত্যু ৭২৮ খ্রীস্টাব্দ), রাবেয়া (মৃত্যু ৭৫৩), ইব্রাহিম আদহম (মৃত্যু ৭৭৭), আবু হাশিম (মৃত্যু ৭৭৭), দারুদ তা'য়ী (মৃত্যু ৭৮১), মারুফ করখী (মৃত্যু ৮১৫) প্রমুখই সুফি মতের আদি প্রবক্তা। পরবর্তী সুফি জুনমুস মিশরি (মৃত্যু ৮৬০), শিবলি খোরাসানি (মৃত্যু ৯৪৬), জুনাইদ বাগদাদি (মৃত্যু ৯১০) প্রমুখ সাধকরা সুফির মতকে লিপিবদ্ধ, সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁদের কারো কারো মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাদৃশ্য লীলা ও অস্তিত্ব বোঝাবার জন্য 'ইরফান' তথা বোধি কিংবা গুহ্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই সৃষ্টি করে সুফিবাদ। এজন্যই তারা বিশ্বব্রহ্মবাদী সর্বেশ্বরবাদী। অনেকে আবার বিশ্বাস করেন, হজরত মুহম্মদ (সঃ) হজরত আলিকে তত্ত্ব বা গুপ্তজ্ঞান দিয়ে যান। সে-জ্ঞান হাসান, হোসেন, খাজা কাসিম বিন জায়দ ও হাসান বসরি আলি থেকে প্রাপ্ত হন। মুহম্মদ এনামুল হক *বঙ্গে সূফী প্রভাব* গ্রন্থে বলেন, 'বাঙলাদেশে সূফীমত প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগসাধন প্রভৃতি পন্থা বঙ্গের সূফী মতকে অভিভূত করে ফেলতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গের সূফী মতবাদের সহিত এ দেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে। এবং সূফীমতবাদ ও সাধন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দু পদ্ধতির সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে থাকে।' তাঁর মতে ভারতীয় পুস্তকের আরবি ফারসি অনুবাদের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান বৌদ্ধভিক্ষুর সান্নিধ্যে এবং আল বিরুনি অনূদিত *পাতঞ্জল-যোগ* এবং কপিল-এর *সাংখ্যতত্ত্ব'র* সঙ্গে পরিচয়ই এ প্রভাবের মুখ্য কারণ। বায়জিদ বিস্তামির সিন্ধু দেশীয় তথা ভারতীয় গুরু বু-আলির প্রভাবও এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

সুফির জিকর ভারতীয় প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণায়াম ও জপের রূপ নেয় এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবে বৌদ্ধ গুরুবাদও (যোগতান্ত্রিক সাধকের অনুসৃতি বশে) সুফি সাধকের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। সুফি মাত্রই তাই পির, মুর্শিদ নির্ভর। গুরুর আনুগত্যেই সাধনা সিদ্ধির একমাত্র পথ। সুফিরা আল্লাহ্‌র ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসেবে পিরের চেহারা ধ্যান শুরু করেন। গুরুতে বিলীন হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়ার সাধনার যোগ্য হয়। প্রথম অবস্থার নাম 'ফানা-ফিস

শেখ', দ্বিতীয়টি মুরাকিবাহ্ (আল্লাহ্‌র ধ্যান)। মুরাকিবায় যৌগিক পদ্ধতি গৃহীত হয়! আমল, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এ চতুরঙ্গ যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া। পিরের খানকাহ্ বা আখড়ায় সামা (গান), হালকা (ভাবাবেগে নর্তন), দারা (আল্লাহ্‌র নাম কীর্তনের আসর) ও হাল (অভিভূতি), সাকি, ইশক্ প্রভৃতি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি'র আমল থেকেই চিশতিয়া খান্দানের সুফিদের সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। পরে নিজামিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়েও তা গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার সাযুজ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

চোদ্দ-পনের শতকের মধ্যেই সুফির সর্বেশ্বরবাদ আর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অভিন্ন রূপ নেয়। আচার ও চর্চার ক্ষেত্রেও যোগপদ্ধতির মাধ্যমে ঐক্য স্থাপিত হয়। বাংলায় দেশী তত্ত্বচিন্তা ও চর্চার সঙ্গে ইসলামের বহিরাবয়বের মিলন ঘটানর চেষ্টা ক্রমে পরিণত হয়ে ওঠে। ভারতীয় যোগচর্চা ভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা কিছু মুসলিম সুফিরা গ্রহণ করেন তাকে নামত একটা মুসলিম আবরণ দেওয়ার চেষ্টা চলে। আরবি ফারসি পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই এর ইসলামীকরণ সীমিত থাকে। যোগ-নির্বাণ হল ফানা, কুণ্ডলিনী শক্তি হল নকসবন্দিয়াদের লতিফা। হিন্দু তন্ত্রে ষড়পদ্ম হয় এদের ষড় লতিফা বা আলোককেন্দ্র। এদেরও অবলম্বন হয় দেহচর্চা ও দেহস্থ্ আলোর ঊর্ধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলো দ্বারা সাধকের সারা শরীর আলোময় হয়ে ওঠে। এ হচ্ছে এক আনন্দময় অন্বয় সত্তা—এর সঙ্গে সামরণ্য জাত সহজাবস্থার সচ্চিদানন্দ বা বোধি চিত্তাবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এর সাথে সুরা নূর-এ আয়াত ৩৫ লক্ষণীয়, 'আল্লাহ্ই আসমান ও জমিনের আলো।'

আইন-ই-আকবরী'তে চোদ্দটি সুফি খান্দান বা মণ্ডলীর উল্লেখ আছে। চিশতিয়া ও সুহরাবর্দিয়া মত প্রথমে ভারতে এবং বাংলায় প্রসার লাভ করে। এর পরে নকশবন্দিয়া এবং আরো পরে কাদিরিয়া সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়। মনে হয় ষোল শতক অবধি চিশতিয়া, মাদারিয়া ও নকশবন্দিয়ার প্রভাবই বেশি ছিল। পরে মাদারিয়া ও কালান্দরিয়া জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে।

হিন্দু পুরোহিত এবং বৌদ্ধ শ্রমণদের মতই বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে আবির্ভাব ঘটে মোল্লা-মৌলবির। ইসলামী শরা-শরিয়ত পালনে, প্রাত্যহিক নামাজে, ঈদের জামাতে বা নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানে এরা পৌরোহিত্য করেন। মসজিদে নামাজ পড়ান, আজান দেওয়া, মিলাদে-মহফিলে-জামাতে এরাই যান। সাধারণ মানুষ তাদের ওপর পরম বিশ্বাসে ধর্ম-কর্মের ভার দিয়ে যেন নিশ্চিত থাকে। আর এঁদেরও জীবিকার্জন এসব ধর্ম-কাজের মাধ্যমেই। এদের কেউ কেউ বেশ শিক্ষিত ও জ্ঞানী ; কেউ কেউ আবার একেবারেই অজ্ঞ। সমাজের বৃহত্তর পরিসরে কখনো-বা এরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কখনো উদার মতাবলম্বী, আবার কখনো-বা ভীষণ গোড়া বামুন-পুরোহিতেরই মত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মতোয়াল্লি প্রথার সাথে গওয়াল ব্রাহ্মণদের প্রথার মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের ইসলামধর্মানুসারিগণ সাধারণত সুন্নি মুসলমান হলেও শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবও এদেশে রয়েছে। সাইফুউদ্দিন ফিরোজ শাহ-এর শিলালিপিতে মুহম্মদ, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসেন-এর নাম বাকি তিন খলিফা ছাড়াও

আছে। শিয়া পঞ্জতন পাক বা পাঁচ পবিত্র ব্যক্তিত্বের কথাই এগুলো স্মরণ করার। ষোড়শ শতকের প্রাথমিক দিকের আর এক শিলালিপিতে আছে শিয়া ঐতিহ্যের অন্য পাঁচ পঞ্জতন—ইয়া বুদ্ধু, ইয়া ফত্তা, ইয়া আল্লা, ইয়া কুদ্দুস এবং ইয়া সুব্বু। বুদ্ধু শব্দটা স্পষ্টতই বুদ্ধ-এর রূপান্তর। মুকুন্দরাম মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার প্রার্থনার স্থানের নাম বলেছেন হোসেনবাড়ি, মসজিদ নয়। বারবোসা বাংলায় প্রচুর পারস্য বণিক দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। পারস্য উপসাগর ও ইরাক-এর সাথে বাংলার বাণিজ্য ছিল প্রচুর। হয়ত এ সূত্র ধরেই এবং পরে মোগলদের সাথেই শিয়া প্রভাব এদেশে আরো বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে মহরম অনুষ্ঠানে। আশুরা বা মঞ্জিলের দিন অর্থাৎ দশই মহরম তারিখে তাজিয়া বের করা, লাঠি-ছুরি-তলোয়ার-বর্শা-বল্লম দিয়ে যুদ্ধ অভিনয় অথবা বুকে হাত পিটিয়ে 'হায় হাসান হায় হোসেন' করা শিয়া প্রভাবজাত। এ উপলক্ষে জারিগান যেন কাওয়ালিরই ভিন্ন রূপ। আশুরা দিবসের অনুষ্ঠানের পেছনে হিন্দুর দুর্গাপূজা-উৎসব বা রথযাত্রার প্রভাবও লক্ষণীয়। দুর্গাপূজার দুর্গামূর্তি বা রথযাত্রার রথ নিয়ে যেভাবে সোরগোল তুলে শোভাযাত্রা করা হয়, মহরমের তাজিয়া-ফেস্টুন নিয়েও প্রায় একই ধরনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

যুগের পর যুগ পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমান একে অপরের ধর্মীয় দেবতা বা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে, সদকা দেয়, মানত করে। দুঃখে-শোকে হিন্দু মুসলমানের আল্লাহ-রসুল-পির-দরবেশকে এবং মুসলমান হিন্দুর কালী বা কৃষ্ণকে স্মরণ করে। মঙ্গলকাব্যে কোন কোন মুসলমান মনসা পূজা করত বলেও উল্লেখ আছে। হিন্দু-মুসলমানদের চিন্তাধারার সমন্বয় সবচেয়ে উল্লেখজনকভাবে ঘটেছে সত্যপির এবং সত্যনারায়ণ-এর ধারণায়। এতে একেশ্বরবাদ এবং সামাজিক সমতা বিদ্যমান। এ ধারণা সম্পূর্ণ বিমূর্ত বলা যায়, কোন মূর্তি গড়ার দরকার পড়ে না। একটি কাঠের তক্তার ওপর সত্যপিরকে কাল্পনিকভাবেই উপবিষ্ট করান হয়। পরে এ তক্তার ওপর দেওয়া হয় অফুরন্ত ফুল। মোল্লা পড়েন মন্ত্র এবং সত্যপিরের উদ্দেশে দেওয়া হয় শিরনি। পরে সেই শিরনি বিতরণ করা হয় ভক্তদের মধ্যে। পূর্ণিমার দিন এ অনুষ্ঠান করতে হয়।

সত্যপির সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর কাহিনীও আছে। একটি হল যে, ময়মনসিংহের এক ব্রাহ্মণ যুবক কৃষক হিন্দু সমাজচ্যুত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। পিরের মুরিদ হয়। পরে সে বিখ্যাত *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য রচনা করে। *বিদ্যাসুন্দর* সম্ভবত ১৫০২-এর দিকে রচিত। আঠার শতকে ভারতচন্দ্র আর এক কাহিনী জানান। এক মুসলমান ফকির জনৈক ব্রাহ্মণের সামনে উপস্থিত হয়ে শিরনি প্রার্থনা করেন। মুসলমান বলে ব্রাহ্মণ তাকে তা দিতে অস্বীকার করলে ফকির হরিরূপে ব্রাহ্মণের সামনে আবির্ভূত হন। ব্রাহ্মণ তখন বোঝেন যে, হরি বা সত্য এবং ফকির বা পির বস্তুতপক্ষে আধ্যাত্মিকভাবে একই ঈশ্বরের দু রূপ। তিনি তখন সত্যপিরকে পূজা করে শিরনি দেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এজন্যই বলেন, বিষ্ণু এবং আল্লাহ্‌র কোন তফাত নেই। ষোড়শ শতক থেকে সত্যপিরপ্রথা বাংলায় খুবই জোরদার হয়ে উঠে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের পাশেও সত্য-ভিটার। সম্ভবত বৌদ্ধরাও সম্মিলিত এ চিন্তার বিরোধী ছিল

না। সনাতন গোস্বামী নামে জনৈক গৌড় ব্রাহ্মণ প্রবর্তন করেন দরবেশিয়া সম্প্রদায়। এরা তসবিমালা পড়ত এবং মুসলমান ফকিরদের মত আলখাল্লা গায়ে দিত। আল্লা, খোদা ও মুহম্মদের (সঃ) নাম নিয়ে এরা গানও গাইত।

ইসলাম ধর্ম বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধী। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের যেমন একটি বিশেষ স্থান আছে এবং উচ্চশ্রেণী, নিম্নশ্রেণী-কায়স্থ, অন্ত্যজ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদাভেদ আছে, তেমন মুসলিম সমাজেও আশরাফ-আতরাফ-এর একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা রয়েছে। সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠানরা সমাজের উচ্চকোটিতে অবস্থিত, আর সাধারণ মুসলমানরা, যেমন কৃষক, জেলে তাঁতী, দর্জি ইত্যাদি নিম্নস্তরে। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা আশরাফ বা শরীফ বলেও অভিহিত। তাদের সাথে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের, যাদের বলা হয় আজলফ, আতরাফ বা রজিল, একমাত্র নামাজের সময় এক কাতারে দাঁড়ানো বা ঈদের সময় কোলাকুলি ছাড়া তেমন কোন সম্পর্ক থাকে না। উৎসব অনুষ্ঠানেও আজলফজাদ বা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একত্রে বা একই সারিতে অথবা একই আসনে বসার অধিকার পায় না। এমনকি খাবার-দাবারের বেলায়ও নিচু স্তরের মুসলমানদের ভিন্ন বাসনপত্র ও ভিন্ন খাবার সরবরাহ করা হয়। গোয়ালা, জোলা বা তাঁতী, পিঠারি, কাবারি বা মাছ বিক্রেতা, খোরসালকাল বা ভিখিরি, শনকার, কাগজি ইত্যাকার ধরনের কতক পেশার ব্যক্তিবর্গ হিন্দু প্রভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে বংশপরম্পরায় হয়।

হজরত মুহম্মদের (সঃ) জন্মদিবস বা ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী ও মিলাদ শরীফ পালন, যেখানে সাধারণত ক্বেয়াম প্রচলিত অর্থাৎ সমাগত সবাই দাঁড়িয়ে কোরাস গায় 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' ইত্যাদি, ফাতেহা পাঠ বা মৃত আত্মীয় স্মরণ, খত্না বা সুন্নত অর্থাৎ মুসলমানি বা লিঙ্গের ত্বকচ্ছেদ উৎসব, আকিকা বা নবজাত শিশুর নামে পশু কোরবানি ইত্যাদি খাস ইসলামের দৃষ্টিতে বাহুল্য হলেও প্রথাগতভাবে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে প্রচলিত। নাজুমি বা জ্যোতিষশাস্ত্রের জনপ্রিয়তা ও এর প্রতি বিশ্বাস, কোষ্ঠী বিচার, হস্তরেখা ও রাশিফল গণনা, জাত ও কুলের প্রশ্ন, দেবী শীতলা বা কলেরার ওলা দেবীকে ওলাবিবি হিসেবে মান্য করা, ভুত-প্রেত-জ্বিন-পরির আছর, দেহের ওপর চাঁদের প্রভাব, প্রসূতি ও ঋতুস্রাবকালে মেয়েদের অশুচি গণ্য করা, শিশুর জন্মসময়ে 'ছটি' ঘরে বাস, ছটি বা ষাইট্যারা অনুষ্ঠান পালন, কবরে ফুল ও বাতি দান ইত্যাকার ধরনের স্থানীয় নানা লোকাচার বাংলার মুসলমানদের ভেতর পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। মুসলমানদের মধ্যে তাবিজের ব্যবহার, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোরান শরীফ খুলে দেখার প্রথা, মুসলমান ফকিরদের মাথার [illegible] কামানো ও সারাদেহ ভাস্মাচ্ছদিত করার রীতি, হিন্দু বনদ[illegible] [illegible]তরূপ মুসলমানের বনবিবি ফাতেমা, মৎস্যেন্দ্রনাথের মুসলমানি সংস্করণ [illegible] সমন্দালি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের সরল বিবাহপ্রথার স্থলে আন[illegible]নিকতা, প্রদর্শনবাতিকতা, দেনমোহরের আধিক্য, যৌতুকপ্রথা, উপঢৌকন প্র[illegible]ন, নাচ-গান, কৌতুক মুসলমান সমাজেও আছে। বিধবা বিবাহ শরিয়ত-প্রথা সিদ্ধ হলেও হিন্দু প্রভাবে তা যথেষ্ট নিচু চক্ষে দেখা হয়। বিধবারা বিয়ে না-করলে বরং সম্মান পায়। মৃত স্বামীর সাথে বিধবার সহমরণ প্রথা, দারিদ্র্য ও অন্যবিধকারণে মেয়ে শিশু

হত্যা এবং হিন্দুর সাথে মুসলমানের বিয়ে বাদশা জাহাঙ্গিরের আমলেও রাজপুরে ঘটেছে। হাল আমলে হিন্দু মেয়ে বা ছেলে ধর্মান্তরিত না-করে বিয়েত ঘটছেই।

উৎস মুখের সন্ধানে

বাংলার ইসলাম ধর্মের লোকায়ত রূপ লাভ করার পেছনে আছে এদেশের বহুদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নতুন মতবাদের সাথে সমন্বয় সংঘটনের এক ক্রমবিবর্তন ধারা। বাংলাদেশের অধিবাসীদের ধর্মমতের উৎস ও ভিত্তি হল অস্ট্রিক-মঙ্গোলিয়-দ্রাবিড় জ্ঞানবিজ্ঞান ও তত্ত্বমনন। এসব অস্ট্রিক-মঙ্গোলিয় জ্ঞাতি পার্বত্য ও অরণ্য যেমন কোল ভীল সাঁওতাল ওঁরাও রাজবংশী গাড়ো হাজং খাসিয়া মনিপুরী লুসাই নাগা মিজো খুসি তিপরা মুরং কুকী কোচ প্রভৃতির মধ্যে যেসব নিয়ম-নীতি ও রীতি-রেওয়াজ চালু রয়েছে সেসবের অনেকগুলোই ভিন্ন আকারে অথবা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে সভ্য বাঙালির প্রথাসিদ্ধ আচারে লোক-স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেছে। তুকতাক মন্ত্র, দারুটোনা, ঝাড়ফুক, বান-উচাটন, কবজ-মাদুলি বশীকরণে আস্থা তাই বাংলার অধিবাসীর অবিচল। বৃক্ষ দেবতা, নারী দেবতা, পশুপাখি দেবতা, দেহচর্যা ও জন্মান্তরে বিশ্বাসের তাই কমতি নেই। বট অশ্বত্থ তাল তেঁতুল তুলসি প্রভৃতি গাছ, কাক পেঁচা শকুন শালিক পাখি, গরু শেয়াল হাতি বাঘের মত পশু, সাপ টিকটিকির মত সরীসৃপ, নৈসর্গিক তিথি নক্ষত্র দিনক্ষণ মাস, অশরীরী ভুত প্রেত পিশাচ, জ্বিন-পরি, ডাইনী, ইত্যাদি এদেশের লোকদের শুভাশুভ চিন্তায়, রোগের চিকিৎসায় এবং সিদ্ধি ও সাফল্য কামনায় উপযোগ আজো হারায় নি। ধান দুর্বা হলুদ আমপাতা কলাগাছ কলসি ঘট কুলা দীপ ধূপ মাছ দই জীবনাচারে আজো বাঞ্ছাসিদ্ধির ভরসা জাগায়।

নানা শুভকর্ম বা গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি ছাড়াও গৃহনির্মাণে গৃহপ্রবেশে গোসলে বিশেষ করে পার্বাণিক স্নানে, নববস্ত্র পরায় মাস দিন ক্ষণ গ্রহ নক্ষত্ররাশি নির্ভর শুভাশুভ জানা হয়। যেমন শ্রাবণ-ভাদ্রে নতুন ঘর তৈরি করলে সে-ঘর সর্বদা রোগ-শোক আপদে আকীর্ণ থাকে। সোম বুধ ও বৃহস্পতিবার গোসল করলে ধন বাড়ে। শুক্রবারেও গোসল উত্তম। মঙ্গলবারের স্নানে আয়ু কমে ও দুশ্চিন্তা বাড়ে। রোববারে গাছতলায় উলঙ্গ হলে রোগে ধরে। মানুষের কুদৃষ্টি পড়লে কিংবা ভুতে ভর করলে হাঁস বা ছাগল দান করে আরোগ্য লাভ হয়। বুধবারে রোগ শুরু হলে আরোগ্য হওয়াবার উপায় কালো মুরগি দান। ঘোড়ার কপালের লোম পুড়ে ধোঁয়া দিলে ও ময়ূরের পুচ্ছ দিয়ে তালপাতা বা ছাতার মত ধরলে দেও-এর ভয় থেকে নিষ্কৃতি হয়—ইত্যাকার ধারণা ছাড়াও শুক্রবারে নতুন কাপড় পরা ও রোববারে নতুন কাপড় ছেঁড়া বিধেয়। বিয়ে ও অন্যান্য শুভকর্ম ও পূণ্যাদি বিষয় শুক্রবার, শনিবার মৃগয়া, রোববারে গৃহনির্মাণ, বাণিজ্যোদ্দেশ্যে শনিবারে বিদেশ যাত্রা, যুদ্ধ শনিবারে শুরু না-করা—এসব হাজারো ধরনের বাধানিষেধ প্রাচীনকাল থেকে আজো কমবেশি এদেশের মানুষ মেনে আসছে।

এদেশের মানুষ রোগমাত্রই দৈবনিগ্রহের কিংবা শত্রু-অপদেবতার কুনজর বলেই বিশ্বাস করে। বিশেষ করে যেসব রোগের নিদান কঠিন, সেগুলো সম্বন্ধে বদ্ধমূল ছিল এ ধারণা। একসময়ে দ্রব্যগুণ নির্ভর টোটকা চিকিৎসাই ছিল বাস্তব অবস্থা। হিঙ্গুল, কস্তুরি,

শসামূল, জতুর গুঁড়া, কালোমাটি, গাভীর হাড়, মাছের পিত্ত, হলুদ চিলের মাংস, প্যাঁচার নাক, কালো বিড়াল ও কালো মুরগির বিষ্ঠা, গন্ধক প্রভৃতি ছিল চিকিৎসার উপাদান। কলেরা বসন্ত শিশুরোগ প্রভৃতির জন্য ওলা শীতলা ষষ্ঠী প্রভৃতি অপদেবতা তো ছিলই, অন্য অনেক দুশ্চিকিৎসা অনির্ণীত রোগমুক্তির জন্য মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুক পানিপড়া তাবিজকবজ পূজা সিন্নি মানত-ধর্ণা বলি-সদকা কাঙাল-মিসকিন ভোজ প্রভৃতিই ছিল ভরসা।

মন্ত্রবলে দর্পণে নারী সৃষ্টি, মৃত ও জড়বস্তুতে প্রাণ সঞ্চার, অন্য মানুষের ওপর অদৃশ্যে ভর করা, মন্ত্রবলে স্বর্গ-মর্ত-পাতালে গমন ইত্যাদি ছিল সর্বব্যাপী ধারণা। ভুত প্রেত জ্বিন পরী দেও দানোর প্রভাবের ওপর সবার বিশ্বাস ছিল অসীম ও জন্মগত। এসব ছাড়াবার ব্যবস্থাও বিচিত্র—প্রয়োজনে অমানবিক নির্যাতনমূলক অনুষ্ঠানও করা হত। তাবিজ কবজ মন্ত্র স্বস্ত্যয়ন দোয়া-কোরানখানি পূজা-সিন্নি দান-সদকা বলি-কোরবানি অনুষ্ঠানে ধূপধুনো লোবান, সোনা-রূপা-লোহা প্রভৃতির ধোয়া জলে ও লোহার ধারণে ছিল অপদেবতার হামলা-ভীত মানুষের ভরসা। অথচ এসবই যে নিরাপত্তাকামী আদি মানবগোষ্ঠীর ভয়-বিশ্বাস-কল্পনা-প্রসূত এবং যাদু-বিশ্বাস ও আচারের ক্রমোৎকর্ষপ্রাপ্ত সংস্কার ও রূপ তা বলা বাহুল্য।

অভিজ্ঞতা থেকে এদেশের মানুষ জেনেছে বীজে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফল এবং ফলে বীজ আবর্তিত হয়—ধ্বংস হয় না। সে বীজও বিচিত্র—কখন দানা, কখন শিকড়, কখন কাণ্ড আবার কখনো-বা পাতা। কাজেই প্রাণ ও প্রাণীর আবর্তন আছে, বিবর্তনও সম্ভব, কিন্তু ধ্বংস যেন অসম্ভব। এ থেকেই হয়ত উদ্ভূত হয়েছে আত্মা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্ত্ব। হয়ত স্বপ্নের অভিজ্ঞতাও তাকে এক্ষেত্রে করেছে প্রত্যয়ী। আবার অদৃশ্য শত্রু বা মিত্র শক্তির সঙ্গে সংলাপের ভাষা নেই বলে সে প্রতীকের মাধ্যমে জানাতে চেয়েছে তার প্রয়োজনের কথা এবং তার ভয় বাঞ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। তার এ অনুযোগ ও প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে নাচে গানে মুদ্রায় চিত্রে এবং প্রতীকী বস্তুর উপস্থাপনায়। এভাবে প্রাণ ও আয়ুর প্রতীক হয়েছে দুর্বা, খাদ্যকামনার প্রতীক হয়েছে ধান। সন্তানসন্ততির বাঞ্ছার অভিব্যক্তি পেয়েছে মাছের প্রতীকে। কলাগাছের রূপকে প্রকাশ পেয়েছে বৃদ্ধির কামনা। কচি আমপাতা জরা ও জ্বরমুক্ত স্বাস্থ্যের ও যৌবনের প্রতীক। আর পূর্ণকুম্ভ হচ্ছে সিদ্ধির ও সাফল্যের প্রতীকী কামনা। তাই দেখা যায় এদেশের মানুষের ধর্মতত্ত্বে, মুসলমানদের ভেতরেও, পাপপুণ্য গুনাখাতা সোয়াবের কথার চেয়ে রয়েছে জীবন-রহস্য জানবার ও বুঝবার প্রয়াস।

বস্তুত বাংলার মুসলমানরা যে সাধনা বরণ করে নিয়েছিল তা ছিল পূর্বস্মৃতিরই জের। এর অনেকটুকুই যোগ ও তান্ত্রিক সাধনাভিত্তিক। অন্য কথায় বলা যায় যে, এদেশে পূর্বে থেকে স্থিত যোগ-তান্ত্রিক সাধনায় ইসলাম একটা নতুন উপাদান হিসেবে যুক্ত হয়। দু-চারটা আরবি-ফারসি পরিভাষা এবং আল্লাহ্-রসুল, আদম-হাওয়া, মুহম্মদ (সঃ), খাদিজা, আলি-ফাতেমা এবং রাকিনী প্রভৃতির বদলে ফেরেস্তা বানিয়ে প্রাচীন কায়াসাধনাকে ইসলামী রূপদান করা হয়। ধর্ম, আদ্য, পুরুষ, পুরাণ, নাথ ও নিরঞ্জন উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশেও আল্লাহ্-খোদার পরিভাষা রূপে

গোটা সামন্তযুগে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। যোগ ও তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটে বৌদ্ধ যুগে এবং বৌদ্ধ সমাজের ক্রমবিলুপ্তিতে গড়ে ওঠে বাংলার ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম সমাজ। তাই পূর্ব-ঐতিহ্যের ও বিশ্বাসের রেশ থেকে যায় তাদের মনন ও আচারে। সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, হিন্দু কিংবা মুসলমানের ভেদ মতগত নয়, আচার-পদ্ধতিগত। সবাই দেহসীমায় আস্থা রাখে। দেহতত্ত্ব সবারই অবশ্য জানতে হয়। নির্বাণকারী বৌদ্ধদের দেহবাদ ঈশ্বরবাদী হিন্দু-মুসলমান দেহাত্মাতে রূপান্তরিত হয়। সুফিবাদের মারফত সাধনায় যোগ ও যোগপন্থাই অনুসৃত হয়েছে। শাহ শরফুদ্দিন বু'আলি কলন্দর, গউস গোয়ালিয়র থেকে প্রায় সবাই যোগভিত্তিক সাধনাতেই আস্থা রেখেছেন।

মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের পির ও ফকিরের উদ্ভব হয় যারা মারেফাতকে শরিয়ত থেকে আলাদা করে নেয় এবং শরিয়তের বিভিন্ন ব্যাপারের ভিন্নতর মারেফতি অর্থ বের করে। মদ ও গাঁজা সেবন করাকে তারা 'মারেফতে ইলাহি' বা খোদার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার উপায় হিসেবে গণ্য করে। মুসলিম বাউল ফকিরগণ 'পঞ্চরস সাধন' নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কালো, সাদা, লাল, হলুদ ও মুর্শিদ-এর বাক্য মানে। এখানে কালো অর্থ মদ, সাদা অর্থ বীর্য, লাল অর্থ ঋতুবতী নারীর ঋতুস্রাব এবং হলুদ অর্থ মল। স্ব-স্ত্রী বা পরস্ত্রী গমনের মাধ্যমে তারা 'রতিসাধন,' 'রস সাধন,' 'লাল সাধন' ও 'গুটি সাধন' করে। নেড়া ফকিরের দল 'হাউজে কাওসার' শব্দের অর্থ ঋতুস্রাব হিসেবে করে এবং ঋতুস্রাব ও বীর্যপান করে খোদা-প্রেমে বিভোর হয়। বীর্যপানের সময় তারা 'বীজ মে আল্লাহ্' উচ্চারণ করে বোঝাতে চায় বীর্যেই আল্লাহ্ অবস্থান করেন। আর এক ধরনের ফকির আছে যারা তাদের মুরিদদের বাড়িতে গিয়ে কৃষ্ণলীলার অভিনয় যুবতী মেয়েদের কাপড় অপহরণপূর্বক করে থাকে। কোন কোন বাউল ফকির বিবাহিতা স্ত্রীদের সাথে সীমিত যৌন সম্পর্কে সন্তুষ্ট না-থেকে পরস্ত্রী বা বারাঙ্গনার সাথে যৌন মিলন করে। আর এভাবেই নাকি তাদের মারফতি তত্ত্ব লাভ হয়।

দীক্ষিত মুসলমানদের কেউ কেউ কখনো কখনো স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় হয়ে যায় অনেক সময়। তাদের কেউ-বা কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে স্বাতন্ত্র্যলাভের আত্যন্তিক আগ্রহে প্রতিবেশীর জ্ঞাতিত্ব ও পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য সচেতনভাবে পরিহারে উৎসাহী হয়। নিজেদের আরব-ইরানি-তুর্কি মুসলমানদের জ্ঞাতি বলে ভাবতে আগ্রহী হয়। দীক্ষা-গ্রহণের মুহূর্ত থেকে তাদের কর্তব্য হয় যেন ইসলামী আচারে-আচারণে রীতি-রেওয়াজে যথানিষ্ঠ হওয়া, পূর্ব পুরুষের তথা কাফেরদের সবকিছু ভোলা ও বর্জন করা। আর এ স্বাতন্ত্র্য-চেতনা আত্মোন্নয়নের চেয়ে বর্জনশীলতায়ই হয় সীমিত এবং অনুকরণবৃত্তিতে নিয়োজিত। হিন্দু ধর্মকথার আসরের রূপ পায় ওয়াজ মহফিলে, কীর্তন-কথকথার আদলে গড়ে ওঠে মিলাদ। হরির লুটের অনুকরণে হয় মিষ্টি বিতরণের প্রথা। মন্ত্রের রসাশ্রিত চাহিদা পুরণের জন্য রামায়ণ-মহাভারত-পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর আদলে আলেফ-লায়লা-শাহনামা ও ইসলামের উন্মেষযুগের খ্যাতনামা বীরদের নিয়ে গড়ে ওঠে কাল্পনিক প্রেম ও বীরগাথা। চৈতন্য অপহরণের অনুকরণে ইমাম-চুরির কাহিনী রচিত হয় আঠার শতকে, যেমন হাসান-হোসেন অপহরণ। জন্মাষ্টমীর কাহিনীর মত জন্ম-মুহূর্তে মুহম্মদ (সঃ) হত্যার ষড়যন্ত্রের কাহিনীও কল্পিত হয়।

লোকবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ আবদুল হাফিজ *রক্তাক্ত বাংলা* গ্রন্থের প্রবন্ধে বলেন, 'বাংলার হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ও কুড়িটি উপজাতি একই ভৌগোলিক পরিবেশে, একই আবহাওয়ায়, একই ঐতিহাসিক কালপরিবেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী বসবাস করেছে, একই আবেগে, ধ্যানে-ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়েছে, একই রকম আচার-ব্যবহার পূজা-পার্বণ, দৈনন্দিন কাজকর্মে অভ্যস্ত হয়েছে, একই রকম প্রাকৃতিক ও মানসিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে।...যে মুসলিম মাতা সন্তানের মঙ্গলকামনায় পীরের দরগায় শিন্নি দেন, তিনি জানেন না হয়তো—ঠিক একই ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে একজন হিন্দুমাতাও স্বামী-পুত্র-কন্যার মঙ্গলের জন্য কালীর দুয়ারে ধরণা দেন। উভয়ের বিশ্বাস উৎপত্তি লাভ করেছে সর্বপ্রাণবাদ থেকে। 'মানসিক' করবার মধ্যে সত্যবস্তুটা কি। একজন যা মনে মনে চান, তা যেন পূর্ণ হয়। পীরের মধ্যে অগাধ শক্তি, এমনকি তিনি মরে যাবার পরও তাঁর শক্তি কমে না। আর সেজন্যই পীরের দরগায় কিছু দেব বল মানত করলে কিছু দিতে হয়। কালীই হোন আর যে-কোনও দেবদেবীই হোন, দৃশ্যত তিনি বা তাঁরা মৃন্ময় মূর্তিধারী বা ধারিণী, কিন্তু তার ভেতর আছে জাগ্রত মহাশক্তির আধার (এরূপ মনে করা হয়)। সেজন্যই হিন্দু মোটর বা বাস ড্রাইভার পথিপার্শ্বে কালী মন্দিরে সামান্যক্ষণের জন্য হলেও বাস থামিয়ে পয়সা দেয় আর একই কারণে মুসলিম বাস ড্রাইভার পথের পাশে পীর-দরবেশ-ফকিরের মাজার কিংবা দরগা দেখলে বাস থামায় এবং পয়সা দিয়ে চলে যায়। বিশ্বাস করা হয় যে, তা না করলে বাস বা মোটর বন্ধ হয়ে যাবে। কখনো কখনো এমন ঘটে যে, একই ড্রাইভার যুগপৎ মন্দিরে এবং দরগায় গাড়ি থামিয়ে পয়সা দেয়।...যে মুসলিম রমণীর পক্ষে পৌত্তলিকতা একান্ত নিষিদ্ধ এবং যিনি দিনে রাতে পাঁচবার নামাজ পড়েন, তিনি হিন্দু রমণীর মত বিশ্বাস করেন রবিবার বাঁশ কাটা মানা—কেননা ঐ দিনটি বাঁশের জন্মদিন। ...কি হিন্দু কি মুসলমান সবাই একই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'হুজমা দেও'য়ের গান গায়। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে মাগুন করে বদনা মাথায় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বদনার জল ছিটানো হয়, লাঙল উল্টো করে পুঁতে রাখা হয়। মেয়েরা গ্রামের নির্জন প্রান্তে বিবস্ত্র হয়ে নাচ করে—মাটিতে পানি ফেলে কাদা করে এবং ব্যাঙের বিয়ে দেয়। এককালে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ক্ষেত্র-পূজা। হিন্দু-মুসলমান সবার জমিতে ধান বা অন্য ফসল লাগাবার পূর্বেই জমিতে ক্ষীর-গুড় দিত, দরিদ্রকে খাওয়াত, ধানকাটার সময় নানারকম আচার-অনুষ্ঠান করত, ধান কাটা হলে সাড়ম্বরে নবান্ন করত। এসব স্থলে সবার দৃষ্টিভঙ্গী এক ও অভিন্ন—জমির মঙ্গলার্থে, অধিক ফসল উৎপাদনের আশায় এবং ভবিষৎ যাতে নিশ্চিত হয় সেজন্য এগুলি করা হয়। নারীর জীবনে সঙ্কট আসে বারে বারে—যেমন প্রথম ঋতুস্রাবের সময়, বিয়ের সময়, গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের সময় এবং এ-ধরনের প্রতিটি সঙ্কটের ক্ষেত্রে—হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান একই ক্রিয়া (রিচ্যুয়াল) ও অনুষ্ঠান (সিরিমনি) পালন করেন। গর্ভে সন্তান থাকলে বাংলাদেশের নারীরা লাউ-কুমরা-কাটেন না, কোন জিনিস ডিঙিয়ে যান না, সহজে বাড়ির পেছন দিকে যান না, অমাবস্যাকালে সাবধান থাকেন। সন্তান হলে আতুরে আগুন রাখা হয় সর্বক্ষণ, শিশুর শিয়রে রাখা হয় লোহার যে-কোন অস্ত্র বা জিনিস, পোয়াতীকে বাইরে যেতে হলে নানা নিয়ম-কানুন

মানতে হয়। তেমনি নবজাতকের বেলায় আছে বহু বাধানিষেধ। শিশুর কপালে কালো টিপ ছাড়া বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ কেননা কুদৃষ্টির প্রভাব মারাত্মক হতে পারে।... বাংলাদেশের এমন কোন স্ত্রীলোক নেই যিনি তাঁর ঋতুস্রাবকালে ব্যবহৃত ন্যাকড়া লোকচক্ষুর আড়ালে না রাখেন, কারণ ঐ ন্যাকড়াকে মন্ত্রপূত করে তার ক্ষতি করা সম্ভব।...অসুখে বিসুখে সমস্ত ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথি বিদ্যা যদি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, তাহলে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের লোকেরাও সংস্কারের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। ঝাড়-ফুঁক, তেল-পড়া, পানি-পড়া, সন্ন্যাসীর পাদোক কিছুই তখন বাদ যায় না। আর এসমস্ত সংস্কার আচার অনুষ্ঠান ও লোকবিশ্বাস এসেছে সর্বপ্রাণবাদ থেকে।'

আধুনিক কালেও এ ধরনের লোকাচার বাংলাদেশের মুসলমানদের ভেতর অব্যাহতভাবেই প্রভাবিত করে চলেছে। আজানের সময় মুসলমান মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়া, জুম্মার দিনে মসজিদে সিন্নি মানত, কুস্বপ্নের জন্য ভিখিরিকে দানখয়রাত, রাতে ঘর ঝাড়ু দেওয়া অলক্ষ্মীর কাজ, বের হওয়ার সময় হাঁচলে কুলক্ষণ, পরীক্ষার সময় কলা বা ডিম খাওয়া ক্ষতিকর ইত্যাকার হাজারো ধারণা সমাজের গভীর মর্মমূলে আজো আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে নির্ভয়ে। এসবের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই। এগুলোর জন্ম দৈনন্দিন জীবনের নানা টানাপোড়েনের ভেতর থেকেই। অনেক ক্ষেত্রে এসবের অনেককিছুই একেবার মূল্যহীন ও হাস্যকর মনে হলেও সময়ে সময়ে ভীষণ জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ মনে হয়। অনেক আচার-অনুষ্ঠান আবার এদেশের বার মাসের তের পার্বণের সূত্রে ধরেই যেন নব নব রূপে আবির্ভূত হচ্ছে সমাজের অনুষঙ্গ হিসেবে।

সৃজনশীল মানুষ ও ইসলাম

খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, কিন্তু খাদ্য পেলে সেটা কত সুন্দর করে খাওয়া যায় সেই ভাবনাটাও আসে। খাদ্য আহরণ করতে গিয়েই সৃষ্টি হয় সৌন্দর্য চেতনা। অর্থাৎ জৈবিক কামনা বাসনা তৃপ্ত করাই কেবল নয়, সেই বাসনা-কামনা কত চমৎকৃতভাবে তৃপ্ত করা সম্ভব তা মানবগোষ্ঠী কালে কালে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনেছে। একদা-গুহাবাসী মানুষ তার আবাসগৃহটিকেও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার গুণ অর্জন করেছে দিনে দিনে অনুশীলনের মাধ্যমে। অসুন্দরকে সুন্দর এবং সাধারণকে অসাধারণ করে তোলার এ চেতনাবোধেই প্রকাশ পায় মানুষের সৃজনশীল প্রকৃতি। এ চেতনাবোধই তাকে করে তোলে শিল্পী ও স্রষ্টা। এ সৃষ্টিশীলতাই নানা বিষয় ও মাধ্যম ঘিরে নানা রূপে নানা ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে নানা সময়। তুলে ধরে মানুষের অন্তর্লোকের অজ্ঞাত পরিচয়। খুলে দেয় মানুষের মধ্যে নিহিত অযুত সম্ভাবনার দ্বার।

মানব-জীবন তেমন দীর্ঘ না-হলেও তার অবসর মুহূর্তগুলোও কম নয় একেবারে। এসব অবসর মুহূর্ত ভরে তোলে সে সৃষ্টিশীল নানা কাজে। যুগের প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা এ ধরনের কাজেকর্মে নিজেদের নানাভাবে ফুটিয়ে তোলে। নানা ধরনের কাজে তারা রুচি ও সামর্থ অনুযায়ী লিপ্ত হয়। কেউ হয় শাসক-প্রশাসক জননেতা, কেউ হয় সাধু-সন্ত-ফকির-দরবেশ, কেউ বিজ্ঞ-পণ্ডিত জ্ঞানী-গুণী, কেউ কবি-সাহিত্যিক-চিত্রকর, কেউ অভিনেতা-সঙ্গীতজ্ঞ-ক্রীড়াবিদ। যে সমাজ মানুষের এসব প্রতিভা স্ফূরণের সুযোগ বেশি করে দিতে পারে সে-সমাজই বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে সেই সময়ের মানুষের কাছে। আর এসব প্রতিভাস্ফূরণের সুযোগ করে দিতে পারলেই হয় সমাজ-সভ্যতা তথা মানুষের অগ্রগতি। পশু থেকে মানুষের পার্থক্য এসব সৃজনশীল কাজ প্রকাশের মধ্যেই নিহিত। সৃষ্টিশীল এ প্রকাশগুলো মানুষের জন্মগত বলেই এগুলো দাবিয়েও রাখা যায় না। এসবের বিকাশ হতে-না-দিলে যেমন মানসিক প্রবৃত্তিগুলো বিকশিত হয় না বা সমৃদ্ধি ঘটে না কোন জাতির বৈষয়িক সাংস্কৃতিক আত্মিক বিভিন্ন রূপের, তেমন সভ্যতারও ঘটে অপমৃত্যু। অথবা বিষফোঁড়ার মতই সমাজে সৃষ্টি হয় নানা ক্ষতের। বস্তুত এসব পরিচর্যার সুযোগ বন্ধ করাটাই অমানবিক। অমানবিক কোনকিছুই চিরন্তন হয় না কখনো, আপাত-স্থায়ী হলেও। এমন সমাজ নিশ্চয়ই কখনই কল্পনা করা যায় না বা বাস্তবেও সম্ভব নয় স্থাপন, যেখানে কেবলই সকলে ধর্মকর্ম করছে, না-করছে চাষবাস, না-বানাচ্ছে বাড়িঘর, না-খাচ্ছে খাবার-দাবার। ধর্মকর্ম করতে হলেও দরকার এসবের। আর এগুলো বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলেই অসুন্দরকেও সুন্দরে রূপান্তরিত করার স্পৃহা মানুষের মধ্যে জাগাটাই স্বাভাবিক। শৈল্পিক বোধেই মানুষ মানুষ।

কারো কারো মতে কখনো মানুষের সৃষ্টিশীলতা অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও মানুষী এ বৈশিষ্ট্য রুদ্ধ করে রাখতে পারে নি কখনো কেউ। বড়জোর মাধ্যমগুলোর 'থিম' বা ভাব বদল হয়েছে প্রয়োজন মত। হয়েছে হয়ত কেবল বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মসম্পৃক্ত। কিন্তু একটিমাত্র ধর্ম বা সম্প্রদায় নিয়ে পৃথিবী নয়। নয় কোন দেশও। উৎপাদন ব্যবস্থাও থাকে নি কখনো সর্বদা একই পর্যায়ে। তাই সংঘাত এবং সমন্বয়, গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষের সৃজনশীল প্রতিভা এগিয়েছে। শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও এদেশের মানুষের সৃজনশীল প্রতিভা বন্ধ দুয়ারে আঘাত করে করে তাই থেমে যায় নি কোনদিন একেবারে। এগিয়েছে হয়তবা রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদীদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে, সুবিধাভোগী আর বঞ্চিতদের সংঘর্ষে, অর্বাচীন আর বিজ্ঞজনের বাহাসে-বিতর্কে।

২.

কোরান শরীফের সুরা শোয়ারা'র ১১ রুকুর ২২৪, ২২৫ ও ২২৬ সংখ্যক আয়াতে আছে, 'পথভ্রষ্ট লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখছ না যে, তারা (কবিরা) বনেজঙ্গলে মাথা খুঁড়ে ঘুরে মরে (সীমা ছাড়িয়ে বাড়িয়ে বা কমিয়ে বর্ণনা করে) এবং এই যে, যা তারা করে না তাও তারা বলে।' কোরান কোন কাব্যগ্রন্থ নয় বা হজরত মুহম্মদ (সঃ) কবি নন একথাও পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে। তিরমিজি জানান, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, 'গায়িকা মেয়েদের কিনবে না, বিক্রিও করবে না, শিক্ষাও দেবে না। তাদের উপার্জন হারাম।' কিন্তু তারপরও মহানবীর সাহাবি আবদুল্লাহ ইব্‌ন রওয়াহা (মৃত্যু ৬২৯খ্রিঃ) ইসলামের অনুকূলে ইসলাম বিরোধী কবিদের ব্যঙ্গ কবিতার জবাবে বহু কাব্য রচনা করেন। এরূপ প্রায় পঞ্চাশটি কবিতা বিদ্যমান। মহানবীর আমলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন তারিক-এর করুণ মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে হাসান ইব্‌ন সাকিব কবিতা রচনা করেন। আর এটাই মানবিক। মদিনাবাসিগণ এই গানটি গেয়ে হজরতকে হিজরতের সময় অভ্যর্থনা জানায় :

> তলাআল বদরু আলাইনা
> মিন্ সানিয়াত্বিল বিদায়ী—
> ওজাবাশ শুকরু আলাইনা
> মাদাআ লিল্লাহে দায়ী

অর্থাৎ সানা পাহাড়ের প্রান্ত থেকে পূর্ণচন্দ্র উদিত হচ্ছে, আমাদের কর্তব্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

বোখারি এবং মোসলেম বর্ণিত হাদিসে আছে যে, হজরত আবু বকর মিনা'র দিনে তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন, দুটি বালিকা 'দফ' (একধরনের বাদ্যযন্ত্র) বাজাচ্ছে আর রসুলুল্লাহ (সঃ) কাপড় দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে রেখেছেন। আবু বকর তাদের শাসন করলে হজরত (সঃ) মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, 'ওহে আবু বকর, ওদের ছেড়ে দাও, কারণ আজ ঈদের দিন।' আর এক বর্ণনায় আছে, 'হে আবু বকর, প্রত্যেক জাতির উৎসব আছে এবং এটাই আমাদের উৎসব।'

হজরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর আবাসগৃহ অথবা মসজিদ জাঁকজমকভাবে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর রওজা মোবারক ছিল সাধারণ ধরনের। তাঁর মাজার (মাজার ফার্সি শব্দ, অর্থ কবর) শরিফ অতি সাধারণভাবে রাখার এবং সুসজ্জিত না-করার কথা বলেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর প্রতিকৃতি আঁকতেও তিনি অনুমতি দেন নি বলে কথিত। হজরত আবু বকর, হজরত ওমর প্রমুখ খুব সরল, অনাড়ম্বর ও দীনহীনভাবে জীবনযাপন করতেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও তাঁদের দরবার ছিল শানশওকত ও জৌলুস বর্জিত। রাজকোষ থেকে অতি সামান্য ভাতা তাঁরা নিতেন। বিত্তশালী ওসমান তো নিম্নতম এ পারিশ্রমিকও নিতেন না। ইন্তেকালের সময় ওমর মাত্র পাঁচটি দিনার ও মোটা কাপড়ের একটি কোর্তা রেখে যান। অথচ তাঁরা তিনজনই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। আলিসহ চারজনই শিক্ষিত। ওমর কবি। আলি সাহিত্যিক। প্রত্যেকেই আবার যোদ্ধাও।

তবে সৌন্দর্য পিয়াসী কি তাঁরা ছিলেন না? হজরত (সঃ) দুটি পয়সা উপার্জন করলে একটি দিয়ে খাদ্য এবং অন্যটি দিয়ে ফুল কেনার কথা বলেছেন—এ নিয়ে চমৎকার কবিতা রচিত হয়েছে। উৎসবের দিনে বালিকাদের দফ বাজানো বন্ধ-না-করায় বোঝা যায়, নির্দোষ আমোদ-আনন্দেরও বিরোধী তিনি ছিলেন না। এমনকি প্রাক-ইসলামী যুগের কাব্য-সাহিত্যও তিনি ধ্বংস করে ফেলেন নি। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে সমাজের বিত্তশালীরা জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করত। সুরম্য হর্মরাজিতে বাস করত। নাচগানবাদ্যাদিতে চিত্তবিনোদন করত। সুদৃশ্য গালিচায় তাদের ঘরের মেঝে আচ্ছাদিত থাকত। এসবের কোনকিছুই খলিফারা ছিনিয়ে নেন নি বা ফেলে দিতেও বলেছেন বলে জানা যায় না। তবে হজরত ওমর জেরুসালেম দখলের সময় তাঁর অভ্যর্থনাকারীদের বর্ণাঢ্য পোশাকের চাকচিক্য দেখে বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

বস্তুত বিলাসিতা ও জাঁকজমকেরই বিরোধী ছিলেন ইসলামের উদ্যোক্তাগণ। বিরোধী ছিলেন সেইসব কাব্যে ওকাজের মত মেলায় যেসব সুন্দর সৃষ্টি হয়েও উদ্দীপ্ত করত শত শত অন্যায় সংঘর্ষে অনাচারে অমিতাচারে। প্রতিকৃতি তৈরিতে সম্ভাবনা ছিল মূর্তিপূজায় রূপান্তরিত হওয়ার যা সেদিনও ছিল আরবিগণের পরম আরাধ্যের বিষয়। বিলাসী জীবনযাপনে সম্ভাবনা ছিল ইসলামের মূল আদর্শ—সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবার। একবার ভোগে নিমজ্জিত হলে তা সংরক্ষণের জন্য যেসব কাণ্ডকীর্তি করতে হবে তাতে সৃষ্টি হতে বাধ্য অবিচার ও অন্যায়ের—একথাই তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। কিছুটা বিলাসী ওসমানের সাথে এ নিয়ে মতদ্বৈধতার কারণে আবু জর গিফারি'র মত ব্যক্তিত্ব তো দূরেই সরে যেতে বাধ্য হন।

প্রকৃতপক্ষে, মানবিকতার যে-ফুলটিকে প্রস্ফুটিত করার প্রয়াস ইসলামের উদ্যোক্তাবৃন্দ চালিয়েছেন তা যেমন তাঁদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দুর্নিরীক্ষ্য হয় না, তেমন অমানবিক হাজার অব্যবস্থাকে সুষ্ঠু পথে আনবার তাঁদের কর্ম-প্রয়াসকেও অসমর্থন করা যায় না। যে-কবি বাস্তব কর্মকাণ্ড ফেলে এলোমেলো জীবন কাটায়, কবিতার মাধ্যমে উস্কে দেয় কেবলই রতিবৃত্তি বা যুদ্ধোন্মাদনা, আর যে ছবি বা ভাস্কর্য

সৌন্দর্যের প্রতীক না-হয়ে হয়ে যায় উপাসনার কোন বিষয়বস্তু অথবা যে গানবাজনা প্রাত্যহিক কর্তব্যকাজকে ভুলিয়ে করে তোলে আকাশচারী কিংবা যে ভোগবিলাস গড়ে ওঠে অন্যায় শোষণ ও বঞ্চনার ওপর, তার বিরুদ্ধে সচেতন মানুষমাত্রই হবে সোচ্চার— এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক পাসপোর্টের মত অত্যাবশ্যক ব্যাপারে ফটো তোলা যেমন অনস্বীকার্য একজন খাঁটি মুসলমানের জন্যও, তেমন জয়নুল আবেদিনের তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সমাজমনস্ক চিত্র যখন হয়ে উঠতে পারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার অথবা গীতকে করে তুলতে পারা যায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উদ্দীপনাময়ী সঙ্গীতে 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'র মত গানে বা শিল্পী বুলবুল চৌধুরীর নৃত্যাভিনয় হয়ে ওঠে জীবনসন্ধানে-রত শিল্পকর্মে, তখন সেগুলো অস্বীকার করা অর্বাচীনতা ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে! গান মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার একটি। ধর্মের দেহাই দিয়েও তা যে বন্ধ করা যায় নি তার উদাহরণ মিলাদ। এতে সুর করে 'ইয়া নবী সালামআলাইকা' ইত্যাদি বলা হয়। এমন কি কোরান শরীফও সুর দিয়েই পড়া হয়, নিরস রুক্ষভাবে নয়।

অবশ্যই পরিমিত-জ্ঞানের অভাবে শিল্প যে-কোন সময় বিচ্যুত হতে পারে মানুষের কল্যাণের ক্ষেত্র থেকে কেবল জৈবক্ষুধার উত্তেজনা মেটাবার কাজে অথবা পারে মানুষের মানবিকবোধ নষ্ট করে অনাচারে প্রলুব্ধ করার দিকে নিতে। ইসলামের নেতৃবৃন্দের ছিল সম্ভবত এখানেই আপত্তি। তাঁদের জীবন এবং কর্মধারা এই-ই সাক্ষী দেয়। সুন্দর সুস্থ পরিমিতিবোধসম্পন্ন মানুষের জীবনই ছিল তাঁদের কামনা। অনাচার অবিচার দূর করে শান্তি (ইসলাম শব্দের একটি অর্থ 'শান্তি') প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের অভিপ্রায়। শান্তির পায়রার স্বপ্ন যুগে যুগেই মহামানবরা দেখে এসেছেন কিন্তু জীবন-দ্বন্দ্বসংঘাতে বার বারই তা হোঁচট খেয়ে খেয়ে ভেঙেছে। সাহিত্য-চিত্রকলা-নৃত্যগীতবাদ্য-ক্রীড়া-চলচ্চিত্র এ সংঘাতময় জীবনের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করতে পারে, সুপ্রশস্ত করতে পারে বিশ্বমানবের শান্তি-মৈত্রী-একতা গড়ার ঐকান্তিক কামনাও।

সুরা মায়েদা'র ৭ পারা ১ রুকুতে আছে, 'হে মোমেনগণ! মদ জুয়া, পূজার মূর্তি এবং (জুয়ার উদ্দেশ্যে) তীর ছোঁড়া অপবিত্র ও শয়তানি কাজের অন্তর্গত। এসব পরিহার করে চল।' এর ইতিবাচক ভাবটি স্পষ্ট।

সাহিত্য

ইসলামধর্মী মুসলমানরা বাংলাদেশে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আসার আগেই বাংলা ভাষার জন্ম। জন্ম হলেও রাষ্ট্রভাষা হয় নি। হয় নি বোধকরি এমনকি বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষিতজনেরও ভাষা। প্রাকৃতজন অর্থাৎ গণমানুষের 'বুলি' হিসেবেই এর ছিল অবস্থান। সমাজের উচ্চস্তরে প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যম সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেই তাই মুসলমানদের পরিচয় ঘটে প্রথম। তের শতকের শুরুর দিকেই আলি মর্দান খলজি'র রাজত্বকালে লখনৌতির প্রধান কাজী ও ইমাম রুকনউদ্দিন সমরকন্দি *অমৃতকুণ্ড* নামে সংস্কৃত ভাষায় রচিত তান্ত্রিক শাস্ত্রবিধির পুস্তকটি আরবি ভাষায় অনুবাদ করান। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই এদেশের সাহিত্যজগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিজেতা মুসলমান তুর্কিদের। নানা

যোগসাধনা ও রিপুদমনের বিভিন্ন উপায়সহ অমৃতকুণ্ডে আছে দার্শনিক আলোচনাও। গ্রন্থটি বার বার আরবি ও ফারসিতে অনূদিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় মুসলমাদের ভেতর এর অসম্ভব জনপ্রিয়তা। বিশেষ করে সুফি সাধকদের ওপর এর প্রভাব দেখা যায় ব্যাপক।

অমৃতকুণ্ড-এর মত সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হলেও এদেশের গণমানুষের ভাষা বাংলার সাথে ভিনদেশী বিজেতা মুসলমানদের পরিচয় ঘটতে সময় লাগে অনেক। স্বাধীন সুলতানি আমলের আগে এ পরিচয়ের তেমন খবর তথ্যগতভাবে পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষা উদ্ভবের সময় থেকেই এদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি সে-ভাষার ক্রমোন্নতির পক্ষে অনুকূলে ছিল না মোটেই। মোটামুটিভাবে দশ শতকের চর্যাপদগুলো এ ভাষার আদি পরিচয়-চিহ্ন হিসেবে ধরে নিলে, সেই থেকে স্বাধীন সুলতানি আমলের আগে পর্যন্ত এদেশে কমবেশি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক ভাঙচুর বিরূপ-পরিবেশ হিসেবে এর জন্য বিরাজ করছিল। দশ-একাদশ শতকে পাল সাম্রাজ্য ক্ষীয়মান। যে-বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এ ভাষার লিখিত চর্চা করছিলেন, তাঁদের জন্য আসছিল দুর্দিন। অনেক অঞ্চলেই তখন আরো ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল স্বাধীনভাবে। এগুলো ছিল ঐক্যহীন। এদের কারো বাংলা-ভাষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিলও বলে জানা যায় না। তাম্রলিপি, শিলালিপি বা মুদ্রা যা পাওয়া গেছে তা সংস্কৃতেই। ফলে গণমানুষের মুখের ভাষা হিসেবে বাংলা ক্রমবিকশিত হতে থাকলেও বিরাট এলাকা জুড়ে এর শ্রীবৃদ্ধি হয়ত ঘটতে পারছিল না। এগার-বার শতকের সেন-রাজগণেরও এ ভাষার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। তবু বাংলা ভাষার অমিত সম্ভাবনার রুদ্ধদ্বার অস্বীকার করতে না-পেরেই যেন এর সীমানা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে জয়দেব-এর *গীতগোবিন্দ*। অত:পর তুর্কিদের আগমন। রাজ্য জয়-বিজয়। সংঘাত। সংঘর্ষ। স্বাধীন সুলতানি আমলের পূর্ব পর্যন্ত এ ধারা। এর ভেতর গণমানুষের বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ লাভ হয়ত হয় নি। অথচ ভাষার উন্নতির জন্য প্রয়োজন যেমন স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, তেমন শাসক-বিত্তবানদের পৃষ্ঠাপোষকতাও। এ শর্তগুলো পূরিত হয় স্বাধীন সুলতানি আমলে।

চর্যাপদগুলোর পরে বাংলা ভাষায় রচিত দ্বিতীয় সাক্ষাৎ প্রমাণটি পাওয়া যায় *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের মাধ্যমে। বড়ু চণ্ডীদাস এর রচয়িতা। শ্রীচৈতন্যের (জন্ম ১৪৮৬, মৃত্যু ১৫৩৩ খ্রিঃ) আগে একটি রচিত বলে অনুমিত। এ সময় থেকে চোখে পড়ে আরো অনেক সাহিত্যকর্ম। রামায়ণ-মহাভারতের বাংলায় অনুবাদ, বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বিশেষ করে বৈষ্ণব ধর্মাদির বিষয় কাব্যের মাধ্যমে দেশী ভাষায় লিখিত হওয়ার ফলে সেগুলো যেভাবে প্রচারিত, প্রসারিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা দেখে বোধকরি এদেশের সে-সময়ের মুসলমানরাও আপ্লুত হন। হয়তবা তারা দেশজ। ধর্মান্তরিত। অথবা বিদেশ থেকে আগত হলেও অনেকদিন ধরে বসবাস করার ফলেই হোক বা হোক অন্য কোন কারণে, এদেশকে তারা আপন দেশ হিসেবে এবং এদেশের অনেককিছুই নিজের বলে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। এঁরা ছিলেন গণমানুষের তথা মাটির কাছাকাছি। ছিল তাদের সাথে আত্মিক যোগ। তাঁরা

বুঝতে পেরেছিলেন, ধর্মের কথাই হোক বা হোক মানুষের জীবনেরই কথা, তা দেশীভাষা তথা গণমানুষের মুখের ভাষায় বলতে না-পারলে না প্রচারিত হবে ধর্ম, না বুঝতে পারবে তা জনগণ। করতে হবে তা আবার সাধারণ মানুষেরই পরিবেশ-প্রতিবেশ ভাব-চিন্তাকল্পনার আশ্রয় করেই!

অন্যদিকে, স্বাধীন সুলতানি আমলের শাসকরা ভিনদেশী তুর্কিজাতীয় হয়েও এবং উচ্চস্তরের লোকজন, বিশেষত তাঁদের সাথে আগত রাজকর্মচারিগণ অন্যদেশী হলেও তাঁদের স্বাধীনতা বজায় রাখার কারণে দেশীয় জনগণের সাহায্য-সহানুভূতি লাভের জন্য বা নিজেদের সংখ্যাল্পতার জন্য কিংবা নিছক সাহিত্যপ্রীতির জন্য অথবা সবকিছু মিলে তাঁরা দেশে প্রচলিত গণমানুষের ভাষা বাংলার লেখকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।১৪২৫-৩২-এ মা হুয়ান সংকলিত চীনা বৃত্তান্তে জানা যায় যে, এদেশে তখন সর্বজনীন ভাষা ছিল বাংলা। তবে কেউ কেউ ফারসিও বলতো। এ যুগে বস্তুত ফারসি-আরবি ভাষা কতটুকু ব্যবহৃত হত তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। মুহম্মদ এনামুল হক *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থে জানান যে, 'যাঁহারা এদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহারা ছিলেন জাতিতে তুর্কী, ধর্মে মুসলমান ও সংস্কৃতিতে মুখ্যত: পারসিক। তাঁহারা ঘরে তুর্কীভাষা বলিতেন, রাজনীতিতে ফারসী-ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরবী-ভাষা চালাইতেন।' তবে ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি ইসলাম প্রসারিত জগতে প্রভাব বিস্তার করলেও গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য এবং মাতৃপিতৃভাষা একেবারে নি:শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয় না। শাসক-সুলতানরা ছিলেন তুর্কি-আফগান-পাঠান। সঙ্গে আগতরাও অনেকে ছিলেন বটে তাই। তাঁদের মুখের ভাষাও নিশ্চয়ই ছিল তাদের জন্মস্থানের বা স্বদেশের ভাষাই। অনেক পরে-আগত মোগল বাদশা বাবুর স্বয়ং তুর্কি ভাষার চেয়ে মোটেই অন্য ভাষা ও সংস্কৃতি, এমনকি অন্য কোন দেশও পছন্দ করতেন না। অবশ্য ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবির ব্যবহার ছিল। মুদ্রাগুলোর ভাষা সাধারণত আরবিই হত। শিলালিপি আরবি-ফারসি উভয়েতেই আছে। এতে প্রাপ্ত নানা পদবি দেখা যায় ফারসিতে। তবে বাংলা সাহিত্যের অজস্র সৃষ্টি, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, এমনকি ঈশা খাঁ-র কামানের গায়ে বাংলা লিপিতে তাঁর নাম উৎকীর্ণ (?) হওয়ায় প্রমাণ করে সেকালের শাসকদের বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা প্রীতি।

শাহ মুহম্মদ সগীর-কে স্বাধীন সুলতানি আমলের এখন-পর্যন্ত-জানা প্রথম মুসলমান কবি হিসেবে পাওয়া গেছে। তাঁর *ইউসুফ-জুলেখা* কাব্যটি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ অথবা গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ'র সময় রচিত বলে মনে করা হয়। সেই থেকে শুরু করে এই স্বাধীন সময়ের পরও, ষোল শতক অবধি, একদল মুসলমান লেখকের নাম পাওয়া যায়—জৈনুদ্দিন, মুজাম্মিল, চাঁদ কাজী, শেখ কবির, আফজাল আলী, শা বিরিদ খান, দোলা গাজী, শেখ ফয়জুল্লা, দৌলত উজীর বাহরাম খান, মুহম্মদ কবির প্রমুখ, যাঁরা দেশী ভাবসম্পদসহ আরবি-ফারসি নানা বিষয়বস্তু হাজির করেছেন এদেশী সাহিত্য-বস্তুতে। সগীর তাঁর কাব্যের রাজবন্দনায় বলেন :

তিরতিএ পরনাম করো রাজ্যক ঈশ্বর
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নির্ভর।

রাজা রাজশ্বর মৈদ্ধে ধার্মিক পণ্ডিত
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত।

জৈনুদ্দিন *রসুল-বিজয়* কাব্যে ভণিতা করেন এভাবে :

দান ধর্মে হরিশচন্দ্র মানে গুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিম প্রধান।

এ সম্মিলন ধারা এমনই ছিল যে, মুসলমান কবিরা পদাবলী পর্যন্ত রচনা করেন, যেমন, শেখ ফয়জুল্লা, চাঁদ কাজী, শেখ কবীর প্রমুখ। সত্যপিরের কথা ও কাহিনী নিয়েও অনেক সাহিত্য গড়ে ওঠে।

অবস্থাটা মনে হয় বদলে যেতে থাকে ষোল-সতের শতকের দিকে এসে। এ সময় থেকে বাংলার স্বাধীন সত্তাও দিল্লীর মুঠোয় চলে যায়। মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হওয়ায় উত্তরভারতসহ অন্যান্য স্থান থেকে এবং ইরানে সাফাভি বংশের পতনের পর সে-দেশের অনেক মানুষ বাংলায় আসতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এরা তাদের নিজস্ব আদব-কায়দা-লেহাজ এবং এদের মধ্যের শিক্ষিতজনরা ফারসি সাহিত্যের প্রভাব বিস্তৃত করে তোলে। ফারসি তাহজিব-তমদ্দুনের আওতায় পড়ে এদেশী শিক্ষিত উচ্চস্তরের মুসলমানরাও বাংলাভাষাকে মনে করতে থাকে 'হিন্দুয়ানি' ভাষা বলে। আত্মস্বার্থ সমৃদ্ধির জন্য দেশী উচ্চস্তরের মুসলমানরা ফারসির গুণকীর্তন শুরু করে। অবশ্য বিশাল হিন্দু ও বৈষ্ণব সাহিত্যের পাশে মুসলমান লেখকদের লেখা আসলেও ছিল অকিঞ্চিৎকর। এঁরা ইসলামের কথা বললেও দেশের মানুষের বোঝার জন্য প্রয়োগ করতেন দেশী আবহ ও ভাবধারা যার অনেককিছুই ছিল ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত। এর ফলেও ফারসি-প্রেমিকদের কাছে বাংলা ভাষা ইসলাম থেকে বেশকিছুটা দূরবর্তী বলে মনে হতে থাকে। গণ-মানুষের ভাষা বাংলা তাই এসময় এক প্রচণ্ড শ্রেণীদ্বন্দ্বের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। এ দ্বন্দ্ব বিদেশ-থেকে আগত এদেশের সম্পদ-সম্পত্তি লুণ্ঠনরত সুবিধাভোগী শ্রেণীর সাথে দেশীয় সংস্কৃতির বাহন বাংলা ভাষা-ভাষীর দ্বন্দ্ব।

স্বাধীন সুলতানি আমলের বাংলাদেশকে বাগে আনতে মোগলদের কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল অনেক—একেবারে বাবুরের সময় থেকে জাহাঙ্গিরের আমল পর্যন্ত। প্রায় একশ বছর। সুলতান নসরত শাহ্‌র সময় থেকে ভূঁইয়া ওসমান খাঁ-মুসা খাঁর সময় পর্যন্ত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগী হলে আসে সংকীর্ণতা, আর পরিপূরক হলে আসে উদারতা। মোগলরা বাংলা জয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী ছিল বাংলার স্বাধীন সুলতানদের। তাদের হটিয়েই তারা এসেছিল। ফলে ক্রোধ ছিল। হিংসা ছিল। জিঘাংসা ছিল। অথচ স্বাধীন বাংলার স্বাধীন-সুলতানরা এদেশে ঠিক তা ছিলেন তা। তাঁরা তেমন প্রতিযোগী খুঁজে পান নি আপামর জনগণের মধ্যে। প্রতিযোগী ছিল তাদের নিজেদেরই মধ্যে। স্বগোত্রীয়। জনগণ বরং তাদের বরণই করে নিয়েছিল। এ দেশ বিজয়ে তাদের যে রক্ত ঝরেছিল তাতে এদেশের পাইক-বরকন্দাজরাও ছিল। তাছাড়া, তারা এদেশে বসবাস করছিলেন মোগলদের চেয়ে অনেক আগে থেকে। জয় করেছিলেন অনেক আগে। কাজেই জন্মেছিল অধিকার বোধ। যুগের পর যুগ বসবাস করতে করতে এদেশকে তাঁরা

গ্রহণও করে ফেলেছিলেন নিজের বলে। স্বদেশ বলতে গেলে হয়ে গিয়েছিল এদেশই। বহুদূর হয়ে গিয়েছিল এক সময়ের ফেলে-আসা তুরস্ক আফগানিস্তান। মাঝখানে গড়ে উঠেছিল আরো অনেক রাজ্যও। মোগল সহ। উপরন্তু, তাঁদের সংস্কৃতির চেয়ে অনুন্নত বোধকরি মনে হয় নি এখানকার সংস্কৃতি, যেজন্য তাঁরা হন এদেশী সংস্কৃতি ও ভাষার ধারক ও বাহক।

মোগল আমলের প্রেক্ষাপট ভিন্নতর। মূলত তুর্কি হলেও মোগলরা গ্রহণ করেছিল ফারসি সংস্কৃতি। ফারসি ভাষা। দুঃসময়ে হুমায়ুনের ইরানে আশ্রয় গ্রহণ ও সাহায্য নেওয়ার জন্যও বটে, সেখানকার সংস্কৃতি মোগলদের চেয়ে উন্নত স্তরের হওয়ার জন্যও বটে—এ ঘটনা ঘটে। কৃতজ্ঞভাজন হুমায়ুন ইরানের শাহকে সন্তুষ্টও করতে চান হয়তবা। ফলে এর প্রভাবের কবলে পড়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে জাগে আলোড়ন। পাঠান বিতাড়নের সাথে সাথে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধিত ভাষা-সংস্কৃতিও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বাংলা ভাষার স্থলে ফারসি ভাষার প্রবল প্রতাপ শুরু হয়। এ দেখে শঙ্কিত না-হয়ে পারেন নি সে-যুগের সংবেদনশীলরা। সৈয়দ সুলতান-এর (জন্ম ১৫৫০-মৃত্যু ১৬৪৮) মত লেখকরা লেখেন—

কিন্তু যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষা হয় তার অমূল্য রতন।

ফারসিঅলারা মনে হয় ভয় পাচ্ছিল এদেশের ভাষাকে। এ ভাষার লেখকদেরকে। ভাষা মানুষকে সংগঠিত করে। একত্র করে। একতা আনে। একীভূত করে। পরস্পরের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমে একে অপরের কাছে আসে। ফলে মোগলদের ভয় ছিল। গণঐক্যের ভয়। যে-ঐক্য হয়ত জাগিয়ে তুলতে পারে স্বাধীনতার স্পৃহা। সুলতানি আমলের বংশধর পাঠানরা তখনো নিঃশেষ হয়ে যায় নি। সম্ভাবনা ছিল ফলে তাদের ফিরে আসার। তাদের প্রতি দেশীয়দের প্রীতিবোধ তো অনেক সময় পাওয়াও গেছে। অন্যদিকে, বাংলা আপামর জনগণের ভাষা হওয়ায় দেশীয় লেখকদের কলমে তাদের কথাই উঠে আসত, যে গণমানুষ ছিল স্মরণাতীত কাল থেকে শোষিত। বঞ্চিত। নিপীড়িত। অত্যাচারিত। পরাধীন আমলে এ অত্যাচার এবং শোষণটা হয় দ্বিগুণ, দু তরফ থেকে—দেশীয় সুবিধাভোগী ও বিদেশী খবরদারিদের থেকে। এ বুঝতে পারলে ভয় থাকে গণজাগরণের। গণবিদ্রোহের। এদের দুঃখদুর্দশা এবং মনের কথা তুলে ধরার অর্থই হল তাদের জাগ্রত করা। সে-সময়ের প্রেক্ষাপটে স্বাধীন সুলতানি আমলের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলো ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পাওয়া। শোষণের চিত্রটি স্পষ্ট করে তোলা। তাই দেশীয় লেখকরা ফারসিঅলাদের কাছে হচ্ছিলেন ধিক্কৃত। 'মোনাফেক' বলে চিহ্নিত। সৈয়দ সুলতানই জানান

মুনাফেক বলে মোরে কিতাবেতে পড়ি
কিতাবের কথা দিনু হিন্দুয়ানি করি।
অবশ্য, মোহের মনের ভাব জানে করতারে
যথেক মনের কথা কহিমু কাহারে।

অথচ সত্য তো ছিল এই যে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে—জীবনাচরণে, রীতিনীতি-সংস্কারে, প্রতিদিনের যাপিত জীবনে হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, বৌদ্ধই হোক আর হোক অন্য কোন ধর্মাবলম্বী, পার্থক্য ছিল তাদের সামান্যই। লেখকদের এ জীবন-সত্য অস্বীকার করা ছিল অসম্ভব। সেজন্য শত শত বছরের পুরানো *অমৃতকুণ্ড*'র ধারায় লিখিত হচ্ছিল শেখ জাহিদ-এর *আদ্য পরিচয়,* সৈয়দ সুলতান-এর *জ্ঞান প্রদীপ* ও *জ্ঞান চৌতিশা,* সৈয়দ মর্তুজা'র (?) *যোগ কলন্দর,* আলি রেজা'র *জ্ঞান সাগর* ইত্যাদি—যাতে যোগী ও সুফি মতবাদ একাত্ম হয়ে মিশে আছে। মিশে আছে হিন্দু দেবদেবীর বর্ণনার সাথে মুসলমান পির আউলিয়া-ফেরেশতাসহ অনেক কিছুই। বস্তুত, দেশী ভাষায় লিখিত সবকিছুতেই দেশী ভাবধারা আসতেই থাকে। ধর্মীয় কথা থেকে শুরু করে প্রণয় গাথায় পর্যন্ত। যত বেশি আসছিল ফারসি প্রভাব, ততই বোধহয় এদেশী সত্তা হচ্ছিল বিপর্যস্ত এবং করছিল প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ, যার সর্বোৎকৃষ্ট চিহ্ন আছে আবদুল হাকিম-এর ভাষায়—

যেই দেশে যেই বাক্য কাহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে যে সবের তখন।
যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।

আবদুল হাকিমের এমন সোচ্চার উচ্চারণে মনে হয় ভাষার সংঘাত এসে পৌঁচেছে চরম পর্যায়ে। মানতে চাচ্ছে না এদেশের লোক দিল্লীঅলাদের খবরদারি। ফারসিঅলাদের মাতবরি। এদেশে তারা থেকে-খেয়ে বড় হয়ে স্বপ্ন দেখবে ভিনদেশের! ফেলে-আসা দেশের। অথচ যে-দেশেটির না-ভাষা না-সাহিত্য ছিল ধর্মের ভাষা বা সাহিত্য। তাহলে কি দোষ করল দেশী ভাষা! হিন্দুয়ানি বলে একে ধিক্কার কেন! যুক্তিবাদী মানুষেরা এর উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। দেখছিল কেবল শক্তি-মদ-মত্ততা। অযৌক্তিক দাবি। দাবি হচ্ছিল দিল্লির শক্তিতেই। সতের শতক ছিল জাহাঙ্গির-শাহ-জাহান-আওরঙজের-এর শাসনকাল। দিল্লির ক্ষমতা তখন বাংলার ওপর সর্বব্যাপ্ত। প্রচণ্ড। সুবাদাররা শক্তিশালী মুঠোতে বন্ধ করে রেখেছেন সুবা বাংলাকে। তাদের বদৌলতে শহর-নগর-বন্দর-গঞ্জে আসছে ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরির খোঁজে অথবা সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ফারসি ঐতিহ্যে আপ্লুত লোকজন—গৌড়, তাণ্ডা, রাজমহল, জাহাঙ্গিরনগরে।

সেই দাপটে বাংলা ভাষা দেশ ছেড়ে যেন পালাতে বাধ্য হয় আরাকানে। রোসাঙ্গ রাজসভায়। আলাওল (জন্ম ১৬০৭-মৃত্যু ১৬৮০)-এর মত প্রতিভাবান কবিকে আশ্রয় খুঁজতে হয় সেখানেই। গৌড়ে না, জাহাঙ্গিরনগরে না। সেখানেই কিছুদিনের জন্য সমৃদ্ধি

ঘটে বাংলা সাহিত্যের। আর খাস বাংলায়? অধোগতি ঘটে। ফারসি সংস্কৃতি সয়লাব করতে থাকে সারা বাংলা। মধ্যযুগে বাংলা ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন এভাবেই হয় আপাত-ব্যর্থ।

এসময়ের ইতিবাচক কিছু কিছু দিকও অবশ্য ছিল : এক, মানব-রসাশ্রিত সাহিত্য-ধারার প্রবর্তন হয়তবা ফারসি সাহিত্যের প্রভাবেই সম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন, *ইউসুফ জুলেখা* বা *পদ্মাবতী।* প্রভাব পড়ে উত্তর ভারতের হিন্দি-উর্দু ভাষারও। হিন্দি *পদুমাবত*ইতো আলাওলের *পদ্মাবতী*। দেখা যায়, প্রচণ্ড ফারসি প্রভাবের সময়ও অস্বীকার করতে পারছে না লেখকরা দেশী-আবহ। দুই, ইরানিদের আগমনে ইসলাম ধর্মের শিয়া শাখা এদেশে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে কারবালা'র কাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠে মহরমি সাহিত্য যা মরসিয়া সাহিত্য নামেও পরিচিত, যেমন মুহম্মদ খান-এর *মকতুল হুসেন বা হোসেন বধ,* আবদুল আলি'র *হানিফার লড়াই,* নসরুল্লা খানের *জঙ্গনামা* ইত্যাদি। তিন, বাংলা ভাষার সংগীত শাস্ত্রাদি সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচিত হতে থাকে, যেমন দানিশ কাজী ও ফাজিল কাসিম অথবা চম্পা কাজী ও মুহম্মদ পরান-এর *রাগমালা।* লোকমানসের খবর পাওয়া এবং লোকসাহিত্য হিসেবে এসব লেখার একটা আলাদা মূল্য আছে।

মোগল আমলের শেষদিকে, নবাবি আমলে এবং ইংরেজ কোম্পানির শাসনামলে এদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দেয় ফারসি ও উত্তর ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সম্পৃক্ত, বিশিষ্ট পণ্ডিত আনিসুজ্জামান-এর ভাষায়, 'মিশ্র-ভাষা রীতির কাব্য,' যা সাধারণত 'পুথি সাহিত্য' নামে পরিচিত। এ ভাষাকে মুহম্মদ এনামুল হক 'হিন্দুস্থানী বাংলা'ও বলেছেন। এটি কারো কারো কাছে আদৃত হয় 'মুসলমানী ভাষা' হিসেবে। 'দোভাষী পুঁথি' বা 'কলমি পুঁথি' নামেও পরিচিত এগুলো। উনিশ, এমন কি বিশ শতকেও কেউ কেউ এ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

বাস্তববিমুখতা হল ওই তথাকথিত মুসলমানি সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। উদ্ভট সব কাহিনী। গাঁজাখুরি আখ্যান। অসম্ভব হাস্যকর সব কল্পনা। তাতে না-ছিল সমকালের কোন সমস্যা, না-ছিল সমকালীন ধ্যান-ধারণা। সারা বাংলা সহ ভারতবর্ষ তখন চলে যাচ্ছে বিদেশী মোগলদের চেয়েও আরো অনেক দূরের মানুষ—একেবারেই ভিন দেশী ভিন্ন গোষ্ঠী-জাতি ইংরেজদের হাতে। এদেশী সামন্তবাদ পরাজিত হচ্ছে ধনবাদী ইংরেজদের হাতে। সামন্তরা নেতিয়ে পড়ছে কোম্পানির দাপটের কাছে। হচ্ছে তারা তাদের চাটুকার, সহযোগী, বেতনভুক কর্মচারী। মোগল আমলে এদেশের যেটুকু আত্মসম্মান ছিল তা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে ন্যাক্কারজনকভাবে। শোষণের এসেছে তীব্রতা। লাগছে সবার গায়ে। গণমানুষ উঠছে ক্ষেপে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে ফারায়জি আন্দোলন, এমনকি তরিকা-ই-মুহম্মদিয়ার মত আন্দোলন চলছে। অথচ এসবের কোনকিছুই নেই এযুগের সাহিত্যকর্মে। পরাজয় এনে দিয়েছে অনেকের মনে আত্মবিশ্বাসহীনতা। পথ খোলা ছিল কোম্পানির শোষণের বিরুদ্ধে হয় সংগ্রামের নয় সহযোগিতার ও স্বপ্নচারিতার। দ্বিতীয় পথটি লেখকরা বেছে নেয়। কেবল স্বপ্নচারিতা। গণবিচ্যুত ফারসি উপরিতলের সুবিধেবাদীদের ভাষা-সংস্কৃতি হওয়ায় এবং তাই

তখনকার কবিসাহিত্যিকরা গ্রহণ করায়, সাহিত্য হয় উন্মার্গগামী। বাংলা ভাষার দেশী ধরন-ধারণ যোগ করেও তা রোধ করা সম্ভব হয় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-না-করে সান্ত্বনা খোঁজে অবুঝ কল্পনায়। কল্পনায় ইসলামধর্মীদের কাছে বহির্শক্তি হয় পরাজিত। পির ফকিররা দেখান কেরামতি। বুজরুকিতে মাত হয় সবকিছু। *লায়লি-মজনু, গুলেবাকাওলি, শয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল-এর* মত রোমান্টিক প্রণয়োপন্যাস থেকে তথাকথিত ঐতিহাসিক-অলৌকিক কাহিনী *আমির হামজা, জঙ্গনামা, গাজীকালু-চম্পাবতী, কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকিরাতুল আওলিয়া* ইত্যাদি হল এ সময়ের সাহিত্যকীর্তি। গরীবুল্লা, সৈয়দ হামজা, মালে মুহম্মদ, জনাব আলি, রেজাউল্লা, আবদুল মজিদ প্রমুখ হলেন কবি-সাহিত্যিক।

আরো একটা বিষয় লক্ষণীয়। সতের শতক অবধি সারা বাংলায় সাহিত্যের ভাষা ছিল এক। একে সাধুভাষা বা অবিকৃত বাংলা বলা যায়। এতে তৎসম, তদ্ভব ও খাঁটি দেশী শব্দের সংমিশ্রণ হত। আরবি-ফারসি শব্দও প্রয়োজন ও সুবিধা-সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহৃত হত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষেই তাই করত। এতে ভাষায় আসত সৌকর্য। কিন্তু আঠার শতক থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা হিন্দি-উর্দু-আরবি-ফারসির মিশ্রণে যখন মিশ্র ভাষা চালু করলেন, পূর্ববঙ্গের কবিরা তখনো সাধুভাষায় পুঁথি লিখছেন। আবার আঠার শতকের শেষদিক থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার কোন কোন মুসলমান কবি সাহিত্যিক আরবি ও ফারসি হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা চালানে। পশ্চিম বাংলার মুসলমান কবিরা যখন ফারসি হরফে বাংলা লেখার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রতিপক্ষরা চেষ্টা করছিলেন আরবি হরফে লেখার।

২.

উনিশ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবযুগ শুরু হয়। প্রথমে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের হাতে। পরে দেশী ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে। শতকের মধ্যভাগে এভাষা প্রকৃতপক্ষেই সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারিচাঁদ মিত্র থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হন। কথ্যভাষার সঙ্গে লেখ্যভাষা হিসেবে বাংলা সাহিত্য বিশাল আকার ধারণ করতে থাকে।

দেশের ভাষা ও সাহিত্যের এ যখন অবস্থা তখন বাংলার মুসলমান কিন্তু মোগলাই ভাবে আচ্ছান্ন। মোগলরা ভারতবর্ষকে, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলকে বলত 'হিন্দুস্তান'। হিন্দুস্তানের দিল্লি-আগ্রা-লক্ষ্ণৌ-আজমির-মুর্শিদাবাদ-জাহাঙ্গিরনগর তথা তাদের শাসককেন্দ্রের স্থানগুলোতে অর্থ-বিত্ত-রাজকর্মচারীর সমাগম হত। এখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে চলাফেরা-আচার-আচরণের একটা বিশেষ ঢং কালক্রমে গড়ে ওঠে, যা হিন্দুস্তানি বা মোগলাই সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করা যায়। এর সৃষ্টিতে ছিল মোগল বাদশা ও আমির-ওমরাহ-উজির-নাজির, যাদের অনেকেই ইরান তুরান থেকে আগত। আগত এ মোগল ইরান-তুরানির সাথে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির সংযোগেই গড়ে ওঠে মোগলাই বা হিন্দুস্তানি সংস্কৃতি। মোগল শাসন বহুদিন ধরে চালু থাকায় এ সংস্কৃতির প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশ জোরদার এবং সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত হয়। আর্থিক উন্নতির

সাথে সাথে আঠার শতকে ইংরেজ সাহেবদের 'নাবুব' হওয়ার খায়েশ এ সংস্কৃতির প্রভাবেই হত। উনিশ শতকেও এর প্রভাব দেখা যায় উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের পোশাক-আশাক-আদব-তমিজের কায়দায়। ধীরে ধীরে কোটপ্যান্টের তলায় তা চাপা পড়তে থাকলেও বিশ শতকের প্রথমার্ধেও এ প্রভাব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নি, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্য থেকে।

মোগলাই সংস্কৃতির ভাষা ছিল হিন্দি ও উর্দু। সাধারণভাবে এগুলো 'হিন্দুস্তানি' ভাষা বলে পরিচিত। সারা ভারত, ইরান ইত্যাদি সহ মিশ্র ভাষা-ভাষীর সৈনিকদের ভাব আদান প্রদানের সুবিধার জন্য ক্যাম্পভাষা হিসেবে উর্দু একদা গড়ে উঠলেও পরে তা উত্তর ভারতীয় অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষের ব্যবহৃত ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। উর্দু আরবি হরফে লেখা হয় বলে এর অক্ষরকে ইসলামী ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে ধরে মুসলমানরা একে হিন্দির চেয়ে বেশি আপন ভাষা মনে করতে থাকে। উপরন্তু, মুহম্মদি আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ বেরিলবি বা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ'র প্রচারের মাধ্যম ছিল উর্দু। যেসব বই-পত্র এসময় লেখা হয় তার বেশকিছু ছিল উর্দুতে। পরে আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমও হয় উর্দু। স্যার সৈয়দ আহমদও উর্দু ভাষার সমৃদ্ধির জন্য খুব সচেষ্ট ছিলেন। ইসলামের বহু তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কিত রচনা উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়। সেজন্য এভাষা মুসলমানদের কাছে বেশি আদৃত হতে থাকে।

বাংলাদেশে মোগল ও নবাবি আমলে উত্তর ভারত থেকে যেসব লোক এসে বসবাস করত তাদের ভাষা-মাধ্যম মোটামুটিভাবে ছিল উর্দু। একই ধর্মের হওয়ায় বাংলার আশরাফ শ্রেণী উর্দুসহ এই তথাকথিত মুসলিম তাহজিব ও তমদ্দুনকে নিজের মনে করে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস পেত। ১৯২৫-এ *জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এ* প্রকাশিত প্রবন্ধ 'এ বেঙ্গলি বুক রিটন্ ইন পারসিয়ান স্ক্রিপ্ট' -এ আছে, 'জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক ১২১৫ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে) তাঁর মৃত্যুশয্যায় শপথ করান যে, তাঁর একমাত্র পুত্র বাংলা শিখবে না, কারণ এতে সে নিচু হয়ে যাবে। বাংলার মুসলমান ভদ্রলোকরা ফারসিতে লিখতেন এবং কথা বলতেন হিন্দুস্থানিতে (অর্থাৎ উর্দুতে)।' এদেশের ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও এ চেতনা ছিল অত্যন্ত প্রকট। বাংলার ফরিদপুরের অধিবাসী হয়েও নবাব আবদুল লতিফের মত প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিত্বের উর্দুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল। তিনি বাংলা ভাষা কেবল আতরাফ মুসলমানদের জন্য রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাও সংস্কৃত শব্দাবলী ছাঁটাই করে। লতিফের সোসাইটির ভাষা ছিল উর্দু, ফারসি ও ইংরেজি। এর সভায় এ তিন ভাষাতেই আলোচনা বক্তৃতা হত, বাংলায় নয়। এ যুগের অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তি, যেমন আমির হোসেন, সৈয়দ আমির আলি প্রমুখও ছিলেন উর্দুর পক্ষপাতী।

বাংলা ভাষার প্রতি এমন অনীহার খবর পাওয়া যায় অনেক। মীর মশাররফ হোসেন *আমার জীবনী'* তে জানান, 'বাঙ্গালা বিদ্যা গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সীমাবদ্ধ ছিল। পূণ্য জন্য আরবি শিক্ষা। কোরান শরীফ পাঠ। সে পাঠ বড়ই আশ্চর্য। অক্ষর পরিচয় হইলেই কোরান শরীফ পড়ার নিয়ম। সে পড়া পড়িয়া যাওয়া মাত্র। আরবি কোরান শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না...মুন্সী সাহেব বাঙ্গালায়

অক্ষর লিখিতে জানিতেন না। বাঙ্গালার বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।' *ইসলাম সুহৃদ* পত্রিকার সম্পাদক শেখ আবদুস সোবহান ১৮৮৮-তে স্পষ্টই বলেছেন, 'আমি জাতিতে মোসলমান—বঙ্গভাষা আমার জাতীয় ভাষা নহে।' মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ, যিনি নিজে ছিলেন বাংলা লেখক ও সাংবাদিক, তাঁর *হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফার জীবন-চরিত* ভূমিকায় বলেছেন, 'উর্দু ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মুসলমানগণ জাতীয়তাবাদহীন ও কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত তাহা চিন্তা করার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে, বঙ্গীয় মুসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে, তাহারা জাতীয়তাবাদহীন নিস্তেজ দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।' শেখ আবদুর রহিম *মিহির ও সুধাকর-এ* ১৩০৬-এর ৮ পৌষ সংখ্যায় বলেছেন, 'বঙ্গীয় মুসলমানদিগের পাঁচটি ভাষা শিক্ষা না করিলে চলিতে পারে না, ধর্ম ভাষা আরবী, তৎসহ ফারসী এবং উর্দু এই দুইটি, আর রাজভাষা ইংরেজী, তৎসহ মাতৃভাষা বাঙ্গালা।' আবদুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী জানান, 'বাঙ্গালা ভাষা স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়া অধিকাংশ মুসলমানেই অতীব গর্হিত বলিয়া মনে করেন।' আকরাম খাঁ তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে বলেন, 'উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে কিন্তু ভারতবর্ষে মোছলেম জাতীয়তা রক্ষণ ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার।' নবাব সলিমুল্লা, নবাব সৈয়দ নবাব আলী প্রমুখও ছিলেন উর্দুর পক্ষপাতী। তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত সংস্থাগুলোর মাসিক সভা, নানা বক্তৃতা ও বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত উর্দু অথবা ফারসি।

এভাবে দেখা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু যখন সমাজ ও জাতির মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার জ্ঞান নানাভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে অভিনব রূপে সমৃদ্ধ করার কাজে লিপ্ত, তখন শিক্ষিত মুসলিম সমাজ উর্দুর চিন্তায় মশগুল, নয় ফারসিতে আক্রান্ত—যেগুলো না-তার ধর্মীয় ভাষা, না-তার দেশীয় ভাষা। অথচ মজার ব্যাপার, শিক্ষাব্যবস্থা তদন্ত করতে গিয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই এডাম দেখেছিলেন যে, বাংলা ভাষার ব্যবহার ও তার পঠন-পাঠনের ব্যাপারে গ্রামবাংলার মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে কোন তফাত নেই। শহরের মুসলমানরা সাধারণত উর্দু বলে, কিন্তু এ সংখ্যা সারা বাংলার তুলনায় নগণ্য। মারি টিটুস *ইণ্ডিয়ান ইসলাম* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বিশ শতকের গোড়ায় বাংলাতে উর্দুভাষী ছিল মাত্র ১৭,৮০,০০০ এবং বাংলাভাষী ছিল ২,২২,৪০,০০০। এমনকি সারা ভারতের প্রেক্ষাপটে বাংলাভাষী মুসলমানরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। অবস্থার এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভবত রেয়াজউদ্দিন, আকরাম খাঁ প্রমুখের মত কিছুটা বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন প্রাগ্রসর ব্যক্তিত্ব বাংলাকে 'মাতৃভাষা' বলে অভিহিত করেন। এবং উর্দুর পক্ষে বললেও তা হয় অনেকটা নরম সুরের।

বাংলা ভাষার প্রতি উপরোক্ত অনীহ-ধারার পাশাপাশি এর বিপরীতে আবদুল হাকিমের মত বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন একটি ধারাও অবশ্য বর্তমান ছিল। ফারসি-উর্দুর প্রচণ্ড প্রতাপের সময় এঁদের বক্তব্য তেমন জোরালোভাবে উপরে উঠে আসতে পারেনি হয়তবা, কিন্তু উনিশ শতক থেকেই, বিশেষ করে শতকের শেষদিকে ক্রমেই তা

জোরদার ও সোচ্চার হতে থাকে। এ চিন্তাধারার লোকেরা যেমন ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার করতেন তেমন প্রচারপত্র এবং পুস্তিকাদিও রচনা করতেন। শেখ আবদুর রহিম *হজরত মহম্মদের জীবনচরিত্র ও ধর্মনীতি* গ্রন্থে ১৮৮৯ তে এ ফারসি উদ্ধৃতি ও এর বঙ্গানুবাদ দেন যে, 'ধর্মের কথা হিব্রুভাষায় বল, আর সিরিয়ান ভাষায় বল অথবা সত্যানুসন্ধান জাপলকা দেশে কর আর জাবলসা দেশেই কর তাহাতে ধর্মের বা সত্যের কোন তারতম্য হয় না।' *সুধাকর, ইসলাম প্রচারক, মিহির, হাফেজ* ইত্যাদির মত পত্র-পত্রিকা হয় এ জনমতের বিশেষ ধারক ও বাহক। মাসিক *আল-এসলাম* পত্রিকার ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় লেখা হয়, 'মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ, বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দু বা আরবি বলিয়া পরিচয় দেওয়া কিংবা বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি, এরূপ বলা—এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেই দেখা যায়। যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা এবং মাতৃভূমির প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজমুখে মায়ের এবং দেশের দীনতা জ্ঞাপন করে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।'

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ১৩২২ বঙ্গাব্দ মাঘ সংখ্যার *কোহিনূর* পত্রিকায় 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে লেখেন, 'বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মত সত্য। ভারতব্যাপী জাতীয়তা সৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল।' তাঁর মতে, বাংলা ভাষাকে মুসলমানি (অর্থাৎ আরবি-ফারসি শব্দবহুল) করার চেয়ে শতগুণ শ্রেয় হবে বাঙলা সাহিত্য মুসলমানের জীবন ও ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করা। 'বঙ্গসাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান' প্রবন্ধে আবদুল মালেক চৌধুরী *আল-এসলাম* পত্রিকার ১৩২৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে লেখেন, 'আমাদের পূর্ব পুরুষগণ আরব পারস্য, আফগানিস্তান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউক, আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। আসলে এ ক্ষোভের বিষয়—এমন অনেক রওশন খেয়াল মুসলমান আছেন, তাহারা বাঙ্গাল তথা শ্রীহট্টের বাঁশবন ও আম্রকানন মধ্যস্থিত পর্ণকুটীরে নিদ্রা যাইয়া এখনো বাগদাদ, বোখারা, কাবুল, কান্দাহার ও ইরান-তুরানের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন।' এ যেন আবদুল হাকিমের বক্তব্যই উত্তরসুরিদের কণ্ঠে ধৃত।

১৩২৫ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোন জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে?...অনেকদিন পূর্বে উর্দূ বনাম বাংলা মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতর উঠিয়াছিল, তাহাতে বাংলার ডিক্রী হইয়া যায়। বর্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উর্দূ পক্ষকে সওয়াল জওয়াব করিতে শুনিতেছি।...দখল বাংলারই থাকিবে।' তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে আকরাম খাঁ এও বলেছিলেন, 'দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দু না বাঙ্গালা? এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত। নারিকেল গাছে নারিকেল ফলিবে

না যেন।...বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই তাহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। এবং ভবিষ্যতের মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হইবে।'

তবে কোন কোন মুসলমান সাহিত্যিক হিন্দু সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকদের কিছুটা দোষারূপ করেছেন এ বলে যে, তাঁরা মুসলমান চরিত্র অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে এবং কলঙ্ক আরোপিত করে সৃষ্টি করেন। ১৯০৩-এ *নওবাহার* পত্রিকার সম্পাদক অভিযোগ করেছিলেন যে, 'অক্ষয়বাবু, নিখিলবাবু এবং বিহারীবাবুর' মত খ্যাতনামা কবিগণ ছাড়া এমন হিন্দু লেখক কমই পাওয়া যাবে যিনি মুসলমানদের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করেছেন এবং তাদের গৌরব ও ব্যর্থতা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন। এজন্যও মুসলমানদের কেউ কেউ বাংলা ভাষার প্রতি অনীহ হয়ে পড়েন। কিন্তু এ কারণে বাংলা ভাষা ছেড়ে দিতে হবে তাও মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। এজন্যই ১৯২৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান ছাত্রদের জন্য উর্দু অত্যাবশ্যকীয় ভাষা হিসেবে চালু করতে চাইলে *মোহাম্মদী* এবং *শিখা* পত্রিকা দুটি তীব্র প্রতিবাদ করে।

মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা অনেকে স্বীকার করলেও স্বাতন্ত্র্যচেতনার উজ্জীবনকালে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মীয় চেতনা সম্পৃক্ত হয়ে এদেশের মুসলমান নেতৃত্বের মননে একটা অস্বচ্ছ ভাবাবেগ উর্দুর প্রতি দেখা যায়। পাকিস্তান আন্দোলন যতই জোরদার হতে থাকে ফারসি-উর্দু প্রভাবিত হিন্দুস্তানি এ ভাবধারাটি নতুনভাবে তাহজিব-তমদ্দুন বাংলার মুসলমানদের জন্য খুঁজতে শুরু করে। বাংলা ভাষার প্রতি অনীহ ধারাটি বৃহত্তর মুসলিম সমাজের চেতনার বিকাশে সামনে এগিয়ে এসে অবস্থান নিতে থাকে। সেজন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই পূর্বাঞ্চলের ভাষা কী হবে এ নিয়ে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। একদল বাংলা ভাষাকেই যেভাবে আছে সেভাবেই গ্রহণ করার এবং অন্য দল তা বাতিল করে উর্দু চালুর পক্ষে মত দেন। নিদেন অক্ষর বদলানোর পরামর্শ দেন। প্রথম দলের মধ্যেও দুটি মত দেখা যায়, একদল চান এর স্বাভাবিক গতিকে অব্যাহত রাখার অর্থাৎ জোর করে উপর থেকে সরকারি আদেশ নিষেধ জারি করে তা নিয়ন্ত্রিত না-করার ; অন্যেরা চান কিছুটা সংস্কারের। এ সংস্কারপন্থীদের নিয়ে সরকার গঠিত ভাষা সংস্কার কমিটির পর্যবেক্ষণ 'বাংলা ভাষায় হিন্দু ও সংস্কৃত প্রভাব, এবং এজন্য হিন্দু ধর্ম, পুরাণ ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দ বাক্যরীতি বর্জন ও অসংস্কৃত ইসলামী ভাবধারার প্রচলন।' এ ধারার ব্যক্তিরা পুথিসাহিত্যকে সেজন্য উচ্চ মূল্য দিয়ে থাকেন।

অবশ্য পাকিস্তান আন্দোলন কেবল তথাকথিত আশরাফদের আন্দোলন ছিল না। এতে যোগ দিয়েছিল নবউত্থিত দেশজ-মধ্যবিত্ত মুসলমানরাও। প্রাচীনপন্থীদের ধর্ম-জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাদের সব ধ্যান-ধারণা ও আধিপত্য মেনে নিতে চাচ্ছিল না। এরা ছিল গ্রামের কৃষিজীবী থেকে শহুরে নিম্নবিত্ত। এদের মাতৃভাষা ছিল মূলতই বাংলা। পাকিস্তানি আমলের পশ্চিমী আর্থিক প্রবঞ্চনা তাদের সংঘবদ্ধ করে। ভারতবর্ষের বিভক্তির ফলে যে-ঐক্য উত্তর ভারতীয় উর্দু ভাষীদের সঙ্গে ইতোপূর্বে এদেশী উচ্চবিত্তের ছিল, তা ছিন্ন হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হাজার/বারশ মাইল দূরে অবস্থানও এ বিভক্তি বাড়িয়ে তোলে। তাছাড়া আধুনিক জ্ঞান-

বিজ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে উর্দুর নিজস্ব কোন ভূমিকাই ছিল না বলে এটি গ্রহণেও কোন সার্থকতা চোখে পড়ে না। এসব কারণ একত্রিত হয়ে দেশের বিশাল বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটায়। বাংলা ভাষা মর্যাদা পেতে থাকে। তবে প্রাচীনপন্থীরাও বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারেন না। পাকিস্তানের মাধ্যমে যে-সুখস্বপ্ন মোগল যুগ তথা সামন্তকায়দাকানুন ফিরে আসার স্বপ্ন তাঁরা দেখছিলেন তা টুটে যাচ্ছে দেখে তাঁদের সাথে আঁতাত ঘটে প্রধান শোষক পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের যারা এরকম ঝুটঝামেলায় চাচ্ছিল স্বীয় আর্থিক পরিবৃদ্ধি। ভাষার প্রশ্নে নানা ফ্যাকড়া তোলে তা তারা ঘটাতেও থাকে। এমনকি বায়ান্নতে হেরে গিয়েও রোমান অক্ষরে বাংলা লেখার প্রশ্ন তোলে ষাটের দশকে। তবে তাও মার খায়। তথাকথিত আশরাফদের নতুন প্রজন্মও তা গ্রহণ করে নি।

এভাবে দেখা যায়, বাংলা ভাষাটা-যে মুসলমাদেরও ভাষা এটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সকল মুসলমান পারে নি বহুদিন। দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বেই কেটেছে বিশাল সময় : মোগল যুগে ফারসির সাথে দ্বন্দ্ব তথা মোগল শোষণের সাথে দ্বন্দ্ব বা ভিনদেশী সামন্তশ্রেণীর সাথে দ্বন্দ্ব দেশী জনগণের এবং পরে উর্দুর সাথে দ্বন্দ্ব তথা উঠতি ভিনদেশী মুসলিম বুর্জোয়াদের সাথে দ্বন্দ্ব স্থানীয় মানুষের। এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় সৃষ্টিশীল সাহিত্য বিশেষ কি আর হতে পারেই বা। মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধ-স্রোতের দু'একজন মীর মশাররফ হোসেন প্রচণ্ড বাধাবিপত্তির মধ্যে কতটুকুইবা আর তা অপসারণ করতে পারেন! কিন্তু শত প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজি নজরুল ইসলাম-এর মত অমিতশক্তিধর কবি আবির্ভূত হয়ে চোখ খুলে দেন যে, মাতৃভাষার সুষ্ঠু ও ব্যাপক চর্চাই হল এদেশের মুসলিম সমাজের আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতির একমাত্র মাধ্যম। আরো বোঝা যায়, বিদেশী আধিপত্য তথা বিদেশী শাসন-শোষণের অবসানের মধ্যেই নিহিত বাংলাভাষার সমৃদ্ধি। স্বাধীন বাংলাদেশ আবির্ভাবের পর থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে জোয়ারের সৃষ্টি হয়, তাই একথার সাক্ষ্য দেয়। যতই গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে ততই এ ধারা আরো বেগবান হবে, কারণ এদেশের গণমানুষেরই ভাষা-যে বাংলা।

শিল্পকলা

সেই-যে কাবা শরীফ থেকে তিনশ ষাটটি মূর্তি হজরত মুহম্মদ (স:) সরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই থেকে ইসলামধর্মীরা মূর্তি-তৈরি বিরোধী। শিল্পের জন্যও মূর্তি নির্মাণ সন্দেহের চোখে দেখা হয়। তবে কেবল মূর্তি কেন, আবুল মনসুর-এর *শিল্পী দর্শক সমালোচক* গ্রন্থের ভাষায়, 'রক্ষণশীল মুসলিম মানসিকতা সব ধরনের শিল্প প্রচেষ্টারই ঘোর বিরোধী ছিল—বিশেষ করে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সৃষ্টিকে মনে করা হত ধর্মবিরোধী।' অথচ দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ এসব ঐতিহ্যে এতই ছিল উন্নত যে এগুলোর ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট যা আজো আছে তাই সকল গুণীজনের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যেমন ভাস্কর্য। সারা দক্ষিণ এশিয়ায় মূর্তি তৈরি একদা যেমন ছিল ধর্মের অঙ্গ, তেমন শিল্পেরও। বাংলার পাল-সেন যুগের শিল্পীরা যেসব ভাস্কর্য পাথর, কাঠ বা মাটি দিয়ে তৈরি করতেন তার মধ্যে পাথরের কিছু কিছু চিহ্ন আজো টিকে আছে। টিকে

আছে কিছু কাঠেরও। এগুলো বর্তমানের উন্নত শৈল্পিক কলা-কৌশলের যুগেও রসিকজন ও পণ্ডিতবর্গের প্রচণ্ড বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। কারুকাজের চমৎকারিত্বে, শিল্পতত্ত্বের পরিমিতিবোধ এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির অসীম ক্ষমতা এসব ভাস্কর্যে যেভাবে ফুটে উঠেছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় অত্যন্ত উচ্চমানের শিল্পী বাংলাদেশে ছিলেন যাঁরা বোধহয় পুরুষানুক্রমে এ ধরনের মূর্তি তৈরিতে ছিলেন সুদক্ষ। অথচ ঠিক এ ভাস্কর্য-সৃষ্টিরই বিরোধী হল ইসলাম-অনুসারীরা। এর ফলে এদেশে ইসলাম আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই রাজ-পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ শিল্পকলাটি একরকম অবলুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু শিল্পীমনের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা-তো অবলুপ্ত হয় না। এর প্রকাশ ঘটে ভিন্নভাবে। নবরূপে সেই অনুভূতি আর আবেগ প্রকাশ পায় শিলালিপি, দেয়াল অলঙ্করণ, দরজার খিলান ও অন্যান্য শিল্পকর্মে। বোখারি শরিফ থেকে জানা যায়, 'যদি অগত্যা এ কাজ করতেই চাও তবে জীবের ছবি না এঁকে বৃক্ষাদির এঁকো।' আরো আছে, 'ওবায়দুল্লা বললেন, আপনি কি শোনেন নি, উক্ত হাদিসে তিনি এ বাক্যও উল্লেখ করেছেন যে কাপড়ের মধ্যে যদি গাছপালা কিংবা লতাপাতার ছবি থাকে তবে তা নিষেধাজ্ঞার বাইরে।' হয়ত এ থেকেই শুরু হয় আরবি ও ফারসি হরফ পাথরের ওপর খোদাই করে কোন বিশেষ দিবস বা উৎসব অথবা কোন ব্যক্তি বা ঘটনা স্মরণে বা ভবন নির্মাণ স্মৃতি হিসেবে ধরে রাখার জন্য স্মৃতিফলক তৈরির প্রবণতা। আর এ কাজে নিযুক্ত হয় সম্ভবত প্রাচীন সেই ভাস্কর্য শিল্পীরাই। এরা কেউ কেউ হয়ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আর কেউ কেউ হয়ত স্বধর্মে থেকেই আরবি বা ফারসি ভাষায় শিলালিপি ইত্যাদি সৃষ্টি করতে থাকে। শিলালিপির পাথরগুলোর বেশকিছু সংগৃহীত হয় পূর্বের তৈরি ভাস্কর্য থেকেই। যেসব ভাস্কর্যের পাথর ছিল মসৃণ অর্থাৎ এক পিঠে মূর্তি খোদাই থাকলেও বিপরীত পিঠ ছিল নিশ্চিদ্র, তার ওপর সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন ধরনের আরবি ফারসি হরফে লিপি খোদা করা হত। অক্ষরের ধরন অনুযায়ী এগুলো কুফিক, তুগরা, নস্‌ক্‌, সুল্‌স্‌, নাস্তালিক ইত্যাকার নামে পরিচিত। উচ্চমানের শিল্পীরা কারুকাজে 'তীর ও ধনুক' অথবা 'নৌকা ও দাঁড়'-এর মত চিহ্ন এসব হরফের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলে পরিচয় দিচ্ছেন দেশ, প্রকৃতি ও স্থানীয় জনজীবনের। এসব লিপি কতশত বিষয়বস্তুতে চমৎকারভাবে-যে ব্যবহৃত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মসজিদের অলঙ্করণে এর ভূমিকা-তো সর্বব্যাপ্ত। লিপিশৈলীর এ উৎকর্ষ ও প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে শিলালিপি, পাণ্ডুলিপি, মূদ্রা সহ অস্ত্রশস্ত্রে, কাচের বাসনপত্রে, চীনামাটির দ্রব্য, ধাতব বস্তু সামগ্রী এবং তৈজসপত্রাদিতে।

তবে শুধু এ কেন, 'লৌকিক সংস্কৃতিতে মুসলমান যুগের দান,' গোপাল হালদারের *সংস্কৃতির রূপান্তর*-এর ভাষায়, 'কতভাবে জমা হইতেছিল তাহার ঠিকানা নাই।...শহরে, বাজারে ও সওদাগরী দোকানপত্রে মুসলিম দান বাড়িয়া উঠিল। কাগজ এদেশে তাহারাই আনয়ন করে, তাহার পর কেতাবের কদর বাড়িল। খানাপিনায় নূতন বিলাসিতা দেখা দিল, মুসলিম হাকিম ও মুসাফিরেরা সমাদৃত হইল।...এই কৃষি সমাজে মুসলমানদের দান ছিল প্রধানত কারুশিল্পে ও সওদাগরী কাজের উন্নতিতে। একদিকে শাল, কিংখাব, কার্পেট, মসলিন প্রভৃতি, অন্যদিকে নানারূপ অলঙ্কার, মিনার কাজ,

বিদরীর কাজ প্রভৃতিও তখন মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনেক সময়েই মুসলমান কারুশিল্পীর হাতে গড়িয়া উঠে। মধ্যযুগের কারুকলায় চরম নিদর্শন হিসেবে সেযুগের পৃথিবীতে এসব কাজের তুলনা মিলে না।'

বস্ত্রবয়নে, চীনামাটির বাসনপত্রে, কাচের নানা দ্রব্যসম্ভারে, কারুময় দারুশিল্পে, ধাতব দ্রব্যাদি তৈরিতে, কার্পেটের কারুকাজে রক্ষণশীল বাধানিষেধ না-মেনে সুরুচিরই পরিচর্যা হয়েছে। পশুপাখি বা মানুষের অনুকৃতির উপস্থিতিও এসবে একেবারে শূন্য নয়। নকশি কাঁথার নানা রকমের নকশার মধ্যে নারী-পুরুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর প্রতিকৃতি তো যুগ যুগ ধরেই অঙ্কিত হয়ে আসছে ফুল-লতা-পাতা-জ্যামিতিক ডিজাইনসহ। বস্তুত, পাথরে, কাঠে, কাপড়ে, কাঁথায়, তুলট কাগজে, তালপাতার পুঁথি চিত্রনে, বালিশের ওয়ারে, শিকা-মালসায়, মিষ্টি তৈরিতে, ঘটিতে-বাটিতে, পালঙ্কে, পানের ডিবায়, পোড়া ইটে, মাদুরে-পাটিতে, হাতির দাঁত ও ধাতব তৈজসপত্রে, পুঁতির মালায়, নারকেলের মালায়, অস্ত্রের বাঁটে, হলে ইত্যাদি নানারকম জিনিসে যে সৌন্দর্য প্রয়াস তা শিল্পের অনন্য সাধারণ উদাহরণ। ধর্মসম্মত নয় বলে এগুলো নাকচ করা যায় না মোটেই। গ্রামের মেলায়, পালা-পার্বণে মাটির মূর্তি ও পুতুলের প্রচলন এ দেশে স্মরণাতীত কাল থেকে বিদ্যমান। হাতি, ঘোড়া, বাঘ, মোরগ, হুঁকো হাতে বুড়ো, সাপ, আম-কাঁঠাল-কলা-পেঁপে-লিচুর মত ফলমূল, ইত্যাকার কত ধরনের মাটির মূর্তি-যে আজো তৈরি হয় তার ইয়ত্তা নেই। মুসলমানরাও এগুলো খেলনা ও শিল্প-সৌন্দর্য হিসেবে অনাদৃত করে না। বারুনি বা অষ্টমী স্নানের মেলায় চিনি ও গুড়ের তৈরি ঘোড়া-হাতি-পাখি-মন্দিরচূড়া ইত্যাদি খাবারও মুসলিম জনসাধারণ খাদ্য হিসেবে গ্রহণে অনীহ বোধ করে না। কোথাও কোথাও পিরের দরগায় মাটির তৈরি ঘোড়া তো মানতই করা হত। মঙ্গল উৎসবাদিতে আলপনা আঁকা প্রথাটিও অবলুপ্ত হয় নি। ভাষা আন্দোলনে শহীদদের একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারাদিতে এর প্রচলন এখন সর্বব্যাপ্ত।

তেমনি পাণ্ডুলিপি চিত্র। মুসলিম শাসনামলের একেবারে প্রাথমিক যুগ থেকে পাণ্ডুলিপি চিত্রের সরাসরি উদাহরণ পাওয়া-না-গেলেও ষোল শতকের সূচনা থেকে ধারাবাহিকভাবে এগুলোর দেখা মেলে। মোগল যুগে পাণ্ডুলিপি চিত্র চরম উৎকর্ষে পৌঁছে। মনে হয়, পাল আমলের সুবিখ্যাত সেই পাণ্ডুলিপি চিত্রের ধারাটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। পালযুগ থেকে মোগলযুগের অন্তর্বর্তী সময়ের শত শত বছর হয়ত তা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। অথবা সে-সময়ের সেসব চিত্র আবহাওয়াজনিত কারণে বা সংরক্ষণের অভাবে আমাদের সময় পর্যন্ত পৌঁছয়নি। হতে পারে এখনো আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় তা রয়েছে। আঠার শতকে চিত্রচর্চার কেন্দ্র হিসেবে মুর্শিদাবাদের উত্থান এ ধারণা সমর্থন করে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এছাড়া পটচিত্র তো গ্রামে-গঞ্জে সবসময়ই কমবেশি প্রচলিত ছিলই। ব্রিটিশ আসার আগে থেকেই প্রচুর চিত্রিত পট অঙ্কিত হয়েছে যাতে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও উজ্জ্বলভাবে রয়েছে।

মুর্শিদাবাদ স্কুলের প্রাথমিক মোগলরীতি বেশ জনপ্রিয় ছিল। এগুলো প্রধানত স্বতন্ত্র ছবি। অনেক সময় একত্রে বাঁধাই করা। স্থানীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত পাহাড়ী ছবির নিম্নমানের

তা পার পায় নি সর্বসাধারণের জগতে। বরং হাল আমলে পুরানো-যে দ্বিধা-সংকোচ সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্য বাদ্যের ব্যাপারে ছিল তা অনেকটাই বিদূরিত হচ্ছে নতুন চিন্তাচেতনায়। মরমী সঙ্গীতজ্ঞ লালন ফকির, হাসন রাজা থেকে শুরু করে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা, ওস্তাদ আয়েত আলি খা, মুন্সী রইসউদ্দিন, মোহাম্মদ হোসেন খসরু, গুল মোহাম্মদ খা, আব্বাসউদ্দিন, আবদুল আলিম প্রমুখ খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী আবির্ভূত হয়ে এ পথকে করে তুলেছেন আরো প্রশস্ত। অনুরূপভাবে, চিত্রশিল্পে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন যে-রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছেন, তার ফলেই বর্তমানকালে অমিতসম্ভাবনাপূর্ণ একরাশ চিত্রশিল্পীর জন্ম হতে পেরেছে এদেশে। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলতে যে-মুসলমানদের দ্বিধা-সংকোচের অন্ত ছিল না তথাকথিত ধর্মীয়-বিধিবিধানে, আজ তাই ঝেড়ে ফেলে ক্রীড়াজগতেও তারা এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে—ফুটবল, ক্রিকেট, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদি থেকে দাবা খেলা পর্যন্ত। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে তাতে অংশগ্রহণ করছে। অংশগ্রহণ করছে অভিনয়ে, নাটকে, চলচ্চিত্রেও। আজো হয়ত এমন লোকের অভাব একেবারে না হবে না যিনি মরে গেলেও ফটো তুলতে চাইবেন না, কিন্তু তবুও এ-হল অতীতের বিস্মৃতলোকের মতই দু'চারটি উদাহরণ মাত্র !

বস্তুত এদেশে শিল্পকলার সমস্ত বিষয়ই অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে বহুদিন ধরে আবর্তিত হচ্ছে। এর ফলে অগ্রগতি হচ্ছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। পূর্বোক্ত গ্রন্থে আবুল মনসুর বিষয়টি পর্যালোচনা করেন এভাবে, 'যখন শিল্পকলা কিছু পরিমাণে (মুসলিম সমাজে) সহ্য করা হতে লাগলো তখন একমাত্র ইসলামী ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও অনুসরণই করনীয় বলে মত প্রকাশ করা হল। বাঙালী শিল্পীসমাজে এ মতের অনুসারী কখনোই বিশেষ পাওয়া যায় নি। তবে তাঁরা যে সবসময় ঐতিহ্যের সঠিক অনুসন্ধানে ব্রতী ছিলেন একথাও বলা যাবে না। এ বিষয়ে বরং তাদের ঔদাসীন্য ও পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মনোভঙ্গিই প্রকট। তবে পাকিস্তানের পরাধীন পরিবেশে একটি ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা সবসময়ই প্রবল ছিল, শিল্পকর্মে তার পরিচয় থাকুক বা না-থাকুক, অধিকাংশ শিল্পীই এ মানসিকতার সঙ্গে সমন্বয় করে চলতেন।'

বাংলাদেশ হলে পর, আবার আবুল মনসুরেরই ভাষায়, 'শিল্পকলায় আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় বিধৃত থাকতে হবে—এটাই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় বুলি। এছাড়া সরকারি মহল থেকে শিল্পের গণমুখীনতা ও সামাজিক ভূমিকার কথাও বলা হত। কিন্তু এসকল ধারণার শৈল্পিক প্রতিরূপ সম্পর্কে কল্পনা ছিল অস্বচ্ছ ও পরস্পর বিরোধী। এমন কি শিল্পকলায় আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কেও ধারণা পরিষ্কার ছিল না। একটি শক্তিশালী লৌকিক ধারা, পাল-সেন আমাদের ভাস্কর্য, মৃৎফলক ও পাণ্ডুলিপি চিত্র, স্থাপত্য ও স্থাপত্য-অলঙ্করণের ইসলামী ঐতিহ্য, চিত্রকলায় প্রাদেশিক মুগল রীতি, বৃটিশ প্রভাবে অঙ্কিত চিত্ররীতি, বেঙ্গল স্কুলের ছাঁচে ঢালা প্রথাগত রীতি এবং সমকালীন পাশ্চাত্য শিল্পকলার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব—সব একাকার হয়ে গেল।' এ 'সব একাকার' হয়ে যাওয়া থেকে মুক্তিই কেবল দিতে পারে এদেশের শিল্পকলায় নতুন মাত্রাজ্ঞান-ভাবকল্পনা-রীতিবৈচিত্র্য-রূপময় বৈশিষ্ট্য।

অনুকরণ উনিশ শতক অবধি প্রচলিত ছিল। ওড়িশি চিত্ররীতি এসময় বাংলার ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে এর সংলগ্ন জেলাগুলোতে। রাজস্থানি প্রভাবও পড়ে। ইংরেজ রাজত্বকালে ইউরোপিয় চিত্রকলার সংস্পর্শে এসে দেশীয় চিত্ররীতিটি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। এজন্য ইংরেজ আমলকে কেউ কেউ ভারতীয় চিত্ররীতির মৃত্যুঘণ্টা বলে অভিহিত করেন।

লক্ষণীয় যে, শতবর্ষের ওপর ঢাকা মোগলদের প্রাদেশিক রাজধানী থাকলেও স্থাপত্য ছাড়া মুর্শিদাবাদের মত কোন প্রাদেশিক মোগল রীতি বা স্বতন্ত্র কোন ধারার চিত্ররীতি এখানে গড়ে উঠেছে বলে জানা যায় না। ফরিদপুরের মত কয়েকটি হাতে-গোনা অঞ্চলে কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে যেগুলোতে প্রধানত লৌকিক ধারার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, কিছুটা মোগলরাজপুত প্রভাবসহ। আঠার শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের শুরুর দিকের দুটি জল রং সিরিজ 'ঈদ' এবং 'মুহরম'-এর চিত্র বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আছে। আলম মুসাব্বির এগুলোর শিল্পী বলে কথিত। ছবিগুলোর মান তেমন উন্নত নয়। ব্রিটিশ প্রভাবও লক্ষণীয়।

অন্যদিকে, নাচ-গান-বাজনা ইত্যাদিতেও কি ইসলামধর্মীদের উৎসাহের কমতি ছিল! ধনিক-বণিক-সামন্ত বাদশা-সুলতান-আমীর-ওমরাহের পৃষ্ঠপোষকতায় সময়ে সময়ে এসব প্রভূত উন্নতি লাভ করে। সুলতানি-বাদশাহি আমলের নানা কাব্যগাথায় নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির চিত্র পাওয়া যায়। দৌলত উজির বাহরাম খান-এর *লায়লী মজনু*'তে আছে 'অনেক মধুর বাদ্য বাজাও বিশাল' অথবা 'ন্বত্য গীত নটরঙ্গ যন্ত্র যত ইতি' ইত্যাদি। 'পটেত বিচিত্ররূপ দিলেন্ত লিখিয়া'—চিত্রশিল্পের কথাই স্মরণ করায়। গানবাজনা-যে কত জনপ্রিয় সে-সময় ছিল তা বোঝা যায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুকরণে বাংলায় রাগ-তালের যেসব বই মুসলমানরা লিখেছেন তা থেকে। 'পণ্ডিত' নামধারী মুসলিম সঙ্গীত বিশারদরা হাড়ি-ডোমদের গানবাজনা শেখাতেন। চট্টগ্রামের চম্পাগাজী পণ্ডিত, কমর আলি পণ্ডিত, বখশ আলি পণ্ডিত, ওয়ারিশ পণ্ডিত লোকস্মৃতিতে আজো অমর। সঙ্গীতের উচ্চ সাধনার ফলেই সম্ভবত কিছু কিছু মিশ্র রাগ-রাগিণীর পর্যন্ত সৃষ্টি হয়। যেমন, ধানসী বেগরা, ধানসী বেরুণী, বেরুণী-সিন্দুরা, বেউরপুরী ভাটিয়াল, ভাটিয়াল বৈরাগী ইত্যাদি। ফাজিল নাসির মুহম্মদ-এর *রাগমালা* এবং আলি রজার *ধ্যানমালা* সে-সময়ের সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ষোল শতকের মীর ফয়জুল্লাহ, সতেরো শতকের আলাওল, আঠার শতকের ফাজিল নাসির মুহম্মদ, কাজি দানিশ, আলি রজা, চম্পাগাজী, বখশ আলি মুজফ্‌ফর, তাহির মাহমুদ প্রমুখ, উনিশ শতকের দোবান আলি, সন্তু খা, মুহম্মদ আজিম, জীবন আলি, বিশ শতকের আবদুল ওহাব সঙ্গীতশাস্ত্র সংকলন করেন।

এসব ছাড়াও গ্রামীণ ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত যাত্রাগান, ঘাটুগান, কবিগান-এর মত লোকায়ত শিল্পগুলোও সুদূর অতীত থেকে চর্চা হয়ে আসছে। জারিগান, সারিগান, মুর্শিদি, ভাটিয়ালির মত জীবন-অন্বিষ্ট গীত-বাদ্যও সর্বদাই চালু রয়েছে। নাটক-সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদি আধুনিক যুগের প্রয়োজন-মাফিক আবির্ভূত হয়ে মুসলমান মানসে ঠাঁই করে নিয়েছে। রক্ষণশীলরা কখনো কখনো এসবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেও

স্থাপত্য

মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, দরগা প্রভৃতি ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত স্থাপত্য নিদর্শনগুলোসহ প্রাসাদ, মিনার স্মৃতিসৌধ, মাজার, দুর্গ, প্রাকার ইত্যাদি হল মুসলমান যুগের স্থাপত্য-শিল্প কীর্তি। ইসলাম ধর্ম অনুসরণে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে এসবের সৃষ্টি। এসব তৈরির রীতিনীতি মুসলমানরা গ্রহণ করেছে নানা দেশ থেকে—প্রাচীন ইরান, গ্রীস, বাইজেন্টাইন ইত্যাদি থেকে। তবে গম্বুজ, মিনার ইত্যাদির আদিসৃষ্টি ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও, মুসলমানরা এগুলো এত বহুল পরিমানে ব্যবহার করেছে যে, ইসলামী স্থাপত্যরীতি বললে যেন এখন এগুলোই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সদাসর্বদা। আহমদ হাসান দানি'র মত বিশেষজ্ঞ-পণ্ডিত ব্যক্তিগণ মুসলমানকৃত এ ধরনের নানা স্থাপত্যকর্মকে 'মুসলিম স্থাপত্যশিল্প' বলতে ইচ্ছুক। কেউ কেউ অবশ্য এর সম্মিলিত নাম 'ইসলামী শিল্পকলা'ও দেন। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার খিলান, গম্বুজ, মিনার এবং মিহ্‌রাব যেমন এ শিল্পে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমন ব্যবহৃত হয়েছে জেরুসালেম বা দামেস্কের সবুজ ও সোনালি রঙের মোজাইক অথবা পারসিক টালিকাজের চমৎকার রং কিংবা অত্যাশ্চর্য স্পেনীয় ফ্যানটাসি'র কারুকাজের স্থলে বাংলার অতীত ঐতিহ্যের অনুসরণে অপরূপ শিল্পমণ্ডিত পোড়ামাটি ফলক। আবার, প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনে মানুষ এবং প্রাণী অঙ্কন নিষিদ্ধ থাকায় হাজারো রকমের জ্যামিতিক নকশার অলঙ্করণে অথবা লিপি-শৈলীতে অট্টালিকাগুলো হয়েছে সুচারু ও সুসমৃদ্ধ।

অন্যদিকে, এসব প্রাসাদ-অট্টালিকা গড়ে উঠছে অনেকটাই স্থানীয় চাহিদা, প্রয়োজন এবং জলহাওয়ার ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের অফুরন্ত ঝড়-জল-বৃষ্টি এবং বাঁশঝাড়ের উপস্থিতিতেই এখানে ঘরবাড়ি তৈরিতে সর্বদা ব্যবহৃত হয়েছে বাঁশ এবং দোচালা-চারচালা ধরনের খাড়া বাঁকানো চাল যাতে বৃষ্টিতে পানি আটকে না-থেকে ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়ে যায়। আরো ব্যবহৃত হয়েছে মাটি, কাদা ও পাটশোলা, যা সবই স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত। চমৎকার ধরনের পলিমাটি-কাদা বাংলায় পাওয়া যায় স্মরণাতীত কাল থেকেই। এ যেমন ব্যবহৃত হয়েছে ঘর ও বেড়া লেপায়, তেমন এ থেকে তৈরি হয়েছে আগুনে পোড়ানো ইট এবং রকমারি অলঙ্করণের ফলক। সারা বাংলায় পাথর নেই বলতে গেলে। মালদা জেলার রাজমহল পাহাড় থেকে আনতে হয় কালোপাথর। বেলেপাথর এবং গ্রানাইট আনতে হয় বিহার থেকে। তাই পাথরের চেয়ে ইটের ওপর নির্ভর করেই এদেশে বাড়িঘর তৈরি করতে হয়েছে। এজন্য বাংলার স্থাপত্য শিল্পকে 'ব্রিক স্টাইল' বা ইটা পদ্ধতিও বলা হয়।

ইটের ব্যবহারও আবার অফুরন্ত নয়। হয়তবা এর অপ্রাপ্যতা, তৈরির প্রচুর খরচই দায়ী। দায়ী সামন্ত আমলের বিধি নিষেধও হতে পারে। প্রভুর অনুমতি ছাড়া হয়তবা সেসব বাড়ি তৈরি হত না। আবার বাঁশের প্রাচুর্যও হয়ত সেসব তৈরিতে নিরুৎসাহিত করত। যাই হোক, এদেশে স্মরণাতীতকাল থেকে বাঁশের তৈরি গৃহই ছিল প্রধান স্থাপত্য কর্ম। এসবের ছাদে ব্যবহৃত হয় শুকনো খড়। বিত্তশালীরা এসব ঘরে নানাধরনের কারুকার্য হয়ত করত অথবা হয়ত এধরনের তৈরি ঘর কাঠের কড়িবর্গা-টিন দিয়ে তৈরি করত। আজো করে। বাঁশের ধরনে তৈরি গৃহই অতীতে ইটের তৈরি বাড়িঘরও প্রভাবিত

করেছে। এ প্রভাব তিনভাবে দেখা যায় : স্থাপত্যের গঠনপদ্ধতিতে, এগুলোর ধরন ধারণে এবং তৈরির মাল মশলায়। বস্তুত খড়ের ঘর থেকেই মুসলিম যুগে দোচালা-চৌচালা ধরনের অট্টালিকা তৈরির প্রচলন ঘটে। ১৪৫৯-তে ষাট গম্বুজ মসজিদ তৈরির সময় থেকে চৌচালা এবং শাহজাহানের আমলের দোচালার প্রচলনের সাক্ষ্য আজো রয়েছে। বাঁশের তৈরি ঘরের চার কোণে বাঁশের খুঁটির ওপর বাঁশের কড়িবর্গার মত করে অট্টালিকা তৈরির পদ্ধতি শুরু হয় জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ্র সময় থেকে। কার্নিসের কার্ভেচার এবং ছাদের কিনারা-দেয়ালও তাঁর সময় দেখা যায়। কোণের টাওয়ার বা চুড়োগুলোর তলে খুঁটি এমনভাবে ব্যবহৃত যেন মনে হয় সেগুলো এরাই ধরে রেখেছে। গুনমন্ত মসজিদ এবং পুরানো মালদার জামে মসজিদ নৌকার ছই-এর অনুসরণকৃত। কিনারার স্তম্ভ থেকে ক্রমে ছাদের মধ্যস্থলে সুউচ্চ খিলান তৈরির কায়দাও এসেছে গ্রামবাংলার কুঁড়েঘরের অনুসরণে। আদিনা মসজিদের মিহরাবে যে কারুকাজ দেখা যায় তা এ উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এ ধারাটি বাংলার অট্টালিকায় খুবই প্রচলিত।

চুনা ব্যবহার মুসলিম সময়কালে বাংলার স্থাপত্যকলার আর এক বৈশিষ্ট্য। এর আগে চুনের ব্যবহার এদেশে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য তখনকার তৈরি-পদ্ধতির জন্য এর তেমন দরকারও হত না। তখন ইট বা পাথর একটির ওপর আর একটি স্থাপন করে কেবল ভর বা ওজনের ওপর দালানের ভারসাম্য রক্ষা করা হত। এজন্য ইট বা পাথর করতে হত খুবই মসৃণ যাতে খুব সুন্দরভাবে জোড়া লাগে, নড়চড় না-করে। ঢাকার পরিবিবি'র স্মৃতিসৌধ এরূপ পাথরের ওপর পাথর চাপিয়ে প্রাক-মুসলিম রীতিতে তৈরি। 'ট্রেবিয়েটেড কনস্ট্রাকসান' নামে পরিচিত এ পদ্ধতি পরে পরিত্যক্ত হয়। খিলান বা গম্বুজের জন্য এ পদ্ধতি ছিল অনুপযুক্ত। অপ্রয়োজনীয়ও হয়ে পড়ে চুন-বালি-পানি মিশ্রিত মশলা ব্যবহারের দরুন। টেকসই করার জন্য ইটের আকার করতে হয় ছোট। পলেস্তরা হিসেবেও চুনের ব্যবহার শুরু হয়, বিশেষত ছাদের কিনারা বরাবর দেয়ালে বা প্যারাপেটে, ছাদে এবং গম্বুজে, যাতে ভবনটি জল-হাওয়া-রোদ থেকে রক্ষা পায়। মোগল আমলে পলেস্তরা ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। দেয়ালেও তা করা হত। পনের শতক থেকে গ্লেজড্ টাইল বা চকমকে টালি'র ব্যবহার শুরু হয়। এগুলো একরঙা অথবা বিচিত্র বর্ণালঙ্কৃত হত। কোনকোনটিতে ফুললতাপাতা বা জ্যামিতিক নকশাও আঁকা হত। টালিগুলো সম্ভবত স্থানীয়ভাবেই তৈরি হত।

মহাস্থান, ময়নামতী, পাহাড়পুর আবিষ্কারের পর দেখা গেছে কী ধরনে কৌণিক এবং ফ্যাসেট বা পল, খাঁজ এবং উদগত অংশ, শক্ত কোণা ও দেয়ালের ওপরে বা বাইরে কারুকাজ কেমন ভূমিকা মুসলিম স্থাপত্যকলায় রেখেছে। এগুলোর সবখানেই অত্যন্ত ভারি গৃহ গড়ার একটা প্রচেষ্টা যেন রয়েছে যাতে শক্ত ভিত এবং বিরাট টাওয়ার সহ সেগুলো তৈরি করা যায়। মুসলিম স্থাপত্যকলায়ও এসবের চিহ্ন রয়েছে। একক স্তম্ভ এ ধরনের ঐতিহ্যবাহী আর এক চিহ্ন। এক আদিনা মসজিদ ছাড়া এ ঐতিহ্য সর্বত্র অনুসৃত। খিলান ধরে রাখার জন্য বিরাট আকৃতির যে পাথরের স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে তাও অতীত অনুসরণে। কারুকার্যখচিত কাটা এবং লাল ইটের ব্যবহারও সেই প্রাচীন

ঐতিহ্যের স্মারক। এরই সাথে রয়েছে সমৃণ পাথরের ওপর নানা ধরনের অলঙ্করণ। পোড়ামাটির ফলকে দেয়াল সজ্জিত করার ঐতিহ্য তো শত শত বছরের পুরানো। বাংলায় প্রাক-মোগল যুগে এর ব্যবহার ছিল অবশ্যম্ভাবী। দেয়ালে তখন পলেস্তরা লাগান হত না।

মোগলরাই দেয়ালে পলেস্তরাসহ নানা রঙের ব্যবহার শুরু করে। তারা পোড়ামাটির ফলক সামান্যই ব্যবহার করেছে। তারা এছাড়া ব্যবহার করেছে জ্যামিতিক নকশা যা এমনভাবে লতানো করা হত যেন সামনে যাই পেত সবকিছুকেই জড়িয়ে-ধরে চলে। শিকল ও ঘণ্টার অনুকরণে এক ঝুলন্ত পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়েছে আঙুরগাছের মত করে। এসব লতানো অলঙ্করণগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে কেমনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তা একটু খেয়াল করলেই ধরা পড়ে, বিশেষ করে জংলি দৃশ্যগুলো। হিন্দু-বৌদ্ধ কারিগর সমকোণী চতুর্ভুজাকৃতির পাথরের চাঁইয়ের ওপর দেবদেবীর যেসব মূর্তি আঁকত, তার স্থান মুসলমান যুগে নেয় ফুললতাপাতা-জ্যামিতিক নকশার অলঙ্করণ। স্তম্ভ কখনো-বা চমৎকার বক্রিম করা হত। করা হত নানা অলঙ্করণে পূর্ণ। অলঙ্কৃত মিহরাব যেমন হত, তেমন দরজার বাঁকা চৌকাঠ এবং কড়ি বর্গায় হত ফুললতাপাতার অলঙ্করণ। ফলক বা ইটেও আগের দেবদেবী বা মানুষের প্রতিকৃতির স্থানে এল ফুললতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশার অলঙ্করণ।

২.

মুসলিম যুগের (১২০৫-১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার স্থাপত্যশিল্পকে স্পষ্টতই দু'ভাগে ভাগ করা যায় : প্রাক-মোগল এবং মোগল। প্রাক-মোগল আবার নানা বৈশিষ্ট্য দিয়ে কয়েক ভাগে চিহ্নিত : ক. মামলুক ধরন; খ. প্রাথমিক ইলিয়াস শাহী ধরন ; গ. একলাখি ধরন; ঘ. পরবর্তী-ইলিয়াসশাহি ধরন ঙ. হোসেনশাহি ধরন; চ. খানজাহান ধরন; এবং ছ. স্থানীয় সামন্তজমিদারের জনপ্রিয় ধরন। মোগল আমলেও প্রাক-মোগল যুগের স্থাপত্যশৈলী বেশ জনপ্রিয় ছিল, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এবং মন্দিরে। ধরনের দিক দিয়ে তাই মোগল যুগে দু'রকম স্থাপত্য দেখা যায়; ক. প্রাদেশিক মোগল ধরন ও খ. মোগল যুগের মন্দিরাদির ধরন।

বর্তমানকালে লভ্য অতীতের স্থাপত্যের ভেতর মসজিদগুলোর গঠনশৈলী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্থানীয় আবহাওয়া ঝড়জল এগুলো তৈরিতে করেছে প্রভাবিত। এদেশের মসজিদ হল একটি টানা একক ভবন যেখানে থাকে নামাজ পড়ার জন্য খোলামেলা জায়গা। ভবনের সামনে ঘাসে-ভরা ফাঁকা মাঠ, হয়তবা একদিকে পুকুর। আদিনা মসজিদ এবং ঢাকার কোন কোন মসজিদের পুরানো ধারা ছাড়া এইই হল সারা বাংলার মসজিদের ধরন।

প্রাক-মোগল মসজিদ দেখা যায় চার ধরনের : এক গম্বুজ বিশিষ্ট, সামনে বারান্দাসহ এক গম্বুজঅলা, বহু গম্বুজবিশিষ্ট, এবং কেন্দ্রীয় নাভিকুণ্ডসহ বহু গম্বুজবিশিষ্ট—ছাদ যেখানে ফাঁপা খিলান, যেমন আদিনা মসজিদ, অথবা চৌচালা কুঁড়ের মত, যেমন ছোটসোনা মসজিদ। খাঁটি বাংলার ধরন হল বর্গক্ষেত্রাকার বা আয়তাকার

চার কোণে আটকোণাকৃতির চূড়াসহ ফ্যাসেড বা বাড়তি সম্মুখভাবে বাঁকা কার্নিস এবং মোগল ধরনের সমতল প্যারাপেট। প্রাক-মোগল কোন কোন মসজিদে ছিল মেয়েদের জন্য গ্যালারি। মোগল যুগে তা নেই। মসজিদের অভ্যন্তরে বসার সকল ভাগ সোজা, খোলা দরজার সরাসরি, কেবল 'কেবলা'র দিক ছাড়া। বাংলার উষ্ণ জলবায়ুতে এর ফলে প্রচুর আলোবাতাস ভেতরে ঢোকার সুযোগ থাকে। কিন্তু বৃষ্টি যাতে আবার ভেতরে ঢুকতে না-পারে সেজন্য দরজাগুলো হয় নিচু ও ছোট আকারের। কোন কোন মসজিদ মন্দিরের মালমসলা দিয়ে তৈরি। কখনো-বা মন্দিরকেই একটু ঠিকঠাক করে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সাধারণত মূর্তি বা মনুষ্য-প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেয়াল, স্তম্ভ ইত্যাদি থেকে সেগুলো ভেঙে মুছে ফুললতাপাতার নানা অলঙ্করণ করা হয়েছে। প্রাচীন ধারায় দেশীয় ঐতিহ্য পদ্মফুলের ব্যবহারও এতে আছে।

তুর্কি মুসলমানদের প্রাচীনতম দখলিস্থান লখনৌতি বা দেবকোট-এর কোন স্থাপত্য চিহ্ন বর্তমানে আর নেই। কিন্তু ত্রিবেনি, সাতগাঁও এবং ছোট পাণ্ডুয়ায় কিছু কিছু চিহ্ন রয়েছে। ত্রিবেনিতে জাফর খান গাজীর মসজিদ ১২৯৮-এ তৈরি হয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে। এটি বহু গম্বুজবিশিষ্ট। এতে কেবল আছে নামাজ পড়ার জায়গা। ছোট পাণ্ডুয়ার শাহ শফিউদ্দিনের দরগায় আছে একদিকে তাঁর স্মৃতিসৌধ এবং অন্য দিকে ছোট ছোট মসজিদ। স্মৃতিসৌধটি একগম্বুজবিশিষ্ট। চার কোণে চারটি উঁচু চূড়াসহ এটি একটি বর্গাকার ভবন। কার্নিস এবং ছাদ বরাবর পাঁচিলটি এর বাঁকা। মোগল আমলে এটি পুনর্নির্মিত হয়। দরগাহ মসজিদটিও একগম্বুজবিশিষ্ট। বর্গাকার। ইট দিয়ে তৈরি। ছোট পাণ্ডুয়ার মিনার এবং বড়ি মসজিদ চোদ্দ শতকের প্রথমদিকে তৈরি। মিনারটির উচ্চতা ১২৫ ফুট। বড়ি মসজিদ জাফরখান মসজিদের মতই। এর উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল সম্ভবত মেয়েদের বসার জারগা। হুগলি জেলার মোল্লা সিমলা গ্রামের মসজিদটি তৈরি হয় ১৩৭৫-এ। ঢাকার বিনত বিবির মসজিদ ১৪৫৭-তে তৈরি। এটি একগম্বুজবিশিষ্ট।

বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলে যেসব মসজিদ, স্মৃতিসৌধ, দরগা, মাদ্রাসা ও অন্যান্য ভবন তৈরি হয় যার ধ্বংসাবশেষ বর্তমানেও পাওয়া যায় এরূপ কতকগুলোর বর্ণনা দেওয়া গেল।

আদিনা মসজিদ : নির্মাতা সিকান্দার শাহ। মালদা জেলার পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত। বিরাট এর আকৃতি। মাত্র পশ্চিম দিকের কিছু অংশ বর্তমান। এ অংশটির বাইরে ও ভেতরে চমৎকার কারুকাজ। দেবতার মূর্তিও বিদ্যমান।

আজম শাহর (?) কবর : নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনার গাঁ অঞ্চলের মগরাপাড়া নামক স্থানে এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। পাঁচপির দরগার কাছেই। আদিনা মসজিদের প্রভাব এতে বিদ্যমান। স্মৃতিসৌধটির উপরে আছে বাতি দেওয়ার স্থান—চেরাগদান।

একলাখি ভবন : সম্ভবত গণেশ-যুগে তৈরি। মূলে হয়ত ছিল মন্দির। পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত। আগাগোড়া ইটে তৈরি। এনামেল টালিও ব্যবহৃত হয়েছে।

চিকা মসজিদ : জালালি ভবন নামে পরিচিত। ভেতরে বাদুর বা চিকা ছিল বলে চিকা মসজিদ বলা হয়। একলাখি ভবনের ব্যর্থ অনুকরণ। গৌড়ে অবস্থিত।

ধুনিচক মসজিদ : গৌড়ে অবস্থিত। কিছু দেয়াল মাত্র বিদ্যমান। সম্ভবত গণেশ বংশের পরে নির্মিত।

লোটন মসজিদ : গৌড় নগরীর দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। লোটন নামে জনৈকা নর্তকী কর্তৃক তৈরি বলে কথিত। মিনে-করা ইটে তৈরি ছিল। বর্তমানে মিনে উঠে গেছে।

কতোয়ালি দরজা : গৌড় নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। সম্ভবত নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় নির্মিত।

খান জাহান সমাধি : বাগেরহাটে অবস্থিত। দিল্লির তুগলক আমলের শিল্পকলার প্রভাব রয়েছে। ১৪৫৯-তে নির্মিত। এক গম্বুজবিশিষ্টি। চতুষ্কোণ।

ষাট গম্বুজ মসজিদ : উক্ত সমাধি-ভবনের কাছেই নির্মিত। ষাট গম্বুজ নামে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে সাতাত্তরটি গম্বুজ রয়েছে। বিরাট আকার বিশিষ্ট এ ভবনের এগার খিলান বিশিষ্ট পথ সামনে এবং সাতটি পাশ দিয়ে।

দাখিল দরজা : উত্তর দিক থেকে গৌড়-সুলতানদের দুর্গ ও প্রাসাদে প্রবেশ-তোরণ। ইটে তৈরি। অপূর্ব কারুকাজ সম্বলিত। সম্ভবত বারবক শাহর সময় নির্মিত।

বাইশগজি : গৌড় সুলতানদের প্রাসাদের একটি দেয়ালের অংশবিশেষ। বাইশ গজ উঁচু ছিল বলে কথিত। তাই এ নাম।

মসজিদ বাড়ি মসজিদ : বরিশালে অবস্থিত। মসজিদবাড়ি নামক গ্রামে। ১৪৬৫-তে জনৈক খান মুয়াজ্জম খান তৈরি করেন। খানজাহানি ধরন।

কসবা গ্রামের মসজিদ : বরিশাল জেলায়। খানজাহানি ধরন।

মসজিদকুর গ্রামের মসজিদ : খুলনায় অবস্থিত। খানজাহানি ধরন।

দরাসবাড়ি মসজিদ : গৌড়ের জামে মসজিদ। ১৪৭৯তে ইউসুফ শাহ নির্মাণ করেন। সম্ভবত কোন শিক্ষায়তন বা মাদ্রাসা এর সংলগ্ন ছিল। দরাসবাড়ি অর্থ হল বক্তৃতা-কক্ষ বা মাদ্রাসা ।

চামকাটি মসজিদ : গৌড়ে অবস্থিত। ইটে তৈরি। কিছু পাথরের কাজও আছে। সম্ভবত ইউসুফ শাহর সময় নির্মিত। হয়ত চামকাটি নামে পরিচিত মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত হত।

খনিয়া দিঘি মসজিদ : গৌড়ে খনিয়া দিঘির কাছে অবস্থিত। তাই এ নাম। গঠন চামকাটি মসজিদের মতই।

তাঁতীপাড়া মসজিদ : গৌড় নগরীর তাঁতীপাড়ায় অবস্থিত। এ থেকেই এ নাম। ১৪৮০-তে নির্মিত। অঙ্গগুলো সমানুপাতে বিন্যস্ত। সূক্ষ্ম ও অপূর্ব কারুকাজ। অলঙ্করণে টেরাকোটা বা কারুময় ইটের নিদর্শন রয়েছে।

বাবা আদম মসজিদ : মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপাল গ্রামে অবস্থিত। ফতেহ্ শাহর সময় জনৈক মালিক কাফুর ১৪৮৩-তে এটি তৈরি করেন। গঠন কৌশল গণেশ বংশ-পরবর্তী সময়ে নির্মিত গৌড়ের মসজিদগুলোর মত।

গুণমন্ত মসজিদ : গৌড় নগরীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত। চার কোণে তৈরি স্তম্ভগুলো আটকোণাকার। ইট ও পাথর ব্যবহৃত। ইটের অংশে কারুকার্যময় টেরাকোটা ব্যবহৃত।

পাথরে তৈরি অংশেও এর নকল রয়েছে। ফতেহ্ শাহ অথবা হোসেন শাহি আমলে তৈরি।

শাহজাদপুর মসজিদ : পাবনা জেলার শাহজাদপুর-এ অবস্থিত। নির্মিত সম্ভবত পনের শতকে। পনের গম্বুজ বিশিষ্ট। শাহ মকদুমের দরগার কাছেই অবস্থিত।

ফতেহ্ খানের সমাধি ভবন : গৌড়ে অবস্থিত। দোচালা কুঁড়েঘরের মত গঠন। কেউ বলেন মূলে এটি মন্দির ছিল। কারো মতে, এটি গণেশ আমলে নির্মিত। কারো মতে মোগল আমলে।

ফিরোজ মিনার ঃ গৌড়ে অবস্থিত লাল রঙের এ মিনারটির নির্মাতা সইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ। উচ্চতা ৮৪ ফুট। নিচের অংশের পরিধি ৬২ ফুট। বাঁকানো ৭৩টি সিঁড়ি উপরে ওঠার জন্য ছিল। শীর্ষে ছিল গম্বুজ। এখন সবই ভাঙা।

গুমটি দরজা : গৌড় নগরীতে ঢোকার পূর্বদিকের ফটক। সম্ভবত হোসেন শাহ্‌র সময় তৈরি। গঠন কৌশল সুন্দর। জমকালো। তবে হাল্কা ধরনের।

ছোট সোনা মসজিদ : গৌড়-এর সর্বদক্ষিণ প্রান্তে বাংলাদেশের ফিরোজাবাদ গ্রামে অবস্থিত। হোসেন শাহ্‌র সময় জনৈক ওয়ালি মুহম্মদ-এর নির্মাতা। সোনালি রঙের গিলটির কারুকাজ ছিল। এখনো কিছু কিছু আছে। চার কোণে চারটি আটকোণ বিশিষ্ট স্তম্ভ।

সুরা মসজিদ : দিনাজপুর জেলার সুরা গ্রামে অবস্থিত। সম্ভবত হোসেন শাহ্‌র সময় নির্মিত। ইট ও পাথর ব্যবহৃত। ছোট সোনা মসজিদের মত গঠন কৌশল। অভ্যন্তরের কারুকাজ থেকে মনে হয় একদা একটি মন্দির ছিল।

বড় গোয়ালি মসজিদ : কুমিল্লার বড় গোয়ালি গ্রামে ১৫০০ খ্রী তে তৈরি।

বাঘা-মসজিদ : রাজশাহি জেলার বাঘা গ্রামে অবস্থিত। নসরত শাহ্‌র সময় ১৫২৩-এ নির্মিত। ইটে তৈরি। জমকালো কারুকাজে ভরা।

নবগ্রাম মসজিদ : পাবনা জেলার নবগ্রামে। নসরত শাহ্‌র সময় ১৫২৫-এ তৈরি। গঠন ও কারুকাজে লোটন মসজিদ ও গুমটি দরজার সাথে মিল রয়েছে।

বড় সোনা মসজিদ : গৌড়-এর বৃহত্তর মসজিদ। এর অন্য নাম বারদুয়ারি মসজিদ। ইট এবং পাথর ব্যবহৃত। পাথরের ওপরে নানা কারুকাজ। উপরে এগারটি গম্বুজ। গম্বুজগুলো সোনালি রঙে গিল্টি করা। ১৫২৫-২৬-এ নসরত শাহ এটি নির্মাণ করেন।

কদম রসুল ভবন : গৌড়ে অবস্থিত। এক গম্বুজ বিশিষ্ট। নির্মাতা নসরত শাহ। ১৫৩১-এ তৈরি। গঠন-কৌশল কারুকার্যময়। তবে হাল্কা ধরনের। আটকোণ বিশিষ্ট বিরাট স্তম্ভের ওপর তিনটি খিলান। কক্ষের ভেতরে হজরত মুহম্মদের (সঃ) কথিত পদচিহ্ন সম্বলিত একটা উঁচু কালোপাথরের বেদী। পাথরটি বর্তমানে নেই।

সালিকপুরা মসজিদ : ঝিনাইদহের সালিকুপা মৌজায় অবস্থিত। এজন্য সালিকুপা মসজিদ নামেও পরিচিত। তৈরি সম্ভবত নসরত শাহের সময়। হাল আমলে অপরিকল্পিত সংস্কারের ফলে এর প্রাচীন বৈশিষ্ট্য কিছুটা বিলুপ্ত। খানজাহানি ধরনে তৈরি।

ঝনঝনিয়া মসজিদ : মূল নাম সম্ভবত জাহানিয়া মসজিদ। আড়ম্বরপূর্ণ কারুকাজ। একটু আতিশয্যে ভরা। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহর সময় নির্মিত। ছাদে চ'টি গম্বুজ।

শঙ্করপাশা মসজিদ : সিলেট জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে অবস্থিত। সম্ভবত হোসেনশাহী আমলে তৈরি। গঠন জমকালো। অলঙ্করণ আড়ম্বরপূর্ণ।

কুসুম্বা মসজিদ : রাজশাহিতে অবস্থিত। এটি ১৫৫৮-তে তৈরি। এতে হোসেনশাহি ধরন স্পষ্ট। এতে আছে পূর্ব-উত্তর কোণে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান।

কুতুব মসজিদ : কিশোরগঞ্জ-এর অষ্টগ্রাম-এ অবস্থিত। এর ছাদে রয়েছে পাঁচটি গম্বুজ।

এসব ছাড়াও সোনারগাঁও, মীরপুর এবং ঢাকার অন্যান্য স্থানে হোসেনশাহি আমলের আরো মসজিদ রয়েছে। ফরিদপুর জেলার পাথরাইল নামক স্থানের মজলিস আউলিয়া মসজিদ, দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ গ্রামের মসজিদ, বর্ধমানে কালনা'র মজলিস সাহেবের মসজিদ, বাগেরহাটের সালিক মসজিদ, মুর্শিদাবাদের খেরৌল গ্রামের মসজিদ, সিলেটের রুকন খান-এর মসজিদ স্বাধীন সুলতানি আমলেই তৈরি।

মোগল যুগে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যকলার অবসান ঘটে। মোগলরা দিল্লি-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রির ধরনে ভবনাদি নির্মাণ শুরু করে। মনে হয়, তাদের কাছে কারুকার্যখচিত ইটের অলঙ্করণ কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে নি। তাই এর প্রচলন অবলুপ্ত হয়ে যায়। দেয়ালে আসে পালেস্তরা। এ ছাড়াও বিরাট আকারের প্রবেশপথ এবং গম্বুজ, বিশেষ করে এক বা তিন গম্বুজের প্রচলন ঘটে এন্তার। টুকরো কাচে আয়তাকার বা খিলান ধরনের আকৃতিতে দেয়াল অলঙ্করণও চালু হয়। গম্বুজের জন্য পূর্বের মত পাথরের স্তম্ভ এখন থেকে আর ব্যবহৃত হয় না।

মোগল আমলে সাধারণত চার ধরনের মসজিদ দেখা যায়—বাংলো ধরন, এক গম্বুজ বিশিষ্ট, তিন গম্বুজঅলা, এবং উচ্চ মাচানের মত পাটাতনের ওপর তৈরি মসজিদ।

বস্তুত, স্থাপত্যকলায় বাংলা এবং উত্তরভারতীয় মোগলাই রীতির দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়ভাবেই পরিস্ফুট। স্বাধীন সুলতানি আমলে যেখানে দেশী রীতি-নীতির প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ছিল, দেখা যাচ্ছিল এদেশী দোচালা-চৌচালার ধরন অথবা পোড়ামাটির ঐতিহ্যিক অলঙ্করণ, তা মার খেয়ে যায় মোগলাই ধরনে—দিল্লী থেকে আগত রকমারি পদ্ধতির কাছে। এতে ডাইমেনসন বা বহুমাত্রিকতা বাড়ে ঠিকই কিন্তু দেশীয় পদ্ধতির আরো উৎকর্ষ হওয়ার সুযোগ গেল নষ্ট হয়ে। দুয়ের মিলনেও নতুন তেমন কিছু সৃষ্টি হল না। দিল্লির অনুকরণ ঘটল। অনুবৃত্তি হল। নবায়ন হল না তেমন।

১৫৮২-তে মুরাদ খান কাকশাল বগুড়ার শেরপুর-এ একটি মসজিদ তৈরি করেন। এর বাইরের দিকে প্রাক-মোগল ধরনের কিন্তু ভেতরে মোগল ঐতিহ্য অনুসরণে এক-কক্ষ বিশিষ্ট। উপরে তিনটি গম্বুজ। ১৬২৮-এ তৈরি বিবি মসজিদ এবং ১৬৩২-এ তৈরি খন্দকার টোলা মসজিদও মোগল বৈশিষ্ট্য কার্যকর করা হয় দেয়ালে পলেস্তরা লাগিয়ে। ঢাকার চক-এর চৌরিহাট্টা মসজিদ হল বাংলো ধরনের। ১৬৪৯-এ সুজার সময় তৈরি। মোহাম্মদপুর-এর আল্লাকুরি মসজিদ এক গম্বুজ বিশিষ্ট। এটি সম্ভবত শায়েস্তা খা-র সময় তৈরি। লালবাগ মসজিদ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। শাহজাদা আজম এটি তৈরি করেন। খাজা

শাহবাজ-এর মসজিদ ১৬৭৯-এ তৈরি তিন গম্বুজ ধরনে। আঠার শতকের শেষদিকে তৈরি মুসা খান-এর মসজিদও একইভাবে তৈরি হয়। মোহাম্মদপুরের সাতগম্বুজ মসজিদটি আসলে তিন গম্বুজঅলা। এর চার কোণে চারটি টাওয়ার-এর ওপর গম্বুজাকৃতি রয়েছে যার ফলে একে সাত গম্বুজ বিশিষ্ট মনে হয়। নারায়ণগঞ্জের বিবি মরিয়ম মসজিদও এ ধরনে তৈরি। করতলব খান মসজিদ বা বেগম বাজার মসজিদ ১৭০৪-এ মুর্শিদকুলি খাঁ (যার অন্য নাম করতলব খাঁ)-র সময় তৈরি। এটি পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট। খান মোহাম্মদ মিরধা মসজিদ ১৭০৬-এ তৈরি। এটি তিন গম্বুজঅলা। ভেতরে আছে হুজরাখানা। কোণে উচ্চ টাওয়ার।

মোগল আমলের বহু স্মৃতিসৌধ আছে ঢাকায়। ছোট কাটরবা'য় অবস্থিত বিবি চম্পা'র সৌধ এক গম্বুজঅলা। হজরত চিশতি বেহেশতির মাজার ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে। এটিও এক গম্বুজ বিশিষ্ট। খাজা শাহবাজ-এর মসজিদের পাশেই তাঁর স্মৃতিসৌধটিও এক গম্বুজ বিশিষ্ট। মোহাম্মদপুরের দারা বেগম-এর সৌধও এক গম্বুজের। এটি বর্তমানে মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সৌধগুলোর ভেতর লালবাগের পরিবিবির সৌধটিই সবচেয়ে সুন্দর।

মোগল স্থাপত্য শিল্পে কাটরা ভবনগুলো বিশেষভাবে উল্লেখের দাবিদার। আয়তাকার ধরনের এসব ভবনের মাঝখানে ফাঁকা প্রাঙ্গণ। চারধারে কক্ষ। বুড়িগঙ্গার দিকে মুখ করে তৈরি বড় কাটরা এধরনের একটি চমৎকার নিদর্শন। ১৬৪৪-এ এটি শাহ শুজা'র বাসস্থানের জন্য তৈরি হয়। ১৬৭৩-এ নবাব শায়েস্তা খান তৈরি করেন ছোট কাটরা।

তখনকার দিনে এদেশে দুর্গ তৈরি হত কাদামাটিতে। হয়তাবা সহজলভ্য বলেই। মির্যা নাথন-এর *বাহারিস্থান গায়েবি*'র বর্ণনায় মাটির দুর্গের অনেক উল্লেখ রয়েছে। শেরপুরে মানসিংহ একটি দুর্গ তৈরি করেছিলেন। ঢাকায়ও মোগল যুগের কয়েকটি দুর্গের চিহ্ন রয়েছে। ইসলাম খানের তৈরি পুরাতন দুর্গ-প্রাসাদের অংশবিশেষ বর্তমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল ও পূর্ব দরজায় রয়েছে। লালবাগ দুর্গটি আসলে অসম্পূর্ণ। ১৬৭৮-এ শাহজাদা আজম এটি শুরু করেন। শায়েস্তা খান এখানেই বাস করত।

প্রাক-মোগল ও মোগল যুগের মাত্র তিনটি মিনার সারা বাংলায় এখন পর্যন্ত টিকে রয়েছে : ছোট পাণ্ডুয়ার মিনার, গৌড়ে ফিরোজ মিনার এবং পুরানো মালদা'র নিমসরাই মিনার। ফিরোজ মিনার পরিকল্পনায় ও দেয়াল অলঙ্করণে একেবারেই বাংলার রীতিতে তৈরি। আর নিমসরাই মিনার ফতেপুর সিক্রির হিরণ মিনারের অনুকৃতি মাত্র। প্রাক-মোগল যুগে খুব কমই হয়েছে বিরাটাকারের তোরণ বা প্রবেশপথ। গৌড়ের গোমতি গেট বা ফটক হল সবচেয়ে বড়। মোগল যুগে বড় বড় তোরণের আবির্ভাব ঘটে গৌড়ে এবং ঢাকায়। মোগল আমলের ভবনাদিতে মূল বা মাঝের প্রবেশপথটি সবসময়ই বড় রাখা হয়েছে—তা মসজিদই হোক, আর হোক স্মৃতিসৌধ।

উভয় যুগেই প্রয়োজনের তাগিদে বড় বড় অনেক পুল তৈরি হয়। নদী-নালা-খাল-বিলে পূর্ণ এদেশে এর অত্যাবশ্যকতা বলা বাহুল্য। গৌড়ে আজো টিকে রয়েছে সহজ

পাঁচ স্প্যান বা খিলানের একটি পুল। অনেক পুলই এমনভাবে তৈরি হত যাতে সে-সবের নিচে দিয়ে পাল তোলা নৌকা যাতায়াত করতে পারে। ঢাকার সে-সময়ের পুলগুলো এমনভাবেই তৈরি।

নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে এখানেও বেশকিছু ভবন মোগল ধরনে গড়ে ওঠে। এসবের মধ্যে প্রাচীনতম হল চেহেল সেতুন বা চল্লিশ স্তম্ভের দরবার কক্ষ। এছাড়া বেশ কটি ইমামবারা তৈরি হয়েছিল। সিরাজদ্দৌলার তৈরি ইমামবারা ১৮৪৮-এ আগুন লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। মুর্শিদকুলির তৈরি কাটরা মসজিদটির সংলগ্ন ছিল বসবাসের স্থান। উঁচু মাচানের মত পাটাতনের ওপর এটি তৈরি হয়। সিরাজ বহু ব্যয়ে মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ অতি আকর্ষণীয়ভাবে তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ভাগীরথীর কোলে তা ভেসে গেছে। খোশবাগ নামের সুন্দর একটি বাগানও তৈরি হয়েছিল। এতে আলিবর্দি ও সিরাজের কবর আছে।

মুসলমান শাসন আমলের স্থাপত্যকীর্তিগুলোর মোটামুটি একটা তালিকা পাঠকদের সুবিধার্থে দেওয়া গেল।

ঢাকা মহানগর

বিনত বিবির, মসজিদ, ১৪৫৭
হায়াত বেপারি মসজিদ ও পুল, ১৬৬৪
পাগলা পুল, ১৭ শতক
আওরঙ্গাবার্দ দুর্গ (অর্থাৎ লালবাগ দুর্গ), ১৬৭৮
হাম্মামখানা ও দরবার কক্ষ (ঐ দুর্গে), ১৬৭৮
পরিবিবির স্মৃতিসৌধ (ঐ দুর্গে), ১৬৮৪
মসজিদ (ঐ দুর্গে), ১৭ শতক
আজিমউস-সান-এর প্রাসাদ (পোস্তায়), ১৭-১৮ শতক
ফররুখশিয়ার-এর মসজিদ, ১৮ শতকের প্রথমদিক
খান মুহম্মদ মৃধা বা অতীশখানা মসজিদ, ১৭০৬
ইসলাম খান মসজিদ, ১৭ শতক
নবরায় লেন মসজিদ, ১৭ শতকের প্রথমদিক
বড় কাটরা, ১৬৪৪
চৌরিহাট্টা মসজিদ, ১৬৪৯
ছোট কাটরা, ১৬৬৩
শায়েস্তা খান মসজিদ, ১৭ শতক
চকবাজার মসজিদ, ১৬৭৬
বিবি চম্পা স্মৃতিসৌধ, ১৭ শতক
করতলব খান (বা বেগম বাজার) মসজিদ, ১৭০০-০৪
হোসেনি দালান, ১৮ শতক
তারা মসজিদ, ১৯ শতক
বাদামতলির আসিরউদ্দিন স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ, ১৯ শতক
বড় ঈদগাহ, ১৬৪০
হাজি খাজা শাহবাজ-এর স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ , ১৬৭৯
আল্লাকুরি মসজিদ, ১৬৮০

হজরত চিশতি বিহিশতির স্মৃতিসৌধ, ১৭ শতক
কুঁড়েঘর ধরনে তৈরি অট্টালিকা, ১৭ শতক
দারা বেগম-এর স্মৃতিসৌধ, ১৭ শতকের মধ্যভাগ
সাতগম্বুজ মসজিদ, ১৭ শতকের শেষভাগ
মুসা খান-এর মসজিদ ১৮ শতক
মালিক অম্বর-এর মসজিদ, স্মৃতিসৌধ ও পুল, ১৬৭৯-৮০
টঙ্গি পুল, ১৭ শতক
হজরত শাহ আলির দরগা (মিরপুর) , ১৯ শতকে পুনর্নির্মিত

নারায়ণগঞ্জ

হাজিগঞ্জ : খিজিরপুর দুর্গ, ১৭ শতকের প্রথমদিক
বিবি মরিয়ম-এর মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ, ১৭ শতক
নবিগঞ্জ : কদমরসুল, স্মৃতিসৌধ (নারায়ণগঞ্জের উল্টোদিকে) , ১৮-১৯ শতক
বন্দর : সোনাকান্দা দুর্গ, ১৭ শতকের প্রথমদিক
বন্দর : হাজী বাবা সালেহর স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ, ১৬ শতক
বন্দর : খন্দকার মসজিদ ১৫ শতক
মুয়াজ্জমাবাদ : ফিরোজ খান মসজিদ, ১৫ শতক
শাহ লঙ্গর-এর স্মৃতিসৌধ
সোনারগাঁও মগরাপাড়া : আজম শাহ'র (সিকান্দর শাহ?) কবর ১৪১০
মগরাপাড়া : দুর্গ ১৫ শতক
মগরাপাড়া : মসজিদ (মূলে ১৪৮৪-তে তৈরি)
মগরাপাড়া : নহবতখানা, খাজাঞ্চিখানা,
মগরাপাড়া : শেখ মুহম্মদ ইউসুফ খানকাহ্ ও তৎপুত্র শেখ মুহম্মদ-এর স্মৃতিসৌধ, ১৬ শতক
মগরাপাড়া : মান্না শাহ'র স্মৃতিসৌধ
মগরাপাড়া : পাঁচপির-এর দরগা, ১৭ শতক
গোহাট্টা : পির শাহ আবদুল আল (পোকাই দেওয়ান)-এর স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ
হাবিবপুর : পাগলা শাহ্-'র দরগা
সাদিপুর : গরিবুল্লা মসজিদ ১৭৬৮
পনাম পুল : ১৭ শতক
আমিনপুর : ধ্বংসাবশেষ
গোয়ালদি : মসজিদদ্বয় ১৫১৯ এবং ১৭০৪-এ তৈরি

মুন্সিগঞ্জ

ইদ্রাকপুর : দুর্গ, ১৭ শতক
রামপাল : বাবা আদম শহীদ মসজিদ, ১৪৮৩
পাথরঘাটা : মসজিদ ও তালতলা পুল, ১৭ শতক
মিরকাদিম : পুল, ১৭ শতক
জিঞ্জিরা : হাম্মামখানা, ১৮ শতক

চট্টগ্রাম শহর ও আশপাশ

পুরোনো কিল্লা (আন্দরকিল্লা)
বদর আলম-এর দরগা
জামে মসজিদ, ১৬৬৮
কদম মোবারক মসজিদ, ১৭১৯
হামজা খান মসজিদ, ১৭১৯

ওয়ালি খান মসজিদ, ১৭৯০
বায়েজিদ বোস্তামির দরগা ও মসজিদ, ১৮ শতকের প্রথমপাদ
শেষ ফরিদ-এর চশমা বা ঝর্ণা
হাটহাজারি : মসজিদ, ১৫ শতক
কুমিরা : হামিদ খান মসজিদ, ১৬ শতক
পরাগলপুর : ছুটি খান মসজিদ, ১৬ শতক
মসজিদ্দা : তথাকথিত নয় গম্বুজ মসজিদ, মোগলযুগের শেষদিক
বিভিন্ন দরগা, যেমন বার আউলিয়ার দরগা
মোগলযুগের শেষদিকের মসজিদ, ১৮-১৯ শতক
সীতাকুণ্ড : সাধু মস্তানের মসজিদ
ফৌজদারহাট : মৌলা সাহেবের মসজিদ
ঘোড়ামারা : সাদেক আলী মুন্সীর মসজিদ
ছলিমপুর : দেওয়ানের মসজিদ
কত্তলি মালখানা
বোয়ালখালির হুলাইনস্থ মুসা খান মসজিদ, ১৬৫৮
পটিয়ার হরিণখাইনস্থ কুরাকতনি মসজিদ, ১৮০৬
সাতকানিয়া : মল্লিক সোয়াংস্থ মোহাম্মদ খান-এর মসজিদ

সন্দ্বীপ

দুর্গ এবং মসজিদ, ১৭ শতক, যেমন ফুলবিবি সাহেবান মসজিদ

খুলনা

বাগেরহাট খানজাহান-এর স্মৃতিসৌধ, ১৪৫৯
ষাট গম্বুজ মসজিদ, ১৫ শতক
মসজিদকুর মসজিদ
আমদই : স্মৃতিসৌধ, ১৫ শতক
লাবসা : মাই চাম্পা দরগা
ঈশ্বরীপুর : তেঙ্গা মসজিদ, ১৭ শতক
স্মৃতিসৌধ, ১৭ শতক
আটকোণা অট্টালিকা, ১৭ শতক

রাজশাহি

বাঘা মসজিদ, ১৫২৩
কুসুম্বা মসজিদ, ১৫৫৮
শাহ মখদুম-এর স্মৃতিসৌধ, ১৭ শতক
নওদা : অষ্টকোণা ভবন, ১৭ শতক
রহনপুর : সুলতানগঞ্জ ধ্বংসাবশেষ
মাহিসন্তোষ : কুমারপুর ধ্বংসাবশেষ

পিরোজপুর

নওয়াবগঞ্জ, দরাসবাড়ি মাদ্রাসা ও মসজিদ, ১৪৭৯
ছোটসোনা মসজিদ, ১৪৯৩-১৫১৯
রাজবিবি মসজিদ, ১৫ শতক
ধুনিচক মসজিদ, ১৫ শতক
শাহ নিয়ামতউল্লাহ স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ, ১৭ শতক
তাহ্-খানা, ১৭ শতক

দিনাজপুর

সুরা মসজিদ, ১৬ শতকের পথমদিক

গোপালগঞ্জ মসজিদ, ১৬৪০

হেমতাবাদ : মখদুম দুখরপোষ-এর দরগা ১৬ শতক

কুতুব শাহর মসজিদ, ১৬ শতক

পির বুজুরউদ্দিন-এর দরগা

দেওকোট : (দেবকোট বা গঙ্গারামপুর) মওলানা আতার দরগা

রকুখান-এর মসজিদ, ১৫১২

দেওতলা : শাহজালাল তাবরিজির চিল্লাখানা

একডালা : দুর্গ ও প্রাসাদ, ১৪-১৬ শতক

ঘোড়াঘাট : চেহেল গাজী

ময়মনসিংহ

গড়জরিপা : দুর্গ (ভগ্নাংশ), ১৭ শতক

ঈশ্বরগঞ্জ : কেল্লা তাজপুর (বিলুপ্ত) ও পুল, ১৭ শতক

টাঙ্গাইল

আটিয়া জামে মসজিদ, ১৬০৯

মসজিদপাড়া মসজিদ, ১৬৬৯

গুডাই মসজিদ, ১৭ শতকের শেষদিক

কিশোরগঞ্জ

এগার সিন্দুর : দুর্গ, ১৬ শতক

সাদি মসজিদ , ১৬৫২

শাহ মুহম্মদ মসজিদ, ১৭ শতক

অষ্টগ্রাম : কুতুবশাহ মসজিদ, ১৬ শতকের শেষদিক

সিলেট

শাহজালাল-এর দরগা

শাহজাহালের কবরখানা

বাহরাম খান মসজিদ

বড় গম্বুজ

চশমা

চিল্লাখানা

শাহ পরান-এর দরগা ও মসজিদ

লঙ্গরখানা

নকরখানা

রুকুনখান মসজিদ

শঙ্করপাশা মসজিদ

তিন গম্বুজ মসজিদ

বগুড়া

মহাস্থান : শাহ সুলতান-এর মাজার, ১৬-১৭ শতক

ফররুখশিয়ার মসজিদ, ১৭১৯

শেরপুর মাটির দুর্গ (বিলুপ্ত), ১৬ শতক

খেউরা মসজিদ, ১৫৮২

বিবি মসজিদ, ১৬২৮

খন্দকারটোলা মসজিদ, ১৬৩২
বন্দেগী শাহর মাজার
বরিশাল
মসজিদবাড়ি মসজিদ, ১৪৬৫
কসবা মসজিদ, ১৫ শতকের মধ্যভাগ
নিমতলির নিকট বিবি চিনির মসজিদ
সিয়ালঘুনি মসজিদ
গুজাবাদ দুর্গ
শারিকাল
কুমিল্লা
বড় গোয়ালি মসজিদ, ১৫০০
কৈলার গড় দুর্গ (কসবার নিকট), ১৬ শতক
শাহ শুজা মসজিদ ১৭ শতক
সরাইল মসজিদ, ১৭
নোয়াখালি
বজ্র মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ, ১৮ শতক
মতুবি মসজিদ, ১৯ শতক
ছাগলনাইয়া শমসের গাজীর ধ্বংসাবলী, ১৮ শতক
পাবনা
শাহজাদপুর মসজিদ, ১৫ শতক
শাহজাদপুর মখদুম শাহর স্মৃতিসৌধ ১৫ শতক
নবগ্রাম মসজিদ ২
চাটমোহর মসজিদ ১৫৮২
রংপুর
দরিয়া বা দুর-দুরিয়া
কান্তদুয়ার শাহ ইসমাইল গাজীর দরগা ১৬ শতক
কান্তদুয়ার মসজিদ, ১৫ শতক
মহেশপুর স্মৃতিসৌধ
যশোর
মির্যানগর দুর্গ, প্রাসাদ, গোসলখানা ইত্যাদি ১৬ শতকে
শৈলকুপা মসজিদ, ১৬ শতকের প্রথমদিক
পারবাজপুর মসজিদ ১৮ শতক
চকসি ধ্বংসাবশেষ ১৭-১৮ শতক
মৌতলা ধ্বংসাবশেষ, ১৭-১৮ শতক
ধূলগ্রাম ধ্বংসাবশেষ, ৭-৮ শতক
কুষ্টিয়া
ষটবাড়ি মসজিদ ও মাজার, ৮ শতক
সেউরিয়া লালন শাহ স্মৃতিসৌধ
ফরিদপুর
পাথরাইল (মজবি আওলিয়া) মসজিদ, ১৬ শতক
এছাড়া পশ্চিমবঙ্গেও অনেক স্থাপত্য কীর্তি আছে। যেমন
বর্ধমান
আজিম-উস-সান জামে মসজিদ, ১৬৯৯
পির বাহরাম সাক্কার দরগা
শের আফগান ও কুতুবউদ্দিন খান-এর কবর
কালনায় মজলিশ সাহেবের মসজিদ
খাজা আনোয়ার-এর স্মৃতিসৌধ
মেদিনীপুর
শাহ ইসমাইল গাজীর দরগা
মান্দারান দুর্গ
মুর্শিদাবাদ
বড় কুঠি
হাজার দুয়ারি
হিরাঝিল
ইমামবারা
জাফরগঞ্জ
কাটরা মসজিদ
খোশবাগ
মনসুরগঞ্জ
খেরুল মসজিদ
মতিঝিল
নবাব বাহাদুর প্রাসাদ
সং-ই-দালান
মুর্শিদকুলির স্মৃতিসৌধ
চব্বিশ পরগণা
বশিরহাটে সালিক মসজিদ
মালদহ
সিকান্দর শাহর স্মৃতিসৌধ
তাঁতীপাড়া মসজিদ
হোসেন শাহর স্মৃতিসৌধ
আদিনা মসজিদ
বাইশগজি দেয়াল
বারদুয়ারি মসজিদ
বড়সোনা মসজিদ
বড় দরগাহ
পাঁচ খিলানের পুল
চাঁদ দরোয়াজা
চামকাটি মসজিদ
ছোটসোনা মসজিদ
ছোট দরগা
চিকা ভবন
গৌড় ধ্বংসাবশেষ
দাখিল দরজা
দরাসবাড়ি মসজিদ

ধুনিচক মসজিদ
গৌড়ের প্রুব দরজা বা শাহ সুজা তোরণ
একলাখি সৌধ
ফতেহ খান স্মৃতিসৌধ
ফিরোজ মিনার
গোমতী গেট
গুণমন্ত মসজিদ
পুরোনো মালদহর জামে মসজিদ
জাহানিয়া বা ঝনঝনিয়া মসজিদ
কাটরা ভবন
খনিয়া দীঘি মসজিদ
খাজাঞ্চিখানা
কতোয়ালি গেট
লোটন মসজিদ
নিম দরজা
নিমসরাই চূড়া
ফলওয়ারি গেট
কদম রসুল ভবন
কুতুবশাহি মসজিদ
রাজমহলের ধ্বংসাবশেষ
সালামি দরজা
শাহ গদার মাজার
শাহ নিয়ামতউল্লা ওয়ালি মসজিদ
শাহ নিয়ামতউল্লা ওয়ালি স্মৃতিসৌধ
শাহজালাল মাজার
শাহ সুজা তোরণ

৩.

স্থাপত্য শিল্পের আমূল পরিবর্তন ঘটে আধুনিক যুগে। উন্নত মালমশলা ও টেকনোলজি বা প্রযুক্তিবিদ্যার আবির্ভাব পুরানো ধরন-ধাঁচ একেবারে বদলে দেয়। সিমেন্ট-রড-বালু মিশিয়ে দালান-কোঠা ঘর-বাড়ি তৈরি হচ্ছে হাল আমলে। সহজ অথচ সুন্দর, আকর্ষণীয় অথচ ঋজু, প্রয়োজন মেটানো অথচ বিসদৃশ নয়—এই হল স্থাপত্যাদির বর্তমান চিন্তন। একটা বৈশিষ্ট্য দিয়ে একালের স্থাপত্য-শিল্পকে চট করে চিহ্নিত করা যায়—ট্রানজিস্টার স্টাইল। সরল। অনাড়ম্বর। চৌকোণো বা আয়তাকার। সোজা। খাড়া। বহুতল বিশিষ্ট। জানালায় গ্রিল। কখনো বা ফাঁকাও। দরজা-জানালা কখনো-বা জাপানি ধরনে টানা, ভাঁজ করা নয়। কাঠ বা স্টীলের ফ্রেম দরজা-জানালায়। অফিস-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-গৃহস্থবাড়ি সবই মোটামুটি এ ধারায় গঠিত। সামান্যকিছু বৈচিত্র হয়ত আনা হয় কখনো কখনো—নানা কারুকাজ বা গম্বুজাদির ধরন সৃষ্টি করে, যেমন ঢাকায় বায়তুল মোকাররম মসজিদ এবং এর বাইরের ঘেরাও। এটি প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণও বটে।

তবে সেখানেও আধুনিক এবং নতুন ধরনের চিন্তা-চেতনাও এসে যোগ হয়, যেমন গোলাপ শাহ্‌'র মাজারের নিকটের মসজিদ, যেখানে গম্বুজের স্থানে চোখা-কৌণিক এক পদ্ধতি যুক্ত হয়েছে।

আধুনিক ধারার আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কিছু ভবনও নতুন অঙ্গিকে তৈরি হয়েছে এদেশে, যেমন ঢাকা রেল স্টেশন, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন ভবন, ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউট, নিপা ভবন, জীবনবীমা ভবন, শিল্প ভবন, ঢাকার তিন নেতার স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি। লুই কান-এর শেরে বাংলা নগর পরিকল্পনাটি সংসদ ভবনসহ আশেপাশের সংসদ সদস্যদের জন্য নির্মিত বাসস্থান, কৃত্রিম হ্রদ, নিসর্গ এবং লাল ইটের ব্যবহার একটি উত্তম ধরনের আধুনিক স্থাপত্য নিদর্শন। দেশীয় ঐতিহ্যের সাথে স্থাপত্য উপকরণ, উপযোগিতা ও গঠনশৈলী কমবেশি এগুলোতে আছে।

অবশ্য কিছু কিছু ত্রুটিও বর্তমান-ধারার ভবনাদি তৈরির বেলায় উল্লেখযোগ্য। সুউচ্চ ভবনের ফাঁকা অলিন্দ বা বিস্তৃত বারান্দা, কাচের বহুল ব্যবহার এবং কখনো-বা অতি-নিরীক্ষাধর্মিতা এগুলোকে করে তোলে আবহাওয়ার কিছুটা অনুপযোগী এবং অনাকর্ষণীয়। ঢাকা রেল স্টেশন বৃষ্টিতে ভিজে প্রায় একাকার হয়ে যায়। দেয়ালে অতিরিক্ত কাচের ব্যবহার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল বা এমন আরো ভবন ঝড়বৃষ্টির এ দেশে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজলী সরবরাহ অনিয়মিত হওয়ায় এদেশের বহুতল আধুনিক করিডোরঅলা ভবনকে অন্ধকার খুপড়ি করে তোলে। গরমের দিনে তাতে না যায় তিষ্টোনো, না করা যায় প্রয়োজনীয় কাজকর্ম। স্থনিক পরিবেশ-প্রতিবেশ এজন্যই সবসময় স্থাপত্যকলায় বিশেষভাবে গণ্য করতে হয়। এদেশের মাটি নরম। পলল ভূমি দ্বারা গঠিত। প্রায় সারা বাংলাদেশটাই বদ্বীপ অঞ্চল। ঝড়-ঝঞ্ঝাপূর্ণ। বন্যার দেশ। তাই যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানে শততল অট্টালিকা নির্মাণ কঠিন। উচিতও হবে না করা প্রযুক্তিবিদ্যা তেমন উপযুক্ত কিছু আবিষ্কার করতে না-পারলে। অর্থব্যয়ের বিষয়টিকেও বিবেচনায় নিতে হয়। যে-কোন ভবন তৈরি ছাড়াও, রক্ষণাবেক্ষণের একটা ব্যয় আছে। আজকের দিনে এ ব্যয় বেড়েছে বহুগুণ—লিফ্‌ট্‌-এয়ার কণ্ডিশনার-টিভি ইত্যাদির ব্যবহারে। বছর বছর চুনকাম-ডিস্টেম্পার-বার্নিশ করা, শ্যাওলা ও ময়লা দূর করা, বাগান-গাছপালা সংরক্ষণ ও যত্ন করায়ও খরচ হয় প্রচুর। বাংলাদেশের মত গরিব দেশের তা বহন করার ক্ষমতার বিষয়টি তাই হিসেবে নিতে হয়। উন্নত দেশে অঢেল অর্থসম্পদ থাকায় খরচের কথা হয়ত ভাবতে হয় না, ভাবলেও হয়ত দেখে ব্যয়ের চেয়ে আয়ই বেশি, তাই তারা মাটির নিচেও ঘর করে কৃত্রিম বাজার পর্যন্ত তৈরি করে ফেলতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় তার অনেককিছুই সম্ভব নয় আর্থিক ও বাস্তব কারণেই। আন্ডারপাস রোড হালে মাত্র শুরু হয়েছে।

বাস্তব অবস্থারই প্রতিফলন হাল আমলে বাংলাদেশে বাড়িঘর ভবনাদি নির্মাণে দেখা যায়। আজকাল আর সাধারণত ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশাল আঙ্গিনাসহ প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি হয় না। আগের দিনের জমিদার বাড়ির মত আজকের দিনে কোন ধনকুবেরও তেমন গৃহ তৈরি করে না। জায়গার অভাব এর একটা বড় কারণ।

শহরাঞ্চলেই নয় কেবল, গ্রামেও জনসংখ্যা বাড়ার দরুন স্থান সংকুলানের অভাব। জমির মূল্য বেড়েছে। পাওয়াও যায় না তেমন। সকলে কেবল শহরমুখি হওয়ায় গ্রামাঞ্চলেও তেমন ধরনের গৃহাদি নির্মিত হয় না। বর্তমানের ধনিকরা শহরাঞ্চলেই বসবাস করে। এসব নানা কারণে বিশালাকার ভবনাদি আজকাল কেবল সরকারি পর্যায়েই তৈরি হয়। যেমন, নানা ধরনের একাডেমি, মিউজিয়াম, প্রতিষ্ঠান, অফিস ইত্যাদি। আগে ব্যক্তিগত পর্যায়েও বিশাল অট্টালিকা যথেষ্ট হত—নিজস্ব বাসগৃহ, তোরণ, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি। আগে পাবলিক বিল্ডিং বলতে হত সাধারণত মসজিদ বা মসজিদের মত ধর্মসম্পৃক্ত ভবনে। আজকাল পাবলিক বিল্ডিং বলতে হচ্ছে সিকিউলার বা ধর্ম-অসম্পৃক্ত ভবনাদি। আগে যেখানে ভবনে বহুল কারুকাজ করা হত ফুল-লতা-পাতা থেকে মনুষ্যমূর্তি-পশু-পাখি-জ্যামিতিক নকশা পর্যন্ত, আজকাল আর তা হয় না, হয় অনাড়ম্বর।

আধুনিক যুগে বিল্ডিং অর্থাৎ দালান-কোঠার সংখ্যা বেড়েছে অনেক—তা ইট-বালু-সিমেন্টের আবির্ভাবের জন্যও বটে, অর্থবিত্ত সমাজে কিছুটা সম্প্রসারিত হতে পেরেছে বলেও। আগে কেবল ধনী সামন্তপ্রভু বা জমিদাররাই সে-সব তৈরি করত, আজকাল সাধারণ মধ্যবিত্তের বাড়িও হয় দালান। আগে বাড়ি-ঘর তৈরি করতে ধনিক জমিদারের অনুমতি লাগত এবং সাধারণত স্থানীয় জমিদারের চেয়ে উন্নত ও সুন্দর ভবন তৈরি হতে পারত না। আজকাল আর সে-দিন নেই। সরকার বা পৌরসভা থেকে বাড়ি তৈরির এখন অনুমতি নিতে হয় বটে, তবে আগের মত এত বাধা-নিষেধগ্রস্ত তা হয় না। বাড়ি তৈরি সহজও হয়েছে সিমেন্টের আবির্ভাবে। আগের মত মোটা মোটা থাম তৈরি করতে হয় না ইট-চুন-সুরকি দিয়ে। আজকাল আর. সি. সি. পিলারের ওপর বহুতল ভবন মাত্র পাঁচ কি দশ ইঞ্চি দেয়াল দিয়ে তৈরি সম্ভব হচ্ছে। আগে এধরনের ভবন ছিল অকল্পনীয়। ভবন হত সাধারণত একতল কি দ্বিতল, কদাচিৎ বহুতল বিশিষ্ট, তাও পাঁচ-ছ তলাও নয়। তবে আগের কালের ভবনাদি করতে হত সুউচ্চ। তখনকার একতল ভবনই হত এখনকার তিনতল/চারতল ভবনের মত উঁচু। আজকাল এক এক তল হয় মাত্র দশ/বার ফুট উঁচু, বিশেষ করে অফিসাদি বা বাসগৃহ, এবং যতই ওপরের দিকে ওঠে তত ঘরের উচ্চতা কমতে থাকে একটু একটু করে। আজকালকার ভবনাদি হচ্ছে ভার্টিকেলি বা উপরদিকে, আগের কালে হত হরাইজেন্টালি বা সমতলে। হালে গম্বুজের ব্যবহার কমে গেছে একেবারে, এমনকি মসজিদেও গম্বুজের ব্যবহার হচ্ছে খুবই কম। লাল ইটের ব্যবহার বরং বাড়ছে। আবার আলামত দেখা যাচ্ছে মৃৎফলকের। এদেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ টেরাকোটা বা মৃৎফলক যদি নতুন অনাড়ম্বর ভবনাদিতে পরিমিত মাফিক প্রয়োগ করা যায় তাহলে স্থাপত্য শিল্পে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হতে পারে। এরই সাথে যদি যুক্ত হয় লিপিশৈলী, বাংলা অক্ষরের, নানা বৈচিত্রে পূর্ণ করে এবং ফুল-লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশার অলঙ্করণ সহ পশু-পাখি-মনুষ্য-মূর্তি, তাহলে কেবল অতীত ঐতিহ্যই নবায়ন করা হবে না, বাংলার স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্যও নতুন করে জগৎ-সমক্ষে উদ্ভাসিত হবে। তবে অবশ্যই তা হতে হবে শৈল্পিক মাত্রা-জ্ঞানে, পরিমিতিবোধসিক্ত সৌন্দর্যসৃষ্টি-প্রয়াসে।

পর্যালোচনা

ইসলাম আরবে যখন আবির্ভূত হয় মানব ইতিহাসের সভ্যদশার অনেকদিন কেটে গেছে। সুমের-মিশর-সিন্ধু-হোয়াংহো অঞ্চলগুলোর সভ্যতা উত্তরাধিকার হিসেবে মানব সমাজে স্থায়ী আসন গেড়ে গ্রীস ও রোমের দাসতান্ত্রিক পরাক্রান্ত যুগও পেরিয়ে গেছে। তবে আরবের খুব কাছেই ইরান এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অধ্যায় তখনো শেষ হয় নি। এসব অঞ্চলে ভূমি-নির্ভর একধরনের সামন্তবাদের হয়েছিল আবির্ভাব। রাজনীতিতে স্বৈরতান্ত্রিক বংশানুক্রমিক রাজকীয় বিষয়াদি পেয়েছিল প্রাধান্য। সমাজের জীবনধারা যে-মূল্যবোধ দাবি করছিল তা বিস্তৃত আনুগত্যপ্রিয়তা এবং পরনির্ভরতা। একে অপরের প্রতি অনুগত হলেই কেবল সামন্তস্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে। এ দাবি থেকেই জন্ম নেয় পরনির্ভরতার বোধ।

বিশ্বমানচিত্রের যে-স্থানে ইসলামের আবির্ভাব সে-অঞ্চলে এ দুটি বোধই ছিল যথেষ্ট পরিমাণে নতুন। গোষ্ঠীপ্রাধান্যের স্বাতন্ত্র্যে আরবিয়দের কাছে আনুগত্যের সীমা ছিল খুবই সীমিত। কেবল দল ও দলপতি কেন্দ্রিক। ফলে সামান্যই ছিল পরনির্ভরশীলতাও। উৎপাদন ব্যবস্থাও আনুপাতিক হারে সহজ ও সরল থাকায় (কিছু কৃষি আর ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লুণ্ঠন) এর প্রয়োজনও ছিল নগণ্য। বিশাল মরুভূমির দিগন্ত-বিস্তৃত বালুকারাশিতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগও ছিল না, প্রয়োজনও না। এখানে তাই সামন্ত-ব্যবস্থায় বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটা ছিল সম্ভবপর। প্রয়োজন ছিল কেবল ঐক্যবদ্ধ করার মত একটি মতাদর্শের, যা বিভক্ত গোত্র-গোষ্ঠীগুলোকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতে পারবে। এর ধারাও বইছিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত ইহুদি ও খ্রীস্ট ধর্মের প্রভাবে। অভাব ছিল শুধু দেশী উপাদানের। দেশের মাটিতে বহিরাগত মতাদর্শকে যা সংমিশ্রিত করে নতুন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করতে হবে সক্ষম। ইসলাম সংগঠিত করে ঠিক তাই-ই।

ইসলাম রাজনৈতিক অঙ্গনে যে-ব্যবস্থা চেয়েছিল তা সম্ভবত গোষ্ঠী প্রথার সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা ভেঙে কোন-এক-ধরনের নৈর্বাচনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। সৈয়দ আমীর আলি *এ সর্ট হিস্ট্রি অব দ্য সেরাসিন্‌স্* গ্রন্থে বলেন যে, 'আরবদের মধ্যে উপজাতীয় নেতৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তায় না। নেতা নির্বাচিত হন। এ ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রথা স্বীকৃত। ট্রাইব (গোষ্ঠী)-এর প্রতিটি ব্যক্তি নেতা নির্বাচনে তার মত ব্যক্ত করার অধিকারী। মৃত নেতার পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের মধ্য থেকে নির্বাচনের রীতি প্রচলিত ছিল। রসুলুল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারী নির্বাচনে প্রাচীন এ ধরনের গোষ্ঠীপ্রথা অনুসৃত হয়।' মদিনা চার্টারের মত সনদব্যবস্থা, মসজিদে বসে নানাবিষয়ে সাহাবাদের মতামত গ্রহণ, হজরত আবু বকরকে (মহানবীর জামাতা আলিকে নয়) তাঁর

অসুস্থতার সময়ে ইমামতি করার অধিকার প্রদান ইত্যাদি পরিচয় দেয় হজরত মুহম্মদের (সঃ) গণতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি প্রীতি। তাঁর নীতি অনুসরণ করেই প্রথম চার খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা ওমর রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মজলিস-উস-সুরা'র মত পরিষদ গঠন করেন।

'একথা সত্য যে,' মৌলানা আবুল কালাম আজাদ *ইণ্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রীডম* গ্রন্থে পর্যালোচনা করেন, 'ইসলাম এমন একটি সমাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছে যা জাতি, ভাষা, অর্থনীতি এবং রাজনীতিক সীমা অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, প্রথম কয়েক দশক, খুব বেশি হলে প্রথম শতকের পর ইসলাম সকল মুসলিম দেশগুলোকে কেবল ইসলামের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্রে সুসংহত করতে পারে নি।' ইসলামের আবির্ভাবের (৬১০ খ্রীস্টাব্দে) মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই মুয়াবিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় সামন্তবাদী বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক প্রথা (৬৬২ খ্রীস্টাব্দে)। নৈর্বাচনিক পদ্ধতি হয় বর্জিত। কিন্তু সামন্তবাদী রাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতেও কোন একটা সুষ্ঠু-সুশৃঙ্খল নিয়মনীতি অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক প্রথা গড়ে ওঠে নি। স্বেচ্ছাচারিতার চরম প্রকাশ 'জোর যার মুলুক তার'ই হয় সাধারণ পদ্ধতি।

সামন্তবাদী এ প্রেক্ষাপটে আর্থনীতিক যে-ব্যবস্থা ইসলাম আবির্ভাবের পর থেকে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রচলিত হয় তাতে 'বায়তুল মাল'-এর মত আদর্শবাদী উপাদান থাকলেও জমিজমা-সম্পদ-সম্পত্তি ভোগের যে-ধারা গড়ে ওঠে তাও এরই অনুবর্তী। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর নানা আবেদন রাখলেও ইসলাম অর্থসম্পদ-ভোগে সরাসরি কোন সীমা বা বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। ফলে যে-পদ্ধতিতে ইসলামধর্মী অভিযাত্রীরা জগৎ ও জীবন জয় করেন তা একান্তভাবেই সামন্তবাদীধারা-অনুসৃত। ব্যবসা-বাণিজ্য ইসলাম উৎসাহিত করেছে বটে কিন্তু সামন্ত-খবরদারি এবং ব্যবসার নানা ঝকমারির চেয়ে ভূমি দখলের তাৎক্ষণিক প্রচুর লাভালাভের জন্য বণিক-ব্যবসায়ীদের কখনোই সামন্তশাসকের ওপরে ওঠা বা তাকে পরিচালিত করার মত ক্ষমতা অর্জন করা মধ্যযুগে মোটেই সম্ভব হয় নি। শাসকরাও বণিক হতে উৎসাহিত হন নি তেমন। একচ্ছত্র সামন্তবাদই সে-সময় প্রাধান্য পায়। সামন্তদের যাপিত জীবনবোধই সৃষ্টি করে সমাজের ধ্যান–ধারণা।

গোষ্ঠীপ্রথা ভেঙে সব গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে সারা অঞ্চলকে একটি দেশ-সীমায় বেঁধে দেওয়াটা ছিল আরবদের জন্য রাজনৈতিকভাবে ইসলামের এক সরাসরি প্রগতিশীল অবদান। একইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেকালে আরবে প্রচলিত গোষ্ঠীপ্রথা ও দাস-ব্যবস্থা থেকে সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়ে উত্তরণও ছিল প্রগতিবাদী। কিন্তু অন্যান্য দেশে ইসলাম যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন অনেক স্থানেই এ দুই ক্ষেত্রে আরবি-আদর্শ অনুসরণে নতুনত্ব কিছু ছিল না।

বাংলাদেশেও ইসলাম আগমনের পর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। ইসলাম আসার বহু আগেই এখানে গোত্রপ্রথা অতীত-স্মৃতি, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা বিশেষ শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং আর্থিক প্রয়াসে সামন্তপদ্ধতি বিরাজিত। ইসলাম আসার পর এদেশের উপাদানগুলো বস্তুতপক্ষে

সব আগের যুগের মতই রয়ে গিয়েছিল। 'উহাতে যাহা কিছু তফাত দেখা যাইবে', গোপাল হালদার-এর *সংস্কৃতির রূপান্তর* বইয়ের ভাষায়, 'তাহা-সামান্য। কতকাংশে তাহা এখানকার কৃষি সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ফল, কতকাংশে তাহা নবাগত তুর্ক তাজিক ইরানী মোগল প্রভৃতি জাতিদের বিষয়সম্পত্তি বিষয়ক নিজস্ব নিয়মকানুন ও ধারণা, কতকাংশে-বা তাহাদেরই গৃহীত মুসলমান ধর্মের ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত আইনকানুন, ক্রিয়াকলাপ, আচার পদ্ধতি—তাহাও আবার অধিকাংশই আরবিয়, খানিকটা ইরানী। কিন্তু জীবনযাত্রার বাস্তবভিত্তি তখন পরিবর্তিত হয় নাই—এইটুকু ভুলিবার নয়। পরবর্তীকালে যে সামন্ততন্ত্র সমস্ত মুসলমান আমলের প্রধান লক্ষণ হইয়া রহিল তাহার সাক্ষাৎ গুপ্তযুগেই পাওয়া যায়।...মুসলমান সম্রাটদের শাসনামলে ভারতে সামন্ততন্ত্রের অবসান হইল না, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে একটা নতুন পর্বের সূচনা হইল।'

মুসলিম শাসন অবসানের পর (১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ) বাংলায় যে আর্থনীতিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তা সামন্তবাদ থেকে ক্রমশ দূরে সরে এলেও এর অনেক আলামতই অবশিষ্টাংশ হিসেবে থেকে যায়। ইংরেজ শাসকরা স্বদেশে বুর্জোয়া বা ধনবাদী অর্থব্যবস্থার পুরোপুরি প্রবর্তন করলেও এদেশে এর বিকাশ তাদের স্বার্থেই ঘটায় নি। এদেশটাকে রেখেছিল মূলত তাদের কাঁচামালের যোগানদার হিসেবে। পাট, তুলা, চা ইত্যাদি কাঁচামাল ইংলণ্ডে যেত এবং ডাণ্ডি-ম্যাঞ্চেস্টার-এর মত শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ে উঠত। ছিটেফোঁটা শহর-বন্দর, কোলকাতা-নারায়ণগঞ্জের মত শিল্পাঞ্চল এদেশে যা গড়ে উঠেছিল তা শোষণ ও শাসনের একান্ত প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের বাকি বিস্তৃত অঞ্চল ছিল গ্রামীণ—অতীতের সামন্ত নিগড়ের নানা ব্যবস্থা-চিন্তা-চেতনায় আবদ্ধ। পুরানো এ অবস্থা নতুন-বুর্জোয়া নাগরিক ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে ধীরে—অতি ধীরে একটু একটু করে পরিবর্তিত হচ্ছিল। অর্থাৎ বুর্জোয়া অর্থনীতির ধারা এদেশে ধীর-ক্রমে হচ্ছিল প্রসারিত। পরিবর্তনের এ সূত্রেই বুর্জোয়া বা ধনবাদের প্রাথমিক বাহক মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও ঘটছিল আবির্ভাব। মূলত তাদেরই হিন্দু ও মুসলিম আন্দোলন বিক্ষোভ সম্ভব করে তোলে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা। তাদেরই দু সম্প্রদায়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ঘটে দেশভাগ। অত:পর রাষ্ট্রীয় নীতিমালার কারণে বুর্জোয়া বিকাশ ঘটে এবং এর সুফলটা বেশির ভাগই লাভ করে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ। বঞ্চিত পূর্বাংশে শুরু হয় বিক্ষোভ আন্দোলন। হয় স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব।

সুতরাং যে দুটি আর্থনীতিক ধারা ধরে এদেশের ইসলাম ধর্মানুসারী মানুষেরা এযাবৎ অগ্রসর হয়েছে তা হল সামন্তবাদ এবং ধনবাদ।

সামন্তবাদ-ধনবাদ বনাম ইসলাম

ইসলাম সামন্তবাদের ধর্ম নয়। ধনবাদেরও নয়। পবিত্র কোরানে আছে, 'আসমান এবং জমিনে যা আছে তার সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্।' 'সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহরই রয়েছে।' 'সম্পদ যেন তোমাদের বিত্তশালীদের হাতে কুক্ষিগত না হয়ে যায়।' 'যারা সোনারূপা জমা করে রাখে ও তা আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় না-করে, তাদেরকে কষ্টদায়ক কঠিন আজাবের খবর দাও।' রসুল (সঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দাম বাড়ার জন্য

খাদ্য মজুত করে যে গুনাহ্‌গার।' 'খাদ্যদ্রব্যের মজুতদার অভিশপ্ত।' 'খাদ্যদ্রব্যের বাজারের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করে যে মূল্য বৃদ্ধি করে সে এত জঘন্য হয়ে পড়ে যে আল্লাহ তাকে দোজখের ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন।' 'হে মোমিনগণ, পরস্পরে অবৈধ উপায়ে একে অপরের অর্থসম্পদ হজম করে ফেলো না। ধন-সম্পদকে ক্ষমতাশালী লোকদের নৈকট্য লাভের বাহন হিসেবে ব্যবহার করো না। মানুষের অর্থ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না, যেখানে তোমরা এর পরিণাম সম্পর্কে অবগত রয়েছ।' 'যে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ধ্বংস অনিবার্য সে-সব লোকদের জন্য যারা ওজনে কম দেয়।' 'যেসব ব্যক্তির নিজ শক্তি-সামর্থের সরঞ্জাম নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রয়েছে তাদের উচিত অতিরিক্ত সম্পদ গরিব-দুঃখীদের বিতরণ করা।'

এমন অনেক উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কি সামন্ততন্ত্র, কি ধনতন্ত্র— উভয়েরই বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ইসলাম। অবশ্য হজরত মুহম্মদ (সঃ) বা খোলাফায়ে রাশেদিনের রাজ্য-বিজয় দেখিয়ে সামন্তবাদীরা উদাহরণ দিতে পারে যে, বাস্তবে সামন্ত-প্রথা অনুসৃত। অথবা, ব্যবসা-বাণিজ্য করার উৎসাহ প্রদানে যেসব কথা কোরান শরিফে আছে (যেমন, 'উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের ওপর তোমাদের এমন ক্ষমতা ও অধিকার দিয়েছেন যে, তোমরা তাতে তরি ভাসিয়ে জীবিকার সন্ধানে দেশ-দেশান্তর ছুটে চল। আর আল্লাহ্, তোমাদের চলাফেরা এবং আমদানি-রপ্তানির সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করেছেন।'), সেসব দেখিয়ে ধনবাদীরাও স্বচ্ছন্দে তাদের নীতিবিগর্হিত কাজকর্মের একটা যুক্তি দাঁড় করাবার প্রয়াস পেতে পারে। অথচ সামান্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ইসলাম-প্রবর্তক হজরত মুহম্মদ (সঃ) অথবা তাঁর সাহাবিরা সবাই এসব ব্যাপারে পরিমিত জ্ঞান হারাতে বার বার নিষেধ করেছেন।

বস্তুত, ইসলামে অর্থবিত্ত আহরণের সীমারেখা সুনির্দিষ্টভাবে প্রদত্ত নেই বলে সম্পূর্ণ অমানবিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত সামন্তবাদ ও ধনবাদ উভয়েই নানা ফাঁক-ফোকর দিয়ে নিজেদের অবস্থান ইসলাম ধর্মে খুঁজে বেড়ায়। রাজ্য জয় করতে গিয়ে যে চরম হিংস্রতা সামন্তবাদে এবং অর্থ আহরণ করতে গিয়ে যে প্রচণ্ড প্রবঞ্চনা ধনবাদে অনুসৃত হয় তার কোনটিই ইসলামের ন্যায়নীতির ধারে কাছে নয়। সামন্ততন্ত্র তো হল আসলে পরের জমি-ধন-সম্পদ জবরদখল, আর ধনতন্ত্র হল পরের শ্রমে সৃষ্ট অর্থ-বিত্ত আত্মসাৎ। সামন্তবাদ আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান করতে চায় রাজ্য জয় তথা দখল ও সম্পদাদি অপহরণ করে, ধনবাদ সে-সমস্যার সমাধান করতে চায় শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য চুরি করে। উভয় অর্থনীতিই শোষণ অর্থাৎ অন্যের ধনসম্পদ ও শ্রম অপহরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব তা প্রচণ্ড অন্যায়-দুষ্কর্মের ওপর স্থাপিত। উভয়েই একদল মানুষের সুবিধার জন্য অপর একদল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অসুবিধা ও দুঃখের সুযোগে ধনসম্পদ এবং এর মাধ্যমে ক্ষমতা-প্রভাব প্রতিপত্তি গড়ে তোলে। উভয় সমাজেই এক মানুষ অন্য মানুষের কেবল প্রতিযোগীই হয় না, স্বীয় স্বার্থে নিঃশেষ করে দিতেও হয় না কুণ্ঠিত। দুরবস্থার সুযোগে (যেমন, দুর্ভিক্ষে বা চালের যোগান কম এবং চাহিদা বেড়ে গেলে তার মূল্য বাড়িয়ে অথবা দুর্বল রাষ্ট্রকে সবল রাষ্ট্র জয় করে) এ দু সমাজের

সুযোগপ্রাপ্ত মানুষেরা গড়ে তোলে সম্পদ-সম্পত্তি এবং এর মাধ্যমে প্রভাব-প্রতিপত্তি। এর ভেতর যদি কখনো কারো ভালোমানুষীর কাজকর্ম দেখা যায় তা (যেমন, আজম শাহ'র কাজির বিচারের সামনে দাঁড়ানো—সেই আজম যিনি পিতার বিরুদ্ধে লড়াই করে সিংহাসন দখল করেন, অথবা মন্বন্তরে বা দুঃসময়ের সুযোগে-হওয়া কোন ধনকুবের তৈরি করেন হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) একান্তভাবেই ব্যক্তিচরিত্র নির্ভর অথবা দৃষ্টান্ত স্থাপনের বা বাহবা পাওয়ার কিংবা স্বীয় অপকর্ম স্খালনের জন্য করা হয়। এতে সম্পদগত বৈষম্য-অসাম্য অথবা শ্রেণী-শোষণ অবসানের কোনকিছুই হয় না।

অর্থবিত্ত উপার্জনের শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আসলে ব্যক্তিগত মহান হৃদয়ের দু' চারটি মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ত স্থাপিত হতে পারে, শাসক-প্রশাসক ধনিক-বণিক-গরিবের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে হতে পারে নরশ্রেষ্ঠ, কেউবা নরদানব, কিন্তু এ একান্তভাবেই ব্যক্তিচরিত্র নির্ভর। সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের উচ্চনিচ স্থলে তা হতে পারে না পালিত। আর্থনীতিক ন্যায়বিচার না-এলে রাজনীতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কোন ক্ষেত্রেই সাম্য আনা-যে সম্ভব নয় তার সাক্ষী মানুষের ইতিহাস। আর্থিক অসাম্য প্রতি মুহূর্তেই যেমন একটি ব্যক্তির অবস্থান নির্দেশ করে তেমন অন্যের সুযোগও করে দেয় বন্ধ। আর্থিকভাবে বলিয়ান ব্যক্তিই সমাজ-সংসারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে হয় অপ্রতিহত। আর বিশাল প্রতিভা নিয়েও দীন মানুষ হীন হয়ে নিচে পড়ে থাকতে হয় বাধ্য। পবিত্র কোরানে যেভাবে দান-খয়রাত করা, গরিবের প্রতি নজর দেওয়া, আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য সহায়তা করা, এতিমদের দেখাশোনা, মাতাপিতাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করার কথা বার বার বলা হয়েছে তাতে বোঝা যায় সকল মানুষের মধ্যে মানবিক বোধগুলো ফুটিয়ে তুলে অর্থনৈতিক সমতার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। বোখারী শরীফ অনুযায়ী হজরত আবদুল্লা ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসুলকে জিজ্ঞেস করল কোন্ প্রকারের ইসলাম অর্থাৎ ইসলামী আচরণ উত্তম? তিনি বললেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দেবে। 'মা আমানা বিমাম বাতা জারুহু জারিয়ান' অর্থাৎ যার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটায় সে আমার ওপর খাঁটিভাবে ঈমান আনে নি—কজন মুসলমান একথা মনে রাখে? 'আত্য়েমূল হায়েদা-আ-উদুল মারিদা অ-ফাক্কুল আনি' অর্থাৎ তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দান কর, রোগীর সেবা কর এবং ঋণের দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত কর—এমন কটা ঘটনা সমাজে ঘটে!

বস্তুত, ধর্মকে ব্যবহার করে অথবা এর কথা বলে সেই অতীত থেকে আজ পর্যন্ত আসলে সকলেই যে আত্মোন্নতিতে হয়েছে উৎসুক তা অতীতের ইতিহাসের সামন্ত অর্থনীতি থেকে ধনবাদী অর্থনীতির বিকাশ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। বাংলাদেশেই মুসলমান শাসন আমলের সেই ইবনে বতুতার আগমন কালেরও আগে থেকে আজ পর্যন্ত জনজীবনসহ শাসকগোষ্ঠীর কাণ্ডকারখানা দেখলে ধরা পড়ে ধর্মের চেয়ে অর্থনীতি কীভাবে এবং কতটুকু কার্যকরভাবে সমাজে হয়েছে ক্রিয়াশীল। হয়ত ধর্মীয় আচারের ফরজ-সুন্নত-নফল-ওয়াজেব সহ আরো অনেককিছুই অনেকে বোঝে-

না-বোঝে ঠিকই মেনে চলেছে কিন্তু আবার সেইসাথে চালিয়েছে অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন নানাভাবে নানাজনকে। বতুতার দিনের তথাকথিত একেবারে সস্তার সময়েও সাধারণ মানুষ যেমন ধানের দাম চড়া হলে উৎকণ্ঠায় হয়েছে অস্থির এবং আরো পরবর্তীকালে বিজয়গুপ্ত বা মুকুন্দরামের সময় একজন মোল্লা কেবল হয়ত ইজার ছাড়া আর কিছুই পায় নি পরার অথচ খেদমত করেছে ইসলাম-অনুসারী ইনসানের, আজো সেই অবস্থার এদেশে ঘটে নি তেমন হেরফের। যে-দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য হজরত মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুগত সাহাবিরা একান্তভাবেই ছিলেন উৎসুক, সে-দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছে কজন? কতটুকু পালিত হয়েছে দীন অবস্থায় থেকেই রাজ্য পরিচালনা অথবা উটের পিঠে দাসকে বসিয়ে নিজে দড়ি ধরে হেঁটে-যাওয়া খলিফা ওমরের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়েও সাদামাঠা জীবনযাপন, ত্যাগের অবিস্মরণীয় মহিমা প্রতিষ্ঠা এবং খলিফা থেকে সাধারণ মানুষটি পর্যন্ত সমাজজীবনে একই সমতলে অবস্থিত—সাম্যবাদী এ মূল্যবোধই-বা কতটুকু বাস্তবজীবনে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত! সুন্দরসব উদাহরণ শুধু উদাহরণ হিসেবেই থেকে গেছে। তালেবে এলেম্‌রা ওস্তাদের কাছ থেকে এসব শুনে সুন্দর চিত্রের কল্পনা হয়ত করেছে, মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হওয়ারও স্বপ্ন হয়ত দেখেছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে পালন তা করতে পেরেছে সামান্যই। বাস্তবের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের অর্থবিত্তের চাপে পড়ে বিকশিত বা প্রস্ফুটিত হতে পারেনি তাদের সুন্দর কল্পনাসব। বরং সেই স্রোতে কালক্রমে গা ভাসিয়ে নিজেও হয়েছে একদিন সেই শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অথবা হয়েছে শোষিত।

ধর্ম বনাম রাষ্ট্র

সত্য বটে তত্ত্বগতভাবে ইসলামে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতা, উপজাতীয়তা প্রভৃতির স্থান নেই। সত্য বটে তত্ত্বগতভাবে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা সকলে মিলে অবিভাজ্য একটি 'উম্মা'। কিন্তু এই উম্মা হজরত মুহম্মদের (সঃ) পর থেকেই কিছুটা এবং হজরত ওসমানের সময় থেকে তো বটেই, রাজনৈতিকভাবে বহুধা বিভক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মুসলিম-অধ্যুষিত রাজ্য আলাদা আলাদা ভাবে যার যার অধীন থেকে স্বাধীনভাবে শাসিত হয়েছে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও বিরোধ থেকে এ উম্মা শুধু শিয়া ও সুন্নি এ দু প্রধান ভাগেই বিভক্ত হয় নি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতের শাসক-শ্রেণীর স্বার্থে মুসলিম ফেকাহ্ ও ব্যবহার-বিদ্যার ঘটেছে রূপান্তর। এসব ফেকাহ্‌র মসলা-মসায়েল মুসলিম জগতের সবখানে এক নয়। প্রধান দুই ফেরকা শিয়া-সুন্নিও বহু শাখা-উপশাখায় বিভক্ত। প্রায়-প্রতিটি ফেরকারই উদ্ভব ঘটেছে রাজনৈতিক মতভেদ থেকে। রাজনৈতিক মতবিরোধ প্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে নানা ধরনের আধ্যাত্মিক ফেরকাও উদ্ভব ঘটে। হাসান-বিন সাবাহ্'র নেতৃত্বে হাশিশিদের মত সন্ত্রাস দ্বারা সমাজ পরিবর্তনকারীদেরও আবির্ভাব ঘটে রাজনৈতিক মতবিরোধ থেকেই। এসব ফেরকার কেউ কেউ আবার একে অপরকে মুসলমান বলেও

স্বীকার করতে চায় না। যেমন হাল আমলের কাদিয়ানি'দের স্বীকার করে না পাকিস্তানের কেউ কেউ। অথচ কে মুসলমান আর কে তা নয়, সে-বিচার করার একমাত্র মালিক আল্লাহ্ বলেই ইসলামি শাস্ত্র জানায়।

এসব নানা মতবাদী লোকেরাই রাষ্ট্র গড়েছে ভেঙেছে। ধর্ম সেখানে একটি উপাদান হিসেবে মানুষের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করলেও তাই দেখা যায় রাষ্ট্র স্থাপিত হয়, গড়ে ও ভাঙে রাজনীতিক অর্থনীতিক সামাজিক নানা বাস্তব কার্যকারণের ভিত্তিতেই। একই ধর্মের রাজনৈতিক বিরোধ ও দলাদলির কারণেই নির্বাচিত খলিফা হজরত ওসমান এবং হজরত আলি নিহত হন। সেই থেকে রাজনীতিক ক্ষমতালাভের ব্যক্তিগত শ্রেণীগত ও উপজাতিগত উচ্চাভিলাষকে কেন্দ্র করে মুসলমানে মুসলমানে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে এবং সে-সব যুদ্ধে রক্তপাত মুসলমানের ঝড়েছে, বিদেশী-বিধর্মী দ্বারা বা বিদেশী-বিধর্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তত বেশি মুসলমান বোধ হয় কখনো প্রাণ হারায় নি।

আবুল ফজল সমকালীন চিন্তা গ্রন্থে বলেন, 'ধর্ম এবং রাষ্ট্র উভয়ের আয়ু সুদীর্ঘ—এ সুদীর্ঘকালে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কোথাও কোন দেশে কোন কালেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ধর্মীয় অনুশাসন আর বিধিবিধান যেখানে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনের জন্য শাসনতান্ত্রিক আর আইনসঙ্গত বাধ্যবাধকতা নেই তেমন দেশ বা রাষ্ট্রকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র বলার কোন মানে হয় না। খোলাফায়ে রাশেদিনের দিনেও আরব দেশে এমন রাষ্ট্র চালু ছিল সেকথা ইসলামের ইতিহাস বলে না।' তিনি আরো বলেন, 'মানুষ অর্থনৈতিক জীব। ধর্মীয় জীব নয় কোন অর্থেই। ধর্মের ষাঁড় শুধু পশুর বেলায় ব্যবহৃত হয়—মানুষের বেলায় প্রয়োগ হলে তা রীতিমত গাল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ অর্থনৈতিক শেকলেই বাঁধা।'

আনিসুজ্জামান 'বাংলাদেশে ধর্ম, রাজনীতি ও রাষ্ট্র' প্রবন্ধে জানান, 'পাকিস্তানি পন্ডিত ইকবাল আহমেদ লিখেছেন যে, ইসলামের ১৪০০ বছরের ইতিহাসে ১১০০ বছরই ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথক থেকেছে। তাঁর মতে, ধর্ম ও রাষ্ট্রের বন্ধন ছিন্ন হয় ৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে, যখন বুয়াহিদ শাহজাদা মুইনউদৌলা আহমদ রাজধানী বাগদাদ দখল করে ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা রূপে আব্বাসীয় খলিফার দ্বৈত ভূমিকার অবসান ঘটান। ইকবাল আহমেদ অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন যে অনেক গোঁড়া আলেমই খোলাফায়ে রাশেদিনের পরে আর ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এক্ষেত্রে ৬৬০ খ্রীস্টাব্দের পরে আর কোন মুসলিম রাষ্ট্রকে ইসলামি রাষ্ট্র রূপে স্বীকার করা যায় না। তিনি আরো বলেন যে, শিয়া আলেমরা আবার হজরত উমর ও হজরত ওসমানকে বৈধ খলিফা বলে বিবেচনা করেন না। তাতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্কচ্ছেদের তারিখ আরো পিছিয়ে দিতে হয়।'

বস্তুত বাংলাদেশেও বখতিয়ারের বিজয়ের পর থেকে মীরকাসিম পর্যন্ত যে-রাষ্ট্র দেখা যায় তার শাসকরা মুসলমান থাকলেও তাঁরা যেমন অন্যধর্মীদের নির্বংশ করে ফেলেন নি, তেমন দেশীয় বহু আইনকানুন, প্রথা-আচার, সংস্কার-সংস্কৃতি ঝেঁটিয়ে বিদায় করেন নি। ধর্ম থেকেছে রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি থেকে বেশকিছুটা দূরেই। রাষ্ট্রশাসিত হয়েছে অনেকটাই ধর্মনিরপেক্ষভাবে। আরো ঠিকভাবে বললে বলা যায়,

ইহজাগতিকভাবে। ইহজাগতিকতার অর্থ দুনিয়াদারি অনুযায়ী চলা। কোন দেশেই একটিমাত্র ধর্মের মানুষ বাস করে না। করলেও একই ধর্মের ভেতরে থাকে বিভিন্ন মতবাদ। সম্পর্ক রাখতে হয় ভিন্নধর্মের লোকজনের অথবা রাষ্ট্রের সাথে।

ধর্মকে রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করে রাষ্ট্রপরিচালনায় অত্যুৎসাহী অনুসারিগণ বড়জোর এর ভাবসম্পদকেই কাজে লাগাতে পেরেছেন। বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন কেবল এর সর্বজনীন নৈতিক বিধি-বিধানগুলোকেই। নীতিসারগুলোও পুরোপুরি সবসময় বাস্তবায়িত হতে পারে নি। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, রাষ্ট্র কখনোই একমনা একাত্মা দিয়ে গঠিত কতকগুলো মানুষের অধিবাস হয় না। হয় না লখিন্দরের লোহার ঘর। এতে বসবাস করে নানা ধরনের মানুষ—বহির্যোগাযোগ বাদ দিলেও। আর, বহু মানুষ মানেই বহুতর রূপ। বহুতর মনমানসিকতা। বহুতর মতামত। কেবলমাত্র একটি সরলরেখায় একটিমাত্র নীতির সুনির্দিষ্ট দাগে রাষ্ট্রপরিচালনা অসম্ভব। কোন একক ধর্মের ভিত্তিতে তো বটেই। শাসনতন্ত্রে কয়েকটি আরবি ফারসি শব্দ বসালেও রাষ্ট্রটি ইসলামী রাষ্ট্র হয় না। আবুল ফজলের ভাষায়, 'ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র স্রেফ এক ইউটোপীয় অবাস্তব কল্পরাজ্য। প্রাচীনকালে সবদেশেই সমাজ ছিল সরল, জটিলতামুক্ত, লোকসংখ্যাও ছিল সীমিত। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের তেমন চাপ ছিল না—তখন যা সম্ভব হয় নি, আজকের দিনে তা সম্ভব এ কল্পনা করাও স্রেফ বাতুলতা।'

আবুল ফজল উক্ত বিষয়ে নির্মোহ দৃষ্টিতে আরো বলেন, 'আধুনিক মানুষ আর আধুনিক রাষ্ট্র এখন হাজারো সমস্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—আর এ বন্ধন তাবৎ বিশ্ব আর বিশ্বসমস্যার সাথে জড়িত। একক আর বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র এখন অকল্পনীয়। যে রাষ্ট্র অনুন্নত অবস্থায় সকলের পেছনে পড়ে থেকে সকলের মার খেয়ে খেয়ে সব সময় অন্য রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকতে চায়—তেমন রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নভাবে কিছুকাল রক্ষা করলে করতেও পারে। কিন্তু যে-রাষ্ট্র আধুনিক জীবন-জোয়ারে শরিক হয়ে আত্মসম্মান আর আত্মনির্ভরতার সাথে বাঁচতে চায় তার পক্ষে তা সম্ভব নয়। এমন রাষ্ট্রকে বিশ্ব-জ্ঞানের অংশীদার হতেই হবে—সে-জ্ঞানের সঙ্গে যদি ধর্মের বিরোধও থাকে, তা হলেও সে-জ্ঞান গ্রহণ না-করে উপায় নেই। আধুনিক জীবনের দাবী এত অপ্রতিরোধ্য যে, তাকে অস্বীকার করা মানে কূপমণ্ডুক হয়ে থাকা।' রাজনীতির তথা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনার বিষয়ে তাঁর সাফ সাফ মন্তব্য, 'আমাদের দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের চেয়ে সস্তা আর লোক-ক্ষেপানো শ্লোগান আর নেই। তাই অনেকেই এই শ্লোগানের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। একমাত্র উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল।'

রাজনৈতিক এ উদ্দেশ্য হাসিল অথবা রাষ্ট্রকে কোন বিশেষ একটি নীতি বা রূপে টিকিয়ে রাখতে হলে একে ব্যবহার করতে হয় যন্ত্র হিসেবে। রাষ্ট্র তাই বাস্তবে হয়ে ওঠে একদল মানুষের ওপর অপর একদল মানুষের শাসনের হাতিয়ার মাত্র। এখানে ধর্ম উপাদান হিসেবে থাকলেও সর্বগ্রাসী হতে পারে খুবই কম। হয় বরং শ্রেণী-গ্রাসী। আর শ্রেণী তো গড়ে ওঠে আর্থিক বুনিয়াদের ভিত্তিতেই। অর্থাৎ সম্পদসম্পত্তির মালিকানা তথা উৎপাদনের উপায় উপকরণের মালিকানা ও তার বণ্টনব্যবস্থারই ওপর। সেজন্যই

রাষ্ট্র হল শেষবিচারে এক শ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর শাসন করার একটা বিশেষ অস্ত্র মাত্র। মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে এদেশে এ শাসক-মালিক শ্রেণী ছিল সামন্তবর্গ। হালে ধনিক-মধ্যবিত্ত।

শ্রেণী-উৎপাদনব্যবস্থা-মানসসম্পর্ক ও বাংলাদেশ

ধর্ম অনুসারে ও তত্ত্বগতভাবে সকল মুসলমান এক উম্মা হলেও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীগতভাবে তারা বাস্তবে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত : ধনী ও দরিদ্র, প্রভু ও ভৃত্য, সামন্ত ও রায়ত, বুর্জোয়া ও শ্রমিক। অর্থাৎ একদল মুসলমান জমিজমা সম্পদ-সম্পত্তি-কল-কারখানা-শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, অন্যদল তাদের অধীনে কর্মরত ভৃত্য-শ্রমিক-কৃষক-চাকরিজীবী ইত্যাদি। মধ্যস্তর হিসেবে এদের ভেতর কিছুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গ রয়েছে, যারা একদিকে একইসাথে কিছু জমিজমা-কলকারখানার স্বত্বাধিকারী, অন্যদিকে হয়ত চাকরি-ব্যবসা-বাণিজ্যও করে থাকে। মূলে শাসন করে ও সমাজপতি হয় ধনসম্পত্তি যাদের বিশাল, তারাই। তাদের তাবেদার বা সহযোগী হিসেবে অবস্থান করে উক্ত মধ্যস্তর, যাদের সাধারণত পেটি-বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত বলা হয়। এর অবস্থানের জন্যই এটি আলাদা কোন শ্রেণী নয়। তবে আধুনিককালে এদের সংখ্যা যথেষ্ট বলে সমাজে একটা বিশেষ প্রভাব পড়ে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রে যেখানে বৃহৎ শক্তিশালী বুর্জোয়া অনুপস্থিত। উৎপাদন ব্যবস্থার পুরো মালিক নয় বলে এদের অবস্থান দুর্বল। ভূমিকাও দুর্বল। যেদিকে পাল্লা ভারী দেখে সেদিকেই ভিড়ে। উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে কিছু বখরা-বাঁট পাওয়ায় এবং যুগ যুগ ধরে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে বাস করার ফলে চেতনাগতভাবে ঝোঁকটা এদের এদের কোন-কিছু-একটার মালিক হয়ে বসার দিকে। অর্থাৎ শোষক হওয়ার দিকে। ফলে তাদের নিজেদের বঞ্চনার সময় সর্বহারার দিকে ঝুঁকলেও, বঞ্চিত শ্রেণীর সুবিধার জন্য সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে আসে কমই, বরং সে-পরিবর্তনকে ভয় পায়।

মোটামুটি তিনস্তরের এ জনমানুষ নিয়ে যে-সমাজ বাংলাদেশে গঠিত তার বিভক্তির রূপ রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত। সামন্তযুগে বাস্তবে ও চেতনাগতভাবে আশরাফ আতরাফে বিভক্ত তো ছিলই, বর্তমানযুগেও এর জের অনেকটুকুই রয়ে গেছে। আচারে ব্যবহারে এর প্রকাশ আজো সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। একজন দরিদ্র কামলা ফিটফাট পোশাক-পরা উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক দেখলে যেমন সসম্ভ্রমে সালাম জানায় বা মুখে আসে তার কাঁচুমাচু ভাব (এই সালাম জানানো ও কাঁচুমাচু ভাব সৃষ্টিতে ভদ্রতা প্রকাশ পায় যত-না ভয়মিশ্রিত বিনয় প্রকাশিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশি—এ ভাব ওই প্রভাব-প্রতিপত্তি-অর্থ-বিত্তের জন্যই: সাহেব ইচ্ছে করলে কতকিই-না করতে পারেন!), সেই মধ্যবিত্তটিই আবার হয়ত একজন বিত্তশালীর সামনে গিয়ে হয়ে যায় তেমন বিনয়ী। সত্যিকারভাবে শক্তিশালী সমতুল্য মনমানস নিয়ে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এরা প্রায় কেউই একে অপরের নিকট করতে পারে না। পারে, কেবল সমান সমান হলে—একজন কামলা অপর কামলার সাথে, একজন মধ্যবিত্ত অন্য মধ্যবিত্তের কাছে এবং একজন ধনিক অন্য ধনিকের সাথে। এ দীনতা হীনতা অথবা সবলতা আসে, বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থায়

শ্রেণীগত অবস্থানের কারণেই। শ্রেণী-চেতনার বহি:প্রকাশ মুসলিম জনধারায় এমনিভাবে প্রতি পরতে থাকে বিধৃত।

বাস্তবতার এ আলোকে একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের সাথে একই ধর্মের বলে মনে মনে একাত্মবোধ করতে চাইলেও ধনী এবং গরিব হওয়ার জন্য মনে আসতে পারে একধরনের অস্বস্তি। আবার ভাষাগত ফারাকের জন্য বোধ করতে পারে অসুবিধা। বিজাতীয় হওয়ায় মনে কতে পারে একে অপরের অচেনা-অপরিচিত। অর্থাৎ ধর্মীয় আদর্শ একাত্মবোধের একটা উপাদান হলেও, কখনোই প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় একমাত্র বিষয় নয়। তা নির্ভর করে আরো অনেক উপাদানের সম্মিলনের ওপর : ভাষা, জাতীয়তা, অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ওপর। ঠিক এ কারণেই ধর্মীয় আদর্শ বিভিন্ন গোষ্ঠীর, ভাষা-ভাষীর এবং সামাজিক বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত লোকদের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পরলেও, এর কোনকিছুই একেবারে বিলুপ্ত বা বিদূরিত হয় না, অথবা একেবারে একীভূত কখনোই করতে পারে না। বরং গোষ্ঠীচেতনার প্রাবল্য, ভাষা-বক্তব্যের পার্থক্য, আর্থিক অসমতা ইত্যাদি ঠিকই রয়ে যায়। কখনো কখনো কোন-কোনটা মাথাচাড়া দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে প্রবল বেগে।

আবার উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মনোজগৎও পরিবর্তিত হয়। চাঁদের বুড়ি আজকের দিনে আর চড়কা কাটতে পারে না—শিশুদের মনেও। কোন 'পিচ্চি'কেও একথা বললে বিশ্বাস করতে চায় না—টিভি, রেডিও আর পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সে-সম্বন্ধে খবরাদি শোনে এবং নেইল আর্মস্ট্রংদের সেখানে অবতরণের কথা জেনে। বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় এবং ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিবৃদ্ধিতে উত্তর মেরুর ছ'মাস দিন ছ'মাস রাত্রির মত জায়গায় অথবা চাঁদের মাঝে বসে (যে চাঁদ দেখেই ধর্মের অনেক নিয়ম-নীতি পালিত হয়) ধর্মের নানা আচার-সংস্কার পালন কীভাবে সম্ভব এ সমস্যাও আধুনিক মানুষের মন-মননকে করে তাড়িত। যত যুক্তিই খাড়া করে এমন সব ব্যাপারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কেউ দিক-না কেন, তা অনেক সময়ই অযৌক্তিক ঠেকে বাস্তবতার নিরিখে। তাই দেখা যায়, বুর্জোয়া সভ্যতার বিকাশ, নগর সভ্যতার ক্রম-প্রসরণ এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির বদৌলতে, ক্রমেই দূরীভূত হচ্ছে অতীতের সামন্তচেতনার ধারা। বিজলী বাতি জ্বালানোর সাথে সাথে চলে যায় ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো। অন্য কথায়, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনে বাস্তব অবস্থার যেমন পরিবর্তন হয়, তেমন পরিবর্তন হয় ধ্যান-ধারণা-চিন্তা-চেতনারও।

তবে উৎপাদনব্যবস্থা যে-হারে বা যে-গতিতে দ্রুত পরিবর্তিত হয়, মানুষের মনোজগৎ তত দ্রুত পরিবর্তিত হয় না। এ পরিবর্তন ঘটে যথেষ্ট ধীর-লয়ে। এবং ঘটে নানা বুঝ-ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ, বর্জন-গ্রহণের মাধ্যমে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিবর্তন বস্তুগত। দৃষ্টিগ্রাহ্য। কিন্তু মনোজগতের পরিবর্তন ভাবসম্পৃক্ত। অদৃশ্য। একটা আবিষ্কারই হয়ত বস্তুগত পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট কিন্তু মনোজগৎ পরিবর্তনের জন্য দরকার হাজারো অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের মুসলমানদের বেলায়ও এ সত্য।

দেশ বনাম বিদেশ যোগ দেশ

আজকের দিনের বাংলাদেশের অধিবাসীরা চাকরি-ব্যবসার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে অথবা যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্র-জার্মানি-জাপান-মালয়েশিয়া-এর মত দেশে যাচ্ছে, অতীত দিনের বিভিন্ন দেশের মুসলমানরাও তেমন ইরান-তুরান-আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশ থেকে বাংলাদেশে রুজি-রোজগারের আশায় এসেছে। যতদিন রোজগার করেছে, ততদিন থেকেছে। রোজগার শেষে কেউ হয়ত চলে গেছে নিজ বাসভূমে, থেকেও গেছে কেউ কেউ। বিদেশ-থেকে-আগত এসব মুসলমান ও দেশজ ধর্মান্তরিত মুসলমান মিলে গড়ে উঠেছিল এদেশের যে-মুসলিম জনগোষ্ঠী তাতে তাদের ভেতর অনিবার্যভাবেই দু'ধরনের মন-মানসিকতা গড়ে ওঠা ছিল স্বাভাবিক। বিদেশ-থেকে-আগত রোজগেরে মুসলমানদের প্রবাসীর মন-মানসিকতা থাকাটাই সম্ভব (আজকাল যেমন এদেশের অনেকে ইংলণ্ডে থেকে, রোজগার করে, খেয়েদেয়ে, আলোবাতাস গ্রহণ করেও অনুভব করে 'নিজের দেশ' তথা বাংলাদেশের প্রতি টান)। তাদের ওই প্রবাসী-মনে স্থানীয় মাটি ও মানুষের প্রতি মায়া তেমন হয়ত জাগে নি কখনোই—অন্তত যে-প্রজন্ম বিদেশ থেকে এসেছে, তার তো বটেই (ব্যতিক্রম ছাড়া), তার কাছ থেকে সেই-ফেলে-আসা-স্বদেশের কথা শুনে শুনে হয়ত পরের আরো কয়েক প্রজন্ম তার কাছাকাছি একটি টান-অনুভব করেছে। বিদেশে (সে সময়ের বাংলায়) থাকায় দূরে অবস্থিত স্বদেশের (ইরান-তুরান-আফগানিস্তান) প্রতি টানটা হত মোহমায়ার (যেমন বর্তমানেও হয় বিদেশে অবস্থানরত এদেশবাসীর)। বিভিন্ন দেশ থেকে আসার ফলে তাদের ভেতর ভাষাগত, এমনকি সংস্কৃতিগত নানা ফারাক থাকলেও বিদেশে (বাংলায়) অবস্থানের জন্য কখনো-বা মুসলমান হিসেবে, কখনো-বা জাতিগোষ্ঠী হিসেবে পরস্পর মানসিকভাবে কিছুটা সন্নিকটেও অবস্থান করত এ বাংলায় অবস্থিত সকলে (যেমন আজকাল করে বিদেশে বসবাসরত এদেশিগণ)।

বিদেশ-থেকে-আগত বাংলায় বসবাসরত মুসলমানরা নিজেদের কেবল বিদেশীই ভাবত না, ভাবত উচ্চস্তরেরও। কারণ, অর্থে-বিত্তে-চাকরিতে-ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে অর্থাৎ জাগতিক সকল কর্মকাণ্ডে তারাই ছিল মূলত সমাজের উপরের স্তরের লোক (আজকের দিনে বিদেশে বসবাসরত এদেশীদের ঠিক উল্টো)। উৎপাদনের চাবিকাঠি নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা ছিল তাদেরই হাতে। তাদের সাথে নানা কাজে সম্পর্কযুক্ত এদেশ-জাত ধর্মান্তরিত মুসলমান অনেকেও নিজেদের এদেশী ভাবতে ছিল কুণ্ঠিত। উপরের স্তরের প্রাধান্যের জন্য এরা উচ্চকোটির সাথে সম্পর্কের সূত্র খুঁজত বহিরাগত হওয়ার। দেশজ মুসলমানসহ সে-যুগের শাসকগোষ্ঠী ছিল নগণ্য সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘুত্বের আত্মরক্ষণবৃত্তির প্রেরণায় সংকীর্ণতা, রক্ষণশীলতা ও স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির ভাবধারা দীক্ষিত মুসলিম সমাজের মধ্যেও ছড়িয়েছিল। উচ্চস্তরে কেবল সম্পদ আয়ত্তের অন্ধ অনুকরণবৃত্তিই ছিল কার্যকর। তাদেরই আবার অনুসরণ করতে চাইত দেশজ নিচের স্তরের লোকেরাও। দেশীয় মুসলমানদের মধ্যে উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের মানুষ সংখ্যায় ছিল অল্প। তারা মুন্‌সি, মোল্লা, কাজী, খন্দকার, মৌলবি, মোয়াজ্জিন, গোমস্তা বা বড়জোর উকিল হলেই কৃতার্থ হত। নিম্নবিত্তের তো লেখাপড়ার রেওয়াজই ছিল না। অর্থবিত্তের

অভাবে সে-সামর্থও হত না। প্রশাসনিক ভাষা ফারসি থাকায় তা ছিল দূরধিগম্যও। দেশজ বাংলা ভাষার পরিবৃদ্ধিতে মনে হয় গ্রামে-গঞ্জে লোক-সমাজের চিন্তা-চেতনা শাসকদের থেকে কিছুটা যেন দুরে অবস্থান করত, বিশেষ করে মোগল যুগের শেষদিক থেকে। আর গ্রামাঞ্চলে অমুসলমানাদের বসবাসই ছিল বেশি। সেখানে তাদের প্রভাব কার্যকর থাকা অস্বাভাবিক ছিল না।

একথা ঠিক যে, ইসলাম ধর্মের আবেদন আন্তর্জাতিক। দেশ ও জাতির সীমা ছাড়িয়ে সকলের ধর্ম হওয়ার দাবি এ করে। সামন্ততন্ত্রেরও কোন দেশ-সীমা নেই। যে-রাজ্য দখল হয় তাই নিজের দেশ বলে বিবেচিত হতে পারে। সাধারণত জন্মস্থানকেই স্বদেশ বলে সে-সময়ের মানুষ ভাবত বটে, কিন্তু সে-ভাবনার পরিসর বেড়ে যেতে পারত দেশ-বিজয়ের মাধ্যমে। এ প্রেক্ষাপটের সাথে বেখাপ্পা হত-না ইসলামী ভাবসম্পদ। সারা পৃথিবীকেই সে জয় করে নিতে পারত শক্তি, ক্ষমতা ও অন্তরের আহ্বানে। কবি ইকবালের ভাষায় 'সারা জাঁহা হামারা' বলে ইসলামধর্মী গর্ববোধ করতে পারত। একটি বিশেষ স্থানের সীমায় আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন তার ছিল না আধুনিক রাষ্ট্রের মত।

কিন্তু আধুনিক যুগের ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ জাগরণের কালে এ ঘোষণা কেবল তত্ত্বগতভাবেই দেওয়া সম্ভব, জাতিগত বা দেশগতভাবে নয়। ফলে এ সময় দেশপ্রেম বনাম বিশ্বপ্রেম (বা বিশ্ব অধিকার)-এর এক মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় মুসলমানদের মধ্যে। অতীতের উচ্চকোটির মানুষের মন-মানসিকতায় বাইরমুখো অর্থাৎ তাদের ফেলে-আসা-দেশের জন্য মায়ার ভাবটা আধুনিক যুগে মুসলিম মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশের সাথে সাথে দৈশিক ও রাষ্ট্রিক চেতনাবোধসম্পন্ন জাতীয়তা বাড়ার সময়ও ভেতরে ভেতরে যেন নীরবে কাজ করে যেতে থাকে। এদের কেউ কেউ হয়ত ছিল ওই ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত বা সামন্তদের ভগ্নাংশ, অনেকে একেবারেই দেশজ। তাছাড়া ইসলাম ধর্মের আবেদন সর্বজনীন হওয়া সত্ত্বেও 'এক রাজ্য পাশে' সারা বিশ্বকে বেঁধে দেওয়া কেন সম্ভব হয় নি, এ প্রশ্নও উদিত হওয়াটা স্বাভাবিক।

বাংলাভাষী মুসলমানরা এ অঞ্চলের বাংলাভাষী অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে ভাষাগত ও দেশগত সাযুজ্যের জন্য বোধ করে একাত্ম এবং বিপরীতপক্ষে মুসলমান হিসেবে সে বিশ্বে বিস্তৃত মুসলমানদের সাথে বোধ করে নৈকট্যও। প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ধারায় (যেমন, কথা বলা, মাছ-ভাত খাওয়ায়) একজন অমুসলমান এদেশীকে অনেক বেশি নিকটতর মনে হয় একজন মুসলমান আরবি'র চেয়ে। আবার মুসলমান হিসেবে একজন আরবিও একেবারে দূরের মনে হয় না। প্রথম ভাবটি জাতীয়, দ্বিতীয়টি আন্তর্জাতিক। প্রথমটি ভৌগোলিক সীমানাগত ঐক্যভাব, বা অন্য কথায়, আনুগত্য, দ্বিতীয়টি বহির্দেশীয় ঐক্যভাব, বা আনুগত্য। বলা বাহুল্য, ভাব দু'টি আপাত-বিরোধী। একত্র করে চালাতে গেলে প্রয়োজন হয় বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা-চেতনা ও সংস্কারমুক্ত মন। নইলে বহির্দেশীয় আনুগত্য নষ্ট করে দিতে পারে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ। প্যান-ইসলামবাদ একদা যেমন ভারতবর্ষের কোন কোন মুসলমানকে তাড়িত করেছিল বিদেশে হিজরতে।

বিচিত্র এ মনোভঙ্গির ব্যাখ্যা গোপাল হালদারের ভাষায় দেওয়া যায় এভাবে, 'ভারতের (বাংলাদেশেরও) বাহিরে তাহাদের (মুসলমানদের) 'পবিত্রভূমি', দিনে পাঁচবার তাহারা পশ্চিমে মুখ রাখিয়া নিজেদের সেই স্বপ্নের স্বদেশের কথা স্মরণ করে; মক্কা তাঁহাদের প্রাণভূমি, আরব তাহাদের ধর্মের জন্মভূমি, তাহাদের মূল উত্তরাধিকার সেখানকার আরব্য সমাজের; ধর্ম-ভাষাও তাঁহাদের আরবী, মূল ধর্ম-নেতৃবৃন্দ আরব-সন্তান ফকির-দরবেশ সাহিত্য-শিল্প ; দার্শনিক চিন্তা পর্যন্ত প্রধানত আরব, পারস্য, মিশর, সিরিয়ার—ভারতের নয়; তাই ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দীতেও ইসলাম নিমজ্জিত হইয়া গেল না।' গেল না বলে যে অবস্থার সৃষ্টি হল তা *রক্তাক্ত বাংলা* গ্রন্থে আবদুল গাফফার চৌধুরী'র 'দ্বিজাতিতত্ত্বের অপঘাত মৃত্যু' প্রবন্ধের ভাষায় বলা যায়: 'ভারতীয় মুসলমান তাদের অমুসলিম পূর্বপুরুষের সাফল্যে গর্ব এবং পরাজয়ে বেদনাবোধ না করে উল্টোটা করেছেন এবং বহিরাক্রমণকারী ধর্মে মুসলমান হলেই তাকে জাতীয় বীর ভেবে বন্দনা করেছেন।' তিনি আরো বলেন, 'ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পারসিক সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে, ভারতের শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে যারা পৌত্তলিক জ্ঞানে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করতে চায় নি, রামায়ণ বা মহাভারতকে যারা নিজেদের জাতীয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করতে চায় নি, তারা মুসলমান ভ্রমে পারস্যের পৌত্তলিক বীর সোহরাব-রুস্তমকে ইসলামের জাতীয় বীর হিসেবে গ্রহণে আপত্তি করে নি। ভারতের মুসলমানদের *শিশুপাঠ* গ্রন্থে ইসলামী ঐতিহ্য ও ভাবধারা সংরক্ষণের নামে যে নৌফেল বাদশা, হাতেম তাই বা রাজা নওশেরওয়ার কিস্সা কাহিনী রয়েছে, আসলে তা আরব ও পারস্যের পৌত্তলিক যুগের রাজরাজড়ার কাহিনী।'

উনিশ-বিশ শতকে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত অতীত ঐতিহ্য ঘাটতে গিয়ে দেখে যে, বাংলা বা সারা ভারতের ইতিহাসে খ্রীস্টীয় তের শতকের আগে তাদের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নেই, আট শতকের আগে তো এদেশে তাদের জন্মই হয় নি। অথচ দেশজ যে-ঐতিহ্যের তারা উত্তরাধিকারী তার সবটুকু জুড়েই আছে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও নানা ধরনের চিন্তা-চেতনা। এর ভেতর আবার তথাকথিত হিন্দুয়ানি ভাবটাই প্রধান, যে ধর্মের মধ্যবিত্তের সাথে হচ্ছে এ সময় তাদের সংঘাত। 'স্বদেশ বনাম বিদেশ এই চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয় জাতীয়তাবাদ।' অন্নদাশংকর রায় *বাংলার রেনেসাঁস* গ্রন্থে বলেন, 'কিন্তু গোড়ায় সেটা রূপ নেয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের। প্রাচীন ভারতের হিন্দু জাতির পুনরুজ্জীবনই হয় লক্ষ্য। মুসলমানরা তো প্রাচীন ভারতে ছিল না। সুতরাং তাদের বাদ দিয়ে ভাবা হয়। যাদের বাদ দেওয়া হল তারাও চায় পুনরুজ্জীবন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের নয়। কারণ সেখানে তারা ছিল না। তারা চায় ইসলামের আদিপর্বের পুনরুজ্জীবন। তাদের বেলা ওটা জাতীয়তাবাদ নয়। প্যানইসলামিজম। পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদ যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হয় তখন প্যানইসলামিজম হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ।'

দুই প্রধান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির এ ত্রুটিটা সৈয়দ মুজতবা আলী ব্যাখ্যা করেন এ ভাবে: 'ষড়দর্শননির্মাতা আর্য মনীষিগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্রপৌত্ররা মুসলমান

আগমনের পর শত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাটিতে দর্শনচর্চা করলেন; কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদ্রাসায় শত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিয়প্লাতিনিজম তথা কিন্দি, ফারাবী, বু'আলী সিনা, আল গাজ্জালী, আবু রুশদ ইত্যাদি মনীষিগণের দর্শনচর্চা হল তার কোন সন্ধানই পেলেন না। এবং মুসলমান মৌলানাও কম গাফিলতি করলেন না—তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না পাশের চতুষ্পটিতে কিসের চর্চা হচ্ছে।' বিচ্ছিন্নতাবাদের এই-যে উপাদান ছড়িয়ে রয়েছিল সারা-দেশে, তারই ফলে যেন আধুনিক জাতীয়তাবাদ জাগরণের সময় দ্বিধাবিভক্তির সূত্রগুলো উস্কে ওঠে।

মধ্যবিত্তের চেতনা-সংকট

বখতিয়ার খলজির আক্রমণ মুসলমান হিসেবে বিচার করলে বাংলাদেশের একজন মুসলমান উৎফুল্ল হতে পারে মুসলিম বিজয় ভেবে, কিন্তু একজন এদেশী বা বাঙালি হিসেবে ভাবলে হয় বিষণ্ণ—একটা পরাজয়ের ভাব যেন তার ভেতর এসে হয় উপস্থিত। এটা আবার এমনই ন্যাক্কারজনক পরাজয় যে, মাত্র উনিষজন ভিনদেশী মানুষ নদীয়া তথা বাংলা জয় করে বলে কথিত! এর পেছনের অতোসব সত্যাসত্য না-ঘেঁটে, এ জনশ্রুতি তার ভেতর সৃষ্টি করে এক হীনমন্যতাবোধ। অথচ মজার ব্যাপার, না-ওই লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বাঙালি, না-ছিল তখন বাঙালিত্বের অমন কোন বোধ অথবা না-ছিল বখতিয়ারের মুসলমানিত্ব ফলাবার সর্বগ্রাসী কোন ইচ্ছা। সামন্ত প্রভুরা দেশ জয় করেছে স্বীয় স্বার্থেই। মুসলমানরাও দেশ জয় করেছে সেকালের ধারা বেয়েই। যদি কেবল ধর্ম প্রচারের জন্যই সে-সব জয় সমর্থিত হত তাহলে আর কোরান শরীফেই এমন ধরনের আয়াত থাকত না 'লা-কুম দীনুকুম ওয়ালিয়াদীন'—তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার; অথবা 'লা ইকরাহা ফি দ্বীন'—ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই।

আসলে যে-কোন ধর্মগোষ্ঠী অথবা জাতিগোষ্ঠী নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে অতীত ইতিহাসটা চায় নিরবচ্ছিন্নভাবে উজ্জ্বল। চায় সেই ধর্ম বা জাতির অন্তর্গত লোকসমষ্টির সুদূর অতীত থেকে একেবারে বর্তমান পর্যন্ত এক অপ্রতিহত আধিপত্য, অন্তত বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে অবিচলিত সংগ্রাম। অথচ ভাবে না যে, কি ধর্ম, কি জাতিগত পরিচয় ইতিহাসের একটা বিশেষ সময় পর্যন্তই সীমিত। গোটা বিশ্বের মানব সমাজের কাহিনী তার চেয়ে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া, কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যেমন নয়, তেমন কোন ধর্মগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠীর জীবনেও কেবল সুখকর জয়ের চিহ্নই সর্বদা থাকে না, থাকে পরাজয়, হতাশা এবং গ্লানিও। বিবেচক মানুষ বা জাতি গোষ্ঠী সেসব কাটিয়ে উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়াস পায়। আর অবিবেচকের দৃষ্টি হয় কেবল অস্বচ্ছতায় আচ্ছন্ন। নির্মোহ দৃষ্টির অভাবে অতীতের কোন ঘটনার জন্য নিজেকে তার সাথে জড়িয়ে একজন বাঙালি মুসলমান 'বাঙালি' হিসেবে পরাজয়ে বোধ করে মানসিক যাতনা, এবং বিজয়ে আহ্লাদিত হয় সেই বাঙালি মুসলমানই 'মুসলমান' হিসেবে। ধর্মবোধ এবং জাতীয়বোধ এভাবেই দোদুল্য ও বিচলিত হয় বিচিত্র দ্বৈত-সত্তায়।

যে-মধ্যবিত্ত বাংলার (এমনকি সারা ভারতেরও) উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ ছাড়িয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে, এর মধ্যে চিন্তা-চেতনা কোন সুনির্দিষ্ট রূপে মাত্র একটি খাতে প্রবাহিত হয় নি। একদিকে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী-স্বার্থে চেয়েছে তথাকথিত মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন, অন্যদিকে তারাই কখনো বাঙালি স্বাদেশিকতায় আর কখনো সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদে হয়েছে নিমজ্জিত। সিকিউলারিজম ও কম্যুনালিজম একই সাথে অনেকের ভেতর হয়েছে কার্যকর। যে মুসলমান ব্যক্তি হয়ত হিন্দুদের নানা অন্যায়-অত্যাচার দেখিয়ে তুলো ধুনো করেছে তাদের, সেই হয়ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ওই হিন্দু সম্প্রদায়ের কাউকে রক্ষা করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। মানবতাবোধের কাছে মার খেয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। ইহজাগতিকবোধ এসেছে এগিয়ে। বৈষয়িক-আর্থিক সুবিধা দেখে সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রাধান্য পেয়ে যে-মধ্যবিত্ত সৃষ্টি করে পাকিস্তানের মত রাষ্ট্রের, সেই ফের স্বধর্মীদের হাতে নিগৃহীত হয়ে সৃষ্টি করে অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা ভিত্তিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টির পর দেখা যায় সিকিউলারিজম গভীরভাবে যেন এ দেশের মধ্যবিত্তের মন-মানসে প্রোথিত হয় নি। দেখা দেয় কারো কারো ভেতর সেই-ফেলে-আসা পাকিস্তানের প্রতি মায়া-মোহ। এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব।

এমন কিছু মুসলমান এদেশে আজো পাওয়া যাবে যারা কোন বিষয়ে পাকিস্তানের বিজয়ে হয় উৎফুল্ল, পরাজয়ে বিষণ্ন। আর এর বিপরীতে, আশ্চর্য হলেও সত্যি, ভারতের বিজয়ে বিষণ্ন এবং পরাজয়ে উৎফুল্ল। এ যেন অনেকটাই মুসলিম প্রীতির সাথে পাকিস্তান-প্রীতি গুলিয়ে ফেলা এবং ভারত-বিদ্বেষের সাথে হিন্দু-বিদ্বেষ তুলে আনা। অন্য কথায়, পাকিস্তান যেন হয়ে দাঁড়ায় ইসলামী ব্যবস্থার প্রতীক, আর ভারত, হিন্দু ব্যবস্থার। অথচ ভাবে না যে, না পাকিস্তান একটি খাস ইসলামী রাষ্ট্র, না ভারত আসলে একটি হিন্দু রাষ্ট্র। একবারও যেন মনে হয় না এদের যে, ভারতে আছে বহু মুসলমান এবং অন্তত সাংবিধানিকভাবে হলেও সে-রাষ্ট্রটি সিকিউলার, আর পাকিস্তান-যে ইসলামী রাষ্ট্র কতটুকু তা তো সকলের জানা। আরো মজার ব্যাপার, যে-মুসলিম মধ্যবিত্ত ব্যক্তিটি প্রচণ্ড ভারত-বিদ্বেষী, সেই হয়ত দেখা যায় সে-দেশের ভাল কাপড়টি, সেন্টটি কিনে এনে ব্যবহার করছে, মনোযোগ দিয়ে শুনছে সে-দেশের গান, তারিফ করছে, দেখছে ভি সি আর-এ সে-দেশেরই ছায়াছবি!

যে-ব্যক্তিটি হয়ত সাতচল্লিশে দেশভাগের সময় বিদ্বিষ্ট হয়ে চলে এসেছিল পাকিস্তানে, সেই হয়ত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কালে পাকিস্তানী সৈন্যের তাড়া খেয়ে আশ্রয় নিয়েছে ছেড়ে-আসা ভারতের আত্মীয়-বান্ধবের কাছে। মাত্র উনিশ শ পঁয়ষট্টিতে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের অনেক মুসলমান যেখানে আদাজল খেয়ে লেগেছিল ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে, সেই-ই মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় পাকিস্তানি ফৌজের পিটুনিতে সীমান্ত পার হয়ে একদা-শত্রু ভারতেই গিয়ে আশ্রয় খুঁজেছে বাঁচার। আবার, যে-পাকিস্তান এদেশী মুসলমানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করেছে একাত্তরে, সেই দেশের জন্যই কেউ কেউ মনে মনে বোধ করে কেমন একধরনের আর্তি অথবা মায়া। একে কেবল রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে কতকিছুই পরিবর্তিত হতে পারে বলে উড়িয়ে

দেওয়া যায় না। বরং এ দ্বৈত-চেতনা ও বৈপরীত্যের সাক্ষ্য খুঁজতে হয় অতীত ইতিহাসের গভীর থেকে উৎসারিত মন-মননের কাঠামোয় তীব্রভাবে প্রোথিত সাইকোলজিক্যাল বা মনোজগতের অচেনা বলয়ের সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রাবলীর মধ্যে। ধর্ম ইসলাম এখানে অনেকটাই বহিরঙ্গ মাত্র, বা, পুরো বহিরঙ্গও নয়। কখনো-বা সুবিধাবাদীদের হাতিয়ার।

ভারতরাষ্ট্রকে হিন্দুরাজ্যের সাথে গুলিয়ে ফেলার কারণ, ভারতের সবকিছুই কারো কারো কাছে হিন্দু-আধিপত্যের প্রতীক রূপে মনে হয়। যে-রামরাজ্যের কথা একদা প্রাক-দেশবিভাগ কালে বলা হত, বয়স্ক অনেক মানুষসহ তাদের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ ভারতকে সেইভাবেই চিহ্নিত করতে চায়। হিন্দু-প্রধান ভারতকে কেবল হিন্দুদের দেশ বলে ভাবে এরা। হিন্দু বলতে এরা এখানে সনাতনপন্থী লোকজনদেরই মনে করে, মনে করে না যে খাস মোগলরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এবং রাজ্যে প্রচুর মুসলমান থাকা সত্ত্বেও তাদের রাষ্ট্রকে বলত হিন্দুস্তান। তাছাড়া, হিন্দু-প্রাধান্যের জন্য কেউ কেউ ভাবে বাংলাদেশেও ভারত প্রভাব বিস্তার করে তাদের আধিপত্য প্রসার করতে পারে। বিরাট রাষ্ট্র বলে তা এর করা কিছুটা সম্ভবও বলে অনেকে ভাবে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পাশে বিরাট রাষ্ট্রের অবস্থান এমনিতেই কিছুটা মানসিক অস্বস্তি সৃষ্টি করে অবশ্যই—আধিপত্যের ভয়ে, সেজন্যই অখণ্ড পাকিস্তান থাকলে তা বিশাল ভারতকে কিছুটা হলেও মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিল বলে এরা ভাবে, আর সে-ভাবনায়ই এরা হয় পাকিস্তানের সমর্থক। ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ স্বাধীনতা দেওয়ার কালে হিন্দু-আধিপত্য-ভীতি ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত মুসলমানকে একত্রিত করার একটি উপাদান হিসেবে বিরাজিত ছিল।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতর বর্ণভেদপ্রথার আজো যে-অবস্থা বিদ্যমান এবং একদা মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনদের অনেকের সাথেও তাদের অনেকের যে-অসম সম্পর্ক ছিল, ভাবত যবন বা ম্লেচ্ছ হিসেবে, জল ছুঁলে নষ্ট হয়ে যেত, এক পংক্তিতে খেত না, বসবাস করত দূরে, ছায়া মাড়ানোও অনেক সময় হত ধিক্কারের কারণ,—এসব সামাজিক ব্যাপারও স্বাভাবিকভাবে স্মরণে আসে বাংলাদেশের কোন কোন মুসলমানের। হিন্দু-আধিপত্য এলে পুরানো সে-অবস্থা ফিরে আসতে পারে ভেবেই তারা হয় ভীত। অথচ ভাবে না-যে, তাদের সম্প্রদায়ের ভেতরও এসব কম ছিল না। মুসলিম সমাজেও আকবর বাদশা আর আকবর কামলা সমাজের এক পংক্তিতে বসতে পারত না। এখনো পারে না। তাছাড়া, ফেলে-যাওয়া হিন্দু-সম্পত্তি ভোগদখল করার যে-সুবিধা কেউ কেউ পাকিস্তান আমলে পেয়েছিল তা ক্ষুণ্ন হতে পারে ভেবেও কোন কোন মুসলমান হয় উৎকণ্ঠিত।

যে-ব্রিটিশ ভারত থেকে আলাদা পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয় তারই কাছে যেন মাঝে মাঝে ফিরে যেতে হয়, মানসিক এ যাতনাও কম নয়, যেমন পঁয়ষট্টিতে তার করুণার ওপরই স্থিত ছিল। এদেশের স্বাধীনতা এদিকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে, অথবা একাত্তরে সংগ্রামের জন্য তার সাহায্যের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল অনেকটা। পাকিস্তানের প্রায় একটানা তেইশ বছর ভারত-বিরোধী প্রচারণাও অনেকের

মানসিকতায় সৃষ্টি করে একধরনের ভারত-ফোবিয়া। উপরন্তু, এক সময়ের অমুসলমানরাই মুসলমান হয়েছে এদেশে—অতীত ইতিহাস ঘাটলে এ সত্য যখন বেরিয়ে আসে তখন কারো কারো মনে জাগে অস্বস্তি। তাই ভুলতে চায় সেই অতীত প্রচণ্ডভাবে তা অস্বীকার করে। অথচ এ তো সত্য যে, সাত শতকের আগে পৃথিবীর কোথাও কেউ মুসলমান ছিল না। মানুষ ছিল অবশ্যই। তাদের ইতিহাসও ছিল। আরবিয়রাও ওই সময় থেকেই মুসলমান। তার আগে পৌত্তলিক। তবুও তাদের ইতিহাস আছে এবং সে-ইতিহাস অস্বীকারও করা সম্ভব নয়। লজ্জাও নেই স্বীকার করায়। কিন্তু অজ্ঞতা, ভুল চিন্তা, নির্মোহ দৃষ্টির অভাব এবং নানা প্রকার প্রচারণার জন্য এদেশে যেন তা করার প্রয়াস চলে, যেমন পাকিস্তান আমলে বার শতকের ওদিকে এদেশের ইতিহাস পড়ানোয় উৎসাহিত করা হত না মোটেই। অথচ আধুনিক জ্ঞানের জন্য সাতচল্লিশের আগে পর্যন্ত এ উপমহাদেশের ইতিহাসকে কোনমতেই একেবারে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়—সে-ইতিহাস অবশ্যই অন্যান্য সকল মানুষসহ হিন্দু-মুসলমান সকলের মিলিত ইতিহাস। দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে হয়ত তা নানাভাবে লেখা যেতে পারে, কিন্তু আলাদা করা যাবে না কিছুতেই।

ভারত-ভীতির বিপরীতে অবস্থান করে পাকিস্তান-প্রীতি। মাত্র কয়েক দশক আগেই মুসলিম মধ্যবিত্ত অখণ্ড ভারত-বিরোধী হয়ে সৃষ্টি করেছিল যে-পাকিস্তান, তা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম দেখেই সৃষ্টি করল বাংলাদেশ। কিন্তু নতুন প্রজন্মের আগমনে সেখানে এল যেসব প্রগতিশীল চিন্তাধারা, তার সাথে অতীতের মিল নেই অনেকটাই। এদের গণমুখিতার তথা সাধারণ মানুষের (অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর) আধিপত্যের জোয়ারে ভয় পেয়ে ফেলে-আসা পাকিস্তানের প্রতি মধ্যবিত্তের কেউ কেউ তাই হয়ে ওঠে মায়াদারি। মনে ছিল তাদের কারো কারো ব্যর্থতার গ্লানিও। পাকিস্তানকে নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সৃষ্টি করেও ফেলতে হল ভেঙে। গড়ার অনেক কারিগরই হল ভাঙারও কারিগর। ভাঙার পরে পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ জাগে এবং নতুন-গড়া বিষয়টি পূর্বের মতই না-হলে ভেঙে-ফেলা বস্তুটির জন্য জাগে মোহমায়া। তাই হয় এদেশের মধ্যবিত্তের কোন কোন মানুষের মনে। এক-সফল-প্রয়াস পাকিস্তান-ভাঙায় পাকিস্তানের জন্য একদা আন্দোলনকারী পুরানো কেউ কেউ দেখে পরাজয়ের গ্লানি হিসেবে বাংলাদেশের উপস্থিতি। ফলে এদেশের প্রতি জাগে ক্ষোভ। আসে কিছুটা আনুগত্যহীনতা।

ইসলাম এবং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ও সমৃদ্ধির দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনেকে বুঝতে অক্ষম-যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের মূল কারণ অর্থনীতি, ধর্ম নয়। আবার, ইসলামের পুরানো দিনের ঐতিহ্য হিসেবে যা বোঝানো হয় তা যে আসলে ইসলাম যতটুকু-না তার চেয়ে অনেক বেশি আরবি সংস্কৃতি-কৃষ্টিসহ সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণা-ঐতিহ্য-সংস্কার—তাও অনেকে বোঝে না। মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদীরা অতীত সময়টা বেশি উজ্জ্বল দেখিয়ে যেমন বিভ্রান্ত করে সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনা, তেমন উস্কে দেয় ভেদবুদ্ধি জ্ঞানও। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় অন্ধতার সৃষ্টি করে তাদের ঠেলে রাখা হয় অন্ধকুঠুরিতে। তবে ধর্মবিদ্বেষ, বিশেষ করে হিন্দু-বিদ্বেষ

এদেশে অনেক কমে গেছে বাস্তব কারণেই। হিন্দুরা এখন আর অর্থনীতির ধারকবাহক নয়, প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়। যেটুকু বিদ্বেষভাব আছে আজো, তা অতীতের জের হিসেবেই আছে। তাও উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডেই কেবল সামনে এগিয়ে আসতে চায়। এর ফলে এদেশের কোন কোন হিন্দুর ভেতর সৃষ্টি হয় ইসলাম বা মুসলমান ভীতি। এদেশকে আপন করে নিতে জাগে দ্বিধা। তাকায় এরা কিছুটা ভারতের পানে। কিন্তু সে-দেশ যেহেতু স্বদেশ নয়, অনেকটাই অচেনা, সেজন্যই সেটাকেও নিজের বলে ভাবতে জাগে সংশয়। তবে হিন্দু-প্রধান হিসেবে মনে মনে কিছুটা একাত্মবোধ করতে পারে। পারে ওইরকম একাত্মবোধ করতে ভারতেরও কোন কোন মুসলমান পাকিস্তানের প্রতি। আর সেই ভরসায়ই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামকে ওদেশের কোন কোন মুসলমান খুব সুনজরে দেখে নি। পাকিস্তানে নির্ভর করার মানসিক সূত্রটি যেন তাদের কিছুটা খর্ব হয়ে যায় তা অখণ্ড না-থাকায়।

এমন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এদেশে পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ত একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। আবার বিপরীতটা পাওয়াও সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে এমন ঘনিষ্ঠতা হলেও সম্প্রদায়গতভাবে হয়ত ওই মুসলমানটিই হিন্দু বিদ্বেষী অথবা হিন্দুটি মুসলিম-বিদ্বেষী। ধর্মগতভাবে নিজেকে আলাদা ভেবে দুই ধর্মের লোকেরা স্ব-স্ব ধর্মের লোকদের ভাবে কাছের মানুষ। এখানেই ধর্মের বাস্তব অবস্থাটি খুঁজতে হয়। 'ধর্ম জাতীয়তা আর জাতীয় সংহতির বুনিয়াদ যে নয়', আবুল ফজলের ভাষায়, 'এ সত্য যুগে যুগে সব দেশেই বার বার প্রমাণিত হয়েছে। আজকের মধ্যপ্রাচ্যেই শুধু নয়, ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানে মুসলমানে রক্তক্ষয়ী লড়াইর এন্তার নজীর রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবেরা মুসলিম জগতের তদানীন্তন খলিফা তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল—তারই নতিজা আজকের ইসরাইল। তখন সারা প্যালেস্টাইন ছিল তুরস্কের দখলে। আরবেরা তুরস্কের বিরুদ্ধে না গেলে সে যুদ্ধের পরিণতি হয়ত এমন হত না। আব্বাসিয় উম্মীয়রাও পুরোপুরি মুসলমানই ছিল। কিন্তু তারাও কি পরস্পর কম লড়াই করেছেন? মোগল আর পাঠানরাও তো মুসলমান ছিল। তবুও ভারত ইতিহাসে মোগল পাঠানে যুদ্ধ এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায় হয়ে আছে।...স্বার্থের সংঘর্ষ যখন দেখা দেয় তখন ধর্ম আর ধর্মের দোহাই-যে কোন কাজেই লাগে না, তার প্রমাণের কোন অভাব নেই।...ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি খুনোখুনি কি কম হয়? উভয়ে শুধু যে একই মাতাপিতার সন্তান তা নয়, বিশ্বাসও করে একই আল্লায়, একই রসুলে, একই ধর্মে, এমনকি একই বেহেস্তে দোজখে। তবুও একজন আর একজনকে খুন করতে দ্বিধা করে না। আসলে ব্যক্তি-জীবনে যেমন তেমন জাতীয় জীবনেও চাই ন্যায়-বিচার, হক পোরস্তি, পারস্পরিক সহযোগ ও সহযোগিতা। জুলুম আর অন্যায়-অবিচার মানুষ বেশিদিন মুখ বুঁজে সহ্য করে না। এ মানব-স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্যই ভাইও ভাইয়ের মাথা ফাটায়। পৃথক হওয়া তো নিত্য-নৈমিত্যিক ব্যাপার। কার্যকারণ সন্ধান করলে দেখা যাবে এসবের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের অবিচার আর জুলুম। জাতি আর রাষ্ট্রের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। রাষ্ট্র বা জাতিও মানুষকে নিয়ে, মানুষের সমন্বয়েই গঠিত। রাষ্ট্র মোটেই জড়বস্তু নয়। তাই যা-কিছু মানবিক রাষ্ট্রীয় জীবনেও

তার প্রয়োগ আর অনুসরণ করা না হলে পারিবারিক ভ্রাতৃত্ব দ্বন্দ্বের যা পরিণতি রাষ্ট্রীয়-জীবনেও সে পরিণতি না ঘটে যায় না।'

এ সব দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের জন্য কেবল তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, যেমন অনেকে অতীতের হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ বা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি বা 'ভাগ করে শাসন কর' নীতির জন্য দোষ দেয় ইংরেজদের; অথবা পুঁজিবাদী অর্থনীতি একটা গরিব দেশে চালাবার জন্য নানা ফন্দি-ফিকরি-দুষ্টামি-নষ্টামিতেও দোষ ধরে ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে যে-কথা বলেছিলেন সে-কথাই স্মর্তব্য : 'মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে, এই তথ্যটা ভাবিয়া দেখার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্পর্কেই সাবধান হইতে হইবে।'

কেবল জাতিগত পরিচয়-সমস্যা অথবা সম্প্রদায়গত নানা প্রকার সমস্যা নয়, ভাষা এবং শিক্ষাব্যবস্থার মত দৈনন্দিন জীবনের দুটি মৌলিক বিষয়েও অস্বচ্ছ চিন্তা অতীতের জের হিসেবে এদেশে আজো বিদ্যমান।

স্ব-ভাষা বনাম বিভাষা যোগ বিচিত্র শিক্ষাব্যবস্থা

সেই মধ্যযুগ থেকে ভাষা ও শিক্ষার ব্যাপারে যে ধারা চালু হয়ে আসছিল, উনিশ শতকে আধুনিক ধ্যান-ধারণা উদ্বোধনের সময় মুসলিম সমাজ সঠিক দিক-নির্দেশ পায় নি সে-সময়ের মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে। বরং যে ধ্যান-ধারণা তাঁর প্রচার করছিলেন তা ছিল সমগ্র সমাজের অগ্রগতির পরিপন্থী। বাংলার উনিশ শতকের মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই বাংলাজাত হলেও পুরো বাংলাভাষী হয়ত ছিলেন না, থাকলেও বাংলা-ভাষা-প্রীতি তাদের ছিল না। কি নওয়াব আবদুল লতিফ, কি সৈয়দ আমির আলি উভয়েই বাংলা বাদ দিয়ে উর্দুর প্রতি ঝুঁকেছিলেন। উর্দু হয়ত তাঁদের পারিবারিক ভাষা ছিল। তবুও তাঁদের চারপাশের বিশাল জনগোষ্ঠী-যে ছিল বাংলাভাষী সেটা তাঁরা বুঝতেন না বলে মনে হয় না কিন্তু শ্রেণী-দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে আম-মানুষের ভাষার প্রতি তাঁদের কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। এর ফলে তাঁরা যে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সেই ভুল শোধরাতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আসতে হয়। এজন্য এদেশের মানুষের অযথাই অনেকটা সময় এবং শক্তি ক্ষয় হয়। অযথা এ হিসেবে যে, সরল সত্যটা অনেকদিন পর্যন্ত অনেকের চোখে ভাসে নি।

তারপরও বাংলাভাষার দুর্দিন একেবারে কেটে গেছে বলা যায় না। আজো নানা প্রকার সরকারি আদেশ নির্দেশ দিয়ে তা চালু করতে হচ্ছে। স্বত:স্ফূর্তভাবে যেন চালু হচ্ছে না সর্বস্তরে। এখানেও শ্রেণীস্বার্থই কাজ করছে। যে-মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া বর্তমানে বাংলাদেশে সমাজের সকল স্তরে প্রভাব বিস্তার করে আছে তারা মূলত মুৎসুদ্দি দালাল চরিত্রের। নিজস্ব উৎপাদন-স্বকীয়তা বা স্বাধীন ধনবাদী বিকাশের সুযোগ ও সুবিধার অভাবে এরা বহির্দেশীয় বুর্জোয়াদের উপর নির্ভরশীল, যাদের বিরাট অংশ ইংরেজি ভাষাভাষী অথবা ইংরেজি বুঝতে সক্ষম। এ বিদেশীরা এদেশের বাংলা ভাষাটি লিখে

এদেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে ব্যবসা করতে তত উৎসাহী নয়, যতটুকু বা যতক্ষণ চালাতে পারে ওই ইংরেজি দিয়েই। এদের প্রভাবে এদেশের সাধারণ মধ্যবিত্তরাও বৈষয়িক স্বার্থের কারণে দাস্য মনোভাবের পরিচয় দেয় ইংরেজি ভাষা সংরক্ষণের জন্য। এ অবনমিত ভাবের পরিচয় অতীতের বহুদিনের পরাধীন মনোভাবের মাঝেও খুঁজে পাওয়া যায়, ইংরেজরা যখন ইংরেজি ব্যবহার করে প্রায় শ দেড়েক বছর এদেশে করছিল রাজত্ব। তাছাড়া, এদেশে এখনো ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতরাই সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এরা নিজেদের আমমানুষ থেকে ইংরেজি-জানার-ফলে আলাদা বলে ভাবে। গর্ব অনুভব করে। আর সেই গর্ববোধটা সহজে ছাড়তে চায় না। সাধারণ মানুষের ভাষা বাংলায় কথা বললে সেই ভাবটা থাকে কোথায়! শ্রেণী-আধিপত্যের সূত্র এভাবেই মনের গহীনে কাজ করে যায়।

সব বিষয়ে স্বাধীন, বিশেষ করে উৎপাদন-ব্যবস্থায় স্বাধীন দেশ কেমন হয়, সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর *জার্মানীর জার্নাল* বই থেকে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায়: 'ভাষার গুরুত্ব মানুষের জীবনে কতোখানি তা প্যারিসে এসে বুঝতে পারছি। অবশ্য জার্মানীরও ঐ একই অবস্থা। আমার ধারণা, ইংরেজি ইউরোপের প্রায় সব দেশেরই শিক্ষিত মানুষ কম বেশি বুঝতে পারে কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণে তা কিছুতেই তারা স্বীকার করে না, ইংরেজি বলা তো দূরের কথা। নিজের ভাষার প্রতি এখানকার মানুষের এমনতর গভীর প্রেমের কারণেই আজ ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি ভাষার সাহিত্য এতোটা উন্নত। এখানকার একেবারে সাধারণ মানুষও তার মাতৃভাষা নিয়ে যে গর্ব ও গোয়র্তুমী করে থাকে তার এক-দশমাংশ যদি আমরা করতাম আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের চেহারা হত আজ আলাদা। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় বাংলা ও ইংরেজি পত্রপত্রিকার হার প্রায় সমান সমান কিন্তু জার্মানী ও ফ্রান্সে কোন ইংরেজি পত্র-পত্রিকা নেই। অথচ দেশবিদেশের লক্ষ লক্ষ ইংরেজি জানা লোক এই দুটি দেশে বাস করে।' এতে-যে ভিন্নভাষীর খুব অসুবিধে হয় তাও নয়। প্রয়োজনে ভাষাটি শিখে নেয়। ভাষা একটা শেখা এমন খুব কঠিনও-যে নয় তা বোঝা যায় বাংলাদেশের ছাত্ররাই যখন জার্মানি-ফ্রান্স-রাশিয়া-জাপান গিয়ে সে-সব ভাষা শিখে অভিসন্দর্ভ রচনা করে ডক্টরেট ডিগ্রি পর্যন্ত নিয়ে আসে। উচ্চ প্রশংসিত মৌলিক রচনাদিও তারা সে-সব ভাষায় প্রকাশ করে। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি বা সৃষ্টিশীল রচনার জন্য মাতৃভাষার দ্বারস্থ হতে হয়। প্রতি মূহূর্ত প্রতি ঘন্টা প্রতি দিন-মাস-বছর যে ভাষায় যাদের সাথে কথা বলা হচ্ছে, পড়া হচ্ছে, শোনা হচ্ছে, সে-ভাষাই মানুষের মজ্জাগত হয়ে যায়। বাংলাদেশের একজন মানুষ চারপাশেই বাংলা ভাষার প্রভাবে সেটা যত সহজে রপ্ত করতে পারে, বলা বাহুল্য, তা আর কোন ভাষায় পারা সম্ভব নয়।

ভাষা সংকটের সাথে এদেশে আছে শিক্ষায় এক অসম ও অতীতাশ্রয়ী ব্যবস্থা। ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই মোটামুটি দু ধরনের শিক্ষা এদেশের মুসলিম সমাজে চালু হয়—প্রাচীন ধরনের মক্তব-মাদ্রাসা এবং আধুনিক ধরনের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। দু'টি শিক্ষার পাঠ্যক্রম যেমন যথেষ্ট ভিন্নতর তেমন ভিন্নতর তাদের চিন্তা-চেতনাও। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে বর্তমান

জীবনোপযোগী নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়, সেখানে মাদ্রাসা-মক্তবে মূলত মধ্যযুগীর আরবি-ফারসি, বড় জোর উর্দুতে রচিত প্রাচীন ধারার ধর্ম-দর্শন-ফেকাহ্-শাস্ত্র ইত্যাদিতেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসা সামান্য পরিবর্তন করে সাতশ বছরের পুরানো বাগদাদের 'দরসে নিজামিয়া'কেই মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। দেওবন্দের মাদ্রাসায়ও সেই মধ্যযুগীয় পাঠ্যক্রমই চালু ছিল। স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার কোনরকম সুযোগ এসবে ছিল না। উপরন্তু, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা তো দূরের কথা, বিশ্বজ্ঞানের যে-অত্যাবশ্যক চিন্তা-চেতনা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আজকাল প্রয়োজন তারও কোন সুবিধে ছিল না। দুটি ধারার এ শিক্ষার পাঠ্যক্রম এমন আকাশ-পাতাল ফারাক হওয়ায়, মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরের মানুষের মানসিক পরিবৃদ্ধিও ঘটে দু ভাবে: একটি ইংরেজি ধরনের স্কুলে শিক্ষিত হয়ে বর্তমান জীবনযাত্রার সাথে খাপ-খাইয়ে প্রয়োজন অনুসারে চলতে হয় সক্ষম, অন্যটি সামন্ত যুগের ধ্যান-ধারণায় শিক্ষিত হয়ে আবদ্ধ থাকে জ্ঞানের সীমিত গণ্ডিতে।

হাল আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়াদি মাদ্রাসা-মক্তবে ঢুকিয়ে একে আধুনিক করার প্রয়াস চলছে। তবে প্রশ্ন, তাই যদি হয় অর্থাৎ পুরোপুরি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থাই যদি সেখানে চালু করা হয় তাহলে দু ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—একদিকে মক্তব-মাদ্রাসা এবং অন্যদিকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় রাখার যুক্তিটা কি! ধর্মীয় শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর মাদ্রাসা। এর চেয়ে উর্ধ্বতন জ্ঞান নিতে হলে সেখানকার ছাত্রের আধুনিক ধারার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হতে হয়। যেতে হয় আধুনিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, আইন মহাবিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কেবল মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই চলে না অর্থাৎ প্রাচীন তত্ত্ব ও তথ্যজ্ঞানই সব নয়, চলিষ্ণু জীবনের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষারই প্রয়োজন অধিক। আর তা দিতে গিয়ে আধুনিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা এমনি ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামের আগে ইসলাম শব্দটি লাগলেও প্রতিষ্ঠানের কিছু ভিন্ন রূপ ধারণ করে না, যেমন আনবিক বোমা মুসলমান কোন দেশ তৈরি করলেই তা ইসলামী বোমা হয়ে যায় না, আনবিক বোমাই থাকে, কাজ একই করে, তৈরিও একইভাবে হয়। তাছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম কলেজই হোক আর মাদ্রাসাই হোক, সেটি বড় কথা নয়, বড় হল এ প্রতিষ্ঠানে যা শেখানো হচ্ছে তার বিষয়বস্তু। ইংরেজি ধরনের বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানেও ধর্মীয় শাস্ত্রাদির চর্চা হওয়া অসম্ভব মোটেই নয়। বর্তমানে তা হচ্ছেও। তবে আরবেও তেল উত্তোলন হয়েছে প্রাচীন জ্ঞান দিয়ে নয়, আধুনিক জ্ঞানে।

কেবল মাদ্রাসা বা কলেজ শিক্ষাই নয়, গড়ে উঠছে আজকাল নতুন আর এক ধরনের অসমতা এ মুসলিম সমাজেই—কিণ্ডারগার্টেন, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদির মত অতি-ইংরেজি ঘেঁষা তথাকথিত উন্নত ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায়। গড়ছে এগুলো আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত ইসলাম-ধর্মানুসারী মুসলমানরাই। এসবের পাঠ্যসূচীতে অতি-ইংরেজি-প্রীতি বা আচার-আচারণে বিদেশী ভাবধারায় শিক্ষার্থীদের জারিত করে, দেশীয় ভাবধারা ও ঐতিহ্য বিচ্যুত একধরনের ছাত্র-তৈরির প্রয়াস আসলে বিত্ত দিয়ে

শিক্ষা কিনে নেওয়া যেন! শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উপযোগী করে একদল উচ্চস্তরের শাসকশ্রেণীভুক্ত লোক তৈরি করার যে এ এক চেষ্টা তা স্পষ্ট বোঝা যায়। অথচ তাদের সামনেই উদাহরণ রয়ে গেছে উনিশ শতকেরই বাঙালির ইংরেজ-হওয়ার সাধনায় জীবনোৎসর্গ মধুসূদন দত্তের মত অমিত শক্তিধর-প্রতিভাশালীদের দারুন ব্যর্থতায়। এমনকি, সৈয়দ আমির আলির মত ইংলণ্ডবাসীরও পরিচয় খুঁজতে হয় একজন ইংরেজ হিসেবে নয়, বাংলারই খ্যাতনামা শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী-লেখক হিসেবে।

এদেশকে কেউ যদি প্রীতিবশত ইংলণ্ড বা আরব বানিয়ে ফেলতে চান তা-যে একেবারেই অসম্ভব এবং ওইসব দেশের কেউই-যে এ বিষয়টি মোটেই উৎসাহী হয়ে গ্রহণ করবে না, তা পাঁচশ ষাট বছরের তুর্কি-মুসলিম শাসনামল এবং একশ নব্বই বছরের ইংরেজ শাসনকালই প্রমাণ। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান অথবা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের যেমন সম্পূর্ণ উৎখাত করে সে-সব দেশকে নবাগতরা তাঁদের দেশ বানিয়ে ফেলেছে তেমনটা করতে কেউ উৎসাহী হলেও হতে পারে যদি সম্ভাবনা থাকে ধন-প্রাচুর্যের, কিন্তু কখনোই তারা কেউই উৎসাহী হবে না বাঙালিকে ইংরেজ বানাতে। এ সরল সত্যটি অনুধাবন না-করতে পারার জন্য এদেশের অনেকে আত্মপরিচয় সন্ধানে হয় ব্যর্থ। পরিচয় খোঁজে কখনো বাঙালি হিসেবে, কখনো মুসলমান হিসেবে, কখনো এদেশের আকাশে, কখনো মরুসাহারায়, কখনো বা টেমস নদের তীরে। চলিষ্ণু জীবনে কখনো কেউ এদেশ থেকে অন্য দেশে যাবে অথবা অন্য দেশ থেকে এদেশে আসবে, হয়তবা কেউ কেউ আবাসও গড়ে তুলবে এখানে-ওখানে কিন্তু তাই বলে যে-দেশ এবং যে-কালের তারা মানুষ সে-দেশ ও সে-কালকে অস্বীকার করা কখনো সম্ভব নয়। ধর্মের কথা বলেও না।

জীবন-সত্য ও ভাব-সত্য

শরতের নীল নীল আকাশে পেঁজা তুলার মত সাদা মেঘের ভেলা, হিজল গাছের ডালে শালিকের দোল, সর্ষে ফুলের হলুদ সমুদ্রে দিগন্তবিস্তৃত হাতছানি অথবা সবুজ ধানখেতের মন-উপছানো ঢেউ—বাংলাদেশে জন্মে এমনতর দৃশ্য কার না ভাল লাগে! বাদলের দিনে অঝোর বর্ষণের মাঝে প্যাচপ্যাচে কাদায় কেউ এদেশকে হয়তবা মনে করতে পারে, সামন্তযুগের ভাষায়, 'দোজখপুর আজ নিয়ামত', তেমন আর কেউ আপনিই গুনগুনিয়ে উঠতে পারে 'আজি ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে'। এদেশের ভুকানাঙ্গা মানুষ, জীর্ণশীর্ণ ঘরবাড়ি আর দারিদ্র্যের চরম অবস্থা দেখে আজ কেউ কেউ ভিন্ন সুন্দর দেশে বসবাস করার জন্য যেমন পাড়ি জমাতে পারে, তেমন আর কেউ কবির ভাষায় বলে উঠতে পারে 'তোমার যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে/রয়ে যাব, দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে'। প্রকৃতি-নিসর্গ-প্রতিবেশ-পরিবেশের এই-যে ছাপ মনের গোচরে-অগোচরে প্রতি মুহূর্তে রেখে যায় জন্মক্ষণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, তা অস্বীকার করা কি কখনো সম্ভব?

এসব দৃশ্য ও ভাব মনের মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ অথবা বেদনা সৃষ্টি করে সে-সব প্রকাশের মাধ্যমে হতে পারে অনেক ভাষা—বাংলা, উর্দু, ফারসি, ইংরেজি, যে-

কোনটাই অথবা সবগুলোই। তবে, আগেও বলা হয়েছে, এদেশের প্রায় সকল মানুষের ভাষাই যেহেতু বর্তমান সময় পর্যন্ত এসে বাংলায় ঠেকেছে এবং সবসময় যেহেতু এ ভাষায়ই মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়, সেজন্য অন্য কোন ভাষায় এসবের ভাব-প্রকাশ যেন অসামঞ্জস্য ঠেকে। সকলে বোঝে-না বলে আদৃতও হয় না। প্রাত্যহিক জীবনাচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও মনে হয় না। উর্দু, ফারসি, ইংরেজিতে কিছু কিছু লেখাজোখা হলেও এজন্যই সৃজনশীল সবকিছুর প্রকাশ ঘটেছে জীবনসম্পৃক্ত হয়ে বাংলা ভাষাকেই কেন্দ্র করে।

বাংলাদেশে বসবাস করলে মাছ-ভাত খেতে হয়। এগুলোই সহজলভ্য। সহজে উৎপাদিত। কাপড়-চোপড় কম পরলেও চলে। মোটামুটি গরমের দেশ বলে। শীত তেমন তীব্র নয়। জাব্বা-জোব্বা পরার প্রয়োজন হয় না। বেশির ভাগই সমতল ভূমি বলে পাহাড়ী অঞ্চলের লোকজনের মত তত পরিশ্রমী হতে হয় না। মাটি খুঁড়লেই পানি। প্রায় না-চাইতেই বৃষ্টি। হাজার বছরের পুরানো লাঙল দিয়েও চাষ সম্ভব। অল্পশ্রমেই ফসল। এবড়ো খেবড়ো মাটির রাস্তায় গরুর-গাড়িতে চললে আপনিই কণ্ঠে আসে ভাওয়াইয়ার ভাঙা-সুর—'ওরে গাড়িয়াল ভাই'। অথবা অকুল দরিয়ার বুকে নৌকা বাইতে বাইতে বৈঠার টানের সাথে উদাত্ত সুরে আসে ভাটিয়ালি—'নদীর কুল নাই কিনার নাই'। 'শ্রীকান্ত' বা 'অপু'কে রহমান বা টিপু বলে উপস্থিত করলে দুচারটে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া কি চেনার তেমন কোন যো থাকে তাদের আচার-আচরণ-ব্যবহার-ধরন থেকে কে কোন্ সম্প্রদায়ের!

দেশ ও প্রকৃতির এ সত্যের কাছে ভিনদেশ থেকে আগত যে-কোন নতুন দর্শন থমকে দাঁড়াতে বাধ্য। চলতি ব্যবস্থার পুরানো ধারাকে তা একেবারে ভাসিয়ে নিতে পারে না। সবকিছু নি:শেষও করে ফেলতে পারে না। হয়তবা কিছুটা নতুনতর রূপ দিতে পারে। নবায়ন করা যেতে পারে ঐতিহ্য (যেমন প্রাচীন হজ প্রথা ইসলাম গ্রহণ করে নতুন আঙ্গিকে), করা যেতে পারে কোন কোন অমানুষিক বিষয় বাতিলও (যেমন কন্যাসন্তান হত্যা হয় রদ)। যে-মুল্যবোধ সৃষ্টি হয় চলমান জীবনধারা থেকে, নতুন দর্শনের সংস্পর্শে এসে তার চিন্তা-চেতনা-ভাব-কল্পনায় নানা রূপান্তর ঘটতে পারে কিন্তু মরে যায় না একেবারে। সংগোপনে আচানে-কানাচে থাকে এর উপস্থিতি। নানাভাবে। নানা ধরনে। খারাপ-ভাল সহ। সেজন্যই সতীদাহর মত অমানবিক প্রথারও কিছু সমর্থক খুঁজে পাওয়া যায় আজো।

ইসলামও বাংলায় এসে বেশকিছু রূপান্তর ঘটিয়েছে কিন্তু স্থানীয় মানব সমাজের ধারাবাহিকতা, এখানকার জীবনযাত্রাপ্রণালী ছিন্নভিন্ন করে ফেলে নি অথবা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 'মুসলমানরা', অধ্যাপক হার্টন বলেন, 'তাদের চারপাশের মানুষের কাছ থেকে কৃষ্টির যে উপাদান সংগ্রহ করেছে, তার সঙ্গে নিজেদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছে।' এ সমন্বয়ের ধারায় নতুন ভাবসম্পদে এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধই হয়েছে, দেউলিয়া হয়ে যায় নি। ইসলামের শক্তিশালী মানবিক বোধগুলো (যেমন বর্ণ-বিরোধিতা বা এক পঙতিতে আহারভোজনের মত তত্ত্বগতভাব) আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে এদেশের মূল্যবোধে। সেন আমলের রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতা

বিদূরিত হয়েছে। জীবনাচরণে, বিশ্বাসে, সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে সে-প্রভাব সহজভাবেই উপস্থিত হয়েছে। কখনো-বা মিলে মিশে গেছে একেবারে। দেবতার ঐন্দ্রজালিক কর্মকাণ্ড পিরের কেরামতিতে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভোটব্রহ্ম-মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা যেমন এদেশের মানুষ উত্তরসুরি হিসেবে বয়ে নিয়ে এসেছে যুগ হতে যুগান্তে, তেমন বৈদিক ধ্যানধারণা, জৈন-বৌদ্ধ মন-মনন-কল্পনার সাথে সংযুক্ত হয়েছে ইসলামেরও নানা বিশ্বাস-প্রকরণ। কোন্ ধর্মের কোন্ আদেশ-নির্দেশ এর ফলে পালিত হল না-হল, কে পানি বলল আর কে বলল জল— এসব যেমন বড় হয়ে ওঠে নি, তেমন সকল উপাদানকে স্বীকার করে নিয়ে আত্মীকরণের মাধ্যমে লোকমানস সে-সব ব্যবহার করতে হয়েছে উৎসুক। এতে ডগ্‌মা থাকে নি হয়তবা, বিশ্বাস থেকেছে। সংকীর্ণতা আসে নি, উদারতা এসেছে। সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয় নি, মানবতার বিজয় সূচিত হয়েছে।

মানবতার অনেকসময় প্রতিবন্ধক প্রচলিত বিশ্বাস। কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বললে মানুষ-যে ক্ষেপে ওঠে তা আসলে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আবেগপ্রসূত হয়ে যত-না, তার চেয়ে অনেক বেশি তার অহংবোধের জন্য—যে অহংবোধ সৃষ্টি করে আত্মশ্লাঘা এবং গড়ে ওঠে বহুদিনের বিশ্বাসে, তা সত্যই হোক আর হোক মিথ্যা। ধর্মকে যত-না ভালবাসে কোন মানুষ, তার চেয়ে নিজের বিশ্বাসের ভিত্তি আলগা হতে দেখলে মানসিক ভাবে আঘাত পায় অনেক বেশি, কারণ এখানে খর্বিত হয় ব্যক্তিত্ব, তার এতদিনের চিন্তাচেতনা ঘিরে যা গড়ে উঠেছে। এ অহংবোধ সামন্তযুগে বিদূরিত করার প্রয়াস হত বিশ্বাস আর ভক্তি দিয়ে যার চরম অভিব্যক্তি প্রাচীন যুগে ছিল নির্বাণ লাভ—নিজের সত্তাকে 'নাই' করে ফেলা, অথবা করা হত প্রচণ্ড কঠোরতা ও শক্তিমদমত্ততার মাধ্যমে, তীব্র হিংস্রতায় বিনাশ করে। এমনটার ব্যত্যয় আজো ঘটে নি। একাত্তরে বাংলাদেশের মানুষ তা প্রত্যক্ষ করেছে। চরম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে কখনো কখনো কোন মানুষ, সম্প্রদায় বা জাতিকে এভাবে বিনাশ বা অবদমিত করা সম্ভব বটে। তখন বশংবদ ভৃত্যের মত তাকে খাটানো যায়।

এ দু পদ্ধতি ছাড়া আত্মশ্লাঘা বা অহংবোধ বিদূরিত হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনে এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে পড়ে। আজকের যুগ মূলত এ পর্যায়ের। তাই দেখা যায়, একদা যে-চিন্তা ছিল একেবারে অসহ্য, সেটিই কালক্রমে হচ্ছে গৃহীত, যেমন সুদ খাওয়া ইসলাম ধর্মে হারাম হলেও ব্যাংকের সুদের ব্যাপারে হাজির হচ্ছে যুগের প্রয়োজনে ও বাস্তব পরিস্থিতির জন্য নতুনতর ব্যাখ্যা। কেবল বিশ্বাস মানুষকে সবসময়ের জন্য কোন কিছুতে একেবারে আবদ্ধ রাখতে পারে না কখনই। পারলে আর নতুন ধরনের চিন্তার উদয় কখনো হত না। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বাস্তব পরিস্থিতিই বিশ্বাস শিথিল করে, যার গভীরে আছে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন।

স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী হলে সহজেই বোঝা যায়, কেবল বাংলাদেশ কেন, দক্ষিণ এশিয়া বলে যে-অঞ্চলটি আজ বিশেষভাবে পরিচিত হচ্ছে এবং এর ভেতর সার্ক অন্তর্ভুক্ত যে রাষ্ট্রগুলো ক্রমে ক্রমে হচ্ছে উদ্ভাসিত, এসবগুলোতেই রয়েছে মহামানবিক ঐক্যের এক চমৎকার সূত্র—হোক তা অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বা অন্য কিছু। বস্তুত

ইরান-তুরস্কের পশ্চিম প্রান্তসীমা থেকে একেবারে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমির রয়েছে কাছাকাছি আচারিক-ব্যবহারিক-প্রাত্যহিক জীবনের বৈশিষ্ট্য যা গড়ে উঠেছে যুগের পর যুগ পাশাপাশি বসবাস করার জন্যও বটে, একে অপরের অভ্যন্তরে নানাভাবে প্রবেশপূর্বক গ্রহণ-বর্জনের জন্যও বটে। ইন্দোনেশিয়া তাই মুসলিম দেশ হলেও বাধা থাকে না হিন্দু-ঐতিহ্য বলে কথিত গরুড়কে স্বদেশের বিমান সংস্থার নাম হিসেবে গ্রহণ করায়, অথবা ভারতেরও বাধা থাকে না গম্বুজাকৃতির তাজমহলকে স্থাপত্য-সৌন্দর্যের চরমতম নিদর্শন হিসেবে উপস্থিত করায়। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় আবির্ভূত ইসলামের মাধ্যমে সেখানকার অনেককিছুই যেমন এসেছে এ উপমহাদেশের মাটিতে, ছড়িয়েছে আরও পূর্বদিকে, তেমন এ উপমহাদেশও নিজেকে বিস্তৃত করে দিয়েছে পূর্বদিকের খণ্ড-বিখণ্ড দ্বীপসমষ্টি পর্যন্ত।

শুধু এই-বা কেন! বিশ্বজুড়ে কি বিস্তৃত হচ্ছে না এই ভাবসম্পদ! এবং বিপরীতপক্ষে, বিশ্ব কি এসে মিলে যাচ্ছে না একস্থানে! সেক্সপিয়র-টলস্টয়-লু সুন-বিথোভেন-ফেরদৌসি-কালিদাস-নিউটন-আইনস্টাইন-ইবনে সিনা-ইবনে রুশদ্-ইবনে খালদুন-রবীন্দ্রনাথ-এর মত মানুষদের নিয়ে কি কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ প্রশ্ন তোলে কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে ইহুদি বা কে কোন্ ধর্মের, কোন্ দেশের, কোন্ জাতির? মাদাম কুরি বা ভেলেন্তিনা তেরেস্কোভার জন্য কি গর্বিত নয় সমগ্র নারীজাতি! মুসলিম নারীসহ? নেইল আর্মস্ট্রং খ্রীস্টান কি মুসলমান—এ প্রশ্ন কি করে কোন আধুনিক মানুষ? কোন একটি সংস্কৃতিকে যতই এক বিশেষ বলয়ে আটকে রাখার প্রয়াস কেউ পাক-না-কেন, তা রাখা কি সম্ভব হচ্ছে এই আধুনিক বিশ্বে?

যুগটাই বদলে যাচ্ছে। গেছেও। এ আর অতীতের মত পৃথিবীর একপাশে পড়ে থাকার যুগ নয়। পলাশির যুদ্ধ যখন চলছিল তখন নাকি খেতে কৃষকরা ঠিকই হাল চাষ করছিল কিন্তু একালের আণবিক বোমা হিরোসিমা-নাগাসাকিতে চল্লিশ বছর আগে পড়লেও তার ফল আজো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানবসমাজকে। এখন একপাশে পড়ে থাকতে চাইলেও পারা যায়না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রচণ্ড ব্যক্তিস্বার্থের কারণে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়ে প্রতিটি মানুষই সমাজে 'আউটসাইডার' বলে নিজেকে মনে করতে পারে কিন্তু একক দ্বীপ মানুষ কখনই ছিল না। সবসময়েই সে যূথবদ্ধ। আপাত-বিচ্ছিন্ন থাকলেও বিশ্বের প্রেক্ষিতে সমষ্টিবদ্ধ। মানুষের সভ্যতার ধরনটাই এমন যে, দমকে দমকে এসে তাতে যুক্ত হয়েছে নানা দেশের নানা জাতির নানা বর্ণের নানা সংস্কৃতি—সেই অতীত থেকে আজ পর্যন্ত। কোথাও কোন স্থানেই অবিমিশ্র কোন জনগোষ্ঠী পাওয়া সম্ভব নয়। হটেনটট বা পিগমিদের কালচার আলাদা মনে হলেও শিকড়ের গভীরে রয়েছে বিশ্বমানবেরই ধারা। কবির কথায়, 'আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর'। লোককবির সত্যদৃষ্টি তাই, 'নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/ জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত'।

আজ মানুষ ট্রেন-প্লেন-রকেট সুপারসনিকের বদৌলতে এসে গেছে পরস্পরের খুবই কাছাকাছি। যুগটা এখন সাইবারনেটিক্স-কম্পিউটার-রবোট-আই. সি. বি. এম-তারকা যুদ্ধের। প্রতিদিনের জীবনে সংযুক্ত হচ্ছে টি. ভি.-রেডিও-ভি. সি. পি.-ফ্রিজ-রিমোট

কন্ট্রোল, ইন্টারনেট-ইমেল-সিডিরম। প্রযুক্তিবিদ্যা ও কৃৎকৌশলগত উন্নতি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ইউরো-আমেরিকার উত্তুঙ্গ ধনবাদী সমাজের নানা বিষয়-আশয় ও টানাপোড়েনসহ সকলে দেখছে বিভিন্ন দেশের দ্রুত চমকপ্রদ বৈষয়িক উন্নতিও। চাঁদে মানুষের পদার্পণ, মঙ্গলের দিকে পাড়ি জমানোর প্রয়াস, টেস্ট টিউব বেবি, হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশন, জিন প্রযুক্তি, ডলি সৃষ্টি, মৃতের চোখ থেকে চোখ পাওয়া, ক্যান্সার, এইড্‌স্‌, ভাইরাস, হাইপারটেশন কত কি যে আসছে মানুষের নিত্যদিনের জীবনে! পেনিসিলিন আর এন্টিবায়োটিক তো জীবনের আয়ুই বাড়িয়ে দিয়েছে কত! পাঙ্ক কালচার বা মাইকেল জ্যাকসন কি সীমিত থাকছে কোন এক বিশে স্থানে! চেষ্টা করেও কি এসবের বাইরে থাকতে পারছে কেউ? বাংলাদেশের ইসলামধর্মী মুসলমানরাও! আজকের দিনে সভ্যতার দাবিটাই এমন সর্বগ্রাসী। কারণ, এযুগের উৎপাদন ব্যবস্থাটা যৌথ প্রয়াসের। সমবায় ধরনের। অনেকে একসাথে থেকে একসঙ্গে কাজ করে তবেই সম্ভব কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য উৎপাদন। এ থেকে যে-সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমঝোতার সৃষ্টি হয়, তা থেকে ঘটে দৃষ্টির সম্প্রসারণ।

এদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রতিদিন আল্লাহ্‌কে সর্বান্তকরণে ডেকে এবং ইসলামের নানা আচার-বিধি পালন করে ঐহিক ও পারত্রিক সান্ত্বনা লাভ করার সাথে সাথে যুগোপযোগী করে তাই ইসলামকেও দেখার প্রয়াস পাচ্ছে। কবি-দার্শনিক ইকবাল এ বিষয়ে বহু আগেই বলে গেছেন, 'বস্তুজগতের যেহেতু পরিবর্তন হয়েছে, তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান সমুজ্জ্বল বর্তমান বিশ্বের নিকট ইসলামের নীতিমালার প্রাচীনব্যাখ্যাগুলো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এসব ব্যাখ্যা আর বেশিদিন টিকে থাকবে এমন যুক্তি আমি খুঁজে পাইনে। আর কখনোই কি আমাদের সম্প্রদায়ের মনীষিবৃন্দ তাঁদের ভাষ্যগুলোকে চূড়ান্ত বলে দাবি করেছিলেন? না, কখনোই না। আমার মতে তাই বর্তমান যুগের মুসলমানরাও তাদের পরিবর্তিত জীবনপদ্ধতির প্রয়োজনানুসারে নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামের নীতিসমূহের পুন:ব্যাখ্যা দিতে পারে।'

এ ব্যাখ্যাও হতে পারে আবার সম্পূর্ণ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থে, যেমন মনিরুদ্দিন ইউসুফ *ছোটদের ইসলাম পরিচয়* গ্রন্থে বলেছেন, (খোলাফায়ে রাশেদিনের) 'পরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা মিছামিছিই নিজেদের খলীফা বা রসুলের প্রতিনিধি বলতে চেয়েছেন। তাঁরা ছিলেন আসলে বড় বড় রাজা বাদশা। রাজতন্ত্র ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে খাপ খায় না। তাই খলীফারা আসলে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য রাজতন্ত্রের উপযোগী করে ইসলামের ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং রাজকীয় ক্ষমতার বলে আমীর ওমরাহের সহযোগিতার ধর্ম তৈরী করে তা আমল করার কথা ধর্মীয় পুরোহিতদের দ্বারা লিখিয়ে রাজতন্ত্রের মতো করে ইসলামের ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়েছিলেন। সেই ব্যাখ্যাই দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম বলে চলে আসে। রাজপদ যেমন ইসলাম-সম্মত নয়, রাজা-বাদশাদের শাসনামলের ইসলাম-ব্যাখ্যাও তেমন ইসলাম নয়। দুটিই মিথ্যা ও দুটিই বিভ্রান্তিকর।'

অথচ এ বিভ্রান্তিই এদেশে প্রচলিত। প্রচলিত এসব ধ্যান-ধারণাই আজো বহাল রাখার প্রয়াস দেখা যায় প্রায় সর্বস্তরে। অজ্ঞ মানুষের জীবনের বঞ্চনা-প্রতারণা ও না-

পাওয়ার যে-দুঃখ রয়েছে, তাতে ধর্মের এ আবরণটুকুও চলে গেলে মনে সান্ত্বনা পাওয়ার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে-না বলে তাদের অনেকে অজ্ঞতাকেই জোরে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। অজ্ঞতা অবশ্যই একধরনের শান্তি দেয়। এ শান্তি বজায় রাখতে শাসককুলও উৎসুক। সেজন্যই তারা ধর্মের প্রগতিমুখী উপাদানগুলোর চেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মৌলবাদকেই উস্কে দিতে হয় উৎসাহী। তাদের শ্রেণী যে-মধ্যবিত্ত কিছুদিন আগেই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের পত্তনে হয়েছিল একান্ত উৎসাহী, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ছিল সোচ্চার, তারই একাংশ ফের নতুনভাবে ধর্মের নামে এসব হাজির করে নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে। সাংবাদিক জহুর হুসেন চৌধুরী এজন্যই মধ্যবিত্তকে চিহ্নিত ক‌েছেন 'গিরগিটি চরিত্র বিশিষ্ট' বলে—দফায় দফায় রং বদলায়।

বিষয়টি সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দিন 'সমাজ বিজ্ঞান ও বাঙালি সমাজ' প্রবন্ধে পর্যালোচনা করেন এভাবে, 'যে রাজনৈতিক এলিট শ্রেণীটি এখন বাংলাদেশ শাসন করছে অথবা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছে তার উদ্ভব ব্যাপক দুর্নীতির মধ্য হতে। তার মস্তিষ্কে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বহুকালের দাসত্ববোধ বিদ্যমান।...ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেছে ব্যর্থ-প্রমাণিত প্রচলিত আর্থসামাজিক কাঠামো ভেঙে নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে তখন নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক এলিট শ্রেণী তাদেরকে নানা কৌশলে থামিয়ে দিয়েছে। এটা বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে পার পাওয়ার শক্তি তারা পাচ্ছে কোথায়? তাহলে কি এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয় না যে, শোষিত নিপীড়িত জনগণের শ্রেণী-চেতনা এখনও দুর্বল। শ্রেণী-ত্যাগী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব এখনো হয় নি। অথবা হলেও জনগণকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো শক্তি এখনও তারা অর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া, সকল শ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী যখন ঐক্যবদ্ধ তখন তারা বিভক্ত।' এ অবস্থায় সমাজের পরিবর্তন কতটুকু আর হতে পারে! হলেও তা যে ধারায় যাবে সেটা অবশ্যই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ গঠনের দিকেই। আর সেখানে ধর্মও ব্যবহৃত হবে শ্রেণি-শোষণের একটি হাতিয়ার হিসেবে।

উপসংহার

রিচার্ড এম. ইটন *দ্য রাইজ অব ইসলাম এ্যান্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ১২০৪-১৭৬০* গ্রন্থে সারা বাংলায়, বিশেষ করে এর পূর্বাঞ্চলে ইসলাম কৃষি সভ্যতা সম্প্রসারণে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে বলে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে এটি যেন হয়ে গিয়েছিল 'লাঙলের ধর্ম'। অর্থাৎ কৃষকরা ছিল এ ধর্ম প্রচার, প্রসার এবং গ্রহণে প্রধান মাধ্যম। তবে কেবল কৃষিই নয়, রাজনৈতিক সীমা নির্ধারণ এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গঠনেও ইসলাম ধর্মের ভূমিকা ছিল প্রবল। অসীম রায় *ইসলাম ইন সাউথ এশিয়া : এ রিজিওনাল পারসপেকটিভ* গ্রন্থে বাংলা অঞ্চলে সংখ্যাধিক্যের কারণ নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এ স্থানের নিম্নবর্গের লোকজনই ইসলাম ধর্ম বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেছিল এবং আপন চিরায়ত ধারার সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এক সিনক্রেটিসটিক অর্থাৎ সমন্বিত ধারার সমাজব্যবস্থার ধারক হয়ে উঠেছিল। আকবর আলী খান *ডিসকভারি অব বাংলাদেশ* গ্রন্থে ইসলামের এদেশে প্রসারের বেলায় দেখেছেন গ্রাম-সমাজের অনেকটা স্বাধীন প্রবৃত্তি, যেখানে প্রথাগত বড় বড় ধর্মগুলোর আঁটসাঁট বাঁধন ঠিক খোলামেলা গ্রামগুলোর মতই কখনোই তেমন শেকড় গাড়তে পারেনি। ইসলাম ধর্মও এখানে অনেকটা তাদের মত করেই প্রাচীন ঐতিহ্য সহ গৃহীত হয় যেমনটা অন্যান্য ধর্মের বেলায়ও ঘটেছিল।

বস্তুত যে-কোন ধর্ম দর্শন তত্ত্ব বা মতবাদ বাস্তবতার ভিত্তিতেই প্রচার এবং প্রসার লাভ করে। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা অনুকূল এবং চাহিদা কিংবা সম্পূরক হওয়ার মত বিষয় না-থাকলে কোনকিছুই সমাজ-সংসারে ভিত্তি পায় না। আরবে নিয়ত কলহরত বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলোর নিম্নবর্গের মানুষ সহ উচ্চবর্গের পরিবর্তনকামী মানুষকে ইসলাম আকৃষ্ট করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুবিশাল সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক উজ্জ্বল এক সংস্কৃতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা যেমন পালন করেছিল, তেমন বাংলা অঞ্চলের তুর্কি-মোগল সামন্ত শাসকবৃন্দ এদেশ দখলের পর ক্রমর্বধমান জনগোষ্ঠীকে জীবন যাপনে বাস্তবঘনিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণেও সহায়তা করেছিল। প্রাক তুর্কি-মোগল শাসনামলে এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটাই স্থবিরতায় আক্রান্ত হয়েছিল কেবল ভূমি নির্ভর অর্থনীতির বেড়াজালে, বিশেষ করে পাল-সেন শাসিত অঞ্চলে (মুদ্রার অভাব যা সুপ্রমাণিত করে)। এর অবসান ঘটিয়ে সারা বাংলাকে একদিকে এর বাইরের সীমান্তবর্তী ভারত-অঞ্চল, মায় সেকালের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে (যেমন, পারস্য-চিন-খোরাসান-আরব-আফগানিস্তান এর সঙ্গে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের সম্পর্ক বা ইউরোপিয়দের সঙ্গে মোগলদের লেনদেন) প্রায় এক গাঁটে বেঁধে দিয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি সহ

প্রতিনিধি আদান-প্রদানের মাধ্যমে, অন্যদিকে দেশের দূর-দূরান্তে জনবসতি গড়ে তুলে তারা কৃষিজমি উদ্ধার ও চাষাবাদ সম্প্রসারণের ভেতর দিয়ে জনজীবনে এক বিশাল কর্মযোগের সৃষ্টি করেছিল।

তুর্কিরা আসার আগে সেনদের সময় পর্যন্ত বাংলার অনেক অংশই আবাদযোগ্য করা হয়েছিল বটে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, কিন্তু চন্দ্র-বর্ম-দেবদের অধীন থাকা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানই তখনো অকর্ষিত, অনাবাদি এবং জলাজঙ্গলাকীর্ণ ছিল। করতোয়ার পূর্ব দিক থেকে পদ্মার দক্ষিণাংশ তো বটেই, এমন কি চট্টগ্রাম-সিলেট অঞ্চলেও মানুষ তেমনভাবে বসত বা পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলেনি। গঙ্গা নদী ষোল শতকে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে বেশির ভাগ পানি পদ্মার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করার জন্য মোগল আমলে ঢাকা কেন্দ্রিক প্রশাসনের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চল দখল ও বাসযোগ্য করে তোলায় বিশেষ সুবিধা হয়। আবার ১৭৮৩তে মূল ব্রহ্মপুত্রের পানি বর্তমান যমুনার মধ্য দিয়ে বেশির ভাগ প্রবাহিত হতে থাকলে, পুরানো ব্রহ্মপুত্র সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ আসামের দিকে জনসম্প্রসারণ ঘটে।

তুর্কি থেকে মোগল আমল পর্যন্ত বাংলা অঞ্চলের সবটুকু অধিকৃত হলে চট্টগ্রাম-বাগেরহাট থেকে সিলেট-দিনাজপুর পর্যন্ত জনবসতি গড়ে ওঠে। ঝাড়-জলা-জঙ্গল পরিষ্কারপূর্বক চাষাবাদ ব্যবস্থা এবং দেশ-বিদেশ থেকে আগত পির-দরবেশ, বণিক-ব্যবসায়ী, পর্যটক-ভ্রমণকারী, সৈনিক-পণ্ডিত, ভাগ্যান্বেষী-সুবিধাআদায়কারী ইত্যাকার নানা ধরনের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণ ও খাদ্য লাভের মাধ্যমে সুবিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়িত হতে থাকে। সারা বাংলায় এভাবে শাসকদের স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে আনাচে কানাচে যে-জনবসতি গড়ে ওঠে তার ফলে ধর্মও স্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারিত হয়। এ অবস্থার সৃষ্টি না-হলে কোন সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না কেন সেই ঘনজঙ্গলাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল সুন্দরবন বাগেরহাট অঞ্চল কিংবা পাহাড় অরণ্য আচ্ছাদিত সিলেট-চট্টগ্রামে পাওয়া যাবে মসজিদ-দরগা-খানকা কিংবা মন্দির-আশ্রম-তীর্থ প্যাগোডা। বায়েজিদ বোস্তামির চট্টগ্রাম আগমন কিংবা শাহ ইসমাইলের ধড় এবং মাথার দু স্থানে মাজার স্থাপন অথবা সীতাকুণ্ডে হিন্দুদের সতীপীঠ অবস্থানের মত কিংবদন্তি এ সত্যই তুলে ধরে যে, বুদ্ধিমান শাসকবৃন্দ জনগণের মনের ধর্মীয় এবং অলৌকিক বিষয়াদির ব্যাপারে বিশ্বাস উৎপাদন করে সেকালের সেইসব অকর্ষিত নির্জন স্থানগুলোতে মানব বসত গড়ে তুলে কৃষিকাজ বিস্তৃতির মাধ্যমে তাদের রাজস্ব, তীর্থকর বা অন্যান্য খাজনা আদায়ের ইহলৌকিক ও জাগতিক বাস্তবসম্মত এক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ধর্ম-প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিত কোন স্থানের স্বীকৃতি মানেই সেখানে ক্রমে জনবসতিপূর্ণ করে আবাদযোগ্য ভূমি উদ্ধার ও বাজার-পুর-গঞ্জ-শহর স্থাপন এবং সেসব থেকে কর আদায়। এছাড়া কোন স্থানের উদ্বৃত্ত জনগণকে অকর্ষিত দুর্গম বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যা সমাধান যেমন হতে পারত তেমন জীবন-বিমুখ বা বয়স্ক মানুষদের স্বস্তিজনক মৃত্যুও হতে পারত (দুর্গম স্থানে ধর্ম পালন করতে গিয়ে মারা যাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, যে-মৃত্যুতে ছিল মানসিকভাবে অলৌকিক প্রশান্তি)। সেকালের ভূমিদান ওয়াকফ ব্যবস্থা, নিষ্কর জমি বন্দোবস্ত কিংবা ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন অনুদান এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেই কবল উক্ত কাজগুলোর বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা মেলে।

আসলে শুধু তত্ত্ব কিংবা সুমধুর বক্তব্য অথবা শান্তির বাণী দিয়ে-যে কোন ধর্ম বা মতবাদ গৃহীত, প্রচারিত বা প্রসারিত হয় না তা ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক মহানবীর জীবন পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়। মক্কায় প্রথম দশ বছর শত চেষ্টা করেও. কোরান শরিফের চমৎকার সুরা নাজিল হলেও (৯২টি সুরা মক্কায় আর মাত্র ২২টি মদিনায় অবতীর্ণ হয়) এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় কিংবা বেহেশতের মধুর চিত্র তুলে ধরলেও মাত্র হাজারখানেক মুসলমানও যেখানে করা সম্ভব হয়নি (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *সাংস্কৃতিকী* গ্রন্থে হিসাব দিয়েছেন যে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্তও মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র চোদ্দ শ), সেখানে মদিনায় যখন সে-সময়ের প্রচলিত ধারা গ্রহণ করে লুণ্ঠন এবং যুদ্ধনীতির মাধ্যমে মালেগনিমাহ্‌র মত ইহজাগতিক বিষয়াদি চালু হয় তখন আরবিয়রা আপন অর্থবিত্ত বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে (ঐ সূত্র থেকেই জানা যায় যে, হুদায়বিয়া'র সন্ধির দু বছর পর মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে দশ হাজারে দাঁড়ায়)। বিশ্লিষ্ট এক সমাজে এভাবে একটিমাত্র মতাদর্শ (ইসলাম) গ্রহণের ফলে যে একতা এবং মানসিক নৈকট্য সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, এ ঐক্য তাদের মধ্যে বিশেষ শক্তি তৈরি করে, যে-শক্তি দিয়ে তারা স্থানের পর স্থান জয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। আর এসব বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় তারা যুদ্ধের নব নব কৌশল ও কলা আয়ত্ত করে (যেমন, আরবি-ইরাকি ঘোড়া এবং উটের কার্যকারিতা বুঝে যুদ্ধে এদের ব্যাপক ব্যবহার এবং পরিচালনার সুবিধার্থে জিনের সঙ্গে রেকাব বা পাদানি উদ্ভাবন) এমন সেনাদল গড়ে তোলে যা বিশ্বাসে (ইসলাম ধর্মে) জাড়িত হয় এ চেতনায় যে, জয়ে গাজি আর মৃত্যুতে শহীদ। আত্মপ্রত্যয় একটা সময় পর্যন্ত অবশ্যই বিজয়ীর পর্যায়ে নিয়ে যায়।

প্রত্যয় এবং বিশ্বাসের এই শক্তি যোগায় নিত্যদিনে পালনীয় কিছু আনুষ্ঠানিকতা ও মানবিক নীতিবোধও। সব ধর্মেরই আছে দুটি রূপ: একটি এর আনুষ্ঠানিকতা বা অবশ্যপালনীয় বিষয়াদি, এবং অন্যটি, নীতিকথা বা সর্বমানবিক মূল্যবোধ। ঈমান নামাজ হজ রোজা এবং জাকাত—মাত্র এই পাঁচটি ইসলামের আনুষ্ঠানিক বা অবশ্য পালনীয় বিষয়। এর ভেতর হজ এবং জাকাত ধনিকদের বেলায়ই প্রযোজ্য। অন্য তিনটি পালন করা কারো জন্যই তেমন অসুবিধেজনক নয়। নামাজের সময় বরং সকল মানুষ—ধনী-নির্ধন এক কাতারে দাঁড়ায়; ফলে আসে সাম্য এবং ঐক্য বোধের ভাব। ইসলাম সাম্যের বাণীই প্রচার করে—একই আদম-হাওয়া থেকে সৃষ্ট সকল মানুষ একই সমতলে সর্বদাই অবস্থিত, সামাজিকভাবে নানা ভেদাভেদ থাকলেও। আনুষ্ঠানিক দুটি পর্ব হিসেবে ঈদ-এর জামাতও একই বাণী তুলে ধরে। অন্যান্য যেসব অনুষ্ঠান মুসলমানরা পালন করে তা কালে কালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে গড়ে উঠেছে, যেমন শবে বরাত, মিলাদ, মহরম ইত্যাদি, যা কেউ পালন না-করলেও মূল ধর্মের কোন ব্যত্যয় হয় না। কুলখানি, খতনা, কোরানখানি ইত্যাদির মত অনুষ্ঠান, চাই কি বিয়ে শাদিও অতি সাধারণভাবে উদযাপন করা যায়। এসবে-যে নানা লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা উপস্থিত হয় তা বাস্তবিকপক্ষে ধনিকদেরই প্রদর্শনবাতিক মানসিকতার সৃষ্টি।

অন্যদিকে, ইসলামের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে আছে যেসব অনুশাসন নীতিকথা বা ব্যবহারিক বিষয় তা সর্বমানবের কল্যাণবোধের সঙ্গেও জড়িত। এর অনেকগুলো কোরান শরিফের বিভিন্ন কাহিনী-কথার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। মেয়েশিশু হত্যায় নিষেধাজ্ঞা, এতিমদের প্রাপ্য প্রদান, দাসদের মুক্তি দানে উৎসাহ, বিষয়সম্পদ ভাগে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়াস, ব্যবসায় ক্ষেত্রে ওজনে কম না-দেওয়া—নিত্যদিনের ইত্যাকার বিষয়ে ইসলামের যে-শিক্ষা তা একটি সুন্দর সমাজ গঠনে অবশ্যই সহায়ক, বিশেষ করে আরবের প্রাচীন গোষ্ঠীসংঘাতময় জীবনে, এমন কি বাংলা অঞ্চলেও ব্রাহ্মণ্যবাদী বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা কিংবা বৌদ্ধধর্মীয় যোগ-তান্ত্রিকতা পূর্ণ গুহ্যাচারানুষ্ঠানসর্বস্ব সেই পরিবেশে। মাতাপিতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, নারীদের শালীনতায় উৎসাহ দেওয়া, দেহ সাফসুতরো রাখা (যেমন, ওজুর মাধ্যমে), শিষ্টাচার সম্ভাষণ, এমন কি গৃহে প্রবেশের সময় ভদ্রতা রক্ষার মত সাধারণ কান্ডজ্ঞানের যে-বিষয়গুলো কোরান-হাদিসে আছে তা যে-কোন ভদ্রমানুষকে আকৃষ্ট করার মত, আরবসহ অন্যান্য দেশের মায় বাংলাদেশের মানুষকেও।

অপরপক্ষে, ইসলাম যখন প্রচারিত হয় তখন সারা পৃথিবীতেই সর্বপ্রাণবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, দেবতাবাদ, একেশ্বরবাদ, ত্রিত্বেশ্বরবাদ সহ খ্রীস্ট ইহুদি বৌদ্ধ জৈন ব্রাহ্মণ্য জরুস্টিয় কনফুসিয় ইত্যাকার নানা রকমের ধর্ম-বিশ্বাস-মতবাদ দেশে দেশে প্রচলিত ছিল। এসবের মধ্যে ইসলাম স্থান করে নেয় একদিকে এর মানবিক নীতিগুলোর গুণে যেমন, যার কিছু কিছু অভাব প্রচলিত ধর্ম দর্শনগুলোতে ছিল, অন্যদিকে তেমন রাজনৈতিক অবস্থার বৈগুণ্যে। বাংলায় বখতিয়ারের বিজয়ের পেছনে এদেশের সে-সময়ের অসন্তুষ্ট মানুষের যে-একটি ভূমিকা থাকতে পারে তা কেউ কেউ অনুমান করেন। তবে সে-যুগে এ ধরনের বিজয় ঠিক ধর্ম দিয়ে বিচার করা হত না, হত জাগতিক ধারায় এক রাজার ওপর অন্য রাজার বিজয় হিসেবে। *ভারতবর্ষ ও ইসলাম* গ্রন্থে সুরজিৎ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, এমন কি উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তেও হিন্দু জনসংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণ করে যে, দিল্লি-আগ্রা শত শত বছর তুর্কি-আফগান-মোগলদের অধীন থাকলেও ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম জোর করে প্রচারিত হয়নি। সামন্ত শাসকরা রাজ্য জয় করেছেন আত্মস্বার্থ হাসিলের জন্য, কিন্তু ধর্ম প্রচারিত হয়েছে অনেকটা রাজধর্ম হওয়ায় জাগতিক-বৈষয়িক নানা সুবিধার কারণে আর অনেকটা সুফি-দরবেশ ওলি-আউলিয়া বলে অভিহিত ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপে। তাঁরা ইসলামের মানবিক বাণীগুলো তৃণমূল পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন আপন জীবনাচরণ এবং নানাস্থানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে জনবসতি স্থাপন পূর্বক গণমানুষের আর্থিক সমস্যার সমাধান করে।

এখানেও লক্ষণীয় যে, সুফি-দরবেশ বলে আখ্যায়িত হলেও, এঁদের মধ্যে বেশ কিছু ছিলেন সৈনিক-সমরনেতা-যোদ্ধা অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে একেবারেই ইহজাগতিক মানুষ, যেমন খান জাহান, শাহ ইসমাইল, শাহজালাল প্রমুখ। মোগল সেনাপতি ইসলাম খানও সাধকে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়। তাঁদের ওপর অলৌকিকত্ব পর্যন্ত আরোপিত হয়ে গেছে শ্রুতি-কিংবদন্তির মাধ্যমে। সবকিছুতে, বিশেষ করে যেসব

বিষয়ে একটু-অন্যরকম দেখা যেত স্বাভাবিকতার চেয়ে (যেমন একজন সম্পদশালী মানুষের অনাড়ম্বর জীবনযাপন বা প্রচুর দানখয়রাত করন) তাতেই অলৌকিকত্ব আরোপ করা ছিল সে-যুগের মানুষের এক বিশেষ মানসিক প্রবণতা। এ প্রবণতা অবশ্য আজো বিলুপ্ত হয়নি। পিরের প্রতি আজো অবিচলিত ভক্তি, অস্বাভাবিক কোনকিছুতে অন্ধ বিশ্বাস (যেমন, অমুক দিঘির পানি খেয়ে সব অসুখ ভাল হয়ে যাওয়া) অথবা তবলিগের মত বিবাগি-সংসারত্যাগী হয়ে চলা (যদিও ইসলাম দীনদারি এবং দুনিয়াদারি একসঙ্গেই করতে বলে, স্বয়ং মহানবী ও তাঁর সাহাবারা সে-নীতিই পালন করে গেছেন) এখনো প্রবল একটি উপসর্গ হিসেবেই সমাজে বিরাজমান।

মহানবীর কাছে ওহি নাজিল হওয়া, জিবরাইলের আগমন, জিন অথবা প্রাচীন উদাহরণে প্রদত্ত বিষয় ছাড়া ইসলামে অলৌকিকতার স্থান সামান্যই। তবু মেরাজ কিংবা কথিত সিনা সাফ ও চাঁদ দ্বিখন্ডিত করার মত বিষয়াদি ধরে সাধারণ মুসলমান খুঁজে ফেরে অলৌকিক নানা সূত্র। আল্লাহর বাণী জানানোর জন্য হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর কাছে জিবরাইলের আগমনের মাঝে কেউ কেউ দেখে পিরের প্রয়োজন, আর ওহির মত ব্যাপার তাদের অলৌকিক বিশ্বাসে যেন করে উদ্বুদ্ধ। অন্যদিকে, দীনের জন্য আবদুল কাদের জিলানির মত মানুষদের দুনিয়াদারি সম্পর্কে উদাসীনতার বিষয়টি কাউকে করে তোলে বিবাগি। অথচ তারাই অন্যদিকে দেখে না যে, মেরাজের ব্যাপারে (*ইসলামী বিশ্বকোষ* অনুসারে) বিবি আয়েশা, মুয়াবিয়া এবং শহীদ সৈয়দ আহমদ বলেছেন যে, এটি আধ্যাত্মিকভাবে ভ্রমণ, কোন শারীরিক গমন নয়। তারা এও হয়ত ভাবে না যে, কোরান শরিফে সুরা আহকাফ-এর ৯ সংখ্যক আয়াতে মহানবী বলেছেন যে, তিনি কোন গায়েবি খবর জানেন না। সুরা হা-মীম- এর ৬ সংখ্যক আয়াতে স্পষ্ট বলা আছে যে, তিনি একজন মানুষ। অর্থাৎ অলৌকিক কোনকিছু তাঁর ভেতর নেই।

তবে ইসলামে এমন অনেক বক্তব্য আছে যা খুবই নমনীয় এবং বিস্তৃত পরিসরে ব্যাখ্যাযোগ্য। লা ইকরা ফি দ্বীন কিংবা লা কুম দীনুকুম ওয়ালিয়াদিন অর্থাৎ যার যার ধর্ম তার তার কথার মধ্য দিয়ে যে-সহনশীলতা দেখানো হয়েছে তাতে ধর্মসহিষ্ণুতার বিষয়ই প্রকাশ পায়। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক কেউ যেমন দিতে পার, তেমন হাদিসের অনুশাসন কাকেও ফাসেক বা কাফের না-বলা দেখিয়ে তা থেকে নিবৃত্ত করার কথাও বলতে পারে। দাসকে মুক্তি দানের কথা থাকলেও তা নিষিদ্ধ না-হওয়ায় বাস্তবে প্রচলিতই থেকে যায়। এক বিয়ের প্রতি জোর বক্তব্য থাকলেও চার বিয়ের বিষয়টি ফাঁক ফোকর দিয়ে সমাজে প্রচলিত থাকে। বীর্য মাটি রক্ত পানি ইত্যাদি থেকে মানুষের জন্মের কথা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক বিতর্কও কেউ চালাতে পারে। এমন ধরনের কোন কোন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ভেতর রক্ষণশীল এবং উদারপন্থী, মৌলবাদী এবং প্রগতিশীল মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয়। এভাবেই সৈয়দ আমির আলির মত ব্যক্তিত্ব *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম* লিখে এর মর্মবাণী আধুনিক যুগের উপযোগী করে দেখান। তাঁকে অনুসরণ করেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ *মোস্তফা চরিত* কিংবা গোলাম মোস্তফা *বিশ্বনবী*'তে।

এর বিপরীতে মৌলবাদী ও রক্ষণশীল পর্যায়ে ইসলামকে ব্যাখ্যা করা হয় চোদ্দ শ বছর আগের প্রক্ষাপটে এবং সেই সময়ের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চলে এই বর্তমান কালে। যে-যুগের কথা বলে এখানে মাধুর্যময় এক জগৎ তৈরি করা হয় তা-যে আসলে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে অফুরন্ত সম্পদ আহরণের কারণে এবং তা-যে আজকের দিনে অসম্ভব, এ বাস্তব সত্যটুকু অবশ্য খোলাসা করা হয় না। সে-সময়ও আরবি-আজমি-মাওয়ালিদের মধ্যে যে-অসমতা ছিল, তা জানানো হয় না। এমন কি, বিভিন্ন রাজ্যের এত ধনসম্পদ আহৃত হওয়ার পরও কেবল আরবিয়দেরকেই হজরত ওমরের সময় ভাতা দেওয়ার ব্যাপারটি বেশিদিন চালু রাখা-যে সম্ভব হয়নি (যা এম. এ. কিউ. হোসাইনি *এরাব হিস্ট্রি'তে* জানান) তাও বলা হয় না। বরং খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ও রাজনীতির যে-আবর্ত দেখা যায় আর তাতে চারজনের তিনজন শ্রদ্ধাভাজন খলিফাকেই যেভাবে নানা কারণে আত্মাহুতি দিতে হয় তারও কোন সদর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এসবের ব্যাপারে অস্পষ্ট ধোঁয়াশা যেসব কথার অবতারণা করা হয় তাতে যুক্তিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা মেলে না। আর এসব ব্যাখ্যা প্রদান করে সাধারণভাবে আখ্যায়িত মৌলবাদী মানুষজন, যদিও মৌলবাদ অর্থাৎ মূলে যাওয়ার বিষয় থেকে তারা দূরেই অবস্থান করে। এ প্রসঙ্গে হাসান ফেরদৌস 'মৌলবাদ: বিপদ কোথায়' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, 'মৌলবাদী রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ধর্মের অতি সংকীর্ণ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সামাজিক ও রাজনীতিকভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য অনুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।' এবং এ করতে গিয়ে তাদের কাছে উদারপন্থী ও প্রগতিবাদীরা বাতিল হয় তো বটেই, নিজেদের মধ্যেও নানা ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় মুসলমানিত্বের মৌলিক প্রশ্নেও।

আনিসুজ্জামান 'বাংলাদেশে ধর্ম, রাজনীতি ও রাষ্ট্র' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, '১৯৫৩ সালে জামাতে ইসলামীর উদ্যোগে পাঞ্জাবে আহমেদিয়া বিরোধী যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়, তার তদন্ত কমিশনের প্রধান বিচারপতি মুনীর রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি দেখতে পান, কে যে মুসলমান সে-সম্পর্কে দু'জন আলেম একমত নন। আমরা তখনো দেখেছি, এখনো দেখছি, কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়, তা নির্ধারণের দায়িত্ব কোন কোন রাজনৈতিক দল আত্মসাৎ করেছেন। নিজেকে মুসলমান বলে অভিহিত করলে চলবে না, আল্লাহ্ রসুল কোরআনে বিশ্বাস ঘোষণা করলে চলবে না, ওইসব দল ছাড়পত্র না-দেয়া পর্যন্ত কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করতে পারবে না। কে মুসলমান, কে মুসলমান নয়, সে-বিচারের ভার তাঁরা আল্লাহর ওপরেও ছেড়ে দিতে রাজি নন, কেননা তাদের লক্ষ্য যতটা রাজনীতি, ততটা ধর্ম নয়।' ইসলাম ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত—মহানবী স্বয়ং কিংবা খোলাফায়ে রাশেদিনের কার্যকাল এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রদানের বিষয় দেখিয়ে কেউ এ কথা বললেও, সে-সময় ইসলাম রাজনীতিতে যে-প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল (যা উপরে ব্যাখ্যাত হয়েছে) আজকের দিনে অন্যান্য বহু ধর্ম অধ্যুষিত দেশে (যেমন বাংলাদেশে) যেন রাষ্ট্রধর্ম করার মধ্যেই এই অগ্রগতি নিবদ্ধ হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রধর্মের ব্যাপারেও সব মুসলিম রাষ্ট্র একমত নয়। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মতান্তর তো আছেই, যেমন ছবির

বিষয়টি। খাস সউদি আরবেই পাসপোর্টে ছবি না-লাগিয়ে যাওয়া যায় না, এমন কি হজেও না, যদিও ইসলাম ধর্মে প্রতিচিত্র নিষিদ্ধ। আফগানরা মুসলিম হয়েও সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত। এমন কি বর্তমানে বহু মুসলমানেরই ব্যাংকের সুদ গ্রহণে আপত্তি নেই। স্থান কাল এবং পাত্রের ব্যবধানে নিষিদ্ধ এমন বিষয়াদি জীবন-বাস্তবতা থেকেই উদ্ভূত।

এখানেই ধর্মে আসে নবায়নের প্রসঙ্গ। মহানবী নিজেও প্রাচীন কোন কোন বিষয় গ্রহণ করেছেন নবায়নের মাধ্যমে। হজ প্রাচীন একটি প্রথা। তিনি তা গ্রহণ করেছেন ইসলামের আবহ এনে। কাবা ঘরটি প্রাচীন দেবদেবীর বাসস্থান ছিল। তিনি এটি আল্লাহর একক ঘরে রূপান্তরিত করেছেন। ভেঙে ফেলেননি। হজরে আসওয়াদ-এর মত পাথরকেও তিনি ইসলামের জারক রসে সিঞ্চিত করেছেন। প্রথমে তো বহুদিন তিনি জেরুসালেমকেই কেবলা রেখেছিলেন, পরে তা পরিবর্তন করে কাবা'কে করেন। নাম-ধাম পরিচয়ের ব্যাপারেও তিনি পুরানো কিছু ঝেড়ে ফেলে দেননি। মুসলমান না-হলেও হাতেম আত্-তাইয়ের মহানুভবতার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। বস্তুত, তত্ত্বগতভাবে ইসলামের দাবি অতি সামান্য—এর কয়েকটি ফরজ সম্পাদন ও কিছু নীতি-অনুশাসন অনুসরণ, যার মূল উৎস কোরান শরিফ ; কিন্তু ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের দাবি অনেক—সুন্নাহ থেকে ইজমা-কিয়াস-ইজতিহাদ হয়ে একেবারে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা!

অথচ নৃতত্ত্ব আজ তার সামনে মানুষের ক্রমবিকাশের আসল রূপটি একেবারে সাদামাটা ভাবে তুলে ধরছে যার ফলে ধর্মে-কথিত মানব সৃষ্টির বিষয়টি ধাক্কা খাচ্ছে। প্রত্নতত্ত্ব খুঁজে বের করছে ফারাওদের সময়ের প্রকৃত অবস্থা যার জন্য নীল নদে বিলীন হওয়ার কাহিনীটি দাঁড়াচ্ছে অন্যরকম। ভূগোল দেখাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র একইরকম দিবারাত্রি না-হওয়ায় ধর্মীয় অনেক বিধান পালনের অসুবিধা। মহাকাশ বিজ্ঞান চাঁদ কেন, মঙ্গল গ্রহে পর্যন্ত মানুষ গমনাগমনের উদযোগ গ্রহণ করে আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা সমূলে উৎপাটিত করে ফেলেছে। জিনতত্ত্ব মানুষের দেহ সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিচ্ছে—ডলির মাধ্যমে মানুষের প্রতিরূপ মানুষ সৃষ্টির ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গেছে! ইত্যাকার বহু বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যে-হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ক্রমাগত বাড়ছে তাতে রক্ষণশীল মানুষ চোখ বুঁজে থাকার চেষ্টা করলেও বাস্তবে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে সেইসব এন্টিবায়টিক অষুধ কিংবা নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় নানা জিনিস, যা এক হিসেবে নাসারা বা বিধর্মীদের তৈরি বলে ঘৃণায় দূরে ফেলে রাখাই কোন মুসলমানের পক্ষে স্বাভাবিক।

আসলে তত্ত্বমাত্রই অচল এবং অনড় থাকতে চায়, অথচ তত্ত্বমাত্রই স্থান কাল পাত্র নির্ভর। অর্থাৎ যে স্থানে যে-সময়ে যে-মানুষের মধ্যে তা আবির্ভূত হয়, তারই প্রতিফলন ঘটায় সেটি। এ একটি বিশেষ সমাজের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসে এবং এতে সে-সময়ের বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। ইসলামেও আরবিয়দের মধ্যে এর আবির্ভাবকালের সময় যে-চিন্তা-ভাবনা-লোকাচার-কিংবদন্তি-কাহিনী প্রচলিত ছিল তারই চমৎকার প্রতিফলন আছে। তার ওপর আছে এতে স্বয়ং মহানবীর জীবন ও সময়ের ঘটে-যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা-বিষয়-চেতনাধারা। সেই সময় এবং সমাজের সঙ্গে অন্য সময় তুলনা করা অথবা সেই সমাজের অনুরূপ আর একটি সমাজ অন্যত্র কিংবা

অন্য সময়ে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অসম্ভব-কিছু তৈরির চিন্তা কিনা তা বিবেচনার বিষয়। চলমান জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে গেলেই তত্ত্ব বা মতাদর্শকে হতে হয় চলিষ্ণু এবং পরিবর্তনশীল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ-খাওয়াতে না-পারলে তা পরিত্যক্ত অথবা ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীতে আবদ্ধ হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। ক্রমশ তা বিলীন হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে যেতে বাধ্য। সময় এবং সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত বা সমন্বয়ধর্মী রূপ যেটি ধারণ করে তার মধ্যে নতুন অনেক উপাদান এসে একে ভিন্ন এক রূপ দান করে। বাংলাদেশে বা ভারতে ইসলাম ধর্মের বৈচিত্র দেখে একে কেউ খিচুড়ি ধরনের বললেও, এ-যে সমাজ, সময় এবং ব্যক্তিমানুষের জীবন্ত এক অবস্থার অভিব্যক্তি তা হয় সে ভুলে যায়, নয় ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতরূপে বিষয়টি উপস্থাপন করে।

প্রকৃত বিচারে মানুষের জীবনাশ্রিত-জীবনঘনিষ্ঠ কোন জীবনদর্শনই অনমনীয় এবং চিরস্থায়ী কিছু হতে পারে না। নানা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একে চলতে হয়। এক মানুষ অন্য মানুষের সংস্পর্শে যেমন আসে বা আসতে বাধ্য হয়, এক সমাজও তেমনভাবেই অন্য সমাজের স্পর্শে আসে। আলাদা একক দ্বীপবাসী হয়ে কিছুদিন থাকা সম্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত তা থাকতে পারে না। চীন জাপানের মত দেশও 'ক্লোজড ডোর' অর্থাৎ রুদ্ধ দুয়ার নীতি নিয়ে থাকতে পারেনি। ইসলাম আসার আগে এই দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলসমূহও অনেকটা এমন ধারায়ই ছিল। তারা বাইরের কোনকিছুকেই তেমন গণ্য করত-না বলে আল বেরুনি জানিয়েছেন। কিন্তু গণ্য না-করে পারেনি। ইরানি-তুর্কি-আফগান-মোগলরা এসে যুক্ত করে একে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে। আজকেও কোন দেশ জাতি বা জীবনদর্শন বদ্ধকুঠুরিতে আবদ্ধ করে নিজেকে রাখতে পারছে না। স্বার্থান্বেষীরা তাদের স্বার্থে সাময়িকভবে আটকে রাখতে পারলেও, তা শেষ পর্যন্ত থাকতে পারে না, মাঝখান থেকে অপূরণীয় ক্ষতি হয় সেই জাতি-গোষ্ঠীর।

ইসলাম একটি দর্শন তথা তত্ত্বের নাম, আর এর যারা অনুসারী তাদের নাম মুসলমান। প্রথমটি নৈর্ব্যক্তিক একটি বিষয় আর দ্বিতীয়টি ব্যক্তিমানুষ। ব্যক্তি চালিত হয় বাস্তব নানা অবস্থায় জ্ঞান-লাভের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু তত্ত্বমাত্রই থাকে এর গণ্ডিতে সীমিত। নতুন সময়ের উপযোগী হতে গেলেই আসে এর মূলে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন। আর মূলে ফিরে যাওয়া মানেই সেই তত্ত্বের সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ হওয়া অর্থাৎ এর উদ্ভবের সময়ে প্রত্যাবর্তন। অথচ মানব জীবন বহতা নদী, যাতে দ্বিতীয়বার ডুব দেওয়া অসম্ভব। এর ফলে আসে দ্বন্দ্ব। সেই দ্বান্দ্বিকতার গভীরে নিমজ্জিত হয়ে মানুষ আর তত্ত্বের মাঝে চলে যে-টানাপোড়েন তাতে বস্তুবাদী দর্শনের মূলসূত্র ডায়েলেকটিকস-এ পৌঁছানই বোধকরি এর শেষ পরিণতি।

পরিশিষ্ট

ক

বখতিয়ার খলজি'র নাম নিয়ে সাধারণ্যে বিভ্রান্তি আছে। কেউ কেউ তার পুরো নাম ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বলেন। কিন্তু এই 'বিন' যুক্ত নামটি কে বা কারা-যে প্রবর্তন করেছিলেন ঠিক বলা মুশকিল। বাংলাদেশ বা সারা বাংলা'র ওপর প্রামাণ্য গ্রন্থ *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিন যুক্ত করে তাঁর নাম লেখা হয়নি, হয়নি এমন কি এর আকর গ্রন্থ *তবকাত-ই-নাসিরি* তেও। এইচ. জি. রেভার্টি-কৃত এর ইংরেজি অনুবাদে একটি 'ই' যুক্ত করে মুহম্মদ-ই-বখতিয়ার লেখায় হয়ত এই বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে—'ই' 'বিন'-এর সংক্ষেপ ভেবে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি যে সঠিক নয় তা সুখময় মুখোপাধ্যায় *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব* গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে যুক্তিসহকারে লিখেছেন। তিনি তাঁকে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি বলেই উল্লেখ করেছেন। আ. ক. ম. যাকারিয়া অনূদিত *তবকাত-ই-নাসিরিতে* রেভার্টিকেই অনুসরণ করা হয়েছে, তবে বঙ্গানুবাদের সর্বত্র মুহম্মদ বখতিয়ার হিসেবে লেখা হচ্ছে। অর্থাৎ বিন সংযুক্ত করে তাঁর নাম লেখা হয়নি। বিন লাগালে প্রকৃত পক্ষে বখতিয়ার হন ইখতিয়ারউদ্দিনের পিতা; এবং এ হিসেবে তখন তাঁর নাম হয় ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ, বখতিয়ার খলজি নয়। অথচ মূল কোন গ্রন্থেই এ ধরনের কথা পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমান গ্রন্থে বখতিয়ার খলজি নামটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

খ

খলজি শব্দটির উচ্চারণ ও বানান নিয়ে কথা আছে। শব্দটি খলজি না খিলজি নাকি খালজি এবং এটি হ্রস্বইকার না দীর্ঘইকার দিয়ে লেখা হবে-এ একটি প্রশ্ন। ট্রান্সলিটারেসন অনুসারে এটি খলজি হওয়াই সঠিক বলে মত পেশ করেছেন আরবি-ফারসি বিদ্যা ও মুদ্রা বিশেষজ্ঞ জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করীম। এ মতই গৃহীত হল। বানান হ্রস্বইকারে লেখা হল বাংলা একাডেমি প্রদত্ত প্রমিত বানান-রীতি অনুসারে, সেখানে বিদেশী শব্দের বেলায় হ্রস্বইকার ব্যবহার করাটাই বিধেয় বলে অনুমোদিত। বইয়ের অন্যত্রও এই ধারা অনুসরণের চেষ্টা রয়েছে। তবে অনবধানতাবশত এর হয়ত ব্যত্যয়ও ঘটেছে, সেজন্য দুঃখিত।

গ

বখতিয়ার যে-স্থানটি প্রথম জয় করেন তা নবদ্বীপ নাকি নদীয়া অথবা নওদিয়া বা নওদা-এ নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন আ. ক. ম. যাকারিয়া উল্লিখিত অনুবাদ গ্রন্থে। তিনি অত্যন্ত যুক্তি সহকারে প্রাচীন ধারণা বাতিল করে রাজশাহির রহনপুরস্থ নওদা ও এর আশপাশ অঞ্চল বখতিয়ার-বিজিত নওদা বলে নির্ধারণ করেছেন। সবদিক বিবেচনায় বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। সুখময় মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত গ্রন্থে এটি খণ্ডনের প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু তেমন সফল হয়েছেন বলা যাবে না। এ গ্রন্থে যাকারিয়ার অভিমতটি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বখতিয়ার প্রচলিত নবদ্বীপ বা নদীয়া নয় বরং নওদিয়া বা নওদা অঞ্চলই সর্বপ্রথম দখল করেন যা রাজশাহীর রহনপুরস্থ নওদা নামক স্থানটি হওয়াই সম্ভব।

ঘ

বখতিয়ার কত সালে নওদা জয় করেন এ প্রসঙ্গেও পণ্ডিতরা প্রচুর বিতর্ক করেছেন। আজ সরাসরি কয়েকটি 'গৌড় বিজয়' স্মারক মুদ্রা পাওয়া যাওয়ায় এ নিয়ে কোন মতভেদ নেই যে ১২০৫ খ্রীস্টাব্দেই তিনি গৌড় (তথা লক্ষণাবতী, লক্ষণ সেনের নাম থেকে, পরে যা হয় লাখনৌতি) জয় করেন। নওদা অঞ্চলটি হয়ত এর কিছুদিন (কয়েক দিনও হতে পারে) আগেই দখল করেন। মোটামুটি ১০মে যদি গৌড় বিজয় ধরা যায় তাহলে নওদা বিজয়-যে ১২০৫-এর প্রথম দিকের কয়েক মাসের মধ্যেই হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ হিসেবে ১২০৫ খ্রীস্টাব্দকেই বখতিয়ার খলজির আধুনিক বাংলা অঞ্চলের অংশবিশেষ অধিকারের সময় বলে ধরা যায়।

ঙ

বখতিয়ার কখনোই তৎকালীন 'বঙ্গ' জয় করেননি। আজকের দিনের মত সারা বাংলা অঞ্চলকে (পূর্বে মায়ানমার-আসাম, উত্তরে নেপাল ইত্যাদি, পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়-বিহার ইত্যাদি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর-এর অন্তর্বর্তী যে-ভূখন্ড) বোঝাত না। বঙ্গ বলতে তখন কেবল আজকের দিনের পূর্ববঙ্গ বলে কথিত উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ মোটামুটি বৃহত্তর ঢাকা-ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ -কুমিল্লা-নোয়াখালি জেলার কিছু অংশকে বোঝাত। এ স্থানগুলো বখতিয়ার তো ননই, তাঁর অনেক পরে, প্রায় শত বর্ষ পরে বিজিত হয়। বস্তুত বখতিয়ার কেবল গৌড় এবং এর আশপাশের অঞ্চলগুলোই জয় করেছিলেন মাত্র।

চ

বখতিয়ার কত জন সৈনিক নিয়ে নওদা জয় করেছিলেন—এ নিয়ে প্রশ্ন বিরাট। তিনি মাত্র 'সতের জন অশ্বারোহী' নিয়ে 'নদীয়া' জয় করেন বলে একদা প্রচলিত ছিল। হালে তা আঠার জনে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বখতিয়ার আঠারজন অগ্রবর্তী অশ্বারোহী নিয়ে নওদা দখল করেন—এটুকুই সত্য। এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। এক, 'আঠারজন অগ্রবর্তী' এবং 'অশ্বারোহী নিয়ে'। প্রামাণ্য সব বইতেই আঠারজন আছে, কারা কবে কোথায়-যে সতের জন পেলেন তার হদিস নেই। আঠারজনও নয় বস্তুত, বখতিয়ারকে নিয়ে উনিশজন। তবে কেবল এই উনিশজনই নওদা বিজয় করেন তাও সত্য নয়, তাঁদের পেছনে বহু সৈনিক ছিল এ স্পষ্টই বোঝা যায় *তবকাত* থেকে। এ নিয়ে আ. ক. ম. যাকারিয়া বেশ যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করেছেন। সুতরাং মাত্র কয়েকজন তুর্কি সেনা 'নদীয়া' বা 'বঙ্গ' দখল করেন—এ ঠিক ইতিহাসাশ্রিত কথা নয়।

ছ

বখতিয়ার থেকে মিরজাফর পর্যন্ত যত শাসক-প্রশাসক বাংলা অঞ্চলসহ দক্ষিণ এশিয়ায় রাজত্ব করেছেন তাঁরা একদিকে ধর্মে ইসলাম-অনুসারী এবং অন্যদিকে জাতিগতভাবে তুর্কি হিসেবে চিহ্নিত। তৈমুর লঙকে মোগলদের পূর্বপুরুষ ধরলে তারাও বস্তুত বলতে গেলে তুর্কিই, যদিও মায়ের দিক দিয়ে বাবুর-এ এর সম্পর্ক চেঙ্গিস খান-এর সঙ্গেও ছিল। তাঁদের নাম মোগল হয় সেসময় বহিরাগতদের মোগল নামে ডাকা হত বলে। এর আগের অনেকেই, শের শাহ'র বংশধরগণ তো বটেই, পাঠান বা আফগান হিসেবেও অভিহিত। কারণ, আসলে এঁদের অনেকেই মূলে তুরস্ক থেকে এলেও বহুদিন ধরে আফগানিস্তান অঞ্চলে বসবাসের ফলে এ নামেও পরিচিত হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে, যত মুসলমান শাসক দক্ষিণ এশিয়ায় শাসন করেছেন তাঁরা আদতে ঘুরে ফিরে তুর্কিই বটে। জাতিগতভাবে এদিক দিয়ে বিচার করলে পুরো এ সময়টাকে (বখতিয়ার থেকে মিরজাফর) তুর্কি শাসন আমল বললে ভুল হবে না। বাংলা অঞ্চলের শাসক হোসেন শাহ'র মত দু একজন আরবি বলে দাবি করলেও আসলে তাঁরা আরবি কতটুকু তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

জ

এখানে আরো দু'একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার।

১. এ বইয়ে প্রদত্ত যাঁদের নামের পাশে সুলতান শব্দটি সংযুক্ত আছে তাঁরা স্বাধীন হিসেবে বিবেচিত। তখনকার দিনে এ দ্বারাই স্বাধীনতা বোঝাত। স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই তখনকার দিনে নামাজে তাঁর নামে খুতবা পড়া এবং মুদ্রা জারি ও সুলতান বা বাদশা উপাধি গ্রহণ করা ছিল প্রথাগত ব্যাপার।

২. পাঠকদের সুবিধার্থে এ বইয়ে পারতপক্ষে হিজরি (যাকে কখনো-বা হিজরাও বলা হয়) সন ব্যবহৃত হয়নি। খ্রীস্টিয় সন এত বেশি বর্তমানে এদেশে প্রচলিত যে, প্রাচীন ওই সন অনেকেই জানেন না। এখানে উল্লেখ্য যে, 'ইং' লিখে যে ইংরেজি সালকে বোঝানো হয় তা আসলে ঠিক নয়, কারণ ইংরেজি বলে কোন সাল নেই; ইংরেজরা যে সাল ব্যবহার করে তা হল খ্রীস্টিয় সাল। যীশুখ্রীস্টের জন্ম সাল কেন্দ্র করে এটি প্রচলিত। বর্তমানে এটি আন্তর্জাতিক সাল হিসেবে বিবেচিত। খ্রীস্টাব্দ শব্দটি বইয়ে সংক্ষেপে খ্রীঃ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। খ্রীস্টাব্দ লিখতে ইংরেজিতে সি এইচ ব্যবহৃত হওয়ার দরুন খারফলা দীর্ঘঈকার ব্যবহার করাই ট্রান্সলিটারেসন বা প্রতিবর্ণীকরণ অনুসারে বেশি সঙ্গত বলে মনে হয়। সেভাবেই বানান বাংলায় লেখা হয়েছে।

৩. আরবি ভাষা থেকে বাংলায় ভাষান্তরের বেলায় য আর জ নিয়ে বেশ গোল দেখা দেয়। সাধারণভাবে য লেখাই সঠিক বলে মনে করা হয়। মনে হয় এর মধ্য দিয়েই বোধকরি আরবি ফারসি উচ্চারণের বেশি কাছাকাছি যাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়টি সর্বত্র সব সময় প্রযোজ্য হয় না। বস্তুত হাল্কা উচ্চারণের বেলায় য এবং জোর দিয়ে উচ্চারণের বেলা জ বলাটাই মোটামুটি সঠিক বলে কেউ কেউ মনে করেন।

৪. বইয়ে প্রদত্ত সুলতান ও সুফি-সাধকদের তালিকা আনুমানিক ও সম্ভাব্য হিসেবেই ধরা ঠিক হবে, নতুন নতুন নাম বা নামের/স্থানের পরিবর্তন নতুন তথ্য উপাত্ত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়া খুবই সম্ভব। এ সব নিয়ে গবেষণা এখনও প্রতিনিয়ত চলছে, এজন্য হেরফের হতেই পারে বলে ধরে নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ হাল আমলের গবেষণায় সোনারগাঁ'য় সুলতান আজম শাহ'র কবর নয় তাঁর পিতা সিকান্দর শাহ'র কবর অবস্থিত বলে জানা যাচ্ছে। এ বিষয়ে ইতিহাসবিদ-গবেষক হাবিবা খাতুন নতুন গবেষণা-লব্ধ তথ্য উপস্থাপন করেছেন।